প্রাচীন ভারতে সমাজ ও সাহিত্য

সুকুমারী ভট্টাচার্য

প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৯৪
প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু চাকী
প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
উৎসর্গ মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে

মূল্য: ৩০-০০

প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন

এ গ্রন্থে যে কটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে তাদের যোগসূত্র হল প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বোঝাবার জন্যে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রয়াস। প্রশ্ন ওঠে নিজের মনে: আলোড়িত করে বুদ্ধি ও মননকে; প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের আকুতিতে, সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির টানাপোড়েনে গড়ে ওঠে চিন্তার একটি কাঠামো– তারই প্রকাশ এ প্রবন্ধগুলিতে। এগুলিতে কোনও বিষয় সম্পর্কেই শেষ কথা বলার ধৃষ্টতা নেই; চিন্তার একটি স্তরই মাত্র বিধৃত আছে; চিন্তা চলছে এখনও।

‘ঋগ্বেদ-এর যুগের মানুষ’ ও ‘ঋগ্বেদ-এর সৌরসূক্তে কাব্য’ প্রবন্ধ দুটিতে ওই দুটি প্রসঙ্গে পাঠক সাধারণকে সহজ কথায় একটু আভাস দেওয়ার চেষ্টা আছে। বৈদিক সাহিত্যে নারী’ স্বভাবতই ঋথেদের কালকে ছাড়িয়ে অনেক পরের যুগ পর্যন্ত—বেদাঙ্গ সাহিত্যের শ্রৌতি ও ধর্মসূত্র পর্যন্ত পৌঁছেছে; অর্থাৎ খ্রিস্ট পূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত কালে তা ব্যাপ্ত। বলা বাহুল্য, এই দেড় হাজার বছরের মধ্যে সমাজে নানা কারণে নানা বিবর্তন এসেছে যার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ক্ষুদ্র পরিসরের একটি প্রবন্ধে করা কঠিন; তাই এই রচনাটিতে মোটামুটি একটা দিগদর্শনের চেষ্টাই করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য ও উপনিষদের যুগ’ প্রবন্ধে প্রধানত শংকরাচার্যের ভাষ্যের আবরণ থেকে মুক্ত করে উপনিষদকে দেখবার চেষ্টা আছে এবং মনীষী হিসেবে যাজ্ঞবল্ক্যের একটি দিক দেখবার প্রয়াস। এতে অাছে। যে-যাজ্ঞবল্ক্য জন্মান্তরিবাদের প্রবক্তা, তিনি অবশ্যই ক্ষমতায় আসীন সমকালীন শ্রেণিস্বার্থের মুখ্য মুখপাত্র। এ শ্রেণির মধ্যে ধনিক, ঋত্বিক, দার্শনিক–তিনটি সম্প্রদোয়ই আছে। জন্মান্তর ও কর্মবাদ পরবর্তী সমাজে আড়াই হাজার বছর ধরে কায়েমি স্বার্থকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখবার একটি কুটিল কৌশলরূপে নিপুণ ও সার্থক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এবং এই দুটি তত্ত্বের প্রধান উদ্ভািবক যাজ্ঞবল্ক্য। অপর পক্ষে এই যাজ্ঞবল্ক্যেরই অন্য দুয়েকটি দিকও ছিল, যেখানে তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং যেখানে তার বাণী হয়তো ততটা ক্ষতিকর হয়ে ওঠেনি। তখনও। সেই দিকগুলি উদঘাটন করার জন্যে এই প্রবন্ধ।

‘প্রাচীন ভারতে গণিকা’ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। এখানে প্রাচীন ভারতকে ঋগ্বেদের যুগ থেকে খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত কালের পরিসরে গ্রহণ করা হয়েছে। ‘বৈদিক সাহিত্যে নারী’ প্রবন্ধটির পরিপূরক এই প্রবন্ধটি। প্রায়ই শোনা যায়, প্রাচীন ভারত নারীকে সম্মানের আসনে রেখেছিল। কোমগত বা যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে যার স্থান, আদি সামন্ততান্ত্রিক বা সেই গোত্রেরই

এক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্থান কেমন করে সম্মানের হতে পারে, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে শাস্ত্র থেকে যে তথ্য চোখে পড়ল তা-ই উপস্থাপন করা গেছে। এ প্রবন্ধে। বলা নিষ্প্রয়োজন, বহু অনুসন্ধানেও নারী-কে সেকালের সমাজে সম্মানের আসনে দেখতে পাইনি। অশিক্ষার অন্ধকারে নির্বাসিত, স্বাধীন অর্থকরী বৃত্তি থেকে বঞ্চিত নারী আপন রূপ-যৌবন ও শ্রমের বিনিময়ে যেখানে অধিষ্ঠিত ছিল তা আর যাই হোক, সম্মানের নয়। ঐ সমাজে একমাত্র স্বাধীন নারী ছিল গণিকা। সন্ন্যাসিনী, পরিব্রাজিক ইত্যাদি যাঁরা শিক্ষিত ছিলেন তারা সমাজের প্রত্যন্তদেশে বিচরণ করতেন, তাদের সংখ্যাও যেমন নগণ্য ভূমিকাও তেমনি গৌণ। মূল সমাজে শিক্ষায় অধিকার ছিল একমাত্র গণিকারই এবং রাষ্ট্রের ব্যয়ে তার শিক্ষা নির্বাহ হত। উপার্জিত অর্থ এবং নিজের দেহের উপরেও তার কতকটা অধিকার ছিল, যা কুলবধুর ক্ষেত্রে অনেক বেশি সীমিত ছিল, অথবা ছিল না। এ অবস্থা যে শোচনীয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যান্য দেশের প্রাচীন সমাজেও ঠিক এই রকমই ছিল সমাজ ব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা সর্বাংশে না হলেও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত সেখানে নারীর ভূমিকা, স্থান, অধিকার, দাবি ও দায়িত্ব মোটের ওপর একই রকম ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রাচীন সমাজেও নারী নির্যাতিত ছিল; পার্থক্য একটাই সে সব দেশের পণ্ডিতেরা আজ দাবি করে না যে তারা নারীকে মাথায় করে রেখেছিল। বলে না। ‘যত্র নার্যস্তু পুজ্যন্তে শ্রীয়ন্তে তত্র দেবতাঃ’ বা নারীরা ‘পূজার্হাঁ গৃহদ্দীপ্তয়ঃ’। গণিকা প্রাচীন ভারতীয় সমাজে, অন্য সব সমাজের মতোই, একান্তরূপে ভোগ্যবস্তু ছিল, কিন্তু এ সমাজ তার সম্বন্ধে মন স্থির করতে পারেনি। তাকে প্রবঞ্চনা করে আত্মরক্ষণ করতে শিখিয়েছে গ্রন্থের পর গ্রন্থে, আর গ্রন্থের পর গ্রন্থে তার প্রতি অপর্যাপ্ত কটুকটব্য করেছে। ঐসব নির্দেশ মেনে আচরণ করার জন্যে। এ প্রবন্ধে এই দ্বৈধতা ও গণিকার সামাজিক অবস্থিতিই আলোচ্য বিষয়।

‘মহাকাব্য মহাভারত’ প্রবন্ধটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ‘নবীনচন্দ্র সেন স্মারক’ বক্তৃতা দুটির সংকলন। মহাভারতই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, এ মতের প্রতিপাদনে অন্যান্য প্রাচীন মহাকাব্যগুলির সঙ্গে তুলনায় মহাভারতের সাহিত্যিক উৎকর্ষ প্রতিপাদনের চেষ্টা এ প্রবন্ধে। এই সূত্রে স্বতন্ত্র ভাবে এ মহাকাব্যটির বৈশিষ্ট্য কোথায় তার কিছু অনুসন্ধান আছে এর কাব্যগত উৎকর্ষ ও জীবনবোধের আলোচনার মধ্যে। মহাভারত জীবনের মূল্যবোধগুলির যে ভাবে পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করেছে, চরিত্রচিত্রণ ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে তার বিশ্লেষণ করে এর কাব্যগত বৈশিষ্ট্যের উচ্চমানের প্রতি বাঙালি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস আছে এতে।

ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের পর্বে দুঃখান্ত পরিণতি ও সংস্কৃত সাহিত্য’ প্রবন্ধটিতে সংস্কৃতে কেন দুঃখান্ত বা বিয়োগান্ত সাহিত্য নেই তার কারণের অনুসন্ধান করা হয়েছে। সংস্কৃত অলংকার গ্রন্থে সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে, সেটিতে তৎকালীন সমাজের সাহিত্য সম্বন্ধে মনোভাবের প্রতিফলন আছে ধরে নিয়ে তার থেকে এবং যে মুখ্য দার্শনিক চিন্তার পটভূমিকায় সাহিত্য রচিত হয়েছে তার প্রভাবের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যের উৎস সন্ধান করা হয়েছে। ‘কাব্যে অলংকারের সীমা’ প্রবন্ধে অলংকার প্রয়োগের সার্থকতা ও তার সীমা নির্ণয়ের চেষ্টা আছে। অর্থাৎ কাব্যে কেন ও কোথায় অলংকার প্রয়োগ সার্থক, কোথায় কাব্য অলংকার-নিরপেক্ষ হয়েই তার চূড়ান্ত সার্থকতা অর্জন করেছে। সেই সীমারেখাটি নিরূপণের উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধটি রচিত।

কালিদাস সম্পর্কে একটিই প্রবন্ধ, ‘কালিদাস কাব্যে কয়েকটি আদিকল্প’। এতে যে সব আদিকাল্প (archetype) কালিদাসের অসামান্য চিত্রকল্প এবং কিছু উপাখ্যানের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল সেগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা রয়েছে। চিত্রকল্পগুলির উৎস সন্ধান করে দেখাতে চেয়েছি যে কোনও কোনওটি দীর্ঘযুগ ধরে গণ-মানসের গভীরে প্রোথিত

থেকে ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কালিদাস তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিপুণ প্রয়োগে এগুলিকে কী ভাবে ব্যবহার করেছেন গভীর ব্যঞ্জনার দ্যোতকরূপে—তাই দেখানো এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত সাহিত্যে একটি অনন্য সৃষ্টি; দেশে এবং বিদেশে এ নাটক বহুল পরিমাণে সমাদৃত। কী কী কারণে এ নাটক এমন বৈশিষ্ট্য ও সমাদর অর্জন করেছে তারই কিছু বিশ্লেষণ 'মৃচ্ছকটিক প্রবন্ধে। এ নাটকে চরিত্রগুলির আলেখ্য, সমাজ ও মানুষ সম্বন্ধে নাট্যকারের বোধ, তার কবিত্বের বিশেষ চরিত্র কী এবং নাটকের মধ্যে কয়েকটি প্রচলিত মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নের দ্বারা তিনি তাঁর জীবন বোধকে কী ভাবে রূপায়িত করেছেনএ সবই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু। সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্লীলতা' একটি বহু-আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনা। অশ্লীলতার সংজ্ঞা ও সীমা নিরূপণ এবং সাহিত্যে তার স্বরূপ কি সে সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার বাইরে কিছু চিন্তার অবকাশ রয়েছে এতে।

'সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্র ও নারী: পঞ্চম থেকে একাদশ শতকে' প্রবন্ধটি 'রণজয় কার্লেকার স্মারক বার্ষিক বক্তৃতারূপে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত। প্রবন্ধটির কালসীমা নিরূপণের হেতু হল গুপ্তসাম্রাজ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থান ঘটে; বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক প্রভাব তখন একান্তই গৌণ হয়ে এসেছে এবং একাদশ শতকে মুসলমান আক্রমণ তখনও হয়নি। এ দুই যুগের অন্তর্বর্তী এই সাহিত্যযুগটিকে খাঁটি হিন্দু মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে হিসেবে দেখা চলে। নারী ও শূদ্র শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে সমাজের একেবারে নিচের তলার জীব; দ্বিজ ও পুরুষশাসিত সমাজে তাদের কোনও রকম কৌলীন্য ছিল না–এই অবস্থার প্রতিবিম্বন তৎকালীন সাহিত্যে কি ভাবে ঘটেছে, কিছু প্রখ্যাত সাহিত্যশিল্পীর রচনা থেকে বেছে নিয়ে তার থেকে অবস্থাোটা বোঝবার চেষ্টা এ প্রবন্ধে। অধিকাংশ কবি ও নাট্যকারই

ধর্মশাস্ত্র-অনুমোদিত মনোবৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত, তবু দু-চারজনের রচনায় নতুন, হয়তো-বা কতকটা যুগাতিবর্তী বোধের পরিচয় পাওয়া যায়, এরা বিশেষ এক অর্থেই তাই তাৎপর্যপূর্ণ।

'সংস্কৃত সাহিত্যে শতককাব্য' একটি বিশেষ গোত্রের সাহিত্যের আলোচনা। যার উদ্ভব ও অবসান একটি অনতিবিস্তীর্ণ যুগের সীমাতে বিধৃত। মহাকাব্যের দৈর্ঘ্য, তার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য বর্জন করে অল্প কয়েকজন কবি খণ্ডকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সাহিত্যপ্রস্থানটির সূত্রপাত কালিদাসের ঋতুসংহার ও মেঘদূত-এ। দীর্ঘ বিবর্তনের পরে সূত্রগত ঐক্য এবং পরম্পর্যরক্ষার দায় এড়িয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু শ্লোক বিষয়গত সূত্রে গ্রথিত হতে থাকে। শতক কাব্যগুলিতে। এগুলির শ্লোকসংখ্যা নুনাধিক একশত হত, তাই এই নামকরণ; যদিও সংখ্যাগত তারতম্য বিস্তর চোখে পড়ে। কয়েকটি প্রখ্যাত শতককাব্যের আলোচনা করে তাদের কাব্যগত মান নির্ণয় করার চেষ্টা ছাড়াও কোন বিশেষ সাহিত্যিক ও সামাজিক অবস্থায় শতককাব্য রচিত হয়েছিল, এ কাব্যের ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্যে তারই বিশ্লেষণ আছে।

এ গ্রন্থে বিষয়গত ঐক্য নিতান্তই ক্ষীণ: প্রাচীন ভারতে সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি মাত্র চিন্তাই সেই অন্তলীন ঐক্যসূত্র। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে রচিত, সে জন্যে বেশ কিছু পুনরুক্তি অনিবার্য ভাবেই রয়ে গেল। পণ্ডিত বা গবেষক এ রচনার উদ্দিষ্ট পাঠক নয়; সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ সাধারণ কৌতুহলী বাঙালি পাঠক-পাঠিকাভাষার ব্যবধানে যাঁরা তাদের অতীত ঐতিহ্য থেকে বহুলাংশে বঞ্চিত— মুখ্যত তাদের উদ্দেশ্যেই এগুলি উপস্থাপিত করা গেল। প্রবন্ধগুলির দ্বারা কারও চিন্তা যদি সামান্য ভাবেও উদ্রিক্ত হয় বা কেউ যদি প্রাচীন ভারত ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ হন। তাহলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করব। এই

আশাতেই জ্ঞান ও চিন্তার দৈন্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও এগুলি প্রকাশে সাহসী হয়েছি।

ঋগ্বেদ-এর দিনের মানুষ

পণ্ডিতেরা বলেন ঋগ্বেদসংহিতা-র রচনাকাল ১২০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। দেবতাদের স্তব ও তাদের কাছে প্রার্থনাই মুখ্যত এর বিষয়বস্তু। অধিকাংশ সূক্তই তৎকালে বা তার পরে যজ্ঞে প্রযুক্ত হত; যদিও চতুর্দশ শতকে বিজয়নগরে যজ্ঞের পুনঃপ্রাদুর্ভাব কালের ভাষ্যকার সায়ণাচার্যও বেশ কিছু সূক্তের কোনও যন্ত্রীয় প্রয়োগ নির্দেশ করতে পারেননি; অর্থাৎ সব সূক্তই যজ্ঞের উদ্দেশ্যে রচিত নয়, যজ্ঞে ব্যবহারও হত না। অধিকাংশ সূক্ত কবিতার মতো স্বতঃউৎসারিত; তাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, ঋগ্বেদসংহিতা পলগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারি-র ন্যায় একখানি কবিতা-সংকলনগ্রন্থ।

সূক্তগুলির গঠনবিন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গ্রিক স্তবের মতো এগুলিরও মূলত তিনটি অংশ:

১. দেবতার রূপবর্ণনা: যার মধ্যে দুটি অংশ; প্রথমত, দেবতার আকৃতি, বেশবাস, অলংকার, অস্ত্রশস্ত্র, রথ ও বাহনের বর্ণনা; দ্বিতীয়ত, দেবতার শৌর্য, কীর্তি ও পূর্বপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহের উল্লেখ।

২. আপ্যায়ন. এ অংশে ভক্ত কী নৈবেদ্যে দেবতার তুষ্টিবিধান করছেন–ভোজ্য পানীয়ে ও স্তোত্রে–তার বিবরণ। নূতন স্তব রচনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয় দেবতাকে, আবার প্রাচীন–পরীক্ষিত ও দৈবশক্তিযুক্ত–স্তবগানেরও উল্লেখ থাকে।

৩. প্রার্থনা: প্রার্থিত বস্তু সারা ঋগ্বেদ জুড়েই এক—বিজয়, শত্রুবিনাশ, পশুধন, স্বর্ণ, স্বাস্থ্য, শস্য, সন্তান, রোগমুক্তি এবং সর্বোপরি দীর্ঘ পরমায়ু। প্রায়ই শোনা যায়, একশো শরৎ বাঁচবার প্রার্থনা: দীর্ঘকাল যেন সূর্যকে দেখতে পাই–জ্যোক চ সূর্যং দৃশ্যে, (১:২৩:২১) অথবা জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম, (১০:৬০:৬)। সূক্তগুলিতে সাধারণ ভাবে একটা আদানপ্রদানের ভাব থাকে; হব্যের বিনিময়ে দেবতা যেন এই পৃথিবীর জীবনকে নিরাপদ ও চিরায়িত করেন। মোটের ওপরে, প্রার্থনা সবই ঐহিক, জীবনমুখীন; পরবর্তীকালের জীবনবিমুখতার চিহ্নমাত্র নেই। এমনকী, স্বর্গের প্রার্থনা— যা পরবর্তীকালে সংযোজিত অংশে আছে–তা-ও ঐহিক জীবনের সুখের ও ভোগের অনিঃশেষ বিস্তার মাত্র।

স্তব ও প্রার্থনাই ঋগ্বেদের তিন-চতুর্থাংশ; এ ছাড়াও গোটা কুড়ি সংবাদ-সূক্ত' আছেদুই বা ততোধিক ব্যক্তির (নদী, দেবতা, মানুষ, অপ্সরা এবং মনুষ্যেতর প্রাণীরও) সংলাপ। এগুলির বিনিয়োগ অর্থাৎ যজ্ঞগত প্রয়োগ নেই। কয়েকটি সূক্তে আছে সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরমাত্মা বিষয়ে অনুসন্ধান–কাল, হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, পুরুষ এবং সৃষ্টির উপাদান ও প্রকরণ সম্বন্ধে। এগুলিতে পাই জীবনের তত্ত্ব সম্বন্ধে সে যুগের মানুষের চিন্তা, উপলব্ধি ও অনুসুন্ধিৎসা।

এ ছাড়াও অন্য ধরনের কিছু সূক্ত আছে যাতে প্রাগঋথেদি যুগের অস্পষ্ট আভাস বিধৃত; যেমন আগ্রীসূক্ত। এগুলিতে অগ্নিকে বিভিন্ন নামে ও ভূমিকায়

আহ্বান করা হচ্ছে। সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে আগুনের ব্যবহারে যে বিস্ময়, সহসা সভ্যতার যে প্রকাণ্ড, প্রবল যুগপরিবর্তন, নিরাপত্তা ও আত্মপ্রত্যয়ের যুগপৎ সম্ভাবনা, অগ্নিরক্ষী আদিম পুরোহিতের মর্যাদা এবং অগ্নির সাহায্যে প্রথম সংক্ষিপ্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান–এ সবই যেন আগ্রীসূক্তের মধ্যে অনুধাবন করা যায়।

ঋগ্বেদ-এর সম্পূর্ণ কোনও সূক্ত 'দানস্তুতি' নয়; অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে রচিত কয়েকটি সুক্তের কতকটা অংশ দানস্তুতি। এগুলি কিন্তু দানের স্তুতি নয়, দাতার প্রশংসা। প্রাচীনকালে কোন যজ্ঞে কোন রাজা কোন পুরোহিতকে কী কী দান করেছিলেন, তারই তালিকা; বলা বাহুল্য, ভাবী দাতাকে প্রচুরতর দানে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। সমস্ত ঋগ্বেদ-এ একটিমাত্র ঋকে দানক্রিয়ার প্রশংসা আছে।

'সূর্যসূক্ত' (১০:৮৫)-তে বিবাহ সম্বন্ধে আচার-অনুষ্ঠান, প্রার্থনা, নববধূ সম্বন্ধে আশংসা (শ্বশুর শাশুড়ি ননদ দেবরের কাছে সম্রাজ্ঞী হয়ো) ও আশীর্বাদ আছে। 'অক্ষসূক্ত' (১০-৩৪)-তে শুনি জুয়াড়ির আত্মগ্লানি ও খেদ: তার স্ত্রীকে অন্যে নিয়ে গেছে, তার পিতামাতা তাকে অস্বীকার করেন, সে নিঃসম্বল, সমাজে অপাঙক্তেয় অতএব রাত্রিচর। 'মণ্ডুক সূক্ত' (৬:১০৩)-র যজীরীয় বিনিয়োগ নেই। এতে শুনি অতি রাত্রে সোমব্যাগে যেমন ব্রাহ্মণরা বেদপাঠ করেন, তেমনিই বর্ষার ভরা পুকুরে ব্যাঙ ডাকছে। যজ্ঞে বেদপাঠ কি তখনই কতকটা যান্ত্রিক ও কৃত্রিম আবৃত্তি বলে মনে হচ্ছিল? ঋগ্বেদ-এর মানুষের বসতির চারি পাশ যে দুর্ভেদ্য অরণ্য পরিবেষ্টিত অঞ্চল ছিল 'অরণ্যানী সূক্তে' হয়তো তারই চিত্র: সে অরণ্যানী 'অঞ্জনগন্ধি, সুরভি, বহু-অন্না, কৃষকের সঞ্চারণরহিত, বন্যপশুর মাতৃস্বরূপিণী।'

ঋগ্বেদ-এ পাই নিসর্গ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম একটি বোধ ও স্বতঃউৎসারিত আনন্দ–আকাশ, সূর্য, রাত্রি, উষা, ঝড়-বৃষ্টি, তৃণভূমি, অরণ্য–সবই এক সহজ আনন্দের বার্তা বহন করত। এদের কাছে। তারই সঙ্গে ছিল জীবন সম্বন্ধে কৌতুহল ও বিস্ময়। সূর্য প্রত্যহ পূর্বকাশে উদিত হয়ে গগন-পরিক্রমা-অন্তে পশ্চিমে অস্ত যায়। বেদের কবি বলেছেন, আকাশে বরুণ সুন্দর একটি সোনার দোলন টাঙিয়ে রেখেছেন–বরুণশচক্র এতংদিবি প্রেস্তুং হিরণ্যায়ং শুভোকম। (৭:৮৭:৫) গো দোহনের পরে দুধে উষ্ণতা দেখে এরা বিস্মিত: কঁচা গরু থেকে রাধা মিষ্টি দুধ আসছে। কালো গরুর থেকে উজ্জ্বল শাদা দুধ নামছে–আ গোরামা সচা। মধুমৎ পক্কামগ্নে। কৃষ্ণা সতী রুশত ধাসিনৈষা জামর্ষেণ পয়সা পীপায়। (৪:৩:৯) অথবা দেবতাকে কবি বলছেন, তুমি কৃষ্ণা ও পাটল গাভীতে উজ্জ্বল শুভ্র দুধ রেখেছ—ত্বমেদধারায়ঃ কৃষ্ণাসু রোহিণীযু চ। পরুকীয়ু রুশৎ পয়ঃ।। (৮:৯৩:১৩)

গ্রামীণ জীবন নানা ভাবেই আপৎসংকুল। ঋগ্বেদ-এ ষোলটি ঋকের পুরো একটি সূক্ত (১:১৯১) সাপবিষ নাশের উদ্দেশ্যে রচিত, নাম ‘বিষনিহঁরণী উপনিষৎ’। সাপ ছাড়া বিছে, বন্যা ও অন্যান্য বিপদের কথাও এখানে আছে। অন্যান্য বহু সূক্তের পটভূমিকায় দেখি শ্বাপদসংকুল হিংস্র বন্যপ্রকৃতি, আদিম অপরাজিত প্রতিকূল প্রকৃতির নানা অপঘাতের কালো পর্দাােটা দুলছে, তারই মধ্যে অপর্যাপ্ত বিস্ময় ও আনন্দ।। সজীব জীবনরসিক মানুষের মনের উচ্ছ্বাসে ঋগ্বেদ সমৃদ্ধ।

ঋগ্বেদ-এ দেবতারা যে যে কারণে প্রশংসিত হচ্ছেন মোটামুটি সেটা তৎকালীন সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা নির্ধারিত, একথা মনে করা যেতে পারে। প্রধান যে গুণটি প্রশংসা পাচ্ছে তা হল শৌর্য, যার দ্বারা শত্রুবিনাশ, লুন্ঠন, শত্রুর স্বর্ণ, পশু,শস্য ও দাস অপহরণ এবং পরাভূতকে দালন ও হত্যা করা যায়। এই

গুণেই ইন্দ্র ঋগ্বেদ-এর এক-চতুর্থাংশ সূক্তে স্তব পাচ্ছেন: যাযাবর আক্রমণকারী আর্যদলের সেনাপতি ও প্রধান যোদ্ধা ইন্দ্র। প্রচুর পরিমাণে মাদক সোম পান করে ইন্দ্র প্রাগার্য গোষ্ঠীর অগণ্য দলপতিকে হত্যা করে, দুর্গ ভেদ করে তাদের নগরে প্রবেশ করে, পশুধন ও অন্যান্য সম্পদ হরণ করে এনে আর্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। এরই জন্যে সারা সংহিতা জুড়ে তাঁর অক্ষয়-গৌরব কীর্তন করা হয়েছে। 'বায়ুবাতাঃ' ও 'পর্জন্য' স্পষ্টতই আর্য সেনাদলের কল্পচিত্র–প্রবল শক্তিমান, দ্রুতচারী, বিজয়ী। 'অশ্বিনৌ' পরোপকারী দুটি বৈদ্যের দেবায়ন— এঁরা বিপন্নকে, রোগীকে, জলমগ্ন বা অগ্নিবেষ্টিত ব্যক্তিকে দ্রুত উদ্ধার করেন। নিরুক্তকার যাস্কও মনে করেন এঁরা আদিতে পুণ্যকৃৎ রাজা ছিলেন। 'ঊষা' সুন্দরী চিরতরুণী। 'বরুণ'বিচারক–অজস্র নেত্র মেলে অহর্নিশ চেয়ে আছেন মানুষের দিকে, দুষ্কৃতকারীকে দণ্ড দেওয়ার জন্যে। 'যম' লোকান্তরিত মানবাত্মাদের নিয়ে তরুচ্ছায়াতলে আপ্যায়ন করেন। বলা বাহুল্য, এ-সব দেবচরিত্রে সমাজের ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভূমিকায় আসীন মানুষের প্রতিফলন দেখা যায়।

পরবর্তী কালে ভারতীয় সমাজে যে-নীতিবোধ ঋগ্বেদ-এ তার চিহ্নমাত্র নেই। উন্নততর কৃষিজীবী সভ্যতার অধিকারী সিন্ধু সভ্যতার মধ্যে যাযাবর পশুচারী আর্যরা তাদের অশ্ববাহিত রথ ও লোহার অস্ত্র বজের জোরে যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রাগার্য গ্রামনগর দখল করে বসবাস করছে–এমন অবস্থায় নৈতিক মান স্বভাবতই পরবর্তী সামন্ততন্ত্র বা শিল্পযুগের মান থেকে স্বতন্ত্র হবে। এ সময়ের মূল্যবোধ যা কিছু যুদ্ধজয়, আত্মরক্ষা, লুঠ ও সমৃদ্ধি বিস্তারের অনুকূল, প্রাথমিক ভাবে তারই পরিপোষক হবে, তাই সমস্ত ঋগ্বেদ-এ অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে ছাড়া পরবর্তীকালের নীতিবোধ অনুপস্থিত। নীতির যা উদ্দেশ্য–সমাজের মঙ্গল ও সংহতিবিধান করা–তা সে যুগের মানুষের মতে যজ্ঞের দ্বারাই সম্পাদিত হত। প্রথম পর্যায়ে যজ্ঞ ছিল যৌথ, সমষ্টিগত

অনুষ্ঠান, পুরো সমাজের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত। কাজেই যজ্ঞ করাই পুণ্য, যজ্ঞ না করা পাপ। এরা বিশ্বাস করত যজ্ঞের দ্বারাই প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়েছিল এবং পরবর্তী যজ্ঞগুলি সেই আদিম সৃষ্টিকৃতিরই অনুকরণ। যে পরাজিত প্রাগার্য গোষ্ঠী ও কৌমগুলিকে আর্যরা 'দাস', 'দস্যু', 'রাক্ষস' বা 'অসুর' বলে অভিহিত করত তাদের দ্বারা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত ও প্রতিক্ষণে ধ্বংস-সম্ভাবী এই সৃষ্টি যজ্ঞের দ্বারাই রক্ষিত হয়, অসুরশক্তি বিনষ্ট হয়ে শুভশক্তি জয়যুক্ত হয়, জীবনপ্রবাহ অক্ষুন্ন থাকে। যজ্ঞই পুণ্য, তাই আর্যবর্ণ যজ্ঞ করে, অযাজী অসুরবর্ণ তাই পাপী; এর বাইরে পানিপুণ্যের বোধ নিতান্তই ক্ষীণ, অস্পষ্ট।

এই কারণে আজ যাকে পাক বা অন্যায় মনে করা হয় তার অনেক স্পষ্ট অসংকোচ উষ্চারণ ঋগ্বেদ-এ পাওয়া যায়। শত্রুমর্দনে অকুণ্ঠিত আনন্দ বহু ভাবে প্রকাশ পেয়েছে বৃত্র ও অন্যান্য অসুরদের প্রসঙ্গে; বৃত্রকে ইন্দ্র কুপিয়ে কেটেছেন যেমন করে কুঠার দিয়ে ছেদক গাছের ডাল কাটো। (১:৩২:৫) শত্রুর সম্পত্তি হরণ সম্বন্ধেও কোনও দ্বিধা নেই, বারবার বলা হয়েছে, ওদের সর্বনাশ কর। যারা আর্যব্রত (= যজ্ঞ) সম্পাদন করে না তারা মরুক, তাদের ধন আমাদের এনে দাও। (৮:৯৭:৩) জনজাতি কীকটদের গাভী থেকেই-বা কি হয়? আশির (সোমরস আর দুধ বা দইয়ের মিশ্রণ) হয় না, (প্রবর্গ্যযাগের) পাত্রে তাদের দুধও ফোটে না। হে মঘবন, প্রমগন্দের ও নৈচাশাখিদের (পতিত) ধন আমাদের এনে দাও। (৩:৫৩:১৪) বণিকদের মন ভেজাও, হে পুষন, ওদের ধন আমাদের এনে দাও। (৭:৫৩:৬)। তোমার আরা' অস্ত্র দিয়ে পণিদের হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করা, ওদের ধন আমাদের এনে দাও। (৭.৫৩.৭)

পুরুষের বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। (১:৬২:১) ফলে, নারীর সপত্নীযন্ত্রণা ছিল, সে জন্যে তাকে বারেবারেই সপত্নীকণ্টক উদ্ধারের জন্যে দেবতাদের

দ্বারস্থ হতে হত। (১০:১৪৫, ১০:১৬০) অবিবাহিতা কন্যার দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে থাকাটা সমাজ অনুমোদন করত না; এমনই এক মেয়ে 'ঘোষা' অশ্বীদের কাছে সে-দুঃখ নিবেদন করেছে। (১০:৩৯:৩) বিধবা নারী যখন গতিপ্রাণ স্বামীর পাশে শুয়ে আছে তখন দেবর এসে বলবে: ওঠ, নারী, এই গীতপ্রাণ মানুষের কাছে শুয়ে আছ, এস, জীবলোকের অভিমুখে চল। যে তোমার হাত ধরছে সে তোমার গর্ভে সন্তান এনে দেবে, তার অভিমুখে এস; (১০:১৮:৪) উপমাতেও দেখি, বিধবা নারী যেমন শয্যায় দেবরের অভিমুখিনী হয়... তেমনই, হে অশ্বীরা, বেদীর ওপরে কে তোমাদের অভিমুখী হয়?–কো বাং শযুত্রা বিধবের দেবরং মর্যোন না যোয্য কৃণুত সধস্থ আ। (১০:৪০:২) সহমরণ তো নয়ই, এমনকী, কঠোর বৈধব্যযাপনাও নয়, সদ্য-বিধবাকে দেবার ডেকে ওঠাত, 'জীবলোকের অভিমুখে এস'–এই বলে। জীবনকে জয়যুক্ত করবার অভীপ্সা– এই পরিস্থিতিতেও— ঋগ্বেদ-এর জীবনমুখীনতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ঋগ্বেদ-এ সমাজচিত্র সরাসরি যত না পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যায় উপমা থেকে। সর্বজনপরিচিত বাস্তবজীবন থেকেই উপমান সংগ্রহ করেন। কবি, কাজেই তার সত্যতা অভ্রান্ত। যেমন বলা হয়েছে: হে অশ্বিনৌ, তোমরা আমাদের অপর্যাপ্ত ধন দাও, যেমন দেয় পরস্ত্রীতে আসক্ত কামুক তার অভিলষিতাকে–জারঃ কনীন ইব চক্ষন্দনঃ। (১:১১৭:১৮) এমনই আবার পর নারীকে গভীর রাত্রে হরণ করতে চলেছে যে-নায়ক সে প্রার্থনা করছে: তার মা ঘুমোক, বাবা ঘুমোক, তাদের কুকুরটা ঘুমোক, জামাতা ঘুমোক, সমস্ত জ্ঞাতিরা ঘুমোক, চারি দিকের লোকেরা ঘুমোক। (৭:৫৫:৫-৮) কতকগুলি উপমার মধ্যে অন্য, প্রাচীনতর, হয়তো ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায়ের সমাজচিত্র পাওয়া যায়। সে-যুগে স্ত্রী স্বামীর আগে আগে চলত, যেমন সূর্যের স্ত্রী উষা চলেছেন, বা সূর্য উষার পশ্চাতে আসছে, যেন স্ত্রীর পশ্চাতে পুরুষ–

‘উষো যাতি স্বাসরস্য পত্নী কিংবা মর্যো ন যেষামভ্যোতিপশ্চাৎ। (১:১১৫:২) বন্ধুরূপে পাওয়ার জন্য নারীর পিছনে পিছনে ঘুরছে। পুরুষ একথাও উপমায় পাই— বধূয়রির যোষণাম। (৩:৬২:৮) বধু স্বামীকে খুশি করার জন্যে সজ্জাপ্রসাধন করছে–জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।। (৪:৩:২) ‘পুরুষ নিজের বাড়িতে যেমন সুখী’ –এমন উপমা আছে–‘মর্যাইব স্ব ওক্যে’। (১:৯১:১৩) এর থেকে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের সুখশান্তির একটা আভাস হয়তো পাওয়া যায়। এই সমাজে বধু গৃহের অলঙ্কারস্বরূপিণী ছিল–জায়েব যোনাবরম। (১:৯১:১৩) পরবর্তী কালের রচনা দশম মণ্ডলে শুনি: তেমন বধুই সুকল্যাণী হয়, যে বহুজনের মধ্যে নিজের সঙ্গীকে বেছে নেয়–ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎ সুপেশাঃ। স্বয়ংসা মিত্রং বুনতে জনে চিৎ। (১০:২৭:১২) ‘মরুৎরা নানা স্বর্ণ ভরণে অঙ্গসজ্জা করে নেয়, যেমন বর নানা অলঙ্কারে সেজে নেয় বিয়ের দিনে— বরাইবৈদ্রোবতাসোহিরণ্যৈর ভি স্বধাভিস্তন্বঃ পিপিশ্রে। (৫:৬০:৪) কুৎসিত জামাতাকে বারবার ডাকলেও যেমন সে আসতে চায় না তেমন করেই যেন, হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের যজ্ঞে আসতে দেরি কোরো না—-অশ্রীর ইব জামাতা। (৮:৭৬:১০) ইন্দ্র এবং অগ্নি, আমাদের প্রভুত পরিমাণে ধন দিও, যেমন দেয় নিগুণ জামাতা কন্যার পিতাকে কিংবা শ্যালক দেয় ভগিনীর প্রত্যর্থে (১:১০৯:২) এখানে অধুনাপ্রচলিত বরপণের পরিবর্তে কন্যাপণের কথাই দেখতে পাই।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আর্যরা দাসদের প্রচণ্ড তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতেন, যেন তারা মনুষ্যেতর জীব। এ মনোভাব এবং আচরণকে সমর্থন করবার জন্যে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রই দাসদের সমাজে নিচু স্থান দিয়েছেন–যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ। (২:১২:৪) পুরুষসূক্তেও এর সমর্থন: ব্রাহ্মণরা পুরুষের মুখ থেকে, রাজন্য তাঁর বাহু থেকে, বৈশ্য তাঁর উরু থেকে এবং শূদ্র তাঁর পা থেকে সৃষ্ট হয়েছিল। (১০:৯০:১৫)

আমাদের অদ্ভুত একটা ধারণা আছে, বৈদিক যুগের ভারতবর্ষে এত প্রাচুর্য ছিল যে, সমাজে দুঃখী-দরিদ্র ছিল না। ঋগ্বেদের চিত্র এ-ধারণার পরিপোষক নয়। চোরদের কথা বারেবারেই আছে: চোররা যেমন নিজেদের পদচিহ্ন গোপন করে (৫:১৬:৫); আবার চোরের মতো চুপিসাড়ে চলাফেরার কথাও শুনি। (৬:১২:৫) আরও শুনি, সূর্য তাপ দিচ্ছে যেন চোরকে সাজা দিচ্ছে। (৫:৭৯:৯) মনে হয়, প্রচণ্ড তাপে তপ্ত করে–হয়তো ফুটন্ত তেলের কড়াইতে ফেলে বা লোহার কড়াইতে রাখা আগুন বইয়ে (যেমন পরবর্তী কালে উল্লেখ পাওয়া যায়) চুরির অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হত। চুরি ছিল, অভাব ছিল, অবস্থার প্রচণ্ড বৈষম্য ছিল বলে ধনীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অতি সাবধানে রাখতে হত। ‘সোনায় ভরা কলসী যেমন লোকে পুঁতে রাখে তেমনি কুয়োয় পড়ে ছিলেন রেভ, অশ্বীরা তাঁকে উদ্ধার করলেন–হিরণ্যস্যেব কলশিং নিখাতম’। (১:১১৭:১২) পথেঘাটে লোকে ডাকাতের হাতে পড়ত, উপমায় পাই ‘পরিপন্থী’র কথা, যারা ঠেঙাড়ের মতো পথিককে মেরে ধরে লুঠ করে পালাত–পরিপহীব। (১:১০৩:৬) বুড়ো বাপের টাকাপিয়সা ছেলেরা কেড়েকুড়ে নিয়ে নিত এমন কথাও পাই উপমার মধ্যে—পিতুর্ন জিব্রের্বি বেদো ভরন্তঃ। (১:৭০:৯)

সমাজে চুরি যখন ছিল অভাবও ছিল; তার নজিরও আছে। অক্ষসূক্তে সর্বস্বান্ত জুয়াড়ি অনুতাপ করছে জুয়া খেলে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করার জন্যে, সংকল্প করছে এবারে সে কৃষিজীবী হবে। দারিদ্র্য নিবারণ করবার জন্য ভক্ত দেবতার দ্বারস্থ হচ্ছে এমন কথাও দেখছি। তবে যজ্ঞ ক্রমেই অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠছিল এবং কেবল ধনীরই সাধ্য হত এমন ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানের আয়োজন করার। তেমন লোকেরা অবশ্য সামগ্রিক কল্যাণের প্রার্থনা যজ্ঞে প্রয়োগ করবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত বা শ্রেণিগত ভাবে দুঃস্থের যন্ত্রণার গান ওই সব যজ্ঞে প্রযুক্ত হবে–এমন কথা মনে করার কোনও

কারণ নেই। এমন বহু গান নিশ্চয়ই ছিল যা ধনীর বা ব্রাহ্মণের অনুমোদন পায়নি। সে-সব গান হারিয়ে গেছে; হয়তো সেগুলো লোকগাথার মতো দরিদ্রমহলে গাওয়া হত, প্রতিষ্ঠিত বিত্তশালী ব্রাহ্মণ রাজন্যমহলে তার কোনও সন্ধান পাওয়া যাবে না। তবু এক-আধটা চিহ্ন থেকে গেছে: বামদেব বলছেন, তিনি অভাবে পড়ে কুকুরের নাড়িভূড়ি রান্না করে খেয়েছিলেন–অবর্ত্যা শুন আন্ত্রাণি পেচে। (৪:১৮:১৩) সোমযাগে রীতি ছিল, এক শূদ্র সোম বিক্রি করতে আসবে, একটি বাছুরের মূল্যে সোম কেনা হবে। কিন্তু শূদ্রটি যখন বাছুর নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হবে তখন মারধর করে তার কাছ থেকে বাছুরটা কেড়ে নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এটা নিশ্চয়ই সোমযাগের অনুষ্ঠান, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটায় সাধারণ ভাবে সামাজিক মনোভাবের ও আচরণের কোনও প্রতিফলন নেই–এ কথা মনে করা কি ঠিক হবে? যে-সমাজে শূদ্র দাস এবং তার একমাত্র কর্তব্য অন্য তিন বর্ণের সেবা সেখানে তার যে কোনও নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অধিকার থাকবে না তা সহজেই বোঝা যায়। ঈষৎ পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ’ সাহিত্যে একথা স্পষ্টই প্রমাণিত। ঋক্‌সংহিতাকালে দাস’ ‘দস্যু’ অবর বর্ণের’ অর্থাৎ পরাজিত প্রাগার্য জাতি ও গোষ্ঠীগুলির স্থান অন্যরকম ছিল তা মনে করার কোনও কারণ নেই। দরিদ্র শ্রমজীবীর একটি চিত্র অমর হয়ে আছে: গরিব ছুতোর কাজ করার ক্লান্তি ঔ পিঠের ব্যথার কষ্টে হাই তুলছে— তষ্টেব পৃষ্ট্যামযী উজ্জিহীতে। (১:১০৫:১৮)

আর্যরা যাযাবর পশুচারী সভ্যতার স্তরে থাকবার সময়েই এসে পড়েছিল এদেশে; পরে প্রাগার্যদের কাছে শিখে কৃষিজীবী হয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে ও অতি ধীরে ধীরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোটছোট শহরের পত্তন করে নগর-কেন্দ্রিক গ্রামীণ জনপদের বিস্তার ঘটায়। আদিম কৃষিজীবী সভ্যতায় খাদ্যসংস্থানের কোনও স্থিরতা ছিল না— অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্লাবন পঙ্গপাল ইত্যাদিতে বারেবারেই শস্য উৎপাদন ব্যাহত বিপর্যস্ত হত। বলা বাহুল্য, এতে নিচের তলার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা অনেক বেশি মার খেত; তাদের কান্না

ঋগ্বেদের সুক্তে ধরা পড়েনি। কিন্তু বড় রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যখন উৎপাদন নষ্ট হয়ে যেত, তখন আহার্যসংস্থানের অনিশ্চয়তা সমস্ত সমাজকেই স্পর্শ করত। তাই ঋগ্বেদ জুড়ে অন্নের জন্যে দেবতার কৃপা ভিক্ষা এবং অন্নকে প্রায় দেবত্বে উপনীত করা হয়েছে; প্রথম মণ্ডলের ৮৭তম সুক্তের এগারোটি ঋকে পাই অন্নের স্তব–স্বাদো পিতো মধ্বো পিতো বয়ং ত্বা হবামহে।

সমাজে বাণিজ্য প্রচলতি ছিল এবং সেখানে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতারণা, শঠতাও ছিল। ইন্দ্রের মূর্তি নিয়ে কেনাবেচা চলছে; বিক্রেতা ক্রেতার কাছে গিয়ে পণ্য (ইন্দ্রমূর্তি) ফেরত চাইছে, নইলে আরো বেশি দাম চাইছে এবং ক্রেতা সেটা দিতে অস্বীকার করছে। ইন্দ্রমূর্তির মালিক ফেরি করছে মূর্তি; কে দশটা গরু দিয়ে এই ইন্দ্রকে কিনবে? শত্রুবিনাশ হলে পর আমাকে আবার ফেরত দিয়ে যাবে?—ভূয়সা বস্নমচরৎ কানীয়ঃ, অবিক্রীতো অকনিষং পূণর্যৎ/স ভূয়স কনীয়ো নারিরোচীদীনা দক্ষা বি দুহস্তি প্র বাণম/ক ইমং দশভির্মমেন্দ্রং ক্রীণাতি ধেনুভিঃ/যদা বৃত্রাণি জঙ্ঘনদথৈনং মে পুনর্দাৎ। (৪:২৫:৯, ১০) এ ঠিক কেনাবেচাও নয়, ভাড়া খাটানো; ইন্দ্র শত্রুনাশে দক্ষ–এই বিশ্বাস যে, সমাজে ওতপ্রোত, সেখানে জাগ্রত একটি ইন্দ্রমূর্তি নিয়ে এ ভাবে ব্যবসা চলবে সেটা বেশ কল্পনা করা যায়।

পরবর্তীকালের সমাজে সুরাপান ও মাদকসেবন মহাপাতক বলে গণ্য হলেও দেবরাজ ইন্দ্রের সোমপানে অত্যধিক আসক্তি নিয়ে ঋগ্বেদে কোনো সংকোচ নেই। সৈনিক চিরকালই যুদ্ধকালে মাদক সেবন করে; বিজয়ী বীর আর্যসেনাপতি ইন্দ্রের সোমে রীতিমত নেশা হত। ইন্দ্রকে আহ্বান করা হচ্ছে: তৃষিত গৌর মৃগের মতো সোমপান কর। (১:১৬:৫) প্রলুব্ধ করা হচ্ছে: এই সোম তীব্র মধুমান, এই কাম্য সোম পান করে মত্ত হও। (২:৪১:১৪) ইন্দ্রের জঠর যেন সোমে পূর্ণ হ্রদ (৩:৩৬:৮), সোমপানের তৃপ্তিতে ইন্দ্র দাড়ি

নাড়ছেনপ্রোধুবৎশশুষু গ্রীণানঃ।। (২:১১:১৭) ইন্দ্রের সোমের নেশা নিয়ে অতিশয়োক্তিও পাই: একবারে তিনি ত্রিশ সরোবর পরিমাণ সোম পান করেন– একীয়া প্রতিধাপিবৎ সরাংসি ত্রিংশতম/ইন্দ্রঃ সোমস্য কাণুকা। (৮:৭৭:৪)। সোমযাগ সমাজে বিস্তার লাভ করতে করতে সোম সম্বন্ধে উদ্দীপনা বাড়তে লাগল। সোমের নেশার চমৎকার বর্ণনা নবম (সোম) মণ্ডলে: যেখানে অজস্র জ্যোতি, স্বর্গ যেখানে নিহিত, যেখানে আনন্দ, মোহ, কাম, স্বধা, তৃপ্তি-। হে সোম, সেখানে আমাকে অমৃত কর। (৯:১১৩:৭-১১) সোমপায়ীর মনে সোমের উন্মাদক প্রভাবে যে তুরীয় অবস্থা আসে সেই উপলব্ধিরই বর্ণনা এখানে। বলা বাহুল্য, সোমযাগের প্রচার ও প্রসারের মুলে সোমপানজনিত আনন্দ-উন্মাদনাও কার্যকরী ছিল। 'সত্র' হল দ্বাদশবর্ষব্যাপী সোমযাগ। আরও দীর্ঘতর সোমযাগেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু সত্র বেশ বহুল-অনুষ্ঠিত যজ্ঞ ছিল; সোমযাগের বাইরে অন্যান্য যজ্ঞ এত দীর্ঘকালব্যাপী নয়। এর থেকে সোমপান সম্বন্ধে আগ্রহের একটা পরিচয় পাওয়া যাবে। বেশ কিছু যজ্ঞে সোমের সঙ্গে বা স্বতন্ত্রভাবে সুরাও ব্যবহৃত হত; সাধারণত সে-যজ্ঞের যজমান থাকত ক্ষত্রিয়।

বৈদিক সমাজ বলতে যে সর্বসুখময়, আদর্শ, নিষ্পাপ সমাজের কল্পরূপ সাধারণ ভারতীয়দের মানসলোকে উদিত হয়, ঋগ্বেদ-সংহিতায় চিত্রিত সমাজে তার কোনও সমর্থন নেই। বস্তুত ঋগ্বেদের প্রধান ও অনন্য আকর্ষণ। এইখানেই: সুখে দুঃখে পাপে পুণ্যে সাধারণ সজীব সমাজের যে রূপটি এখানে প্রতিভাত তা ওই বাস্তবনিষ্ঠার জন্যেই এত মূল্যবান। অত প্রাচীনযুগের সমাজের এত পূর্ণায়ত আলেখ্য আমরা অন্যত্র পাই না, হোমারও এর অন্তত তিন শতক পরের। এ কথা সত্য যে ঋগ্বেদ-সংহিতা-য় তৎকালীন সমাজের পূর্ণচিত্র নেই। প্রথমত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমাজ–যেখানে চাষি চাষ করছে, রাখাল গারু চরাচ্ছে, অগণ্য মজুর খাটছে, বহু বিভিন্ন শ্রমশিল্পে–সেই

বৈশ্যশূদ্রের সমাজ এখানে উপেক্ষিত; প্রাসঙ্গিক উল্লেখ বা উপমায় যেটুকু পাওয়া যায়, তা ছাড়া তাদের বিষয়ে কিছুই আমরা জানতে পারি না। ঐশ্বর্যবান রাজা যিনি যজমান, পুরোহিতদের যিনি দক্ষিণা দেবেন–তার কথা ও তীর আশ্রিত ঋত্বিক পুরোহিতদের কথাই এখানে প্রধান ভাবে আছে। দেবচরিত্রের মধ্যে গৌণ অপ্রত্যক্ষ ভাবে সামাজিক মানুষই প্রতিফলিত, এ কথা সত্য। কিন্তু সে চিত্র অনেকটাই অনুমাননির্ভর, অস্পষ্ট। যেটুকু পাওয়া যায় তা অপেক্ষাকৃত বিদ্বান ও বিত্তশালীরই চিত্র।

আর পাঁচটা সমাজে যেমন আদর্শবাদ থাকে তেমনই এ সমাজেও ছিল; আবার অন্য-সব সমাজের মতো এখানে শঠতা, ক্রুরতা, ব্যসন, প্রতিহিংসাও ছিল; অর্থাৎ এখানে পাই সজীব মানুষের সমাজের রূপ। এরা দেবতাকে প্রলোভন দেখিয়ে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করে; এদের দেবতাও প্রলুব্ধ হন, যেমন বৃষাকপি সূক্তে ইন্দ্র বলছেন, বৃষাকপির বাড়িতে আমার জন্যে পনের-বিশটা ষাঁড়ের মাংস রাঁধা হচ্ছে তাই খাব আর সোমরসে জঠর পূর্ণ করব— উক্ষো হিমে পঞ্চদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম/ইতাহমদ্বিগ্ন পীবইদুভা কুক্ষী পূণন্তি মে।।(১০:৮৬:১৪) তেমনই আবার এরা সৃষ্টিরহস্যের আদিবিন্দুতে পৌঁছবার জন্যেও ব্যাকুল। লক্ষ্য করি, তত্ত্বমূলক সূক্ত গুলিতে কি আত্যন্তিক উৎকন্ঠা ঔৎসুক্য নিয়ে এরা জীবনরহস্যের শেষ আবরণখনিকে উন্মোচন করতে উদ্যত। বিত্তগত শ্রেণিবিভাগ, জন্মগত জাতিভেদ–এই বহুধাবিভক্ত সমাজে থেকেও অস্পষ্ট ভাবে একটা সংহতির সন্ধানে অনির্দেশ্য কোনও তত্ত্বগত বৃহতের মধ্যে ভেদাভেদ ঘুচিয়ে মিলে যাওয়ার স্বপ্নে এরা সৃষ্টি করেছে ‘পুরুষকে, ব্রহ্মা’কে, বৃহস্পতিকে, ‘পরমাত্মা’কে। তেত্রিশ কোটি দেবতাকে (১:৪৫:২) হবির্দান করেও সন্ধান করেছে একক কোনও স্রষ্টার। সন্দেহ করে নেম ভার্গবের ভাষায় বলেছে: কে সেই ইন্দ্রকে দেখেছে? কার স্তব করি আমরা?–ক ঈং দদর্শকমভি স্তবামী (৮:১০০:৩) কার উদ্দেশ্যে হবির্দান

করব? কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। (১০:১২১ সূক্তের ধ্রুবপদ) কেই-বা নিঃসংশয়ে জানে, কে বলবে, কোথা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কোথায় উৎস এ সৃষ্টির. সে-ই হয়তো জানে, কিংবা সেও হয়তো জানে না–কো অদ্ধা বেদ কাইহ প্র বোচৎ কুত আজাত কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। ...সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ। (১০:১৩০:৩৬, ৭) মনে হয়, এই সংশয়ে ঋগ্বেদের ঋষি আমাদের কাছে অনেক বেশি সজীব ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেন, কারণ চক্ষুষ্মান মানুষ কোনও যুগেই অন্ধ বিশ্বাসে সব কিছু মেনে নিয়েছে এটা ভাবতে হলে হতাশ লাগত। এবং ঋগ্বেদে মানবিকতার চূড়ান্ত স্বাক্ষর তার জটিল দ্বিধাগ্রস্ত চৈতন্যে, এক ধরনের অক্ষয় মূল্য এই ত্রুটিবিচ্যুতিশীল সংশয়ী মানুষের চিত্রণে। ভক্তির যুগ ছিল না সেটা, বরং ইষ্টসিদ্ধির জন্যে যে এক ধরনের বিশ্বাসের প্রয়োজন, তাই ছিল অধিকাংশের মনে বহুদিন পর্যন্ত। কিন্তু নিশ্চয়ই বহু বহুবার যজ্ঞ করেও অভীষ্ট লাভ হয়নি অথবা কাকতালীয়বৎ লাভ হলেও মানুষের যে সন্দেহ করবার ক্ষমতার মধ্যে তার অগ্রগতির বীজ নিহিত সেই সংশয়, সেই ঐশী অতৃপ্তির পরিচয়েই সে-যুগের মানুষ আমাদের কাছে বাস্তবের চূড়ান্ত স্বীকৃতি পায়।

সমস্ত ঋকে সমস্ত যজ্ঞে ঋগ্বেদন্-এর মানুষ চেয়েছে এই পৃথিবীতে দীর্ঘকাল ধরে সুস্থ নির্বিঘ্ন স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করতে। এই আকুতিই মধ্যযুগের শেষে ভারতবর্ষে আবার উচ্চারিত হয়েছে: আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। দুধভাতের সঙ্গে তার মননের ক্ষুণ্ণিবৃত্তিও সে অপরিহার্যরূপেই চেয়েছে; জানতে বুঝতে উপভোগ করতে চেয়েছে জীবনকে পূর্ণ ভাবে, কারণ তা অভাব্য। ঋগ্বেদ। কখনওই এ কথা বলেনি যে মর্ত্যজীবন বন্ধন, এর থেকে মুক্তিই পরম লক্ষ্য: বরং বারবার দ্বিধাহীন ভাবে ঘোষণা করেছে জীবন আনন্দের, যতদিন ধরে যত ভাবে এ আনন্দ ভোগ করা যায় তারই চেষ্টা করতে হবে। এই মানসভূমিতেই সে দিন রবীন্দ্রনাথ আবার একবার বলেছেন: মরিতে চাহি না

আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। তিন হাজার বছর আগে ঋগ্বেদে উচ্চারিত হয়েছিল। জীবনের লক্ষ্য: জীবাতবে ন মৃত্যবে– বাঁচবার জন্যে, মরবার জন্যে নয়। (১০:৬০:১০)

ঋগ্বেদে-এর সৌরসূক্তে কাব্য

ঋগ্বেদ-এর সৌরসূক্তে কাব্য ঋগ্বেদ-এর ধর্ম এক কথায় সূর্যোপাসনা। বৈদিক আর্যরা যে ধর্ম নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন তার মধ্যে নানা নামে, নানা আকৃতি ও প্রকৃতিতে সূর্যের স্তুতি আছে। এই স্তুতিগুলির একটা আনুষ্ঠানিক উপযোগিতাও ছিল এবং সেটা পুরোপুরি সাহিত্যের প্রয়োজনে নয়; তবু শুধু অনুষ্ঠানের জন্যই সূক্তগুলি রচিত হয়নি, তাই ঋগ্বেদ-এর এই সব মন্ত্রগুলির মধ্যে অনেকখানি স্বতঃ উৎসারিত আবেগ রয়ে গেছে।

মোটামুটি ১৫০০ থেকে ১০০০ বা ৯০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ হচ্ছে ঋক মন্ত্রগুলির রচনাকাল। এ সময়ে সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও আলোচনা শুরু হয়নি, স্বতঃস্ফুর্তি ও স্বচ্ছতা এ কাব্যের প্রধান গুণ। ‘ছান্দাস’ বা বৈদিক ভাষা আজ আমাদের দুর্বোধ্য ঠেকে। রচনা এত বাকসংযত ও সংক্ষিপ্ত যে ভাষ্য ছাড়া বোঝা দুরুহ; কিন্তু সে দিন এ ভাষা কথ্যভাষা থেকে হয়তো বেশি দূরে ছিল না। সহজ আবেগকে তীক্ষ্মতর ও মধুরতর করাই ছিল অলংকার প্রয়োগের উদ্দেশ্য। অলংকার তাই উপলব্ধির প্রকাশকে জটিলতর করে তুলত না, অর্থবোধে ব্যাঘাত জন্মাত না। উপলব্ধির মধ্যেও একটা ঋজু বলিষ্ঠতা এ রচনার বৈশিষ্ট্য। সমাসের প্রয়োগ অত্যন্ত পরিমিত, সন্ধি যথাসম্ভব সহজ ও সুবোধ্য। লেখা আবিষ্কারের আগেকার রচনা, তাই কন্ঠস্থ করার সুবিধার জন্যে অনাবশ্যক জটিলতা সযত্নে পরিহার করা হত। স্বরে পাঠ করা হত অথবা সুরে গাওয়া হত–সেও একটা কারণ যার জন্যে এ কাব্য এত সুখপাঠ্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ঋগ্বেদ-এ আর্যাদের যে জীবনবোধ প্রতিফলিত

হয়েছে তার মধ্যে এমন একটি অকৃত্রিম ও প্রবল আবেদন আছে যাতে মনের মধ্যে সোজাসুজি সংবেদনের সাড়া জাগায়।

সূর্য এদের কাছে ছিল জীবনের প্রতীক; যে জীবন চারিদিকে অন্ধকারের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও আলোর মধ্যে নিত্য জয়যুক্ত হচ্ছে সেই জীবন সূর্যের দান। কৃষিচারী সভ্যতা সূর্যকে অন্নদাতা বলে চিনেছে, বৃষ্টিনির্ভর কৃষির জন্যে তাই কৃষক সূর্যের কাছে যথাকলে বর্ষণ ভিক্ষা করেছে। পশুচারী সমাজ সূর্যের কাছে পশুপালনের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি প্রার্থনা করছে। রোগী রোগমুক্তি ও স্বাস্থ কামনা করছে সূর্যালোকের কাছে মুমূর্ষুদীর্ঘ মৃত্যুঞ্জয় জীবনের স্বপ্ন দেখছে চিরনবীন সূর্যের কাছে। সর্বোপরি সূর্য মানুষের কাছে জীবনের চরম বিজয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে; কারণ প্রতি রাত্রের অন্ধকারের পরে সূর্যের নিঃসংশয় উদয়ের দ্বারা জীবনের উপর মানুষের বিশ্বাস প্রত্যহ জয়যুক্ত হচ্ছে।

যদিও ঋগ্বেদ-এর সমস্ত সৌরদেবতাই হিরণ্যাবর্ণ, স্বর্ণাভবেশ ও হিরন্ময়রথে আরূঢ়, তথাপি তাদের প্রকৃতি ও কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। প্রথমেই ধরা যাক সূর্য। স্তবে বলা হয়েছে, উদ্ধৃত্যদর্শতং বপুর্দিব এতি প্রতিহ্বরো যদীমাশুর্বহতি/দেব এতশো বিশ্বস্মৈ চক্ষসে অরম। (ঋগ্বেদ ৭:৬৬:১৪)—অন্তরীক্ষের কাছে সেই দর্শনীয় মূর্তি উদিত হচ্ছে, দ্রুতগামী অশ্বরা তাঁকে বহন করে; বিশ্বলোকের নয়নরঞ্জন সেই দেব।’ শীষ্ণোঃশীর্ষ্ণোর্জগতস্তস্থূষস্পতিং সময় বিশ্বমা রজঃ/সপ্ত স্বাসারঃ সুবিতায় সূর্যবহস্তি হরিতে রথে (৭:৬৬:১৫)।—সূর্য শীর্ষদেশেরও শীর্ষস্থানীয়, অর্থাৎ ঊর্ধ্বতম লোকে বিরাজিত, সমস্ত স্থাবর জগতের অধিপতি অথচ সর্বলোকের নিকটবতী। জগতের কল্যাণের জন্যে সাতটি দ্রুতগতি অশ্ব তাকে রথে বহন করে আনছে।’ ‘তচ্চক্ষুর্দেবিহিতং শুক্রমুচ্চরৎ পাশেম শরদঃ শথং জীবেম শরদঃ শতম।’ (৭:৬৬:১৬)—সূর্য দেবতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত চক্ষু, তার স্তব করে আমরা একশ শরৎ দেখব, একশ শরৎ বঁচিব।’ ‘নমো মিত্রস্য

বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃতং সপর্যত/দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতনে দিবস্থপূত্রায় সূর্যায় শংসিত। (১০:৩৭:১)–মিত্র ও বরুণের সেই মহান চক্ষুকে যজ্ঞকর্মের দ্বারা উপাসনা কর, তিনি বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পান, দেবতারূপে জাত আকাশের পুত্র ও আকাশের কেতনস্বরূপ সেই সূর্যের স্তুতি কর।' 'সূর্য আকাশকে উন্ধের্ব ধরে রাখছে, যেমন সত্য ধরে রাখছে ভূমিকে। আদিত্যেরা স্থিতিলাভ করছে। ঋতের দ্বারা, আর ঊর্ধ্ব আকাশে বিরাজিত সোম— সত্যেনোত্তভিতা ভুমিঃ সূর্যোণোত্তভিতা দৌ। ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোম অধি শ্রিতঃ।।' (১০:৮৫:১)

সবিতা কথাটির মানে জন্মদাতা, সূর্যবাচক দেবতাদের জন্মদাতারূপে কল্পনা করা হয়েছে সবিতাকে, অর্থাৎ তিনি আলোকসর্বস্ব জ্যোতিষ্কদের উৎপত্তিস্থল। আলোকপূজারী ঋষিরা এঁর কাছে প্রার্থনা করছেন মঙ্গল, নিরাপত্তা ও দীর্ঘায়ুর জন্যে–সবিতা পশ্চাতাৎ সবিতা পুরস্তাৎ সবিতোত্তরাত্তাৎ সবিতাধরাত্তাৎ/সবিতা নঃ সুবতু সর্বতগতিং সবিতা নো রাসতাং দীর্গমায়ুঃ।। (১০:৩৬:১২)–সবিতা আমাদের পশ্চাতে, সম্মুখে, উপরে নিচে থাকুন, সর্বপ্রকার মঙ্গল ও দীর্ঘপরমায়ু দান করুন।' সবিতা হল প্রভাতের সেই মুহূর্তটি, পূর্বকাশের সেই বিন্দুটি যেখানে সূর্যের উদয় সম্ভাবনারূপে নিহিত, রাত্রি ও রাত্রির সমস্ত অমঙ্গলের নিশ্চিত পরাজয় যেখানে সূচিত। তাই ঋকমন্ত্রকার বলছেন–'অদ্যা নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎ সাবীঃ সৌভাগম। পরা দুঃস্বপ্ন্যং সুব।' (৫:৮২:৪)–হে দেব সবিতা প্রজাবৃদ্ধিরূপ সৌভাগ্য। আজ আমাদের প্রদান কর, আর রাত্রির দুঃস্বপ্নকে দূরে প্রেরণ কর।' অন্ধকারভীরু দুঃস্বপ্নকাতর মানুষের এই প্রার্থনা আলোকের কাছে।

অর্যমার সঙ্গে আর্য নামটির সাদৃশ্য আছে। আর্য অর্থাৎ মার্জিত ও সুনীতিপায়ণ আচরণ যাদের, অর্যমা হয়তো আদিতে তাঁদের কুলদেবতা

ছিলেন। দান সম্বন্ধে এক সূক্তে আছে’মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য/নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী। (১০:১১৭:৬)–মুখ কৃপণ যে তার অন্ন বৃথা, আমাদের সখা আর্যমাকে সে পুষ্ট করে না; যে এক অন্ন ভোজন করে সে একই পাপ বহন করে।’ এখানে অর্যমা দান করে ভাগ করে অন্ন ভোগ করবার আর্যজনোচিত আদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত; সূর্যের সঙ্গে এর সংযোগ অনেকটা বাঁকাপথে।

যেমন পূষার। পশুর সঙ্গে হয়তো ভাষাতাত্বিক ভাবে পূষার নামের সংযোগ আছে, কার্যতও ইনি পশুর রক্ষা ও পুষ্টির সঙ্গেই সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত; সূর্যের সঙ্গে এর সংযোগ আপাতদৃষ্টিতে ক্ষীণ। দলছাড়া হারানো পশুকে পথ খুঁজে ফিরিয়ে আনেন পূষা, এই কারণেই পরলোকগত আত্মীয় সম্বন্ধে পূষাকে অনুনয় করে বলা হয়েছে তিনি যেন সেই অপরিচিত জগতে পথভ্রষ্টদের পথ দেখিয়ে দেন। পথের দেবতা পূষা; ইহলোকেও, পরলোকেও। ‘পূষার সোনার নৌকাগুলি আকাশের সমুদ্রে চলাফেরা করে–যাস্তে পূষন্নাবোঃ অন্তঃ সমুদ্রের হিরণ্যায়ীরন্তরিক্ষে চরন্তি!’ (৬:৫৮:৩ ক খ) এই পূষা প্রত্যক্ষ ভাবেই সূর্য, প্রাচীন মিশরের সূর্যদেবতা রা’ যেমন সোনার নৌকায় আনাগোনা করতেন ইনিও তেমনি করেন।

বিষ্ণু পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান দেবতা হয়ে ওঠেন, কিন্তু ঋগ্বেদ-এ বিষ্ণুর স্থান গৌণ। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা।’ (১:২২:১৯ গ) ইন্দ্রের সহচারী সখা বিষ্ণু, স্বতন্ত্র ভাবে এর স্তব খুব কম আছে। ইনি অমিতবিক্রম, যেন পাহাড়ি সিংহ–‘প্রতদ্বিষ্ণু স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।।’ (১:১৫৪:২-ক খ) তাঁর তিনটি বিপুল পদক্ষেপে বিশ্বভুবন সমাশ্রিত— যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।’ (১:১৫৪:২) সাধারণ ভাবে প্রাতঃসূর্য, মধ্যাহ্নসূর্য ও অস্তসূর্য আকাশের–এই তিনটি স্থান

অধিক্রমণের জন্যে সূর্যের ত্রিপাদবিক্রমের কল্পনা। পরবর্তীকালে এরই ওপরে গড়ে উঠেছে বামনাবতারের কাহিনি। এর তৃতীয় পরমপদক্ষেপ মনীষীরা সর্বদা দেখতে পান। বিষ্ণু যেন আকাশে আয়ত একটি চক্ষু–'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ/দিবীব চক্ষুরাততম।' (১:২২:২০)

ঋগ্বেদ-এ সূর্য বলে নারীরূপে একটি সৌর দেবতার সাক্ষাৎ পাই। প্রাচীন জার্মান উপকথায় ও উত্তর ইউরোপীয় দেবকল্পনাতেও এর দেখা পাওয়া যায়। ইনি সবিতার কন্যা; সোমের সঙ্গে এর বিবাহের বর্ণনা ঋগ্বেদ-এর শেষের দিকের একটি সূক্তে আছে। কিংশুকেশল্মলি শোভিত সুদর্শন হিরণ্যবর্ণ সুনির্মিত, সুচক্র রথে আরোহন করে, সূর্য, মঙ্গলময় অমৃতলোকে পতির কাছে যাও–সুকিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যাবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম/আ রোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব।' (১০:৮৫:২০) বিবাহে সমাগত জনতাকে বলা হচ্ছে, এই সুমঙ্গলী বধুকে এসে দেখ, তোমরা ওকে সৌভাগ্য দান করে বাড়ি ফিরে যেও–সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত/সৌভাগ্যমস্যৈ দত্বায়াথাস্তং বি পরেতন।' (২০:৮৫:৩৩) সূর্য ও চন্দ্রের বিবাহ একটি বহু প্রাচীন কল্পনা। সোমের এই সুন্দরী বধুটি সূর্যা; হিমের দেশে যখন আর্যরা বাস করত তখন উষ্ণতার আরামে যে তাঁদের পরিতৃপ্ত করত। সে এই কল্যাণী সূর্য।

ঋগ্বেদ-এর সৌরদেবতার স্তবে চরম কাব্যিকে উৎকর্ষ ঊষার বর্ণনায়। ঊষা সূর্যের সুন্দরী বধু— 'উষো যাতি স্বসরস্য পত্নী' (৩:৬১:৪)। স্তুতিমতী অর্থাৎ স্তুতির অধিকারিণী নিম্নমুখী আরক্তবদনা। এই যে রূপসী ঊষা, ইনি বিস্তৃত দশটি বাহুর মত দশটি দিক উদ্ভাসিত করে চলেছেন–'ইয়ং যা নীচার্কিশী রূপা রোহিণ্য কৃতা/চিত্রেষু প্রত্যাদর্শা ি়েযত্যন্তর্দশসু বাহুষু।' (৮:১০১:১৩) ভোরে যখন মানুষ। লাঙলে নিয়ে ক্ষেতে চাষ করতে যায়। তখন সূর্য উজ্জ্বলকান্তি ঊষার পশ্চাদ্ধাবন করেন, যেমন সুন্দরী নারীর অনুধাবন করে পুরুষ–সূর্যে

দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যোন যোষামভ্যোতি পশ্চাৎ/যাত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম।'(১:১১৫:২)। কেমন দেখায় এই সুন্দরী ঊষাকে? সুসংকশা মাতৃমৃষ্টেব যোষাবিস্তন্বং কৃণুষে দৃশে কম (১:১২৩:১১)— যেন মায়ের নিজের হাতে সাজিয়ে দেওয়া সুরূপী কন্যাটি মানুষের দৃষ্টির সামনে নিজের তনু প্রকাশ করছে।' পূর্ব আকাশে যখন প্রথম ঊষার শুভ্র আলোর আভা বিচ্ছুরিত হয় তখন মনে হয় আকাশের কন্যা। ঊষা যেন রাত্রির আকাশে মান করে উঠে তার শুভ্র তনু আমাদের সামনে উদ্ঘারিত করছে। আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে অপধ্বস্ত করে জ্যোতির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে–'এষা শুভ্রা ন তন্বো বিদানোধের্বর স্নাতী দৃশয়ে নো আস্থাৎ/অপ দ্বেষো বাধ্যমানা তমাংসুযো/দিবো দুহিতা জ্যোতিষাগাৎ।' (৫.৮০.৫)

কিন্তু এই সুন্দরী ঊষার একটা নিষ্ঠুর দিক কবির চোখে পড়েছে; ঋগ্বেদ-এর কবি বারবার এই সুন্দর ও নিষ্ঠুরের দ্বন্দ্বের আভাস দিয়েছেন: যে ঊষা জীবকে পালন করে, যার আগমনে পাখি আকাশ ওড়ে, সেই প্রতিদিন মানুষকে জীর্ণ করে। অর্থাৎ নতুন দিনের মধ্যে গত দিনের অবসান নিহিত বলে প্রতি প্রভাতে ঊষা পরমায়ুর ক্ষয় সুচিত করে। কান্তিমতী রক্তবসনা সুন্দরী একদিকে মনোমুগ্ধকরিণী, অন্যদিকে সে অনায়াস ঔদাসীন্যে মানুষকে একদিন একদিন করে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেয়— 'আ ঘা যোষেব সুনষুষা যাতি প্রভুঞ্জতী জরায়ন্তী বৃজনম।' (১:৪৮:৫) 'পুনঃপুনর্জয়মানা পুরাণী সমানং বর্ণমভিশুম্ভমানা/শল্পীর কৃতুর্বিজ। আমিমােনা মর্তস্য দেবী জরায়ন্ত্যায়ুঃ।। (১:৯২:১০)–পুনঃ পুনঃ উদিত হয়ে পুরাতনী ঊষা একই রূপমাধুর্যে প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু ব্যাধনারী যেমন করে তার শিকার করা পাখির ডানা ছিঁড়ে দেয়, তেমনই করে এই সুন্দরী মর্ত্যমানুষের আয়ু জীর্ণ করছে।' ঊষার চিরযৌবনের সঙ্গে মানুষের পরমায়ু-ক্ষয়ের এই উপলব্ধি হয়তো প্রাচীন ইন্দো-

ইয়োরোপীয় কবিকল্পনার একটি সম্পদ, যার অন্যতম রূপায়ণ চিরনবীনা এয়স ও স্থবির টিথোনসের প্রেম-কাহিনির মধ্যে বিধৃত।

সমস্ত সৌরদেবতার কাছে পর্যায়ক্রমে প্রার্থনা করা হয়েছে মঙ্গল শান্তি ও শ্রী—'শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা/শং নইন্দ্র বৃহস্পতিঃ শং নোবিষ্ণুরুরুক্রেমঃ।' (১:৯০-৯) সূর্য যখন প্রত্যক্ষগোচর তখন মানুষ তাকে দেখছে বীর্যবান, সুন্দর জীবন সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রত্যয়ের প্রতীক; আর সূর্য যখন মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত তখন মানুষ কল্পনা করেছে। সেই অদৃশ্য লোকে সৌরদেবতা, বিষ্ণুর অধিষ্ঠান যেখানে মধুর উৎস–বিষ্ণেঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ' (১:১৫৪:৫) সূর্যের মধ্যে আর্যরা পেয়েছিলেন এক পরম আশ্বাস, নিরাপত্তা, স্থিতি ও শ্রীবৃদ্ধি। তাই তাঁরা বলছেন, 'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুযশ্চ (১:১১৫:১)–স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা হল সূর্য।'

বৈদিক সমাজে নারীর স্থান

এক

মাঝে মাঝেই বক্তৃতায় বা বেতারে শুনি, প্রবন্ধে বা বইয়ে পড়ি প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীর স্থান খুব উঁচুতে ছিল। মুসলিম আক্রমণের পরই নাকি নারীর স্থান সমাজে নেমে যায়। এ সব মন্তব্যের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্যে আমাদের হাতে তথ্য আছে, বিশেষত বৈদিক সাহিত্যে। একেবারে প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক যুগেই নাকি নারীর স্থান খুব উঁচুতে ছিল। বৈদিক সাহিত্য ছাড়া তো সে যুগের কোনও ইতিহাস পৌঁছয়নি আমাদের কাছে, কাজেই সেই সাহিত্যের থেকেই খোঁজ করতে হবে। সত্যি সত্যি নারীর স্থান কতটা উঁচুতে ছিল, এ প্রবন্ধে সেই অনুসন্ধানের চেষ্টা।

বৈদিক যুগ বলতে যে যুগে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল তাই বুঝতে হবে। এ সাহিত্য প্রধানত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্রসাহিত্য, অর্থাৎ, প্রধানত শ্রেণীত, গৃহ্য, ধর্মসূত্রই। আধুনিক সমস্ত পণ্ডিতই প্রাচীনতম বেদ অর্থাৎ ঋগ্বেদ-কে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে দশমের শেষ বা নবমের শুরুর রচনা বলে মনে করেন। যজুর্বেদ ও সামবেদ এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলি খ্রিস্টপূর্ব নবম থেকে সপ্তম শতকের। অথর্ববেদ-এর প্রাচীনতম অংশও এই সময়ের; বাকি অংশ ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও উপনিষদগুলি খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে পঞ্চম শতকের রচনা। সূত্রসাহিত্য সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের মধ্যে রচিত। তাহলে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে খ্রিস্ট্রিয় চতুর্থ শতক এই দেড় হাজারের কিছু বেশি সময়ের সাহিত্যে সমাজের যে চিত্র সংগ্রহ করতে পারি তারই মধ্যে খুঁজব নারীর স্থান। এটাও উল্লেখ করা যায় যে, এর শেষ হাজারখানেক বছরের ইতিহাসে সাহিত্য ছাড়াও অন্য উৎস আছে, যেমন প্রত্নতত্ব, শিলালিপি, তা শাসন, দুটি মহাকাব্য, প্রথম যুগের পুরাণ, বৌদ্ধ সাহিত্য, ইত্যাদি।

যাযাবর পশুচারী আর্যরা এল উত্তরভারতে–যেখানে সিন্ধুসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিন্ধু সভ্যতার লোকরা কৃষিজীবী এবং নগরসভ্যতার যুগে বাস করত, ধাতুর দিকে যুগটা ছিল ব্রোঞ্জ যুগ। ইতিহাসের সাক্ষ্য হল বৈদিক আর্যদের সঙ্গে লোহা ঢোকে ভারতবর্ষে। সম্ভবত ইন্দ্রের বজ্র, যার জোরে আর্যদলের সেনাপতি ইন্দ্র প্রাগার্যদের হারালেন, সেটা ছিল লোহার ফলক যুক্ত কোনও অস্ত্র, যার সামনে প্রাগার্যদের নরম ধাতু অস্ত্র দাঁড়াতে পারেনি। এছাড়াও আর্যদের ছিল ঘোড়ায় টানা রথ, প্রাগার্যদের হাতি তার মত দ্রুতগামী নয়। প্রাগার্যসিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের যে বহির্বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল আর্যরা আসবার পরেই তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আবার শুরু হয় দু তিনশো বছর পরে।

যাযাবর পশুচারী আর্যরা এদেশে এসে ধীরে ধীরে এদের পরাজিত করে প্রায় সমস্ত আর্যবর্ত অধিকার করে। প্রাগার্যদের সঙ্গে বিয়ে ও প্রতিবেশিত্বের মধ্যে দিয়ে আর্যরা ক্রমে চাষ করতে শেখে ও যাযাবর থেকে গ্রামীণ মানুষ হয়ে ওঠে। পোড়া ইটের বাড়ি তৈরি করতে শেখে ও থিতু হয়ে এক জায়গায় বসবাস করতে থাকে। যাযাবরদের সমাজসংস্থা ছিল গোষ্ঠী (tribe) ও কৌম (clam)-তে বিভক্ত। কৃষি শিখে কৃষিজীবী হওয়ার পর এ সমাজগঠন ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে। ক্রমে ক্রমে 'কুল'-এর প্রবর্তন হয়, অর্থাৎ একটা বাড়িতে তিন চার পুরুষের পল্লবিত বৃহৎ পরিবার। তারপর আসে যৌথ পরিবার, পুরুষের সম্পর্ক ধরে দু-তিন পুরুষের পরিবার। সবশেষে একক পরিবার, এক পুরুষের সংসার। এসবের সঙ্গেই উৎপাদন ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, কিন্তু একটি ব্যাপার ক্রমশ পরিণতির দিকে এগোচ্ছিল: সমাজে শূদ্র ও নারীর স্থানের অনিবার্য অবনমন, অর্থাৎ ক্রমেই নারীর স্থান সমাজে ও পরিবারে নেমে যাচ্ছিল। উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশ ক্রমেই কমে যাচ্ছিল। যদিও গৃহকর্মে তার পরিশ্রম ও দায়িত্ব যথেষ্টই ছিল তবু তাকে 'ভার্যা' অর্থাৎ অন্যের দ্বারা ভরণীয়া, স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত এই সংজ্ঞা দেওয়া হল। মনে রাখতে হবে 'ভৃত্য' আর 'ভার্যা' শব্দ দুটোর বুৎপত্তিগত অর্থ একই; যাকে ভরণ করতে হয়। স্ত্রী স্বয়ং অন্ন উৎপাদন করে না, তাই সে ভরণীয়া। (ইংরেজিতে মধ্যযুগ পর্যন্ত স্বামীকে লর্ড বলা হত; এই শব্দও স্ত্রী ও ভৃতে–উভয়ের পক্ষে একই। এবং এরও বুৎপত্তি hlaf ward থেকে, অর্থাৎ অন্ন (hlafloaf/রুটি)-র জন্য যার কাছে আশ্রিত (ward)।

বৈদিক যুগের শেষ দিকে অনেক বৈদেশিক আক্রমণ হয় তার ফলে নারীহরণের ও বর্ণসংকরের আশঙ্কায় নারীকে অন্তঃপুরে ঠেলে দেওয়া হয় ও তখন থেকে নারী অনেক বেশি অসুর্যম্পশ্যা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ঘরে-বাইরে যখন যেখানে কোনও বিপত্তি দেখা দিয়েছে তার দামটা দিতে হয়েছে। শূদ্র

এবং অথবা, নারীকে। নারীর ক্ষেত্রে সেটা কেন এবং কেমন করে ঘটল। তাই দেখব। এ প্রবন্ধে।

দুই

ঋগ্বেদ হল বৈদিক সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ। এখানে সরাসরি নারীর স্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উক্তি নেই। কিন্তু নানা বর্ণনা উপমান থেকে নারীর স্থান সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ঋগ্বেদ-এর রচনায় কয়েকটি স্তর আছে, তার প্রথম স্তরের মন্ত্রগুলিতে নারী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচারিণী। দেবী ঊষা কোনও মন্ত্রে সূর্যের বধূ, কোথাও মাতা, কোথাও কন্যা; বিশ্বজনের দৃষ্টির সামনে আপন দেহশ্রী উদঘাটন করছেন। (১:৪৬:৪) কখনও, বা শুনি ঊষা স্মিতহাসিনী; নববধূ যেমন করে স্বামীর সামনে নিজেকে প্রকাশ করে, ঊষা তেমনই করেই নিজের আবরণ উন্মোচন করছেন। (১:১২৪:৭) সুন্দরী সুসজ্জিত ঊষার দেহটি যেন মায়ের নিজের হাতে স্নান করিয়ে দেওয়া ও সাজিয়ে দেওয়া কন্যার দেহটি। (১:১২৩:১২) শুনতে পাই, অগ্নি তেমনই করে স্তোতার স্তবে খুশি হন। যেমন করে প্রেমিক স্বামী তার বধূর সান্নিধ্যে আনন্দ পায়। (৩:৬২:৮) অগ্নি তেমনই পবিত্র যেমন পবিত্র স্বামীর দ্বারা সম্মানিত বধূ। (১:৭৩:৩) দেখা যাচ্ছে, দেবতার আনন্দ দেবতার পবিত্রতার উপমান, মানবের প্রেম, মানবীর শুচিতা। এই যুগেই শুনি নারী নিজেই তার জীবনসঙ্গী বেছে নেয়–স্বয়ংসা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ। (১০:২৭:১২) আবার একটু পরের যুগে শুনি, প্রিয়া স্ত্রী যেমন প্রিয় স্বামীতে আনন্দ পায়, হে ভগাদেব, তুমি যেন আমাতে তেমনই সুখী হও। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২:৪:৬:৫৬) বহুবার একটি উপমা পাই, উপাসক তার দেবতার কাছে আসছেন যেমন করে কোনও পুরুষ তার কাম্য নারীর কাছে আসে বা তার পেছনে পেছনে যায়–মার্যে ন যোষামভ্যোতি পশ্চাৎ।

(ঋগ্বেদ ৭:৮০:২) আরও অনেক জায়গায় এই ধরনের কথা আছে। ঘৃতধারা সোমের দিকে ধাবিত হচ্ছে যেমন করে অলংকৃত সুন্দরী তরুণী স্বামীর কাছে যায়। (ঋগ্বেদ ৪:৫৮:৯)

যাকে বলা হয় অবৈধ প্রণয়, তা নিয়ে ঋগ্বেদের ঋষির কোনও কুণ্ঠা নেই। অনাদিকাল থেকেই তা সকল সমাজেই আছে, তাই তা যেন সর্বজনস্বীকৃত একটি সামাজিক তথ্য। সেই জন্যে, 'জারো না, উপপতির মত, এই উপমাটি বারেবারেই পাই। যম যমী সূক্ত (১০:১০)-তে ভাইবোনের ও নাভানেদিষ্ঠ সূক্ত (২০:৬১:৫-৭)-তে পিতাপুত্রীর আসক্তির কথা আছে, নাভানেদিষ্ঠে মিলনের উল্লেখও আছে। অর্থাৎ এটা প্রচলিত সমাজনীতির ব্যতিক্রম। মাঝে মাঝে সমাজে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মিলন দেখা যায় বলেই ঋগ্বেদ-এর ঋষিও অকুণ্ঠ ভাবে এর উল্লেখ করেছেন। সোম যজ্ঞপাত্রের দিকে যাচ্ছে যেমন কামুক তার বন্ধুপত্নীর দিকে যায়। (৯:৯৬:২২, ২৩; ১০১:১৪) নদীরা বিশ্বামিত্রের দিকে যাচ্ছে যেমন করে চুম্বনে উদ্যত পুরুষের কাছে নারী আনত হয়। (৩:৪৫:১) সোমরস বসতীবরীর জলে আনন্দিত হয়। যেমন উত্তম নারীর সান্নিধ্যে পুরুষ। আনন্দিত হয়। এমনই অসংখ্য দৃষ্টান্তে নারীপুরুষের প্রেম ও মিলনের অসংকোচ উল্লেখ উপমানে।

নারীর ইচ্ছাক্রমে বা অনিচ্ছাক্রমে নারীহরিণের কথাও ঋগ্বেদ-এ মধ্যেমধ্যে আছে। পুরুমিত্রের কন্যাকে বিমদ হরণ করছেন। (১:১১২:৭; ১১৬:১) কোনও পুরুষ রাত্রে একটি নারীকে হরণ করতে যাবেন তাই প্রার্থনা করছেন, মেয়েটির ভাইয়েরা যেন জেগে না যায়, কুকুরগুলো যেন ডেকে না ওঠে। (৭:৫৫:৫-৮)

বিবাহের কন্যাপণের কথা পাওয়া যায়। ইন্দ্র আর অগ্নি ভক্তকে ধন দেন, অবাঞ্ছিত জামাতা যেমন প্রচুর ধন দিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকদের অনুকূল করে

তাদের প্রতিভাজন হয়। (১:১০৯:২) পুরুষের বহুপত্নীত্বের কথা কখনও স্পষ্টত (৭:২৬:৩) কখনও বা গৌণভাবে, সপত্নীনশনের মন্ত্রগুলির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। কন্যার শরীরে ত্রুটি থাকলে একাধিকবার বরপণের কথা আছে। (৬:২৮:৫, ২০:২৭:১২) কুমারী কন্যার কথাও বেশ কয়েকবার আছে। এদের বলা হত অমাজু বা অমাজুরা, অর্থাৎ যারা বাপের বাড়িতেই বুড়ো হয়ে যায়। কিংবা কুলপা বা বৃদ্ধিকুমারী বা জরৎকুমারী (১:১১৭:৭; ১০:৩৯:৩; ১০:৪০:৫) পরবর্তীকালে বিবাহ যেমন নারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছিল, ঋগ্বেদ-এর যুগে দেখছি তা ছিল না। ঋগ্বেদ-এ সহমরণ, পরবর্তীকালে যাকে সতীদাহ বলা হয়েছে, তার কোনও উল্লেখ নেই; বিধবা বেঁচেই থাকত, কখনও বা দেওরের সঙ্গে তার বিয়ে হত, আর কখনও-বা আর বিয়ে হোতই না। সে যাই হোক তার বেঁচে থাকার অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়া হয়নি, ধর্ম বা সমাজের দোহাই পেড়ে পুড়িয়ে মারাও শুরু হয়নি। দ্বিতীয়বার বিয়ের–দেওর ছাড়া অন্যকেও–অধিকারও স্বীকার করা হয়েছিল, কিছু পরেই তার প্রমাণ দেখতে পাব। বেদ রচনার উত্তরপর্বে অর্থাৎ ঋগ্বেদ-এর প্রথমাংশ রচনার পরে, প্রাগার্য প্রভাবেই হোক বা অন্য কোনও কারণে সামাজিক বিবর্তনের ফলেই হোক, প্রথম সহমরণের কথা শুনি অথর্ববেদ-এ। সেখানে এক জায়গায় শুনি, ‘দেখলাম জীবিত নারীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃতের বধু হতে।’ (১৮:৩:৩২) কিংবা অন্যত্র ‘এই নারী পতিলোকে যাচ্ছে, এ প্রাচীন রীতি অনুসরণ করছে।’ (১৮:৩:১) প্রশ্ন থেকেই যায়, এ প্রাচীন রীতি আর্য না প্রাগার্য; কারণ ইন্দো-ইয়োরোপীয় অন্য সভ্যতাগুলিতে সহমরণের কথা পাই না। এ প্রথা কত প্রাচীন? প্রাগার্য সিন্ধুসভ্যতার? বিধবা বেঁচে থাকলেই সব সময়ে তার জীবন সুখের হত না, তাই প্রার্থনা শুনি, ‘যেন ইন্দ্রাণীর মত অবিধবা হই।’ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩:৭:৫:৫১) এটা তো জানাই আছে, সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে যেন বিপত্নীক না হই’ এমন প্রার্থনা কোথাও নেই। বরং এখন এর উল্টো কথাই শোনা যায়, ‘ভাগ্যবানের বউ মরে,

অভাগার গরু।' সম্পত্তি হিসেবেও স্ত্রীর স্থান গরুর নিচে, কারণ নতুন গরু কিনতে টাকা লাগে, আর নতুন বেঁী আনলে টাকা পাওয়া যায়। এই উত্তর-বৈদিক যুগে নারীর বহু বিবাহের কথাও শোনা যায়। অথর্ববেদ-এ শুনি, 'যে নারীর পূর্বে একজন পতি ছিল সে যখন দ্বিতীয় পুরুষকে লাভ করে তখন পঞ্চৌদন আজ দান করলে তার কোনো ক্ষতি হয় না।' (৯:৫:২৭) অন্যত্র শুনি, 'কোনো নারীর দশটি পতি থাকলেও সে যখন ব্রাহ্মাণের পত্নী হয় তখন সেই ব্রাহ্মাণেই তার পতি, রাজন্য বা বৈশ্য পতিরা পতি নয়।' (৫:১৭:৮, ৯) এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য ব্রাহ্মণ পুরুষের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে অন্য বর্ণের হীনত্ব প্রতিপাদন করা। কিন্তু প্রসঙ্গত কোনও নারীর পক্ষে দশটি স্বামী গ্রহণের স্বীকৃতিও এতে আছে।

তিন

যজুর্বেদ-এর যুগেই সাহিত্যে আর্যপ্রাগার্য সংমিশ্রণের স্পষ্ট চিহ্ন পড়েছে। অবশ্য ঋগ্বেদ-এর প্রথম মণ্ডলের প্রথমার্ধ ও দশমমণ্ডলেই এর সূত্রপাত। ততদিনে আর্যরা গ্রামীণ ও কৃষিজীবী; পোড়াইটের ঘরবাড়ি তৈরি করছে; জনপদে, গ্রামে ও পুর বা শহরে বাস করছে। নানা বৃত্তি অবলম্বন করছে। সমাজে জটিলতা বেড়েছে, গোষ্ঠী ও কৌম ভাঙছে; ধীরে ধীরে যৌথ ও বৃহৎ পরিবারেই সমাজের ন্যূনতম সংগঠন দেখা দিচ্ছে। বহির্বাণিজ্য শুরু হয়েছে। ধনসম্পত্তি বাড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের সংখ্যা ও জটিলতা, পুরে র সংখ্যা ও দক্ষিণার পরিমাণ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। এই সময়ে শুনি, দীক্ষার দিনে যজমানে গণিকাসাহচর্য বর্জন করবেন, তার পরদিন পরস্ত্রীর এবং তৃতীয় দিনে নিজের স্ত্রীর।' (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬:৬:৮:৫) অর্থাৎ দীক্ষার দিনেও

পরাস্ত্রীর সাহচর্য নিষিদ্ধ ছিল না এবং গণিকাগমনের জন্যে দীক্ষার দিনে কোনও প্রায়শ্চিত্ত ছিল না।

যজ্ঞে যজমানের পত্নী পাশে থাকতেন, কিন্তু নিস্ক্রিয় ভাবে। তার উপনয়ন নেই, অতএব, 'ন স্ত্রী জুহুয়াৎ—নারী হোম করতে পারবে না।' (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২:৭:১৫:১৭) অথচ অন্যত্র বারেবারে শুনি, 'পূর্বার্ধো বৈ যজ্ঞস্যাধ্বর্যুর্জঘনার্ধং পত্নী।' (শতপথব্রাহ্মণ ১:৯:২:২; ৩:৪:২২, ৫:২:১-১০) অর্থাৎ যজ্ঞের পূর্বার্ধ যজমান, উত্তরার্ধ যজমানপত্নী। কিন্তু এই অপরটি যজ্ঞে কোনও অংশগ্রহণ করত না; শুধু পাশে বসে থাকত। এতটাই নিস্ক্রিয় তার ভূমিকা যে, রাম সোনার সীতা গড়িয়ে নিয়ে যজ্ঞ নিষ্পাদন করতে পেয়েছিলেন। গৌতম ধর্মসূত্র-তে শুনি, 'অস্বতন্ত্রা ধর্মে স্ত্রী —ধর্মাচরণে নারীর কোনও স্বাতন্ত্র্য নেই।' (১৮:১)

গৃহকর্ম ভিন্ন কোনও বৃত্তি কুলনারীর ছিল না। যে দু'একটি কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে। পশম পাকানো ও বোনা, (শতপথব্রাহ্মণ ১২:৭:২:১১)—অন্যান্য কাজের সঙ্গেই তারা এটি করত। মেয়েদের শিক্ষার প্রসঙ্গে দেখি ব্রহ্মাচর্য—যা বেদ অধ্যয়নের প্রবেশদ্বার—তা বহু প্রাচীন যুগেই নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ। অতএব শিক্ষালাভের পথ তার রুদ্ধ। অথর্ববেদ বলে, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা নারী স্বামী লাভ করে। (১১:৫:১৮)। মনে হয়, এ ব্রহ্মচর্য কোনও ব্রত, বা শিবপুজোর মতোই কিছু, স্বামীলাভই যার উদ্দেশ্য। ঋগ্বেদ-এ কিছু ঋষিকার নাম পাই, হয়তো তাদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষালাভের সুযোগ পেতেন; যেমন বিশ্বব্যারা, ঘোষা, অপালা, ও গোধা। পাণিনিতে আচার্য ও উপাধ্যায়া শব্দের বুৎপত্তিতে অধ্যাপনা রত নারীর উল্লেখ আছে; কাশিকাভাষ্যে কাশকৃৎস্না ও অপিশলার নাম পাই— মীমাংসা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত হিসাবে; অন্তর্ণ ঋষির কন্যা বাক, গার্গী, মৈত্রেয়ী, শাশ্বতী— এদের

কথাও পাই। অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রমের মতো কোনও কোনও নারী শিক্ষার সুযোগ পেতেন। কিন্তু শাস্ত্রের নজির দেখলে বোঝা যায় নারীর শিক্ষার অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছিল। তাই শিক্ষিতা নারীর প্রসঙ্গে বলা আছে, স্ত্রিয়ঃ সতীঃ ত উ যে পুংসঃ আহুঃ।।' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১:১১:৪) অর্থাৎ নারী হয়েও তারা পুরুষ। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যুগ থেকে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়, ক্রমে যে অবস্থা দাঁড়াল তাতে গণিকা ছাড়া শিক্ষাতে আর কোনও নারীর অধিকার ছিল না। অনুমান করা যায়, সঙ্গীত নৃত্য ও চিত্রশিল্পে কিছু কিছুকুমারীর অধিকার ছিল, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা থেকে সাধারণ ভাবে সে বঞ্চিতই ছিল। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল; বৃহদারণ্যকোপনিষদ-এ পণ্ডিত কন্যা পাওয়ার জন্যে পিতামাতার আচরণীয় অনুষ্ঠানের কথাও আছে (৬:৪:১৭); কিন্তু সে ব্যতিক্রমই।

সোমযাগের একটা পর্বে যজ্ঞের কয়েকটি পাত্রকে মাটিতে রাখা হয়, বাকি কয়েকটিকে ওপরে তুলে ধরা হয়; এ প্রসঙ্গে শুনি, 'সেইজন্যে সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে মাটিতে রাখা হয়, শিশুপুত্রকে তুলে ধরা হয়।' (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬:৫:১০:৩) সমাজে নারী জন্মাবধি এই স্থানই পায়–পুরুষের নিচে।

পুরুষের বহুবিবাহ ঋগ্বেদ-এর যুগ থেকেই চলে আসছে। তবে সে সময়ে নারীরাও বহুপতিত্বে অধিকার ছিল, যদিও এ অধিকার সে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হারায়। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-এ পড়ি, যজ্ঞে একটি দণ্ডকে বেষ্টন করে থাকে দুটি বস্ত্রখণ্ড; তাই পুরুষ দুটি স্ত্রী গ্রহণে অধিকারী; একটি বস্ত্রখণ্ডকে দুটি দণ্ড বেষ্টন করে না, তাই নারীর দ্বিপতিত্ব নিষিদ্ধ।' (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬:৬:৪:৩; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১:৩:১০:৫৮) অন্যত্রও শুনি, 'একস্য পুংসো বহেব্যা জায়া ভবস্তি। এক পুরুষের বহু পত্নী হয়।' (শতপথ ব্রাহ্মণ ৯:৪:১৬) বলা বাহুল্য এই ধরনের শাস্ত্র হেতুনির্ণয়ের ছলে যজ্ঞের

বিধিবিধানের দোহাই পাড়লেও আসলে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের প্রচলিত কিছু আচরণের শাস্ত্রীয় সমর্থন জোগানো। এবং, এ ধরনের ব্যাখ্যায় শুধু পুরুষের পক্ষে সুবিধাজনক আচরণেরই সমর্থন পাওয়া যায়। সম্ভবত পূর্ববর্তী কালে প্রচলিত নারীর বহুপতিত্ব এ সময়েই নিষিদ্ধ হতে শুরু হয়। তাই আপাত-যুক্তির মতো এক যন্ত্রীয় অনুষ্ঠানের অনুপুঙ্খকে হেতুরূপে উপস্থাপিত করা হল। এখানে পুরুষের দুটি স্ত্রী গ্রহণের কথা বলা থাকলেও কার্যত পুরুষের বহুবিবাহের অনেক নিদর্শন দেখতে পাই। (ঋগ্বেদ৭:২৬:৩) রাজাদের তো বৈধ পত্নীই থাকত চারটি যজুর্বেদ-এর আমল থেকেই— মহিষী, বাবাত, পরিবৃক্তি (বা পরিবৃত্তী) ও পালাগলী। এ ছাড়াও বহু উপপত্নীও থাকত রাজ-অন্তঃপুরে। মৈত্রায়ণী সংহিতা-য় দেখি মনুর দশটিও চন্দ্রের সাতাশটি স্ত্রী-র উল্লেখ আছে। বহু স্ত্রী থাকলেও তাদের প্রতি সমদর্শিতা নাকি প্রত্যাশিত ছিল, তাই চন্দ্র রোহিণীর প্রতি বেশি অনুরক্ত ছিলেন বলে তার যক্ষ্মা হয়। সেইজন্যে যক্ষ্মার অন্য নাম 'জায়েন্য'। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২:৩:৫:১-৩) বিবাহে কন্যাকে দান করা হত। স্বামীকে নয়, স্বামীর পরিবারকে–'কুলায় হি স্ত্রী প্রদীয়তে।' (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২:১০:২৭:৩)। এর কুফল আজও প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখা যায়—শ্বশুর শাশুড়ি ননদ ভাসুর দেওর সকলে মিলেই বধুকে যে নির্যাতন করে সে তো এই অধিকারেই।

চার

'নারী পুরুষের অপরার্ধ' শুনলে মনটা উল্লসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়। কারণ পরের অংশটা হল, 'সেজন্যে যতক্ষণ সে বধূলাভ না করে ও সন্তান না আসে ততক্ষণ পুরুষ অসম্পূর্ণ।' (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬:১:৮:৫) অর্থাৎ, সন্তানজন্মের জরুরি প্রয়োজনেই নারী পুরুষের অপরাধ,মানসিক বা সামাজিক কোনও সংজ্ঞায় নয়। ঋগ্বেদ-এ সদ্যোবধূকে আশীর্বাদ করা হচ্ছে,

‘শ্বশুর শ্বাশুড়ি দেবীর ননদ সকলের সম্রাজীরী (বা অধীশ্বরী) হ’য়ো।’ (১০:৮৫:৪৬) প্রথমত, বধূটর বাস্তবজীবনে সম্রাস্ত্রীত্ব দুর্লভ ছিল বলেই এ আশীর্বাদ। দ্বিতীয়ত, পরবর্তীর্ণ অসংখ্যশাস্ত্রবচনে এর খণ্ডন আছে। তাই অথর্ববেদ-এ পড়ি, সূর্যোদয় হলে প্রেত তেমন করে ছুটে পালায় যেমন করে পুত্রবধূ শ্বশুরের সামনে থেকে ছুটে পালায়।’’ (৮:৬:২৪) কোনও সম্রাস্ত্রী প্রজার সামনে থেকে কবে এমন করে ছুটে পালিয়েছে? উত্তম নারীর সংজ্ঞা হল, ‘যে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর কথার ওপরে কথা না বলে।’ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩:২৪:২৭) পরবর্তীকালে এমনই কথা দেখি আপস্তম্বধর্মসূত্র-তে (১:১০:৫১-৫৩) এ ছবি আর যাই হোক, কোনও কালে কোনও সম্রাজীরী বা অধীশ্বরীর নয়; বরং দীনতম প্রজার বা দাসীর, যে পুরুষ প্রভুর ভয়ে সংকোচে নেপথ্যাচারিণী।

বিবাহের সব কটি মন্ত্রেই উচ্চারণ করে বলা হয় স্ত্রী যেন চিন্তায় ও কাজে স্বামীর অনুবর্তিনী হয়, স্বামীর চিত্তের অনুগামিনী হয়; কোথাও বলা নেই, স্ত্রীরও চিত্ত বলে একটা কিছু আছে এবং স্বামীকে তার প্রতি অনুকুল হতে হবে। মধ্যে মধ্যে শোনা যায়, সুন্দরী বধূ স্বামীর প্রেম লাভ করে। (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩:১:৯:৬)। এতে বন্ধুকে দেহমাত্রসার করে দেখা হয় এবং তার যে অন্য কোনও আকর্ষণ থাকতে পারে সে কথা শাস্ত্রে কোথাও স্বীকৃতি পায়নি। সহজেই বোঝা যায়, সুন্দরী বধূরও রূপযৌবনে একদিন ভঁটা পড়ে, তখন স্বামীর প্রেমে সে অধিকার হারায়। তাছাড়া ভাটা পড়বার আগেও সুন্দরীতিরা নারী স্বামীর চোখে পড়লে তাকে এনে স্বামী পূর্ববর্তিনীর মর্যাদা খর্ব করে। তাই সপত্নীবিনাশের জন্যে, স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেম পাওয়ার জন্যে বা স্বামীকে বশীভুত করার জন্যে বহুতর অভিচারক্রিয়ার মন্ত্র দেখতে পাই ঋগ্বেদ-এ ও অথর্ববেদ-এ। এ বিপদ সে দিনের নারীর কাছে কত ভয়াবহ রকমে বাস্তব ও সর্বনাশা। হয়ে দেখা দিত তা আজ কল্পনা করাও কঠিন!

নারীর স্থান ক্রমেই অন্তঃপুরের গহনে সরে গেছে। ঋগ্বেদ-এ যোদ্ধা নারী মুদগলিনী, বিশাপলা, বধ্রিমতী, শশীয়সীর কথা পড়ি, যাঁদের কেউ যুদ্ধে আহত কেউবা যুদ্ধে বিজয়িনী। তবুও ঋগ্বেদের প্রথম যুগের পরে প্রকাশ্য সমাজ-জীবনে নারীর আর কোনও ভূমিকা রইল না (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ সালেও মেসেগা অবরোধকালে ভারতীয় নারী যোদ্ধার কথা কাটিয়াস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, ততদিনে এ ভূমিকা ব্যতিক্রম, আপদ্ধর্মে পর্যবসিত)। ব্রাহ্মণের যুগেই নারীকে অবরোধে রাখার কথা শুনি, নইলে তার শক্তিক্ষয় হবে!' (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪:১:১:৩১) এ কোন শক্তি যা শুধু অবরোধে থাকলেই অক্ষুন্ন থাকে? অথর্ববেদে অনেকগুলি 'প্রতিষ্ঠাপন' সূক্ত আছে, এগুলি পলাতকা বা পলায়নে উদ্যতা স্ত্রীকে অন্তঃপুরে ধরে রাখবার জন্যে প্রয়োগ করা হত। কাজেই অন্তঃপুরবাসিনী ক্রমেই বন্দিনী হয়ে উঠছিল।

পাঁচ

গোষ্ঠীবদ্ধ, কৌমাবদ্ধ সমাজ ভেঙে ধীরে ধীরে পরিবার-আশ্রিত বা কুল-বদ্ধ সমাজ প্রবর্তিত হচ্ছিল। একটি বৃহৎ পরিবারের বাসগৃহের নাম 'ফুল', এখানে তিন-চার পুরুষের সংসার। এ সংসারের ছোট ছোট বিভাগে একটি পুরুষকে ঘিরে তার নিজস্ব যে পরিবার সেখানে স্বামীই সর্বময় কর্তা। এবং ওই বৃহৎ যৌথ পরিবারের পরিবেশের মধ্যেই, গুরুজন এবং ছেলেমেয়েদের সামনেই, সে পুরুষ একে একে বহু নারীকে নিয়ে আসছে পত্নীরূপে। এই স্বাধীনতা কিন্তু তার স্ত্রীর নেই, কারণ, 'এক স্বামীর বহু স্ত্রী থাকলেও একটি স্বামীই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩:৫:৩:৪৭) তেমনই খেয়ালখুশি মতো পুরুষ গণিকালয়ে যেতে পারত, তার উপপত্নী ও গণিকা সম্ভোগে সমাজ কোনও বাধা দেয়নি; কিন্তু স্বামীর হাজার দোষ থাকলেও নারী উপপতি গ্রহণ করলে

সমাজে সেটা মহাপাতক বলে গণ্য করা হত। আর গণিকালয়ের মতো কোনও বিকল্প ব্যবস্থা তো নারীর জন্যে কখনওই কোথাও ছিল না।

বিবাহকালে বর বলে, ‘এস আমরা মিলিত হই, যেন পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়, যে সন্তান দ্বারা সম্পত্তিবৃদ্ধি হবে।’ এরই শেষাংশে প্রার্থনা আছে, পুত্র, পৌত্র, দাস, শিষ্য, বস্ত্র, কম্বল, ধাতু, বহু ভার্যা, রাজা, অন্ন ও নিরাপত্তার জন্যে। (হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র ১:৬:১২:১৪) লক্ষ্য করতে হবে যে প্রথমত, বিবাহের সময়েই, নব-বিবাহিত বধুর সঙ্গে এবং তার সামনেই বহু ভার্যার জন্যে প্রার্থনা করা হচ্ছে এবং দ্বিতীয়ত, কতকগুলি ভোগ্য বস্তুর সঙ্গে ‘বহু ভার্যার উল্লেখ। ব্যতিক্রম পুত্র-পৌত্র, শিষ্য ও রাজ্য; এর মধ্যে পুত্র-পৌত্র নিজের ব্যক্তিসত্তাঝুই সম্প্রসারণ,–কালে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরও যাতে বংশধারার বিলোপ না হয়; শিষ্য জীবিকার পক্ষে অত্যাবশ্যক, আর রাজা নিরাপত্তার পক্ষে। নইলে বস্ত্র, কম্বল, ধাতু, দাস ও বহু ভার্যা’ সবই ভোগ্য বস্তু। কন্যা সম্প্রদানের সময়ে মাতামহ পিতামহের উল্লেখ আছে, মাতামহী পিতামহীর নেই, অথচ পিতামাতা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এঁদের অবলম্বন করেই। বিবাহে কন্যা সম্বন্ধে পুরুষের পাঁচটি কাম্যবস্তু, ধন, রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বংশ। এর মধ্যে বিদ্যা ও বুদ্ধির সত্যি কোনও উপযোগিতা আছে কিনা তা নিয়ে বিস্তর তর্ক আছে। (মানবগৃহ্যসূত্র ১:৭৬; অন্যত্রও আছে।)

স্ত্রীর প্রধান প্রয়োজন হল সে সন্তানের জননী এবং তার প্রধান কর্তব্য হল, পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়া। (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১:১০-৫১-৫৩) নিঃসন্তান বন্ধ্যাকে বিবাহের দশ বছর পরে ত্যাগ করা যায়, যে স্ত্রী শুধু কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় তাকে বারো বছর পরে, মৃত্যুবৎসকে পনেরো বছর পরে এবং কলহপরায়ণাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা যায়। (বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২:৪:৬; আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২:৫:১১-১৪, মনুসংহিতা৯:৪) পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে না

পারলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার বিধান বহু প্রাচীন; শতপথ ব্রাহ্মণ-এই পড়ি, ‘যা বা অপুত্রা পত্নী সা পরিবৃত্তী— যে অপুত্রা পত্নী সে পরিত্যক্তা; (৫:২৩:১৩) এবং পুত্রসন্তান না জন্মালে স্বামী আবার বিয়ে করতে পারবে। (বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র ২৮:২-৩) অপরপক্ষে মানবিকতার বোধে অনুপ্রাণিত শাস্ত্রবাক্যও আছে, যেমন কলহপ্রিয়া, অশুচি, গৃহত্যাগিনী, বলাৎকৃতা, চৌরগুহীতা হলেও স্ত্রী ত্যাগ করা চলে না; ভ্রষ্টা স্ত্রীও প্রায়শ্চিত্তে শুচি হয়।’ (বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র ২১:৮–১০) আপস্তম্ব বলেন স্ত্রীপরিত্যাগী স্বামীর কঠোর দণ্ডবিধান করা উচিত। (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১:১০-১৯, ২৮) স্ত্রীকে কটুকথা বললেও একদিন উপবাসের প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। (বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২:২:৬৩, ৬৪) কিন্তু সমাজ এ-বিষয়ে কী ভাবত তার জন্যে উদাহরণ দেখা যেতে পারে। কোনও কোনও ধর্মশাস্ত্রে আছে বলাৎকৃত নারীকে পরের মাস থেকে স্বামী শুচি জ্ঞান করবেন; বশিষ্ঠ বলছেন বলাৎকৃত নারী প্রায়শ্চিত্তে শুচি হন। আপস্তম্ব বলছেন স্ত্রীকে কটুকথা বললেও প্রায়শ্চিত্তের জন্যে একদিন উপবাস করতে হবে। অবশ্য স্বামীকে কটুকথা বললে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ পরিত্যাক্তা হতেন।

সে যাই হোক, রামচন্দ্র তো নিশ্চয়ই এসব জানতেন, বিশেষত যখন শাস্ত্রকাররা তাকে আদর্শ চরিত্র বলেছেন। (রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ–রামের মতো আচরণ করা উচিত, রাবণের মতো নয়)। সেই রামচন্দ্র যদি সত্যি বিশ্বাসও করে থাকেন যে সীতা অশুচি, তাহলেও তো শাস্ত্রানুসারে একমাস পরে তাঁকে শুচি জ্ঞান করতে পারতেন। প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধত্ব সম্পাদন করতে পারতেন, এবং নিজে যে সব অন্যায় ও মিথ্যা কটুকথা সীতাকে বলেছিলেন তার জন্যে তার উপবাস করা উচিত ছিল, এবং স্ত্রীপরিত্যাগী স্বামীর দণ্ডও তার পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ সবের কিছুই তিনি করেননি, আশ্চর্যচরিত্র হয়েও কোনও দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্তও তার হয়নি, কাজেই, অন্যে পরে কী কথা। অর্থাৎ ওইসব মানবিক নির্দেশ ছিল শুধু

শাস্ত্রকারদের সমদর্শিতা' প্রতিপাদনের জন্যে, কার্যক্ষেত্রে পুরুষশাসিত সমাজে ওসব বইয়ের পাতাতেই থাকত। এই ধরনের শুনতে ভাল বিধান আরও আছে, 'ধর্ষিতা নারীকে ধর্ষণকারী বিয়ে না করলে বিধিমতে বিনা পণেই তার বিয়ে হতে পারে।' (বৌধায়ন ধর্মসূত্র৪:১:১৫-১৬) কিন্তু সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে ভ্রষ্টা স্ত্রী সমাজের কাছে দণ্ডবিধান ছাড়া কোনও কিছুই পায়নি। তেমনই একাধিক ধর্মশাস্ত্রকার বলছেন ভ্রষ্টা স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করলে (তাহলে ওইসব উদার শাস্ত্রবাক্য সত্ত্বেও স্বামী তাকে পরিত্যাগ করত) পুত্র তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। স্পষ্টই বোঝা যায়, তথাকথিত যৌন দুর্নীতি সম্বন্ধে সমাজে পরিষ্কার দু'ধরনের বিধান ছিল, একটি পুরুষের জন্যে একটি নারীর জন্যে। নারীর ক্ষেত্রেই যৌন অপরাধ অপরাধ, পুরুষের ক্ষেত্রে সমাজ অনেক প্রশ্রয়শীল ছিল। যে দেশে 'সতী' শব্দের ওই অর্থে কোনও পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দই নেই, সে দেশের সমাজে অন্য রকম কিছু আশা করাও যায় না।

'কুমারী কন্যার পিতা যথাকলে বিবাহ দিতে না পারলে সে তিন বছর (বা তিন মাস) পরে যাকেইচ্ছে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু বিয়ে তাকে কোনও রকম অধিকার দেবে না, সব অবস্থাতেই সে পুরুষের অধীন।' বিশিষ্ঠ ধর্মসূত্র-তে পড়ি, 'পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষিত যৌবনে/রক্ষান্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বতন্ত্র্যামর্হতি।' (৫:১-২, ২২:২, ৩, ৪৪, ৪৫) অর্থাৎ, নারীকে কুমারী অবস্থায় রক্ষা করবেন। পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্ররা; নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়। কত আগে শতপথ ব্রাহ্মণ-এ দেখি, স্ক্রিয়ঃ পুংসো নুবন্মানো ভাবুকাঃ।।' (১৩:২:২৪) অর্থাৎ, নারীর পুরুষের অনুপথগামিনী হওয়া উচিত। বৃহদারুণকোপনিষদ-এ পড়ি, পতিং বা অনুজায়।'(১:১:২:১৪) অর্থাৎ, স্ত্রী স্বামীর পশ্চাতে। মনে পড়ে যায়, ঋগ্বেদ-এ ঊষার বর্ণনা, উষো যাতি স্বাসরস্য পত্নী–সূর্যের পত্নী ঊষা চলেছে।' (১:১১৫:২) কোথায়? সূর্যের বা স্বামীর আগে আগে। তার পরে নদীতে অনেক জল বয়ে গেছে, তখন ব্রাহ্মণ্য

সাহিত্যের যুগে স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী, অধীন। একদিকে বলা হচ্ছে, শ্রিয়া বা এতদুপং যৎ পত্ন্যঃ' (তৈত্তিবীয় ব্রাহ্মণ ৩:৯:৪:১৯), অর্থাৎ পত্নীই হল সমৃদ্ধির রূপ; অন্যদিকে শুনি, তদ্বৈ সমৃদ্ধং যস্য কনীয়াংসো ভার্যা আসন ভূয়াংসঃ পশবঃতারই হল। সমৃদ্ধি, যার পশুপালের চেয়ে স্ত্রীরা সংখ্যায় কম। (শতপথ ব্রাহ্মণ ২৩:২৮) এক তো পশুপালের সঙ্গে একনিঃশ্বাসে উচ্চারিত হল স্ত্রী; দ্বিতীয়ত, কত সংখ্যায় স্ত্রী থাকার সম্ভাবনা থাকলে সে সংখ্যা পশুপালের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

ছয়

নারীকে যথেচ্ছ শাসন ও ভোগ করবার অধিকার শাস্ত্র পুরুষকে দিয়েছে, কিন্তু তার জন্যে দায়িত্ব যা দিয়েছে তা নেহাৎই নগণ্য। বৌধায়নধর্মসূত্র-তে অবশ্য পড়ি, সর্বেষাং বর্ণনাং বন্ধু রক্ষ্যতম ধনাৎ, অর্থাৎ সমস্ত বর্ণেরই উচিত ধনের চেয়ে স্ত্রীকে রক্ষণ করা। (২:৪২) কিন্তু কার্যত যে নীতি অনুসৃত হত তা হল চাণক্যের সেই চূড়ান্ত সুবিধাবাদী নীতিটি: আত্মানং সততং রক্ষেদাঁরৈরপি ধনৈরপি –নিজেকে সর্বদাই রক্ষা করবে, প্রয়োজন হলে ধন বা স্ত্রীর বিনিময়েও ' বৈদিক বা পরবর্তী সাহিত্যে ধনের বিনিময়ে স্ত্রীকে রক্ষণ করার কোনও নজিরই মেলে না। বৈদিক যুগের একেবারে প্রথম পর্বের পরে শিক্ষাতেও নারীর আর অধিকার নেই; কারণ দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া উপনয়নে তার অধিকার নেই। জন্মাবধি তার সম্বন্ধে সমস্ত সংস্কারই আমন্ত্রক; সে নিজে মন্ত্র উচ্চারণে বা হব্যদানে অনধিকারিণী; এবং সে যুগে বিদ্যা তো মন্ত্র দিয়েই হত, কাজেই বিদ্যা অর্জনে তার আর অধিকার রইল না। অমন্ত্রক বিদ্যা অর্থাৎ সামান্য কিছু গানবাজনা, সেলাইবোনা, হাতের কাজ আর যাবতীয় গৃহকর্ম, স্বামী সন্তান ও শ্বশুরকুলের উদয়াস্ত সেবাই ছিল তার কাজ। সন্তানের, মুখ্যত পুরুষসন্তানের জননী হওয়াতেই তার চূড়ান্ত চরিতার্থতা। অথচ অন্য সব দেশের মতো এখানেও কিছু পুরুষের শিক্ষিতা নারীর সন্নিধ্য পাওয়ার

স্বাভাবিক সুস্থ আকাঙ্ক্ষণ ছিল। সে আকাঙ্ক্ষণ চরিতার্থ হতে পারত একমাত্র গণিকালয়ে; কারণ একমাত্র গণিকাই ছিল শিক্ষিতা; এবং প্রাচীন ভারতে সে-ই একমাত্র স্বাধীন নারী ছিল। কুলবধূকে শিক্ষা থেকে সর্বতে ভাবে বঞ্চিত করে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে, গণিকাকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী করে সমাজ কুলনারীর প্রতি চূড়ান্ত অপমানের ব্যবস্থা করেছিল। সন্তানধারণে এবং লালনে, গৃহকর্মে এবং পরিচর্যায় হতশ্রী ও বিগত যৌবনা অশিক্ষিতা স্ত্রী যখন স্বামীর মনোরঞ্জনে অক্ষম, তখন স্বাধীনযৌবনা শিক্ষিত গণিকার দিকে খিড়কির দরজা খুলে রেখে সমাজ কুলনারীকে অসম্মানের পাত্রী করে তুলতে দ্বিধা করেনি।

সোমযাগের একটি প্রকরণ হল অগ্নি পত্নীবৎ। সেখানে আছে, ‘বিজু বা লাঠি দিয়ে নারীকে মেরে দুর্বল করা উচিত, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির ওপরে তার কোনও অধিকার না থাকে।’ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৪:৪:২:১৩) এখানে যজ্ঞের প্রসঙ্গে একটা অনুষ্ঠানে যন্ত্রীয় হবি-কে কেন লাঠি দিয়ে মারতে হবে তারই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথা এসেছে; কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় শাস্ত্র ওই ব্যাখ্যার ছলে স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে মারবার অবাধ অধিকার পুরুষকে দিচ্ছে। আর দিচ্ছে সমস্ত সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করবার অধিকার; এবং তার চেয়েও বড় কথা, তার নিজের দেহের ওপরেও তার কোনও অধিকার যেন না থাকে সে ব্যবস্থাও পাকা করছে। এতে প্রচলিত সামাজিক আচরণেরই শাস্ত্রীয় সমর্থন মেলে। সবচেয়ে বিখ্যাত এবং দীর্ঘ যে বৃহদারণ্যকোপনিষদ, তাতে স্বয়ং ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন: ‘স্ত্রী স্বামীর সম্ভোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে ‘কেনবার’ চেষ্টা করবে (যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল ‘অবক্রণীয়াৎ, যেন স্ত্রী পণ্যদ্রব্য), তাতেও অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে।’ (৬:৪:৭) কাজেই স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে নারীর মন বলে কিছু আছে, এ কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা

হয়েছে, তার দেহে তার কোনও অধিকার নেই এবং তাকে অসম্মান শুধু নয়, মারধর করারও পূর্ণ অধিকার স্বামীকে দেওয়া হল, যে-স্বামী বহু পত্নীকে ইচ্ছেমত আনলে, জারিণী বা উপপত্নী সান্নিধ্যে গেলে এমনকী গণিকালয়ে গেলেও স্ত্রী কোনও ভাবে উচ্চবাচ্য করতে পারবেন না। করলেই তাকে ত্যাগ করবার অধিকার স্বামীর আছে। মনে রাখতে হবে সমাজে এ ত্যাগের অর্থ ছিল কীগণিকাবৃত্তি বা দাসীবৃত্তি ছাড়া পরিত্যক্ত নারীর কোনও গতি ছিল না। তার নিজের সম্পত্তি থাকত না এবং পিতা বা স্বামীর ধনে তার কোনও অধিকারও স্বীকৃত ছিল না। (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১:১০:১১, ৩:৬:৩; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪:৫:৮:৭) এবং, জীবনধারণের উপযোগী কোনও বৃত্তির শিক্ষা তাকে দেওয়া হত না। ফলে শুধু বেঁচে থাকার জন্যে তাকে সর্বতো ভাবে স্বামীর অধীনে থাকতে হত।

বারবার বলা হয়েছে যে নারীর সভায় যাওয়ার অধিকার নেই। (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৪:৭:৪) কোনও শিক্ষণ পাওয়ার, ধন অর্জন বা স্বাধীন ভাবে ভোগ করবার, এমনকী নিজের দেহটিকেও অবাঞ্ছিত সম্ভোগ থেকে রক্ষা করবারও অধিকার তার নেই। (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩:৬:৩; ৪:৬:৭; ৪:৭:৪; ১০:১০:১১; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬:৫:৮:২) তার ছেলেমেয়েদের সামনেই তার স্বামী একাধিক পত্নী, উপপত্নী এনে অথবা গণিকাগমন করে তাকে অসম্মান করলে নিম্প্রতিবাদে তাকে তা সহ্য করতে হৰে, অথচ স্ত্রীর সামান্যতম পদস্থলনে সমাজ কঠোর ভাবে দণ্ড দেবে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (২৩:৪) ও হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র(১:৪:১৪:২) ব্যভিচারিণী নারীর যে দণ্ডের বিধান দিয়েছে তা যেমন নিষ্ঠুর তেমনই ঘৃণ্য; উচ্চারণ করতেও জুগুলা বোধ হয়। স্ত্রীর প্রেমিককে হত্যা করবার জন্যে শাস্ত্রে ধর্মীয় অভিচারক্রিয়ার বিধান ও নির্দেশ দেওয়া আছে। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪:৪:১২, ১৩; হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র ১:৪:১৪:৭) অথচ অনুরূপ ক্ষেত্রে পুরুষের কোনও দণ্ড নেই। সে তার বহু পত্নী, উপপত্নী

এবং যথেচ্ছ গণিকালয় গমনের অবাধ অধিকার সযত্নে রক্ষা করেছিল। ‘প্রাজাপত্য’ নামে লঘু একদিনের নামমাত্র প্রায়শ্চিত্তের বিধান কোথাও কোথাও আছে। বটে, কিন্তু সুবৃহৎ সংস্কৃত সাহিত্যে কোনও গণিকাগামী কখনও কোনও প্রায়শ্চিত্ত করেনি।

সাত

তাহলে বৈদিক ভারত নারীকে কি চোখে দেখেছিল? নারী অশুচি, স্বভাবত পাপিষ্ঠা ও অমঙ্গলের হেতু। চাতুর্মাস্যের অন্তর্গত বরুণপ্রঘাস যজ্ঞে প্রকাশ্য জনবহুল যজ্ঞসভায় প্রতিপ্রস্থাত পুরোহিত যজমানপত্নীকে (যজমানকে নয়। কিন্তু) প্রশ্ন করতেন, ‘কেন সহচরসি’ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২২:৫:২:২০), অর্থাৎ কার সঙ্গে ব্যভিচারিণী হয়েছ? এ প্রকাশ্য অপমান সহ্য করে তাকে উত্তর দিতে হত। নইলে যজ্ঞ নষ্ট হবে যে! মৈত্রায়ণী সংহিতা উচ্চারণ করেই বলেছে, ‘নারী অশুভ’। (৩:৮:৩, তৈত্তিরীয় সংহিতা-তেও একই কথা বলা হয়েছে ৬:৫:৮:২) যজ্ঞকালে কুকুর, শূদ্র ও নারীর দিকে তাকবে না। (শতপথব্রাহ্মণ ৩:২:৪:৬) এ সব উক্তি এমনই স্পষ্ট যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কোনও অবকাশই নেই।

নারীর সর্বপ্রধান সংজ্ঞা দুটি, তার স্থানও ওই দুটিতেই সীমাবদ্ধ: সে পুত্রের জননী এবং সে ভোগ্যবস্তু। তৈত্তিরীয় সংহিতা-তেই শুনি, তস্মাদ্ হাস্ত্রিয়ো ভোগমেব হারায়ন্তে–নারী সম্ভোগ আনে।’ (২:৩:১০:৭) এটির রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক, তার মানে প্রায় তিন হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ নারীকে ভোগ্যবস্তু-রূপে দেখছে। পরবর্তীকালের গৌতমধর্মসূত্র-তে পড়ি, ‘পশুভূমিস্ত্রণামনতিভোগঃ,–পশু, ভূমি ও নারীর অধিক ভোগ নয়।’ (১২:৩৯) শাস্ত্রকাররা বারবার নারীর ভোগ্যরূপে উল্লেখ করেছেন অকুণ্ঠ, নির্লজ্জ ভাবে। তাই নারী দক্ষিণার তালিকায় স্থান পায়। সারস্বতনামিয়ান’ যাগের দক্ষিণা হল একটি ঘোটকী এবং একটি সন্তানবতী দাসী! (শঙ্খায়ন

শ্রেণীতসূত্র ১২:২৯:২১) ঘোড়া ব্যবহারে লাগবে, দাসীর পুত্র বড় হয়ে ভৃত্য হবে, দাসী স্বয়ং ভোগ্যবস্তু হবে অর্থাৎ দক্ষিণা বাবদে এগুলো বিনামূল্যে পাওয়া গেল। পেলেন কে? যজ্ঞের ব্রাহ্মণ পুরোহিত! অন্যান্য বহু যজ্ঞে নানা স্তরের নারী দক্ষিণা–সন্তানবতী, অপ্রসূতা ও অনূঢ়া–শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে। রামায়ণ মহাভারত-এর কাহিনিগুলি বৈদিক যুগের অল্প পরের সমাজেরই চিত্র বহন করে; সেখানে এবং পরবর্তী পুরাণগুলিতে অসংখ্যবার পড়ি অতিথিসৎকারে, উৎসবে, যুদ্ধে, যজ্ঞে, যৌতুকে, দানে ও দক্ষিণায় গাভী-স্বর্ণ-শস্য-রথ-গজ-অশ্বের সঙ্গেই অগণ্য নারী দান করা হচ্ছে। এমন দান সম্ভবই হত না। যদি নারীকে বস্তু এবং মুখ্যত ভোগ্যবস্তু বলে না দেখা হত। নারী সম্পত্তি, তাই নারীকে জুয়াখেলায় পণ রাখা যাচ্ছে। সেই ঋগ্বেদ-এর সময় থেকে (অক্ষসূক্ত ১০:৩৪:৪) মহাভারত পর্যন্ত।

'কন্যা অভিশাপ' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ৬:৩:৭:১৩); তাই সন্তানসম্ভবা নারীর একটি আবশ্যিক অনুষ্ঠান হল 'পুংসবন', যার উদ্দেশ্য হল যাতে গর্ভস্থ সন্তানটি পুরুষ হয়। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র-তে পড়ি, নারীং ন হৃদয়েন প্রার্থয়েৎ।' (১:২৭,৭:১-১০) অর্থাৎ, হৃদয় দিয়ে নারীকে প্রার্থনা করা উচিত নয়; কিন্তু যথেচ্ছ ভোগ করার কোনও বাধা নেই। 'নারী মিথ্যাচারিণী, দুর্ভাগ্যস্বরূপিণী, সুরা বা দূতক্রীড়ার মত একটি ব্যসনমাত্র।' (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১:১০:১১; ৩:৬:৩)। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের কাছাকাছি রচনা এই সংহিতা; এবং অত আগেই নারী ব্যসনে পর্যবসিত হয়ে গেছে। 'নারী রাত্রে স্বামীকে মুগ্ধ করে নিজের ইষ্টসিদ্ধি করে নেয়।' (কাঠকসংহিতা ৩১:১: ওই সময়েরই রচনা।) অর্থাৎ, নারী ছলনাময়ী, স্বার্থপর; যেন পুরুষ উৎকৃষ্টতর জীব, এ সব দোষ তার নেই। 'সর্বগুণান্বিতা শ্রেষ্ঠ নারীও তাই অধমতম পুরুষের থেকে হীন।' (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬:৫:৮:২) অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা কী? 'স্ত্রী, শূদ্র, কুকুর, কাল পাখি–এদের দেখো না; নইলে শ্রী ও পাপ, জ্যোতি ও অন্ধকার, সত্য ও মিথ্যা

মিশে যাবে।' (শতপথব্রাহ্মণ ১৪:১:১:৩১১) স্ত্রী স্বামীর পরে খাবে–ভিত্ত্বোচ্ছিষ্টং বঞ্চৈব দদাৎ, –খেয়ে এটোটা স্ত্রীকে দেবে। (খাদির গৃহ্যসূত্র ১:৪:১১) এর থেকে স্পষ্ট করে নারীর স্থান নির্ণয় করা কঠিন। যেখানে দাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে জীর্ণ জুতো কাপড় দাসকে দেবে এবং স্ত্রী সম্বন্ধে বলা হয়েছে খেয়ে এঁটোটা স্ত্রীকে খেতে দেবে–সেখানে স্ত্রীকে কোন পর্যায়ে দেখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনও সংশয়েরও অবকাশ আর রইল না। এ কথা সবচেয়ে স্পষ্ট করে বলা আছে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র-তে: 'কালো পাখি, শকুনি, নেউল, ছুঁচো ও কুকুর হত্যা করলে যে প্রায়শ্চিত্ত, নারীহত্যা ও শূদ্র হত্যাতেও সেই একই প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ মাত্র একদিন কৃচ্ছ্রসাধন। (১:৯:২৩, ৪৫)

পরবর্তী সাহিত্য যে নারীকে ভোগ্যবস্তু ও পণ্যদ্রব্য বলতে সাহস করেছে তার জোরটা জুগিয়েছে বৈদিক সাহিত্যই। ক্রমেই অবশ্য ওই ভোগ্যত্ব ও পণ্যত্বেই জোর দেওয়া বেড়েছে। রামচন্দ্র সীতাকে প্রত্যাখ্যান করবার সময়েও বলেছেন। পরহস্তগতা নারীকে তিনি 'ভোগ' করতে পারবেন না; এই হল প্রাচীন ভারতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল কথা। ক্রমেই অবরোধের দুর্ভেদ্য অন্তরালে নারীকে সরে যেতে হয়েছে। কেন এমন হল? কোন ধীরে ধীরে নারীর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে সে বস্তুতে পরিণত হল? এর বিস্তৃত বিশ্লেষণ এখানে করব না, শুধু একটা দিকের কথাই বলব। সম্পত্তিতে গোষ্ঠীগত সত্ত্বাধিকার থেকে যখন ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল অর্থাৎ গোষ্ঠী ও কৌম ভেঙে 'কুল' বা যৌথ পরিবারই সমাজের ন্যূনতম সংগঠন হল ততদিনে সমাজে আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে। উৎপাদনে কিছু উদ্বৃত্তি ধনের সৃষ্টি হয়েছে এবং সে উদ্বৃত্তি ধন মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যে বিভক্ত হচ্ছে। এই ধন, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্ষরিক অর্থে স্বোপার্জিত নয়।— নিচের দিকের মানুষের শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে, শোষণ করে পাওয়া গেছে–তা যেহেতু কোনও ব্যক্তিগত গুণ বা যোগ্যতার দ্বারা লব্ধ নয়, তাই সে সম্বন্ধে ধনাধিকারীর যেন একটি অতিরিক্ত স্বত্বাধিকারবোধ জন্মায়। এবং তারই

সঙ্গে একটা আতঙ্কও আসে, পাছে সেটা তার নিজের এবং নিজের সন্তান বা বংশধারার দখলের বাইরে চলে যায়। ব্যক্তির পরমায়ুর তো সীমা আছে, তারপরে? তার পরেও যাতে সে-ধন তারই বংশধররা ভোগ করতে পারে সে সম্বন্ধে ভীষণ একটা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ জন্মায়। এ ধান কার হাতে দিয়ে যাওয়া যায়, নিশ্চিত ভাবে নিজেরই সন্ততি ছাড়া? কেমন করে নিশিচন্ত হওয়া যায় সন্তানটি ঠিক তারই কিনা? স্ত্রীকে চোখে চোখে রেখে। যথাসম্ভব পর পুরুষের সম্পর্ক থেকে দূরে রেখে। এই কারণেই নারীর বহুপতিত্ব সমাজে নিষিদ্ধ হয়ে গেল, কারণ তাতে সন্তানের পিতৃপরিচয় সংশয়িত থেকে যায়।

ভুলে গেলে চলবে না, এ যুগের পূর্বযুগে যখন সমাজ গোষ্ঠী ও কৌমাবদ্ধ ছিল তখন সকল সন্তানই কৌম বা গোষ্ঠীর সন্তান বলে পরিচিত ছিল; তখন পিতৃত্ব বা পতিত্বের সীমা এমন সুস্পষ্ট মোটা দাগে আঁকা ছিল না। এ ব্যাপারটা তখনও জীবিত স্মৃতির মধ্যেই ছিল তাই আরও আতঙ্ক। গোষ্ঠীযুগে সব নারীই গোষ্ঠীর বা কৌমের সব পুরুষের ভোগ্য ছিল, সব পুরুষও সব নারীর। নারীর সে ধরনের স্বাধীনতার যুগে স্ত্রীর বা সন্তানের পরিচয় একটি পুরুষের সঙ্গে এমন একান্ত ও অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিল না। সে যুগ সদ্য পেরিয়ে এসে ব্যক্তিগত মালিকানার দিনে সম্পত্তি যখন একান্ত ও নিশ্চিত ভাবে নিজেরই সন্তানের জন্যে রেখে যাওয়ার উগ্র বাসনা জাগল, তখন যাতে ঔরসজাত সন্তানটিকে নিশ্চিত ভাবে চিহ্নিত করতে পারা যায়। তাই স্ত্রীকে অন্য সব পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখার এমন প্রয়োজন বোধ হল। তাছাড়া স্ত্রীও তো তখন সম্পত্তি, অতএব সে যাতে অন্যের ভোগ্য না হয়, তার ওপরে ব্যক্তিগত মালিকানা তাই ষোল আনা জাহির করা চাই। আরও একটা কারণ ছিল; পুরুষের যথেচ্ছ পরিনারী সম্ভোগের অধিকার তখন সমাজ মেনে নিয়েছে; সে তখন বৈধ বিবাহে–অনুলোম ও প্রতিলোমে— বহু পত্নীর স্বামী, আরও বহু উপপত্নীর উপপতি, এবং এ ছাড়াও তার খিড়কির দুয়ার খোলা গণিকালয়ের দিকে। এই জীবনে অভ্যস্ত পুরুষ স্বভাবতই তার একান্ত-

ভোগ্য পত্নীটিকেও সেই রকম সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখবে, কারণ আত্মবন্মন্যতে জগৎ'। তাই তার স্ত্রীর সম্বন্ধে তার পাহারা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে গেল যখন নারী হল কয়েদি এবং স্বামী তার প্রহরী। এই হল উত্তর-বৈদিক যুগের সমাজচিত্র। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সে ব্যতিক্রমই। পরবর্তী দুটি সহস্রাব্দে শেকলগুলো দৃঢ়তর হয়ে নারীকে পাকে পাকে ফেরে ফেরে বেঁধেছে, তালা আরও মজবুত হয়েছে। এর মধ্যে কখন যে প্রহরী নিজেই বন্দি হয়েছে তার স্বৈরাচারজনিত সংশয়ের ক্রুর বন্ধনে, কখন যে সে তার বন্ধু ও সহাচারিণীকে হারিয়ে ফেলে তার বদলে পেয়েছে নিরক্ষর নিষ্প্রাণ এক যন্ত্রতুল্য দাসীকে, তা সে নিজেই জানে না। নিরঙ্কুশ শাসন ও শোষণ মানুষ কখনও চিরদিন মানে না। যে-বঞ্চনা করতে পুরুষ এত আটঘাট বেঁধেছিল সে-বঞ্চনা শেষ পর্যন্ত তাকেও বঞ্চিত করেছে। আর, যে পরিমাণে নারী সে-বঞ্চনাকে নিজের মধ্যে নিষ্প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে সে পরিমাণে সেও তার স্বরচিত শৃঙ্খলে বন্দিনী। বৈদিক ভারতবর্ষে নারীর মর্যাদা ছিল না, মানুষ বলে তার কোনও স্বীকৃতিই ছিল না। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাতেও ছিল না, তবে তাদের উত্তরপুরুষেরা এখন সে-কথা স্বীকার করে–বলে, নারী এই শতাব্দীতেই প্রথম অধিকারসচেতন হয়েছে, আগে সে অত্যাচারিতা বন্দিনীই ছিল। শুধু আমাদের এখানেই জোর করে বলবার চেষ্টা হয়, বৈদিক যুগে নারী নাকি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এতে শুধু যে সত্যের অপলাপ হয় তা নয়, অতীতকে যথার্থ ভাবে না দেখতে পাওয়ার জন্যে অতীতের যে বিষ বর্তমান সমাজদেহে সঞ্চারিত, তাকে চিনতে, তার প্রতিষেধ করতে এবং সুস্থ এক ভবিষ্যতের প্রস্তুতি বিধান করতে অনাবশ্যক দেরি হয়ে যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য ও উপনিষদের যুগ

যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্রের বংশধর; এর পিতা চারায়ণ, দেবরাত, ব্রহ্মারাত, যজ্ঞবল্ক, বাজসনি, ইত্যাদি নানা নামে প্রসিদ্ধ; জননীর নাম সুনন্দা। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী; কাতায়নীর পুত্র কাত্যায়ন। শতপথব্রাহ্মণ-এ বলা আছে শুক্ল যজুর্বেদযজ্ঞবল্ক্যের রচনা বলে আখ্যাত। অর্থাৎ ইনি বাজসনেয়ী সংহিতা-র রচয়িতা; শতপথব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যকোপনিষদও এরই রচনা। একখানি শিক্ষা’ গ্রন্থও যাজ্ঞবল্ক্যের নামে অভিহিত, দুই-একটি অন্য ক্ষুদ্র উপনিষদও এর নামে প্রচলিত, অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারা গঠনের ব্যাপারে যাজ্ঞবল্ক্যের দান প্রচুর ও তাৎপর্যপূর্ণ।

শুক্ল যজুর্বেদ-এর টীকায় প্রথম দিকে টীকাকার মহীধর যাজ্ঞবল্ক্য ও যজুবেদ প্রসঙ্গে একটি কাহিনি বলেছেন:

‘ব্যাসের শিষ্য ঋষি বৈশম্পায়ণ ব্রহ্মহত্যার পাতকী হয়ে প্রাশ্চিত্তের জন্য শিষ্যদের কৃচ্ছসাধনের নির্দেশ দিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য একাই সকলের হয়ে কৃচ্ছসাধন করতে চাইলেন। বৈশম্পায়ন এটাকে অসহ্য অহমিকা মনে করে অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়ে যাজ্ঞবল্ক্যাকে আদেশ দিলেন অধীত বেদ প্রত্যপণ করতে। অগত্যা যাজ্ঞবল্ক্য অধীত বেদ বমন করলেন; তখন বৈশম্পায়নের অপর শিষ্যরা তিত্তিরির রূপ ধারণ করে সেই বমনকৃত যজুর্বেদ ভক্ষণ করেন। এ যজুর্বেদকৃষ্ণ, অর্থাৎ অশুচি, কারণ তা যাজ্ঞবল্ক্যের বমন-করা বেদ; তিত্তিরিপক্ষীর রূপে অনা শিধারা তা গ্রহণ করেছিলেন বলে তার নাম তৈত্তিরীয়।’

লক্ষণীয়, যে-বেদ যজ্ঞবল্ক্য গুরুর কাছে লাভ করেছিলেন এ কাহিনির অন্তরালে তাকে শুচি, শুক্ল বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং সেইটিই তার নামে অভিহিত শুক্ল যজুর্বেদ-এর বাজসনেয়ী সংহিতা। বাজসনি যাজ্ঞবল্ক্যের পিতার নাম, তাই যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয় এবং তার লব্ধ সংহিতা বাজসনেয়ী। কাহিনিটি আক্ষরিক ভাবে সত্য নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রাচীন ভারতে যাজ্ঞবল্ক্যের চরিত্র ও কীর্তি সম্বন্ধে কী ধারণা চলিত ছিল তা এতে স্পষ্টই বোঝা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য উদ্ধত, হয়তো কতকটা দাম্ভিকও–সমস্ত শিষ্যের করণীয় প্রায়শ্চিত্ত একই করতে চাওয়ার প্রস্তাবে আত্মশক্তিতে প্রত্যয়ের সঙ্গে হয়তো কতকটা ঔদ্ধত্যও চোখে পড়ে। অন্তত গুরু সেইটিই দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের পরার্থপরতাও তো আছেসকলের হয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের চেষ্টা এক স্বীকার করতে চাওয়ার মধ্যে কি কিছু পরিমাণ মহত্বও নেই? কাহিনিকার সে দিকটায় জোর দেননি, কিন্তু প্রসঙ্গত সে-কথাও কি বলা হয়নি! তিনি যে-সংহিতার প্রবক্তা তা শুক্ল; যা উদগীরণ করলেন এবং অন্য শিষ্যরা ভক্ষণ করল সেটা কৃষ্ণ। আজ আমরা জানি, শুক্ল যজুর্বেদ শুদ্ধ মন্ত্রমাত্রের সংকলন বলেই 'শুক্ল' বলে অভিহিত, আর কৃষ্ণ যজুর্বেদ-এ মন্ত্রের সঙ্গে অঙ্কুর-রূপে ব্রাহ্মণ-সাহিত্যধর্মপ্রচুর গদ্যনির্দেশের মিশ্রণ আছে বলেই তাকে বলে কৃষ্ণ'। কিন্তু সেদিন এই কাহিনিতে যাজ্ঞবল্ক্যকে শুচিতর সংহিতার রচয়িতা বলেই নির্দেশ করা হয়েছিল।

শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা-র শেষাংশে শতপথব্রাহ্মণ, তারও শেষাংশ বৃহদারণ্যকোপনিষদ–একাধারে আরণ্যক ও উপনিষদ; যাজ্ঞবল্ক্য এ সমস্ত ধারাটিরই রচয়িতা। শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা-র বৈশিষ্ট্য তেমন কিছু নেই; কিন্তু সমস্ত ব্রাহ্মণ'-সাহিত্যের মধ্যে শতপথবিশিষ্টতম ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক ও উপনিষদসমূহের মধ্যে বৃহদারণ্যকোপনিষদ একখানি তাৎপর্যপূর্ণ স্বতন্ত্র রচনা। এগুলিকে সম্যক ভাবে বিশ্লেষণ করা। এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

এখানে শুধু যাজ্ঞবল্ক্য চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ-উপনিষদের যুগটিকে আরও একটু স্পষ্ট করে বোঝাবার চেষ্টা করতে চাই। মহীধরের কাহিনির মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যকে অবাধ্য উদ্ধত ধরনের মানুষরূপে দেখানো হয়েছে; বস্তুত ব্রাহ্মণ-উপনিষদে প্রতিফলিত যাজ্ঞবল্ক্যের যে-চরিত্র তার দ্বারাও এ-ধারণা সমর্থিত।

প্রচলিত সংস্কারকে অস্বীকার করতে যাজ্ঞবল্ক্যের বাধেনি। তাঁর রচিত শতপথব্রাহ্মণ-এ আছে: ধেনু বা অনডুহা (ষাঁড়)-মাংস ভক্ষণ করলে পতিত হতে হয়। কিন্তু ঠিক তার পরেই যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, 'আমি কিন্তু (গোমাংস) ভক্ষণ করব যদি সেটা সুসিদ্ধ (নরম) হয়।'(১) প্রাচীন ভারতে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল–সে অতি সত্য কথাটাকে চাপা দেওয়ার জন্যে আজকাল কত-না ছলাকৌশলের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে; যাজ্ঞবল্ক্য টের পাননি তার উত্তরপুরুষকে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে তাই অসংকোচেই বলে গেছেন: যজ্ঞের জন্যে যে-সোম কেনা হল তা হল অতিথির, তাই রাজার জন্যে ব্রাহ্মাণের জন্যে মানুষের হাব্য হিসেবে যেমন বড় ষাঁড় বা বড় হাতি বা বড় ছাগল রাধা হয় দেবতাদের জন্যেও এঁকে (সোমকে) এই আতিথ্যই করা হয়।(২) আবার বৃহদারণ্যকোপনিষদ-এ পড়ি: গৌরবর্ণ পুত্রকামনায় পিতা একটি বেদ পড়বেন, স্ত্রীকে ক্ষীরান্ন ভোজন করাবেন; কপিল পিঙ্গল পুত্রকামনায় দুটি বেদ পড়বেন ও স্ত্রীকে দধিযুক্ত অন্ন ভোজন করাবেন; শ্যাম-বর্ণ লোহিত্যক্ষ পুত্রকামনায় তিনটি বেদ পড়বেন ও স্ত্রীকে জলে-সিদ্ধ অন্ন ভোজন করাবেন; পণ্ডিত দুহিতা কামনা করে স্ত্রীকে তিলমিশ্রিত অন্ন ভোজন করাবেন; এবং পণ্ডিত যশস্বী, সভায় সুপ্রতিষ্ঠিত সবাক পুত্রকামনায় চতুর্বেদ পাঠ করবেন ও স্ত্রীকে বলদের বা বৃষভের মাংসযুক্ত অন্ন ভোজন করাবেন।'(৩) বৃহদারণ্যকোপনিষদ-এর শেষাংশে একটি কাহিনির অন্তে বলা আছে পাঁচটি পশু ব্রাহ্মাণের অভক্ষ্য, কারণ এদের মধ্যে থেকে মেধা (যজ্ঞে

হব্যরূপে ব্যবহার্যতা) বেরিয়ে গেছে। এই পাঁচটি হল: মানুষ, অশ্ব, গৌ, মেষ এবং অজ।(৪) স্পষ্ট বোঝা যায় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলি এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অনুশাসনে প্রাণীহত্যা সম্বন্ধে নিষেধবাক্য ও অহিংসার ব্যাপক প্রচারই এ নির্দেশের মূলে। লক্ষণীয়, মানুষ এ তালিকায় বিধৃত, সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক আদিমপ্রথা (যুদ্ধে পরাজিতকে হত্যা করে ভক্ষণ)-এর স্মরণে; কিংবা হয়তো মানুষ সর্বত্রই অভক্ষ্য জীবের তালিকায় অগ্রগণ্য, কিন্তু অশ্ব ও গৌ নিশ্চয়ই ভক্ষ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল যেমন মেষ বা অজ; এবং নিষেধ যখন এল তখন সচরাচর-ভক্ষিত মাংসের প্রায় সবগুলির ওপরেই এল। বাকি রইল এণ (হরিণ)-মাংস, শশমাংস ও বাধ্রীণস (গণ্ডার)-মাংস, অর্থাৎ যেগুলি মৃগয়ালব্ধ, অতএব অনিশ্চিত। কিংবা হয়তো-বা মৃগয়া রাজাদের বিলাস বলে তার প্রতি কতকটা প্রশ্রয় দেওয়া রইল। আরও লক্ষণীয়: যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণকেই শুধু অমেধ্য মাংস ভক্ষণে বিরত থাকতে বলেছেন, অর্থাৎক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র তখনও অশ্ব গৌ মেষ ও অজ-মাংস ভক্ষণ করতে পারে। শুধু যজ্ঞে এগুলি ব্যবহার হতে পারবে না, এবং ব্রাহ্মণ খাবে না। অনুমান করা হয়তো অন্যায় হবে না যে, পূর্বে এ নিষেধ না থাকায় উল্লিখিত প্রাণীগুলি অত্যন্ত অধিক পরিমাণে যজ্ঞের জন্যে নিহত হওয়াতে সমাজে পশুধনের অভাব ঘটছিল; গোধন ক্ষয় হচ্ছিল, অশ্বের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল। দেশের পশুসম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যও হয়তো এ-নির্দেশের একটি কারণ।

নারী সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, জায়া নিজের (অর্থাৎ পুরুষের) অর্ধাংশ।(৫) বিবাহে সম্প্রদানের প্রসঙ্গে বলছেন, কে দান করেছিল? কাকে দান করেছিল? কাম দিয়েছেন, কামকেই দিয়েছেন। কমই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা।’(৬) অর্থাৎ কামনাই বিবাহের ভিত্তি, কামনাই একটি পুরুষ ও একটি নারীকে অনুপ্রেরিত করে পরস্পরের কাছে আত্মদান করতে। এ উক্তির মধ্যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির দৃষ্টির স্বচ্ছতাই চোখে পড়ে। আবার শুনি সৃষ্টি রহস্য উদঘাটন করছেন

ঋষি: একা থাকলে কেউ সুখ পায় না। তাই লোকে একাকী না থেকে দ্বিতীয়ের সন্ধান করে। গাঢ়-আলিঙ্গনে-বদ্ধ নারী-পুরুষের মতো তিনি নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন, তখন পতি পত্নী সৃষ্টি হল; তাই এই (যুগল) দ্বিদল বীজের মতো।(৭)

নারীপুরুষের প্রেমকে যাজ্ঞবল্ক্য চূড়ান্ত মর্যাদা দিয়েছেন বৃহদারণ্যকোপনিষদ-এ একে ব্রহ্মোপলব্ধির উপমানরূপে উপস্থাপিত করে: যেমন প্রিয় স্ত্রীর দ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের বাহ্যজগতের কিছুরই বোধ থাকে না তেমনই ব্রহ্মজ্ঞান হলে বাহ্যবস্তুর কোনও বোধই থাকে না।'(৮) নিজের স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলছেন: স্বামীর কামনুতে স্বামী প্রিয় নন, তাঁর মধ্যে (স্ত্রী) নিজেকে অভিস্থাপন করতে পারে বলেই স্বামী প্রিয় হন।'(৯) এ-ও এক মোহমুক্ত দৃষ্টির প্রমাণ এবং মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মজ্ঞানের পরিচায়ক: স্বামী বন্ধু পুত্র এরা ততটাই প্রিয় হয় যতটা নিজেকে তাদের মধ্যে অনুভব করা যায়। নারীর দুর্বলতা সম্বন্ধেও ঋষি অবহিত, বলছেন: যে পুরুষ নাচতে গাইতে পারে তার প্রতিই নারী সব চেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়।'(১০)

যজ্ঞেরও অপরাধ যজমানপত্নী।(১১) পত্নীকে সহধর্মচারিণী বলা হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ যজ্ঞে পত্নীর করণীয় নিতান্তই গৌণ। মনে হয়, আর্যদের এ দেশে আসবার অব্যবহিত পরে এ অবস্থা ছিল না।(১২) যজ্ঞও দুই যজমান দম্পতির কৃত্য ছিল। পরবর্তীকালে প্রাগার্য নারীকে বিবাহ করলে নবাগতকে আর্য সমােজ সামাজিক স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু, জন্মসূত্রে সে ভিন্নধর্ম বলে যজ্ঞে তাকে অধিকার দিতে সমাজ কুণ্ঠা বোধ করে, যার ফলে যজ্ঞে যজমানপত্নীর অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হতে থাকে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য মনে করিয়ে দিতে চাইছেন যে, যজ্ঞে পুরুষের একাধিপত্য নেই, নারীও পূর্বে যজ্ঞের অর্ধাংশরূপে গণ্য হত। তাঁর সময়ে যজমানপত্নীর অধিকার যৎসামান্য তবু তার ভাবগত অধিকার তিনি স্বীকার করেছেন।

নিজের জীবনে নারীর সঙ্গে তাঁর দুটি সংলাপের কথা আছে বৃহদারণ্যকোপনিষদ-এ। একবার ব্রহ্মসম্বন্ধে গার্গীর সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের কথা আছে। তখন গার্গীর শেষতম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আর বেশি প্রশ্ন কোরো না, গাগি, তোমার মাথা খসে পড়বে। (১৩) বলা বাহুল্য, এই সতর্কবাণীর মধ্যে এক ধরনের পরাজয়স্বীকার অন্তর্নিহিত আছে; প্রকাশ্যে নারীর কাছে পরাজয় স্বীকার না করে তিনি গার্গীকে প্রকারান্তরে অস্বস্তিকর প্রশ্ন করা থেকে বিরত হতে বললেন। দ্বিতীয় উপাখ্যানে নিজের স্ত্রী মৈত্রেয়ীর সঙ্গে তার সংলাপ। তপশ্চর্যার জন্যে বনে যাওয়ার পূর্বোতাঁর সম্পত্তি দুই স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইলে কাত্যায়নী স্পষ্টতই সন্তুষ্ট হলেন; কিন্তু মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করলেন: 'যা দিয়ে যাচ্ছ তাতে কি আমি অমর হব?'সত্যনিষ্ঠ স্বামী প্রতারণা করলেন না, বললেন, 'অমরতার লেশমাত্র সম্ভাবনা এতে নেই।' মৈত্রেয়ী বললেন, যাতে অমর হব না তা দিয়ে কী করব?' তখন তিনি আচার্যের দৃষ্টিতে মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ অধিকারিণী জেনে অকুন্ঠচিত্তে অকৃপণ ভাবে এই নারীকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিলেন।

যজ্ঞকালে ঋত্বিক প্রতিপ্রস্থাত যজমানপত্নীকে প্রশ্ন করবেন, 'কার সঙ্গে ব্যাভিচারিণী হয়েছ?' সেই নারী বরুণের কাছে অপরাধিনী হন, যিনি একজনের (স্ত্রী) হয়ে অন্যের সঙ্গে ব্যভিচার করেন, তাই যজ্ঞকালে (এই গোপন তথ্য) অন্তরে শিল্যের মতো যেন না থাকে। সে জন্যে তিনি স্বীকার করেন না। স্বীকার করলে তার আত্মীয়দের প্রতি অন্যায় করেন। (১৪) বলা বাহুল্য, প্রতিপ্রস্থতার প্রশ্ন এবং যজমানপত্নীর উত্তর যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্ভাবন নয়, যজ্ঞে আচরিত বিধিমাত্র। উদ্ভাবন ব্যাখ্যাটুকু। গোপন পাপ অন্তরে শিল্যের মতো বহন করে যেন সে নারী আত্মীয়দের কাছে অপরাধিনী না হয় তাই এ স্বীকারোক্তি। লক্ষণীয়, যজমানপত্নী ব্যভিচারিণী হওয়া সত্ত্বেও যজ্ঞে অধিকারচ্যুযতা নন, স্বীকারোক্তির দ্বারাই তিনি শুচি। এ কথা সত্য যে,

যজমানকে অনুরূপ কোনও প্রশ্ন করা হত না, অর্থাৎ নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক নৈতিক মানদণ্ড তখনই সমাজে আছে। তবু, সমাজের স্থিতিস্থাপিতা এবং যাজ্ঞবল্ক্যের এই বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি বিস্ময় উৎপাদন করে। কোনও শাস্তির কথাই নেই, শুধুমাত্র স্বীকারোক্তি; মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা সম্বন্ধে নীতিবাগীশের মতো কোনও উক্তৃঙ্গ মনোভাব দেখা গেল না ঋষির, বরং অন্তঃশল্যা' শব্দটার মধ্যে যেন অপরাধিনীর মঙ্গলচিন্তাই আছে।

যজ্ঞ করা ধর্মাচরণ কিন্তু মানুষ যজ্ঞ কেন করে সে বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, পুরাকালে ঋষিরা কামনার বশেই যজ্ঞ করেছিলেন, 'এই আমাদের কামনা, এটি পূর্ণ হোক'—এই বলে।(১৫) যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টিতে দেবতা ও মনুষ্য নিতান্ত পৃথক নয়, দেবতারা মানুষের উপরে নির্ভরশীল, পৃথিবীর হবির্দানেই দেবতারা বেঁচে থাকেন।'(১৬) মানুষ যেমন অসুরদের বঞ্চিত করতে চায় তেমনই দেবতারাও মানুষকে স্বর্গ থেকে বঞ্চিত করতে চান। মানুষ পশু লাভ করে সমৃদ্ধ হয় এটা দেবতারা পছন্দ করেন না।(১৭) দেবতারা মানুষ সম্বন্ধে ঈর্ষাকাতর এমন আভাস প্রায়ই পাওয়া যায়।

মানুষ প্রজাপতির সব চেয়ে কাছের (জীব), সে শতায়, শততেজা, শতবীর্য।(১৮) স্বর্গ আগে মর্তের অতি নিকট স্পর্শলভ্য ছিল, দেবতার চাইলেন স্বর্গ ও মর্ত পৃথক ও পরস্পর থেকে দূরবর্তী হোক, তাই হল।(১৯) এই সেই ঈর্ষা যা নিত্যবিদ্যমান মানুষ ও অসুরের মধ্যে; দেখা যাচ্ছে, যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টিতে দেবতারাও তা থেকে মুক্ত নন। যাজ্ঞবল্ক্য দেবতাদের নির্দোষ বা স্বনির্ভর মনে করেননি, বরং এমন কথাও বলেছেন যে দেবতারা মানুষের চেয়ে কনীয়ান, কারণ দেবতারা মানুষের তুলনায় সংখ্যালঘু।(২০) দেবতারা সত্য কথা বলতে বলতে দরিদ্র ও তুচ্ছ হয়ে যান, মানুষেরও তাই হয়, তবে অন্তিমে সত্যবাদী মানুষ শ্রীলাভ করে, যেমন দেবতাদেরও সমৃদ্ধিলাভ

ঘটেছিল।(২১) এ দেবতা তো মানুষের চেয়ে খুব উঁচু স্তরের জীব নয়, এদের ক্ষুধা তৃষ্ণা দারিদ্র্য তুচ্ছতা ঈর্ষা দ্বেষ উত্থানপতন সবই আছে; অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টিতে দেবতারা মানুষের খুব কাছাকাছি স্তরের জীব। এতে দেবতার গৌরব ততটা ক্ষুন্ন হয়নি যতটা মানুষের মর্যাদা বেড়েছে।

বর্ণবিভক্ত সমাজে বর্ণগুলির নির্দিষ্ট স্থান ও আপেক্ষিক মর্যাদা সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য খুবই সচেতন, বিশেষত রাজার সঙ্গে বৈশ্য ও ব্রাহ্মণের সম্পর্ক নিয়ে। স্বচ্ছদৃষ্টি ঋষি স্পষ্টই দেখছেন প্রজার সম্পত্তি নানা ভাবে রাজকোষে আসছে। তাই বারবার বলছেন, প্রজা অন্ন, ভোক্তা ক্ষত্রিয় (অর্থাৎ রাজন্য)। (২২) শ্রেণি হিসাবে এ সময়ে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যই চোখে পড়ে। রাজ্যচালনায় ব্রাহ্মণ অযোগ্য এ কথা স্পষ্টই বলা আছে।(২৩) খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের পর থেকেই উত্তর ভারতে বহু খণ্ড-রাজ্যের অভ্যুত্থানের যুগ–সে-সব রাজ্যের রাজারা নিজেদের সীমানার মধ্যে একচ্ছত্র অধিপতি। ফলে রাজন্য এবং ক্ষত্রিয় শ্রেণি হিসাবে ক্রমেই শক্তিমত্ত হয়ে উঠছে। রাজকোষ সমৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এরা নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন এবং যাজক ব্রাহ্মণ যজমান ক্ষত্রিয়কে অন্নদাতা ও প্রতিপালক রূপে দেখছে। ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে ব্রাহ্মাণের শ্রেণিসত্তা নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি লাভ করছে। অতএব ক্ষত্রিয়ের শ্রেণিগৌরব ব্রাহ্মাণের দৃষ্টিতে স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে তখন। এই কথাই পুরাকল্পরূপ পাচ্ছে: পূর্বে কেবল ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) ছিলেন; একাকী কর্মসম্পাদনে অসমর্থ হয়ে তিনি শ্রেয়োরূপে দৃষ্টি করলেন ক্ষত্রিয়কে। দেবতাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় হলেন ইন্দ্র বরুণ সোম রুদ্র পর্জন্য যম মৃত্যু ঈশান। তাই ক্ষত্রিয়ের অধিক আর নেই, তাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে নীচে থেকে উপাসনা করে রাজসূয় যজ্ঞে; ক্ষত্রিয়ে যশ আধান করে।(২৪) রাজসূয় যজ্ঞে আসন্দীতে উপবিষ্ট রাজা ঋত্বিককে ব্রহ্মান সম্বোধনে আহ্বান করেন। উত্তরে ঋত্বিক বলেন হে, রাজন, আপনিই ব্রহ্মা। এ-সব নির্দেশে মনে হয় ক্ষত্রিয় রাজা এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মধ্যে ক্ষমতার আপেক্ষিকতা নিয়ে একটা অন্তর্নিহিত আন্দোলন তখনই সমাজে

দেখা দিয়েছে। স্মরণীয় যে, তৎকালীন সমাজে এরা দুজনেই ক্ষমতার শিখরে সমারাি়ঢ়। মধ্যযুগের ইয়োরোপে চার্চ ও স্টেটের যে দ্বন্দ্ব তা হয়তো অঙ্কুরীরূপে এখানে এ ভাবে প্রকাি়টত; বিশেষত যখন উপনিষদের যুগ। ক্ষত্রিয় অভ্যুত্থানেরই যুগ।

শুধু যে প্রতাপ-পরাক্রমে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ তা নয়, জ্ঞানেও, এমনকী, ব্রহ্মজ্ঞানেও ক্ষত্রিয়ই প্রথম অধিকারী ও প্রবক্তা। শ্বেতকেতু আরুণোয় বললেন, 'গৌতম...এই বিদ্যা এর আগে কোনো ব্রাহ্মাণে বাস করেনি।'(২৫) ক্ষত্রিয় রাজা জনক যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে 'কামপ্রশ্ন' বর লাভ করেন, অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যকে যখন যা ইচ্ছা সেই প্রশ্ন তিনি করতে পারেন।(২৬) যাজ্ঞবল্ক্য জনকের ক্ষুরধার বুদ্ধিকে ভয় পেলেন, বিশেষত সৃষ্টির অন্তর্নিহিত শেষ তত্ত্বটি সম্বন্ধে যদি ওই বুদ্ধিমান রাজা অনুনয় করেন বসেন।(২৭) জরৎকারু আর্তভাগ যজ্ঞবল্ক্যকে মিনতি করেন একটি প্রশ্নের উত্তরের জন্যে: মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় থাকে। তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে নিরালায় নিয়ে গিয়ে কর্ম' সম্বন্ধে আলোচনা করেন।(২৭) রাজা প্রবাহণ জৈবলির কাছে প্রশ্নে পরাস্ত হয়ে শ্বেতকেতু আরুদেণয় পিতা গৌতমের কাছে এসে অনুযোগ করলেন পিতা তাকে যথেষ্ট জ্ঞান দান করেননি। নিজের অপূর্ণতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে গৌতম স্বয়ং প্রবাহণ। জৈবলির কাছে বিদ্যাথী হয়ে এলেন। ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণ ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীকে এ কথা বাইরে প্রকাশ করতে নিষেধ করে বললেন: এ বিদ্যা তোমার পূর্বে ব্রাহ্মণদের কাছে যায়নি, তাই সর্বলোকে ক্ষত্রিয়েরই প্রশাসন।(২৯)

ব্রহ্মতত্ব সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকোপনিষদ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ; এখানে যাজ্ঞবল্ক্য এ-তত্ত্বের প্রবক্তা রূপে উপস্থাপিত। মূল উপনিষদগুলি প্রত্যেকটিরই প্রধান বিবক্ষিত বিষয় ব্রহ্মবাদ। কিন্তু বহু পরবর্তীকালের শংকর ভাষ্য থেকে দৃষ্টি মুক্ত করে নিলে সাব-কটি উপনিষদের তত্ত্বদৃষ্টির মধ্যে খুব সাধারণ একটা

ঐক্য থাকলেও পরস্পরে প্রচুর পার্থক্যও চোখে পড়ে। প্রবক্তাদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টি যেমন স্বচ্ছ তেমনই কবিত্বপূর্ণ। তত্ত্বের দিকের আলোচনা এ প্রবন্ধের পরিসরের বাইরে, এখানে শুধু দ্রষ্টার বোধ ও সংবেদনশীলতাই দেখবার চেষ্টা করছি। আত্মা কী?' 'প্রাণ দ্বারা যে প্রাণিত হচ্ছে সেই তোমার আত্মা। সব কিছুরই সে অভ্যন্তরবর্তী।'(৩০) পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্য সব কিছুরই অন্তরতর যা, তাই আত্মা।(৩১) যে পৃথিবীতে থেকে পৃথিবীর অন্তরালে, পৃথিবী যাকে জানেনি, পৃথিবী যার শরীর, যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে (থেকে) নিয়ন্ত্রিত করছে, এই সেই তোমার আত্মা— অন্তর্যামী, অমৃত।(৩২) বিদগ্ধ শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করছেন: কা প্রিয়তা। যাজ্ঞবল্ক্য?

উত্তর দিচ্ছেন ঋষি: প্রাণ এবং সম্রাট্।'(৩৩)

রাজা জনক প্রশ্ন করছেন, 'পুরুষের জ্যোতি কি?'

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর, সূর্য'।

'সূর্য অস্ত গেলে?'

'চন্দ্রমা'। চন্দ্রমা না থাকলে?'

'অগ্নি'।

'তাও না থাকলে?'

'বাক'।

'তাও নীরব হয়ে গেলে?'

'আত্মাই পুরুষের জ্যোতি'।(৩৪) এই আত্মার লীলাই লোকে দেখে, তাকে কেউ দেখে না। (৩৫)

এই আত্মাই ব্রহ্ম–এ কথাই উপনিষদের কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য। ব্রহ্ম মানে বৃহৎ। মানুষ নিজেকে চেনে ব্যষ্টিসত্তায় ও সমষ্টিসত্তায়–অর্থাৎ ব্যক্তিরূপে এবং পরিবারে সমাজে ও দেশে। এর পরেও একটি দৃষ্টি আছে, তা হল: অতীতে অনাগত সৃষ্টির তাবৎ মানুষের মধ্যে নিজের সত্তাকে ভাবলোকে সম্প্রসারিত করে দিয়ে তার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়া। উপনিষদের ঋষি এই বৃহৎকেই ব্রহ্ম বলে অভিহিত করেছেন, বলেছেন, এই মানুষের চরম সত্তা। মনে রাখতে হবে, আর্যরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে এসেছেন, এবং প্রথম পর্বের যুদ্ধের পরে যথাসম্ভব শান্তিতে বিনা রক্তপাতে প্রাগার্যদের সঙ্গে সহবসতি করেছেন। বিবাহসূত্রে বহু প্রাগার্য নারী ও পুরুষ আর্যসমাজে অনুপ্রবিষ্ট; এরা সঙ্গে এনেছেন প্রাগার্য ধর্মমত, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি। আর্যরা ধীরে ধীরে সেগুলি আত্মস্থ করে সমৃদ্ধ করে তুলছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম উপাসনা ও দর্শন। বিনা রক্তপাতে এই যে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিপ্লব, যাতে আর্য জীবনযাত্রার ধারা বিশ্বাস আচার–সবই গভীর ভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হল, এটিকে সার্থক করার জন্য আর্য মনীষীরা এক দিকে যেমন আর্য দেবমণ্ডলীর মধ্যে প্রাগার্য দেবতাদের স্থান দিলেন, অন্য দিকে তেমনই ভাবাদৃষ্টি সম্প্রসারিত করে এমন একটি চিন্তাধারার প্রবর্তন করলেন যার মধ্যে বিভেদ গৌণ হয়ে ঐক্যই মুখ্য হয়ে উঠল।'(৩৬) আর্যাবর্তে বহু খণ্ড-রাজ্য, নানা রাষ্ট্রব্যবস্থা, নানা জাতি মত ও আচার, এগুলিকে কল্পলোকে উপনিষদ একটি সংহতি দিয়ে বলল, সবই সেই একক সত্তার প্রকাশ, সত্য সেই এক, সেই বৃহৎ ব্রহ্ম, সেই পরম-সত্তা আত্মা, স্ব-রূপ।

সমাজে অনুষ্ঠিত বহু সম্প্রদায়ভেদগত অন্যায়ের একটি কাল্পনিক ক্ষতিপূরণের এ চেষ্টার যে ত্রুটি, ভারতবর্ষের সমাজ তার পূর্ণ মূল্য আজও শোধ করছে। কিন্তু সে দিন সম্ভবত এ বোধের উদয় হয়েছিল জীবনকে তার স্বরূপে বুঝে নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তাকে বৃহৎ সমষ্টিসত্তার অন্তর্গত রূপে জেনে তার যথার্থতাৎপর্য খুঁজে পাওয়ার জন্যে। যাজ্ঞবল্ক্যের চোখে এ জানাটা খুবই জরুরি; তাই বলছেন: 'গার্গি, এই অক্ষয়কে না জেনে যে এই পৃথিবী থেকে চলে যায় সে কৃপার পাত্র, যে এই অক্ষয়কে জেনে পৃথিবী থেকে যেতে পারে সেই ব্রাহ্মণ।'(৩৭) ব্রাহ্মণ কেন? ব্রহ্ম বা বৃহৎকে সে জেনেছে, তাই। এই পৃথিবীতে থেকেই সে (তত্ত্ব)-টিকে আমরা জানব, নইলে মহতী বিনষ্টি। যারা তা জানে তারা অমৃত হয়, অন্যেরা দুঃখ পায়।'(৩৮) এই তোমার আত্মা সব কিছুরই অভ্যন্তরে, এর বাইরে সব কিছু আর্ত।(৩৯) এর বাইরে কী আছে? আছে বিচ্ছিন্ন এককের বোধ, যে বোধে আমরা শুধুই স্বতন্ত্র, শুধুই খণ্ডিত একটি ব্যক্তি মাত্র। সেই একক সত্তার বোধও মিথ্যা নয়, তবে সে-বোধ অসম্পূর্ণ, সে-বোধে ব্যক্তির মৃত্যু আত্যন্তিক; তাই সে-বোধ মৃত্যুর চরম আর্তিতে ক্লিষ্ট। মানুষের আত্মা তো তার একার শুধু নয়, সমগ্র মানবজাতিরই। সেইখানে সে পূর্ণ, তার বাইরে সে দ্বীপমাত্র, বিচ্ছিন্ন, তুচ্ছ, খণ্ডিত, একান্তবিধ্বংসী। এই সত্তাই যে মানুষের চূড়ান্ত সত্তা নয়। সেইটুকু জানার দ্বারাই মানুষ তার মৃত্যুসীমা উত্তরণ করে তার পরম মানবসত্তায় অমরতা লাভ করে।

উপনিষদে এই বৃহৎ বা ব্রহ্মের উপরে যে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে তার আর-একটা কারণ হয়তো এই যে, এখানে সমস্ত চিন্তার আদিম প্রেরণা আসছে মৃত্যু থেকে। ব্যক্তিসত্তার এই একান্ত বিলুপ্তি, মানবজীবনের সমস্ত তাৎপর্যের এই আপাত প্রবল অস্বীকৃতি, জীবিতের পক্ষে একে স্বীকার করাই যেন এক ধরনের পরাজয়। কোনও-না-কোনও ভাবে তাই মানুষ চিরদিনই বলতে চেয়েছে মৃত্যুতে সব শেষ হয় না। জন্মান্তরবাদে মৃত্যুর দ্বারা বিনাশ আপেক্ষিক বা

আপাতরূপে প্রতিভাত। কিন্তু উপনিষদে আরও সার্থক ভাবে মৃত্যুর সঙ্গে অমরতার সমন্বয় করা হয়েছে। মৈত্রেয়ী যখন বললেন, যাতে অমর হব না তা দিয়ে আমি কী করব।' তখন তার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে যে উপদেশ দিলেন তা হল: আপনি ব্যক্তিসত্তকে বিশ্বসত্তার মধ্যে স্থাপিত করে স্ব-রূপে তাকে জানো; সেই সত্তাই আত্মা, সেই ব্রহ্ম। প্রকারান্তরে বলা হল, এই সেই জ্ঞান যা অমর করে মানুষকে; কারণ ব্যক্তির নাশ হয় মানুষের' ধ্বংস নেই। ইতিহাসের আদিপর্ব থেকে যে-মানুষের অভিযান নানা দেশে নানা কালে অনাগতের অভিমুখে, তার বিনাশ নেই; সেই 'পুরুষ, সেই ব্রহ্ম, মানুষের ভাবসত্তায় সে-ই আত্মা। সেইটো জেনে এ-পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার দিনে মানুষ আশ্বস্ত হয়ে যেতে পারে যে, নিরবধি কাল ও বিপুল পৃথীতে সে অক্ষয়, অমর। বহু জাতি ও সংস্কৃতির সার্থক সমন্বয়ের ঐকান্তিক প্রয়াসেই এ-তত্বটির উদয় হয়েছিল।

উপসংহারে উপনিষদের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বারেবারেই দেখা যায় ব্রহ্মেবাদ্য বা তত্বজিজ্ঞাসার উপক্রমণিকারূপে অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে: কোথাও দুর্ভিক্ষের সময়ে হস্তিপকগ্রামে ব্রহ্মবাদী হীনবর্ণের উচ্ছিষ্ট কুল্মাষ (খারাপ মাষকলাই) ভক্ষণ করছেন, কোথাও শকটের নীচে বসে গাত্রকণ্ডূয়ণ করছেন, কোথাও দরিদ্র ঋষির কাছে যজ্ঞের ঋত্বিকের আহ্বান এসে পৌঁছাচ্ছে, কোথাও বৃদ্ধ শীর্ণ গাভী দক্ষিণার জন্যে সাজানো আছে, কোথাও-বা পিতৃপরিচয়হীন বালক আচার্যের কাছে বিদ্যার্থী হয়ে এসেছে। তত্বজিজ্ঞাসার ভূমিকা হিসেবে এগুলি অপরিহার্য নয়; আচার্য ও জিজ্ঞাসুর সংলাপ সরাসরিই আরম্ভ হতে পারত, যেমন অধিকাংশ মূল উপনিষদে হয়েছে। যে-সাহিত্য কথ্য ও শ্রব্যযেমন উপনিষদ— তাতে শব্দবাহুল্য সর্বদাই পরিহার করা হয়, কাজেই ধরে নিতে হবে এ-সব ভূমিকার কোনও তাৎপর্য আছে। মনে হয়, উপনিষদকাররা বলতে চেয়েছেন, এই দৈনন্দিন তুচ্ছতা–

দৈন্য কুশ্রীত অভাব। কার্পণ্য ও হীনতা–এ-সবের মধ্যেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, এ-সবের জন্যেই প্রয়োজন। এ-সবের থেকে পলায়ন করবার জন্যে উপনিষদ নয়, ক্ষুদ্রতার পরিবেশে থেকেও ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে সেই-বৃহৎকে জা িনবার জন্যে উপনিষদ, যে-বৃহতের মধ্যে বিচ্ছিন্ন খণ্ড ক্ষুদ্রও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষ’ সর্বমানবের প্রতিভূ। দেশে কালে সীমাবদ্ধ, জাতি আচার সংস্কৃতিতে খণ্ডিত, হীনতায় দৈন্যে কুশ্রীতায় ক্লিষ্ট একক মানুষ, জরা েমরণশীল অসহায় ব্যক্তি মানুষ, একটি অবিনশ্বর মর্যাদা লাভ করে তার সেই ভা েবরূপে–সেই পুরুষে, অনাদ্যন্ত কালের মানুষের যিনি কল্পরূপ। এখানে যাজ্ঞবল্ক্য আদর্শবাদী বা ভাববাদী,(৪০) কিন্তু বেদান্তের এই প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতবর্ষের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সংস্কৃতির ভেদ সত্ত্বেও একটি সংহতি দেওয়ার চেষ্টায় এ-দর্শনের হয়তো একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল।

একবার বিদেহের রাজা বসে আছেন এমন সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য এলেন। জনক তাঁকে বললেন, ‘যাজ্ঞবল্ক্যয কী প্রয়োজনে এসেছেন–পশুধনলাভের আশায়, না সূক্ষ্মতত্ত্বের সন্ধানে?’যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ‘উভয়ের জন্যই সম্রাট।’(৪১) আর-একবার ব্রহ্মাতত্ত্ববিচারে বেদজ্ঞদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ হবেন, তার উদ্দেশে বিদেহরাজ জনক সোনায়-শিং-মোড়া এক হাজার গাভী বেঁধে রাখলেন। যাজ্ঞবল্ক্য নিজের শিষ্যকে বললেন, ‘সো েমশ্রবা, গোরুগুলোকে বাড়ি নিয়ে চল।’ ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হলেন; তাঁদের মধ্যে অশ্বল বললেন, ‘যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই বুঝি আমাদের মধ্যে ব্রিহ্মিষ্ঠ (ব্রহ্মজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ)?’ যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ব্রিহ্মিাষ্ঠীকে আমরা নমস্কার করি (আজ এখানে) আমরা তো গোধনের কামনায় (এসেছি)।(৪২) শ্বেতকেতু, সোমশুষ্ম ও যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার জন্যে জনকের কাছে এলেন; একদিন আলোচনার পর ঠিক হল, পরদিন ব্রহ্মোদ্যে (ব্রহ্মা সম্বন্ধে আলোচনায়) নিষ্পত্তি হবে। যাজ্ঞবল্ক্য

ব্রাহ্মণদের বললেন, ‘আমরা ব্রাহ্মণ, ইনি রাজন্য; যদি আমরা একে জয় করি তবে আর কাকে জয় করলাম বলব? ইনি যদি আমাদের জয় করেন। তবে কিন্তু রাজন্য ব্রাহ্মণদের পরাজিত করেছে–এই কথাই লোকে আমাদের বলবে, (কাজেই) এ-ব্যাপারে উৎসাহ ত্যাগ করো।’(৪৩)

এ ক’টি উপাখ্যানে যে-যাজ্ঞবল্ক্যকে দেখি, তাঁর ঋষিজনোচিত তুরীয় ভাব নেই তাতে। বরং, তাঁর সাধারণ বুদ্ধি এবং কাণ্ডজ্ঞান প্রবল আর প্রবল তাঁর অসংকোচ সত্যনিষ্ঠা। উপনিষদে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে কোনও কৃত্রিম সংকোচ নেই। বেঁচে থাকার জন্যে অর্থের প্রয়োজন আছে, পশু দরকার, স্বর্ণশৃঙ্গ গাভী পেলে নিতে হয়–এবং বড় বড় ব্রহ্মজ্ঞ যা স্বীকার করতে পারেননি যাজ্ঞবল্ক্য অনায়াসে তা উচ্চারণ করলেন: রাজসভায় যারা সমবেত তাঁরা ব্রহ্মের জন্যে আসেননি, এসেছেন সোনা আর গরুর জন্যে। রাজাকে তেমনই সহজেই তিনি জানাতে পেরেছিলেন যে শুধু ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার জন্যেই আসেননি পশুধন লাভের প্রত্যাশাও তার আছে। পরবর্তীকালে ঐহিক জীবন সম্বন্ধে অনীহা প্রকাশ এমনই ব্যাপক হয়ে উঠল যে, এই অকুণ্ঠিত সত্যভাষণের সাহস বিরল হয়ে এল। দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলো মায়া নয়, অত্যন্ত জরুরি তাদের তাগিদ এবং সে তাগিদ মেটানোতে যে পাপীও নেই, লজ্জাও নেই, যাজ্ঞবল্ক্যের আচরণে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ‘কেউ বলেন অন্ন ব্রহ্মা, কেউ বলেন প্রাণ ব্রহ্মা; প্রাণ এবং অন্ন দুটি দেবতা এক হয়ে পরমতা প্রাপ্ত হয়; অন্নে এই সমস্ত প্রাণী আশ্রিত।’(৪৪) উপনিষদগুলিতে অসুরদের চেয়েও প্রবলতর শত্রু দুটি: অশনায়া (বুভুক্ষ) ও মৃত্যু। যজ্ঞের প্রাথমিক প্রয়োজন অন্ন সৃষ্টি ও রক্ষার জন্যে। বারবার ঋষিরা বলছেন, অন্নকে উপেক্ষা কোরো না, অন্নকে রক্ষণ করো, তার বৃদ্ধি করো।

মানুষের সকলের বড় এবং অমোঘ শত্রু মৃত্যু। বস্তুত বহু তত্ত্বাচিন্তার সূত্রপাতই হয়েছে মৃত্যুসচেতনতায়। জীবনের তাৎপর্য বুঝতে শুরু করলে

প্রথম ধাক্কাই আসে মৃত্যু থেকে: মৃত্যুতে এসে যা ঠেকে যায় তার আত্যন্তিক মূল্য কী? সমস্ত উপনিষদ জুড়ে তাই কেবলই বলা হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান জাগলে মৃত্যু পরাভূত হয়, মানুষ মৃত্যুকে পেরিয়ে যায়। কেমন করে? খণ্ড ব্যক্তিসত্তা যেখানে নশ্বর, সামগ্রিক জাতিসত্তায় মানুষসংজ্ঞিত জীবের অনাদ্যন্ত ইতিহাস সেখানে শাশ্বত। আমি মরব, কিন্তু আমরা মানুষরা কখনও নিঃশেষিত হব না'–এই প্রত্যয়েই অমরতা, এতেই জীবনের তাৎপর্য। একক জীবনে যে উদ্যম অর্থহীন, মানবজাতির দূর-প্রসারী সত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তা মূল্যবান। মনে হয়, এই বৃহতের চেতনা থেকেই ব্রহ্মাকল্পনার উদ্ভব, এ বৃহতের ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই।

যাজ্ঞবল্ক্যকে বৈদিক যুগের শেষার্ধের একটি যুগমানব বলে ধরা যায়। তাঁর মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলির উপরে সচরাচর বেশি গুরুত্ব অর্পণ করা হয় না, অথচ মনে হয়, এগুলি উপনিষদ-যুগেরই বৈশিষ্ট্য। ইহজীবনকে মায়া বলে উড়িয়ে না দিয়ে তাকে স্বীকার করে, বৃহতের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তিসত্তর সীমা অনাদি-অনন্ত কালে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে, তার ক্ষুদ্রতা নশ্বরতাকে অতিক্রম করে, ভাবগত মানবসত্তর মধ্যে তাঁর অমৃতরূপকে উপলব্ধি করা–সমস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে সংহত ভাবে দেখলে এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিভাত হয়। শংকর ভাষ্য-নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত উপনিষদকে মিলিয়ে দেখলেও এই বোধটিই স্পষ্ট ভাবে চেতনায় সঞ্চারিত হয়।

স্বাভাবিক ভাবেই, উপনিষদের সব ঋষির দৃষ্টিভঙ্গি এক রকম নয়, তাঁরা সুসম্বন্ধ কোনও দর্শনপ্রস্থান রচনার চেষ্টামাত্র করেননি, শুধু ক্রান্তদশীর দৃষ্টি নিয়ে অব্যবহিত উপলব্ধি ও ঐকান্তিক মননের মাধ্যমে একাগ্র নিষ্ঠায় জীবনকে গভীর ভাবে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। ফলে তাদের দৃষ্টির মধ্যে দার্শনিক সংহতি থাকার কথাই নয়, ছিলও না। শংকরাচার্য নিজের দার্শনিক

মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে উপনিষদগুলিকে ব্যবহার করেছেন মাত্র। তাঁর রচনায় তাই উপনিষদ পাই না, পাই শংকরদর্শন, যা উপনিষদ যুগের দেড় হাজার বছর পরের দর্শন এবং অন্তর্বর্তীকালের সমস্ত মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। এই কারণে উপনিষদকে তার নিজস্ব চিন্তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার পক্ষে শংকরদর্শনের উপযোগিতা যৎসামান্য। শংকরদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেদস্তপ্রস্থান; কিন্তু তার কৃতিত্ব শংকরাচার্যেরই, তার মধ্যে উপনিষদের বোধ খুঁজতে যাওয়া নির্ষ্মফল। উপনিষদকার ঋষিদের দৃষ্টির মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। তবু, যেহেতু একই অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত এবং একই সামাজিক ঐতিহাসিক বোধের সংঘর্ষ ও সমন্বয়চেষ্টায় এদের সৃষ্টি, সেই হেতু মতগুলির মধ্যে এক ধরনের অন্তর্নিহিত মিল-অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে হলেও–আছে। ফলে, খুব সাধারণ ভাবে উপনিষদের ভাবধারা বলতে আমরা কয়েকটি কথা বুঝি। সেই প্রধান কয়েকটি বিষয়ের একজন মুখ্য-প্রবক্তা বৃহত্তম উপনিষদটির রচয়িত যাজ্ঞবল্ক্য। তাই যাজ্ঞবল্ক্যে যখন দেখি জীবনবিমুখত নেই, বরং এ-জীবনকে সর্বতো ভাবে স্বীকার করেই বৃহত্তর পটভূমিকায় তাকে অর্থপূর্ণ করে দেখার প্রচেষ্টা আছে তখন সমস্ত উপনিষদের যুগটিই আমাদের কাছে অন্য ভাবে প্রতিভাত হয়।

গুরুর প্রদত্ত বেদবিদ্যা প্রত্যুপণ করেও যাজ্ঞবল্ক্য 'শুক্ল' বেদের ঋষি; নারী ও প্রেমকে তিনি গৌরবে মণ্ডিত করে দেখেছেন; গোমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে অহেতুক নিষেধ মানতে তিনি রাজি নন। বরং তার উপযোগিতা অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করেছেন; ক্ষত্রিয়কে ব্রহ্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠ আচার্য বলে অনায়াসে স্বীকার করেছেন; মৈত্রেয়ী নারী হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ অধিকারিণী জেনে অকাতরে তাকে ব্রহ্মাবিদ্যা দান করেছেন; গোকামনা। ধনকামনা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই; উপযক্ত পুত্র ও কন্যা লাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে মেনে নিয়ে ভাবী পিতাকে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; যৌনজীবনের স্বলনকে উগ্র ভাবে আক্রমণ

না করে মমত্বপূর্ণভাবে প্রতিকার নির্দেশ করেছেন; ক্ষুধা ও মৃত্যুকে পরম শত্রু বলে অভিহিত করেছেন; দেবতাদের মানুষের অনুজ ও মানুষ সম্বন্ধে ঈর্ষাকাতর বলে বর্ণনা করেছেন–এক কথায়, সুস্থ স্বচ্ছন্ন ঐহিক জীবনযাত্রাকে স্বীকার করে মানুষকে মহত্ত্বে ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সমস্তই সে-যুগ ও যুগপ্রতিভু যাজ্ঞবল্ক্যের উপরে নূতন এক আলোকপাত করে। আমরা বুঝতে পারি, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অভ্যুত্থান ও বহু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কী গুণে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল: জীবন সমাজ সংসার সাব-কিছুরই স্বীকৃতি ছিল এর মধ্যে–শুধু ছিল না সংকীর্ণ বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির। যাজ্ঞবল্ক্যও বললেন অনাদিকালের ভূমিকায় মানুষকে তার স্বরূপে না জেনে মৃত্যুতে ব্যক্তির বিনাশের আতঙ্কে মুহ্যমান হয়ে যে ইহলোক থেকে প্রস্থান করে সে কৃপার পাত্র। এ পৃথিবীতে থেকেই উপলব্ধি করতে হবে যে একের মৃত্যুতে একই শেষ হয়—'মানুষ' শেষ হয় না। অতএব একের জন্যে জীবনধারণ করা চূড়ান্ত ব্যর্থতা, মহতী বিনষ্টি।

'এই পৃথিবী সমস্ত প্রাণীর মধু, সমস্ত প্রাণী এ পৃথিবীর মধু।'(৪৫) পৃথিবীর ধূলিও যেন মধুমান হয়–সংহিতার ঋষি এমন প্রার্থনা করেছেন। উপনিষদের ঋষিও পার্থিব এই-জীবনকে তাচ্ছিল্য করেননি। আয়ু সুখ ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ জীবনের তৃপ্তি—কোনওটাই উপেক্ষণীয় নয়, কিন্তু একক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে— মৃত্যু যেখানে অনিবার্য ও চূড়ান্ত সত্য, সেখানে–এ সব সুখই নিরতিশয় ভঙ্গুর। তাই সাহস করে সত্যের উপরকার সোনার আবরণখানি খসিয়ে নিরঞ্জনরূপে তাকে দেখতে হবে সেখানেই, যেখানে প্রতিষ্ঠিত-মানব-জাতি, যা ক্ষুদ্র-আমার' জন্মের পূর্বেও ছিল এবং 'ক্ষুদ্র-আমার' মৃত্যুর পরেও থাকবে। তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এই আপাত-নিরর্থক জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে হবে। তখন এক দিকে যেমন পার্থিব সুখ বর্জনীয় মনে হবে না, অন্য দিকে তেমনই তা একান্ত হয়ে উঠবে না। এই জ্ঞানই বৃহতের জ্ঞান,

ব্রহ্মজ্ঞান। যাজ্ঞবল্ক্য এই ব্রহ্মবিদ্যারই পরম প্রবক্তা, তাই ব্যবহারিক জীবন থেকে পলায়নের পরামর্শ তিনি দেননি, ব্যবহারিক উপলব্ধি অভিজ্ঞতাকে, সুখসম্ভোগকে বৃহতের পটভূমিকায় স্থাপনা করাই তার কীর্তি, কারণ এর মধ্যেই জীবনের চরম মূল্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে।

টীকা

১. যে ধেন্বনডুহোরাষ্ট্রীয়াদগুগতিরিব... পাপী... তস্মাদ্ধোন্বনডুহোর্নাষ্ট্রীয়াত্তদু হোবাচ। যাজ্ঞবল্ক্যোহ

শ্বাম্যেবাহমাংসলং চেম্ভুবতীর্তি। শতপথ ব্রাহ্মণ ৩:১:২:২১

২. অতিথির্বা এষ এতস্যা আগচ্ছতি যৎ সোমঃ ক্রীতস্তস্মা। এতদ যথা রাজের বা ব্রাহ্মণায় বা মহোক্ষং বা মহাগজং মা মহাজং বা পচেত্তদহ মানুষং হবিদেবানামস্মা। এতদাতিথ্যং করোতি। প্রাগুক্ত ৩:৪:১:২

৩. ...ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা।। বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ৬:৪:১৪-১৮

৪. এতে পঞ্চ পশবঃ অদ্ভবংতে অতি উৎক্রান্তমেধা আমেধা অন্যঞ্জিয়াস্তেষাং ব্রাহ্মণো নামীয়াত্তন। প্রাগুক্ত ৭.৫.২.৩৭

৫. অর্ধে বা এষ আত্মনো যজ্জায়া। শতপথ ব্রাহ্মণ ৫:২:১:১০

৬. কোহাদাৎ কস্মা অদ্যাৎ কামোহাদাৎ মামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা। প্রাগুওক্ত ৪:৩:৪:৩৩

৭. সবৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী নরমতে সদ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। সহৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিস্বর্ত্তৌ স ইমামেবাত্মানং দ্বেধাপাতায়ৎ ততঃ পতিশাচ পত্নী চাভবতং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব। প্রাগুক্ত ১:৪:৩

৮. যথা প্রিয়য়া স্ক্রিয়া সম্পরিস্বজো নবাহ্যং কিিঞ্চন বেদ...।
বৃহদারণ্যকোপনিষদ :৩:২১

৯. ন বা অরে পত্তুত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। প্রাগুক্ত ২:৪:৫

১০. য এক নৃত্যতি যো গায়তি তস্মিন্নেবৈতা নিমিল্পতমা ইব। শতপথ ব্রাহ্মণ ৩:২:৪.৬

১১. জঘনাধো বা যঞ্জস্য যৎ পত্নী। প্রাগুক্ত ৩:৪:২.২

১২. গৃহের অধিপতি ছিলেন দম্পতী (মৌলিক অর্থ দম সংগৃহ, তার পতী অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী)।

১৩. গার্গি মাতিপ্রাক্ষীর্মা তে মুর্ধ ব্যপগুৎ। বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৩:৬.১

১৪. স পত্নী মুদানেষ্যন পৃচ্ছতি কেন চসরীতি। বরুণ্যং বা এতৎ স্ত্রী কবোতি যদন্যস্য সত্যন্যেন চরিত্যাথো নেন্মেহন্তঃশল্য জুহাবদিতি... সা যন্ন প্রতিজনীতে জ্ঞাতিভ্যো হাস্যৈ তদহ্নিতং স্যাৎ। শতপথ ব্রাহ্মণ ২.৫.২.২০

১৫. কার্মৈহ স্মী বৈ পুরষয়ঃ সত্রমাসতে... অসৌ নঃ কামঃ স সমৃধ্যতামিতি। প্রাগুক্ত ৪-৬:৯:২৩

১৬. ইতঃ প্রদানা।দ্ধি দেবা উপজীবস্তি। প্রাগুক্ত ১:৩:১:১৫

১৭. তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ। বৃহদারণ্যকেনিষদ ১.৪.১০

১৮. পুরুষো বৈ প্রজাপতের্নেদিষ্ঠঃ সোহয়ং শতায়ঃ শততেজঃ শতবীর্যঃ।
শতপথ ব্রাহ্মণ ৪ :৪:১:৯

১৯. সমন্তিকমিব হে বা ইমেহগ্রে লোকা আসুরিত্যুন্মুশ্য হৈব দৌরাস। প্রাগুক্ত ১:৪.১.২২

২০. কনীয়াংসো হি দেবা মনুষ্যেভ্যঃ। প্রাগুক্ত ২:৩-২:১৮, ২:৩:৩:১৮

২১. প্রাগুক্ত ৯.৫.১.১৩-১৬

২২. অত্তা বৈ ক্ষত্রিয়য়োহান্নং বিটু। প্রাগুক্ত ৮.৭:১:২, ৮:৭:২২, ৯.৪:৩:৫

২৩. ন বৈ ব্রাহ্মণো রাজায়ালম। প্রাগুক্ত ৫:১:১:১৩

২৪. ব্রহ্মা বা ইদমগ্র আসীদোকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ।
তচ্ছেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি। তস্মাদ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্রে এবং তদ যশো দধতি। প্রাগুক্ত ১.৪:১১-১৫

২৫. ইয়ং বিদ্যেতঃ পূর্বাং ন কস্মিংশ্চৈন ব্রাহ্মণ উবাস। বৃহদারণাকোপনিষদ ৬:২:৪

২৬. প্রাগুক্ত ৪.৩.১

২৭. যাজ্ঞবল্ক্য হ বিভয়াঙ্কার মেধাবী রাজা সর্বেভ্যো মাহন্তেভ্য উদরৌৎসীৎ। প্রাগুও, ৪.৩.৩৩

২৮. তৌ হ যদুচতুঃ কর্ম হৈব তদুচতুঃ। প্রাগুক্ত ৩:২:১৩

২৯. যথেয়াং ন প্রাক ত্বত্তো পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমিতি। প্রাগুক্ত ৫.৩.৬

৩০. যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্বান্তরঃ। প্রাগুক্ত ৩:২৮১১

৩১. প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মান্তরিতরাং যদয় মাত্মা তদেব। প্রাগুক্ত ১:4:৮

৩২. যঃ পৃথিব্যাংতিষ্ঠান পৃথিব্যা অন্তরে যং পৃথিবীন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তোরো যময়তোষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃত্যুঃ। প্রাগুক্ত ৩:৭:৩

৩৩. প্রাগুক্ত ৪.১.৩

৩৪. প্রাগুক্ত ৪.৩.১১.১২

৩৫. আরাম্যমস্য পশ্যত্তি না তং পশ্যতি কশ্চন। প্রাগুক্ত ৪:৩:১৪

৩৬. এই সামগ্রিক সত্তাকে কালে ব্যাপ্ত করে দেওয়ার একটি উপায় হল জন্মান্তরবাদ। এই তত্ত্ব অনুসারে একই সজ্ঞা বহুজন্মে নানা রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। ব্রাহ্মণ শূদ্র নারী পুরুষ হস্তী মেষ নানা বিচিত্র প্রকাশ তার; অর্থাৎ আত্মসত্তর কেন্দ্রসূত্রে জীবের বিভিন্নরূপে আত্মোদঘাটন এবং তা দীর্ঘকালে বহুদূরে পরিব্যাপ্ত। এর দ্বারা ভাবলোকে শ্রেণিসম্প্রদায় প্রাণীর প্রকারভেদ সবই একটি অলক্ষ্য কেন্দ্রসূত্রে বিধৃত হয়ে রইল। সমাজে তখন

জাতিভেদ ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছে; হয়তো ভাবলোকে সে-অপরাধবোধের একটি প্রায়শ্চিত্ত জন্মান্তরিবাদের এই দিকটায়।

৩৭. খ এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাব্স্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোহথ যা এতদীক্ষরং গার্গি বিদিত্বাব্স্মায়োকৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণ। প্রাগুক্ত ৩.৮.১০

৩৮. ইহৈব সন্তোহথ বিন্ধস্তদ্বয়ং ন চেন্দর্বেদিমহতী বিনষ্টিঃ। যে তদ্বিদুর মৃত্যাস্তে ভবন্ত্যাথেতরে দুঃ খমেবাপিযন্তি। প্রাগুক্ত ৪:৪:১৪

৩৯. এষ ত আত্মা সর্বাস্তারাহতোহানাদার্তম। প্রাগুক্ত ৩:৪:২

৪০. Uddalaka and Yajnavalkya, the first representing the earliest naturalistic point of view recorded in Indian literature and the latter the most important carly idealistic view to be ultimately consummated in the Vedanta philosophy...the first famous idealistic philosopher of India was Yajnavakya. Dale Riepe: The Nuturaliatic Tradition in Indian Thought, Motilal Banarasidas, 1964, pp. 27-28, 30.

৪১. জনকো হ বৈদেহ আসাঞ্চক্রেহথ হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ। তং হোবাচ। যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থমচারী: পশুনিচ্ছন্নশ্বস্তানিতি। উভয়মেব সম্রাডিতি হোবাচ। প্রাগুক্ত ৪:১:১

৪২. নমো বিয়ং ব্রহ্মাষ্ঠায় কুমে গোকামা এব বয়ম। প্রাগুক্ত উ, ৩:১:২

৪৩. ব্রাহ্মণা বৈ বিয়ং স্মো বাজনাবন্ধুরসৌ যদ্যমুং বায়ং জয়েম কমজৈন্মেতি ব্রুয়ামাথ যদ্যসাবস্মান জয়েদ গ্রাহ্মাণান রাজন্যবন্ধুর জৈষীদিতি নো ব্রুয়ুর্মেদমাদৃত্ব ম্য। শতপথ ব্রাহ্মণ ১১:৬:২:৫

৪৪. অন্নং ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন...প্রাণো ব্রহ্মত্যেক আহুস্তল্ল.এতে হণ্ডেব দেবত্বে একধাভুয়ং ভূত্বা পরমাতাং গচ্ছতঃ..অন্নে হীমনি সর্বনি ভুতানি বিষ্টনি। বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৫:১২:১

৪৫. ইয়ং পৃথিবী সর্বের্যাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বণি ভুতানি মধু। প্রাগুক্ত ২:৫:১

প্রাচীন ভারতে গণিকা

প্রাচীন ভারতের সমাজে গণিকার কী পরিচয় ও স্থান ছিল তা বিচার বা বিশ্লেষণ করার পূর্বে দেখা যেতে পারে প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে গণিকার সংজ্ঞা ও পর্যায়বাচক কী কী শব্দ ছিল। এই প্রতিশব্দগুলির মধ্যে দিয়েই সমাজ গণিকাকে কোন চোখে দেখত তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ঋগ্বেদই ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য এবং এখানেই গণিকাবাচক বেশ কয়েকটি শব্দ পাই: হস্রা, অগ্রু। (৪:১৬:১৯:৩০; ৪:১৯:৯); সাধারণী (১:১৬৭:৪; ২:১৩:১২, ১৫, ১৭) এর কিছু পরে অথর্ববেদে আছে পুংশ্চলী। (১৫:১:৩৬; ২০:১৩৬:৫) শুক্ল যজুর্বেদ-এর বাজসনেয়ী সংহিতায় সাধারণী ও সামান্যা; (৩০:১২) কৃষ্ণ যজুর্বেদ-এর তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও এ শব্দ দুটি

পাওয়া যায়। (৩:৪৭) আরও কিছু পরে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নতুন দুটি শব্দ পাই, অতিস্কদ্বরী ও অপস্কদ্বরী, যে (নিয়ম) উল্লঙ্ঘন করে। (৩:৪:১১:১)। আর পাই ব্রজয়িত্রী, যে আনন্দ দেয় (বাজসনেয়ী সংহিতা ৩০:১; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩:৪:৭:১) পালি বিনয়পিটক-এ একটি শব্দ পাই মুহুত্তিয়া (সংস্কৃত মুহূর্তিক), যে ক্ষণকালের সঙ্গিনী, (৩:১৩৮) জাতকে পাই রূপদাসী, বণ্নদাসী, বেশ্যা, নারিষের, গামনী ও নগরশোভিনী ইত্থি (১:৪৩) এবং জনপদকল্যাণী। এদের মধ্যে রূপদাসী ও বণ্নদাসী অন্য প্রধান গণিকার অধীনে অথবা স্বতন্ত্র ভাবে প্রার্থীকে আপ্যায়ন করতে পারত। (অর্থশাস্ত্র ২:২৭); জাতক-এও এদের কথা পাই। (২:৩৮০; ৩:৫৯-৬৩, ৬৯-৭২; ৪৭৫:৮)

এর পরবর্তীকালে গণিকার প্রতিশব্দ সংখ্যায় বেড়েই চলে। মহাকাব্যে পুরাণগুলিতে ও সাহিত্যে যাদের দেখা পাই তাদের নানা নাম— কুলটা, স্বৈরিণী, বারাঙ্গনা, বারস্ত্রী, বারবনিতা, স্বতন্ত্রা ও স্বাধীনযৌবনা। নটী ও শিল্পকারিকাও মাঝে মাঝে গণিকার প্রতিশব্দ হিসেবে দেখা দিয়েছে, যেমন দিয়েছে কুন্তদাসী এবং পরিচারিকও। বাৎস্যায়নের কামসূত্র-তে গণিকা ও রূপাজীব (৭:৬:৫৪) নাম পাই। জটাধারের শব্দীরত্নাবলী অভিধানে পাই শালভঞ্জিকা, বারবাণী, বর্বটী, ভগুহাসিনী, কামরেখা, শূলা এবং বারবিলাসিনী। শব্দমালা অভিধানে পাই লঞ্জিকা। বৈশিকতন্ত্র-তে আরও কিছু নাম এসেছে: বৃষলী (যার অভিধাগত মুখ্য অর্থ শূদ্রা এবং যার গৌণ একটি অর্থ গণিকা: শূদ্রনারীকে অন্য বর্ণের ভোগ্য মনে করা হত, তাই এতে স্পষ্ট)। এ ছাড়া পাংশুলা (মলিনা), লঞ্জিকা, বন্ধুরা, কুন্তা (শূলার মতো এও একটি বিদ্ধ করার অস্ত্র), কমরেখা, বর্বটী ও রাণ্ডা (এ বিটের রক্ষিতা)। হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি-তে পাই সাধারণাস্ত্রী, পণ্যাঙ্গনা, ক্ষুদ্রা, ভুঞ্জিকা ও বারবধূ। রাজনির্ঘণ্ট অভিধানে আছে ভোগ্য ও স্মরবীথিক এবং অমরকোফ-এ পাই বেশ্যা, বারাষ্ট্রী, গণিকা ও রূপজীব্য। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলে পতিব্রতা হল

একপত্নী, স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের প্রতি আসক্ত নারী কুলটা, তিন জনের প্রতি হলে বৃষলী বা পুংশ্চলী, চার থেকে ছাজনের প্রতি হলে বেশ্যা; সাত আট হলে যুঙ্গ, তদূর্ধে মহাবেশ্যা; কোনও বর্ণের লোকই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। (প্রকৃতি খণ্ড, অধ্যায় ২২৭-২৮)

বলা বাহুল্য, এই প্রায় পঞ্চাশটি প্রতিশব্দের উদ্ভব এক সময়ে হয়নি, এক স্থানেও হয়নি, ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ও কালিক বিকল্পের মধ্যেই নামগুলি সৃষ্ট হয়েছিল। প্রশ্ন করা যেতে পারে, ভারতবর্ষে গণিকাবৃত্তি কত প্রাচীন? এর উত্তরে বলা যায়, ভারতবর্ষে শুধু নয়, তখন থেকে সর্বত্রই গোষ্ঠী ও কৌম ভেঙে পরিবারের পত্তন হচ্ছিল। অর্থাৎ, নারীর উপর যখন পুরুষের স্বত্বাধিকার সমাজ মেনে নিতে শুরু করেছে তখন থেকেই আছে গণিকাবৃত্তি। তখন থেকেই পরিবারের নির্দিষ্ট সীমার বাইরে কোনও নারী যখন অন্য পুরুষকে অর্থ বা বস্তু প্রাপ্তির বিনিময়ে দেহদান করে তখনই সে গণিকা বলে চিহ্নিত হয়। এর মধ্যেও প্রথম পর্যায়ে নিশ্চয়ই নানা স্তর ছিল: দুজনের সম্মতিক্রমে বিবাহগণ্ডির বাইরে পুরুষ বা নারীর এমন সম্বন্ধ ঘটলে তারা ‘জার’ বা ‘জারিণী’ বলে অভিহিত হত। এ শব্দ দুটি ঋগ্বেদে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে, এমনকী উপমায় উপমানরূপেও। কাজেই ঋগ্বেদের সমাজ নিশ্চয়ই বিবাহিত নরনারীর অবৈধ’ প্রণয় একটি পরিচিত ঘটনাই ছিল। এছাড়াও সেখানে নানা বিকল্প সম্পর্কের চিহ্ন পাওয়া যায়। উপহারের বিনিময়ে মিলনেও গণিকাবৃত্তি না-ও থাকতে পারে, যেহেতু উপহার প্রীতির চিহ্নও হতে পারে। সে উপহার কখন মূল্যের বিকল্প তা নির্ধারণ করা কঠিন, কারণ প্রাক-মুদ্রা সমাজের অর্থনীতিতে বস্তু অর্থের বিকল্প, এবং এ-বস্তু মূল্যরূপেও দেওয়া যায় প্রীতি উপহাররূপেও দেওয়া যায়। কাজেই মনে করা যেতে পারে, বিবাহ সম্পর্কের বাইরে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা নারী যখন বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধানের মূল্য’ রূপে অর্থ বা উপহার গ্রহণ করে তখন সেইটিই গণিকত্বের লক্ষণ, সে মূল্যগ্রহণ মধ্যে মধ্যেই হোক অথবা

নিয়মিত বৃত্তিরূপেই হোক। কাজেই গণিকাবৃত্তি বিবাহবন্ধনের বাইরে’ একটি নিয়ামক লক্ষণ এবং মূল্যগ্রহণ’— এ দুটির দ্বারা চিহ্নিত। ঋগ্বেদ-এর জার বা জারিণী, উপপতি বা উপপত্নী কিংবা অবৈধ প্রণয়ী বা প্রণয়িনী, মূল্য দান বা গ্রহণ অনুপস্থিত বলেই এই সম্পর্কে গণিকাবৃত্তির অন্তর্গত নয়।

কবে কীভাবে মূল্যের বিনিময়ে নারী দেহদান করতে শুরু করে তার ইতিহাস উদঘাটন করা আজ বোধহয় সম্ভব নয়; তবে সম্ভবত বলা চলে যে, সমাজে বিবাহ ও পরিবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে, নারী যখন স্বাতন্ত্র্য হারায় তখন থেকেই এর শুরু (এ ব্যাপারটা সূত্রসাহিত্যে দেখতে পাই, সেখানে শুনি ‘পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে/রক্ষান্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বতন্ত্রমহহঁত।’ অর্থাৎ কৌমারে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র নারীকে রক্ষণ করে; নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়)। এবং পিতা স্বামী বা পুত্রের রক্ষণীয়া অর্থাৎ যথাক্রমে লালনীয়া ভোগ্যা-ভরণীয়া এবং পোষণীয়া হয়ে ওঠে তখন এ বন্ধনের বাইরে মূল্য দিয়ে যাকে পাওয়া যায় সে-ই গণিকা। এরই সঙ্গে বা অনুক্রমে আরও একটা ব্যাপার গণিকাবৃত্তির প্রসারে সহায়তা করে। তা হল সমাজে কিছু মানুষের হাতে উদ্বৃত্ত বিত্তের সঞ্চয়, যা সে জীবনধারণের প্রয়োজন মেটাবার পর বিলাসে সম্ভোগে ব্যয় করতে পারে।

আগে আমরা যে পঞ্চাশটি প্রতিশব্দ পেলাম, খুঁটিয়ে দেখলে তার সব কটিই পর্যায়শব্দ নয়; তাদের মধ্যে স্তরবিভাগ আছে। কুবুধম্মজাি তক অনুযায়ী রাষ্ট্রে সবচেয়ে নিচু কর্মচারী হল দ্বারিক (দরওয়ান) এবং তারও নিচে গণিকা। আবার গণিকাই কিন্তু ওই বৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেণির নাম। আর এক নাম নগরশোভিনী বা জনপদকল্যাণী। একটা সম্পূর্ণ জনপদের (প্রাচীনকালে জনপদের জনসংখ্যা হয়তো খুব বেশি ছিলও না) সাধারণ ভাবে ভোগ্য নারীর নাম জনপদকল্যাণী। (কল্যাণ শব্দের আদিমতম অর্থ সুন্দর, গ্রিক Kale-র

পর্যায়বাচক। মনে হয় জনপদের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী যাতে কেবলমাত্র একজনের ভোগ্য না হয়, তাই সে-ই জনপদকল্যাণী ছিল সাধারণী। (১) অর্থশাস্ত্র, কামসূত্র এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে যা তথ্য পাই তাতে দেখি গণিকার স্থান সবচেয়ে ওপরে, রূপে যৌবনে শিক্ষাদীক্ষায় সেই শ্রেষ্ঠ। (কামসূত্র ১:৩:২০) তার নিচে রূপাজীবা যে শিক্ষাদীক্ষা ও রূপযৌবন, ধনসম্পদ এবং সামাজিক প্রতিপত্তিতে গণিকার চেয়ে নিচে। তারও নিচে বেশ্যা— নাম শুনেই বোঝা যায় তার মূলধন বস্ত্রালংকারে, সাজগোজে। গণিকা যখন গণিকালয়ে বাস করত তখন রাষ্ট্র তার শিক্ষার ব্যয়বহন করত, তার আয় থেকে নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় করত এবং কৌটিল্য বার্ধক্যে তাকে কিছু বৃত্তি দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব এং অধিকার দুই-ই তার ছিল। রূপাজীবার শিক্ষার দায় তার নিজের বা তার মায়ের অথবা তার গ্রাহকের, এ ছাড়া ছিল অবরুদ্ধা অর্থাৎ রক্ষিতা, যার সমস্ত দায়িত্ব তার পৃষ্ঠপোষকের অর্থাৎ যে তার আর্থিক সব দায়িত্ব বহন করত এবং বিনিময়ে সে একই তার কাছে আসতে পারত, এর স্বাচ্ছন্দ্য এবং আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণই ওই একজন পৃষ্ঠপোষকের অবস্থা এবং মর্জির ওপরে নির্ভর করত। এর নিচে আমরা নানা রকম বৃত্তিধারিণীর কথা শুনি যেমন সৈরিন্ধ্রী, শিল্পকারিক বা শিল্পদারিক, কৌশিকস্ত্রী, কুম্ভদাসী, বপ্নদাসী, রূপদাসী, নটী, ক্ষুদ্রা, ভুজ্ঞিকা, ইত্যাদি। এরা রাজপ্রাসাদে বা ধনীর প্রাসাদে নিজের শিক্ষা অনুসারে কায়িক শ্রম করে জীবিকানির্বাহ করত। কিন্তু এদের প্রত্যেকেই গৃহস্বামীর ভোগ্যও ছিল।

এর বাইরে ছিল অশিক্ষিতা, অর্ধশিক্ষিতা, রূপহীনা, কখনও বা বিগত যৌবনা, নির্বিত্ত বৃহৎ একটি রূপোপজীবিনীর দল, এদের পরিচয় পুংশচলী, কুলটা, স্বৈরিণী, বারবণিতা (বারমুখ্যা, বারাঙ্গনা, বারাস্ত্রী সবই পর্যায়বাচক শব্দ, অর্থাৎ বার = পালা। অনুসারে যারা পারিশ্রমিক নিত) আয়ের পরিমাপে কতকটা সামাজিক অবস্থান বোঝা যায়: গণিকা রাষ্ট্র থেকে মাসিক ১০০০

পণ পেত, তার চতুঃষষ্টিকলা,শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র নিজ ব্যয়ে বিভিন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করত। বৌদ্ধসাহিত্যে দেখি গণিকা সালাবতীর জন্যে তার মা সিরিমা একরাত্রে ১০০০ কাহাপণ (কার্যাপণ=স্বর্ণমুদ্রা) নিত। (২) সামাজাতকে পড়ি কাশীর গণিকা সামার ৫০০ অনুচারিণী ছিল (জাতক ৩:৫৯-৬৩), এরাই সম্ভবত গণিকাদাসী। গণিকা অম্বীপালীর দক্ষিণা নিয়ে রাজগৃহ ও বৈশালীর মধ্যে রীতিমতো কলহই হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞাত ধর্মকথা নামে জৈন গ্রন্থে দেখি সর্বাঙ্গসুন্দরী ও শিক্ষিতা গণিকার প্রতি রাত্রের আয় ছিল সহস্র কার্যাপণ। মৃচ্ছকটিকে পড়ি বসন্তসেনাকে একবার নিয়ে যাওয়ার জন্য দশ হাজার টাকার গহনাসমেত গাড়ি পাঠিয়েছে রাজশ্যালক শকার। কাজেই ওপরের দিকে রূপযৌবন-যশ-অর্থে প্রখ্যাত গণিকার আয়ের কোনও লেখাজোখা ছিল না। এদের দানের পরিমাণ দেখলেই সেটা কতকটা বোঝা যায়–কেউ বা বুদ্ধ ও একসহস্র শিষ্যকে আহারে আমন্ত্রণ করছেন ও পরিতৃপ্ত অতিথিদের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন অর্থ দিয়ে, কেউ বা আমবাগান দান করছেন, কেউ বা মঠ, কেউ বিহার, কেউ কানন, চৈত্য, স্তূপ, সেতু, কূপ আবার কেউ বা চিত্রশালা। অবরুদ্ধা গ্রাসাচ্ছাদন ছাড়াও মাসে এক পণ নগদ পেত। উল্টোদিকে বিগত যৌবনা রূপহীনা অশিক্ষিতা যে বৃহৎ দলটি ছিল, গণিকাজগতেও তারা অপাঙক্তেয় ছিল। এই পুংশ্চালী স্বৈরিণীদের কাছে যারা আসত তারা যা দিত। তাই এদের নিতে হত। এরা সংখ্যায় বেশি, আকর্ষণ কম, কাজেই চাহিদা এবং মূল্যও কম। ফলে এরা অধিকাংশই খুব দরিদ্র ছিল, অধিকাংশের কাচে গ্রাসাচ্ছাদনটিই ছিল বড় সমস্যা।

এ ছাড়া ছিল দেবদাসী যার অন্য নাম ত্রিদশালয়বনিতা। প্রাচীন গ্রিস, রোম, মিশর, ফিনিশিয়া, কলডিয়া, ব্যাবিলন এবং ভারতবর্ষ সর্বত্রই মন্দিরগণিকার একটা ভূমিকা ছিল। যেখানেই নগর-সভ্যতার পত্তন হয়েছে এবং কোনও কোনও মন্দির সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে সেখানেই দেবদাসীর প্রাদুর্ভাব ছিল। মন্দিরপুরোহিত রাষ্ট্র থেকে বৃত্তি পেতেন, তা দিয়ে তিনি দেবদাসীদের

ভরণপোষণ করতেন, কখনও কখনও দেবদাসীরাও বৃত্তি পেতেন। দামোদরগুপ্তের কুট্টনীমতে দেবদাসীদের রাষ্ট্র থেকে বৃত্তি পাওয়ার কথা আছে, আবার সংযুক্তনিকায়-তে দেখি তারা খাদ্যশস্য পায়। জোগিমারা গুহালিপিতে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের) রূপদক্ষ দেবদত্তের দেবদাসী সুতানুকার প্রতি প্রেমের উল্লেখ পাই। দেবদাসীদের কাজ ছিল পূজা আরাত্রিকের সময়ে মন্দিরে বা মন্দির প্রাঙ্গণে দেবতার উদ্দেশ্যে নৃত্য করা; এটিই তাদের মুখ্য করণীয়, এরই বিনিময়ে তারা বৃত্তি, খাদ্যশস্য বা ভরণপোষণ পেত। তাদের গৌণ অথচ সর্বজনবিদিত ভূমিকা ছিল পুরোহিতের কামনা চরিতার্থকরা। এই জন্যেই ১৯২৯ সালে মাদ্রাজে দেবদাসী প্রথার উচ্ছেদমূলক আইন প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল এ-প্রথা দেশে বহাল ছিল। ১৯৪৭ সালে আবার আইন করে এটা উচ্ছেদ করার চেষ্টা হয়, তথাপি দেশের আনাচে-কানাচে নানা মন্দিরে এখনও দেবদাসী প্রথা ভোল পাল্টে রয়েছে। দেবদাসী তরুণী, সুন্দরী ও নৃত্যকুশলা হলেই চলত। কিন্তু গণিকা বা রূপজীবার এবং কখনও কখনও অবরুদ্ধার পাঠ্যতালিকা দীর্ঘছিল। জৈন গ্রন্থ বৃহৎকল্প (পুণ্যবিজয়জি ভাবনগর রচিত, ১৯৩৩-৩৮) গ্রন্থে দেখি এদের শিখতে হত লেখা, গণিত, নানা রকম শিল্প, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র (বীণা, পটহ, বংশী, ইত্যাদি), দূতক্রীড়া অক্ষাক্রীড়া, কাব্যরচনা (সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ), গন্ধযুক্তি (আতর তৈরি) অলংকার নির্মাণ, সজ্জা, অলংকরণ, সুলক্ষণ ও দুর্লক্ষণ পুরুষ ও নারীর বিচার, অশ্ববিদ্যা, হস্তীবিদ্যা, রন্ধনবিদ্যা, রত্নপরীক্ষা, বিষনির্ণয় ও প্রতিবিধান, স্থাপত্য, শিবির নির্মাণ, সেনা সন্নিবেশ, যুদ্ধবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, নিমিত্তনিদান, ইত্যাদি মোট বাহাত্তরটি বিষয়। (মনুসংহিতা-তেও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু নির্দেশ আছে। ২:৬৭)

গণিকা ও রূপাজীবা যেমন রাষ্ট্রকে আয়কর দিত তেমনই বিনিময়ে সামান্য কিছু নিরাপত্তার ব্যবস্থাও পেত। গণিকা কন্যাকে ধর্ষণ করলে ৫৪ পণ ও তার মায়ের আয়ের ১৬ গুণ অর্থদণ্ড দিতে হত। গণিকার বিদেশি প্রার্থীকে তার

নির্দিষ্ট মূল্য ছাড়া পাঁচ পণ বেশি দিতে হত। পুংশচলী বা কুলটার নির্দিষ্ট কোনও মূল্য ছিল না, কিন্তু সে যদি বেশি টাকা আদায়ের চেষ্টা করত, তাহলে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকেও সে বঞ্চিত হত। রূপাজীবার বার্ষিক বৃত্তি ছিল আটচল্লিশ পণ; অভিনেতা, অন্নবিক্রেতা, মাংসবিক্রেতা বা বৈশ্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকত। গণিকা বা রূপাজীব যদি টাকা নেওয়ার পরে আপত্তি করে তাহলে তার প্রাপ্যের দ্বিগুণ অর্থ তার দণ্ড, আর টাকা নেওয়ার আগে আপত্তি করলে প্রাপ্য থেকে সে বঞ্চিত হত। যাজ্ঞবল্ক্যাি স্মৃতি (২:২৯৫) অনুসারে গণিকার শারীরিক নিরাপত্তার জন্যেও নানা রকম দণ্ড ছিল যার পরিমাণ এক হাজার থেকে আটচল্লিশ হাজার পণ। অন্য দিকে ব্যতিক্রমও প্রচুর পাই; মনু বলেছেন সব গণিকাই চোর ও প্রতারণাপরায়ণ (৯:২৫৯-৬০) আর ধর্মসূত্রকার গৌতম বলেছেন বেশ্যাকে হত্যা করা দণ্ডনীয় অপরাধই নয় (গৌতমধর্মসূত্র ২২:২) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-তে দেখি গণিকাকে প্রকাশ্যে অপমান করার দণ্ড চব্বিশ পণ, শারীরিক অত্যাচার করার দণ্ড আটচল্লিশ পণ, কান কেটে নিলে পৌনে বাহান্ন পণ ও সেই সঙ্গে কারাবাস। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি বলে, গণিকাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করার দণ্ড পঞ্চাশ পণ এবং বহুজনে পরপর ওই ভাবে ধর্ষণ করলে তাদের প্রত্যেকের দণ্ড চব্বিশ পণ। (২:২:৯৩)

গণিকা কী ধরনের প্রার্থী খুঁজবে তারও নির্দেশ দিয়েছেন বাৎস্যায়ন; তরুণ, ধনী, পারিবারিক দায়িত্ব যার নেই, উচ্চ পদস্থ, সদ্বংশজাত, প্রাণবান, শিক্ষিত, কবি, গাথা-কাহিনি-উপাখ্যানে কুশল, বাগ্মী, নানা কলায় পারদর্শী, সুরাসক্ত, বন্ধুভাবাপন্ন, নারীসঙ্গমকারী কিন্তু কোনও নারীর বশংবদ নয়, নিষ্ঠুর বা ঈর্ষাকাতর নয় (কামসূত্র ৬:১:১০, ১২) রাজার হুকুমে ছাড়া অন্য কোনও কারণেই তার ওপরে কোনও প্রার্থী চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। রাজার প্রেরিত প্রার্থীকে বিমুখ করলে তার দণ্ড পাঁচশো পণ এবং এক হাজার বেত্রাঘাত। কাজেই দেখছি, তার দেহের উপরে তার আত্যন্তিক কোনও অধিকার নেই।

অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী (৪:১৩) কোনও একজন পুরুষের প্রতি দীর্ঘকাল আসক্ত থাকা গণিকার উচিত নয়। (কামসূত্র ৬:৫:১-৬) দরিদ্র প্রার্থীকে সে সর্বদাই প্রত্যাখ্যান করবে (কামসূত্র ৬:৬:৩১) এবং প্রার্থীর আগ্রহ কমে যাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে অবহিত থাকবে, তার লক্ষণগুলিও বলা আছে। (কামসূত্র ৬:৩:২৮-৩১) কলাবিলাস গ্রন্থে যে চৌষট্টি রকমে গণিকা তার প্রার্থীকে ঠকাতে পারে তার তালিকা দেওয়া আছে।

দ্বাদশ শতকের গ্রন্থ মৃন্ময়সুন্দরীকথা-তে দেখি গণিকার আয়ের শতকরা পাঁচশ থেকে ত্রিশ ভাগ ছিল রাষ্ট্রের প্রাপ্য অর্থাৎ রাজস্ব। বৌদ্ধ গ্রন্থে গণিকার 'ভট্টি' (সংস্কৃত 'ভূতি') অর্থাৎ বেতন এবং পরিব্বায়' (সংস্কৃত পরিব্যয়ম) খরচের উল্লেখ পাই।। মথুরার বাসবদত্তার পারিশ্রমিকও অত্যন্ত উচ্চহারের ছিল।(৩) রাজগৃহের সালাবতী প্রতি রাত্রে একশো কার্যপণ উপার্জন করত। এ ছাড়াও ইতস্তত খুব উচ্চহারের উপার্জনের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পত্তির–অন্তত স্থাবর সম্পত্তির উপরে তাদের একান্ত অধিকার ছিল না।(৪) শিশু, দাস ও গণিকার সম্পত্তিতে অধিকার নেই। এ কথা মহাভারত-এ বারবার আছে। (আদিপর্ব ১৮২:২২, সভাপর্ব ৭১:১; উদ্যোগপর্ব ৩৩:৬৪) গণিকা ও তার বিকল্প, প্রতিগণিকা মাসিক বৃত্তি পেত সরকার থেকে; নিজস্ব উপার্জনের কোনও কোনও অংশে তার অধিকার ছিল এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে সে দানও করতে পারত। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে তার কন্যার অধিকারে মায়ের সম্পত্তি যখন আসত তখন সে-ও ওই জীবনসত্ত্বের মধ্যে; বন্ধক, বিক্রয়, দায় ও পরিবর্ত এ সবে তার অধিকার থাকত না। রাষ্ট্রের বিপদ হলে তার আয়ের অর্ধেকই বাজেয়াপ্ত হত; (অর্থশাস্ত্র ৫:২) প্রয়োজন হলে তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। (অর্থশাস্ত্র ১:২০) রক্ষিতা বা অবরুদ্ধার ওপরে একটি পুরুষ–তার ভরণকর্তারই একান্ত অধিকার ছিল, সেখানে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করলে তার দণ্ড ছিল আটচল্লিশ

পণ। (অর্থশাস্ত্র ৩:২০) গণিকাকে গণিকত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল দু’রকম: প্রথমত, রাজা ইচ্ছা করলে যে কোনও গণিকাকে কুলনারী বলে ঘোষণা করতে পারতেন, তখন সে গণিকত্বের সামাজিক গ্লানি ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেত এবং কুলনারীর প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার পেত। (মৃচ্ছকটিক নাটকের দশম অঙ্কে গণিকা বসন্তসেনা রাজা আর্যকের প্রসাদে কুলনারীতে পরিণত হয় এবং চারুদত্তের সঙ্গে বিবাহিত হয়ে কুলবধু বলে গণ্য হয়)। দ্বিতীয়ত, যে ভাবে সে গণিকত্ব থেকে মুক্তি পেত তা হল নিক্রয়, অর্থাৎ কোনও পুরুষ তাকে বিবাহ করতে চাইলে বা মুক্তি দিতে চাইলে গণিকালয়ের কর্ত্রীকে চব্বিশ হাজার পণ দিলে সে মুক্ত হত। (মৃচ্ছকটিক নাটকে গণিকা মন্দনিকার প্রেমিক শবিলাক নিস্ক্রয়মূল্য অর্জন করবার কোনও পথ খোলা না পেয়ে অলংকার চুরি করে।)

নানা স্তরের গণিকার কার্যক্রমেরও পার্থক্য ছিল–রাজার, বণিকের বা ধনীর প্রাসাদে নানা ভূমিকায় দেখা যেত গণিকাকে। গান্ধারী গর্ভবতী হলে ধৃতরাষ্ট্রের গণিকার প্রয়োজন হয়েছিল। (মহাভারত, আদিপর্ব ১১৫:৩৯)। জৈন গ্রন্থ বাসুদেবহিণ্ডি-তে স্ত্রীর বিকল্পের কাহিনি আছে, সেখানে কৌমপতি ভারতের প্রাসাদে স্ত্রী ছাড়াও একটি ভোগ্য নারী থাকত। একবার কৌমের অধীনের সকলেই নিজের নিজের মেয়েকে ভরতের কাছে পাঠালেন এবং এরা সকলেই এক সঙ্গে ভারতের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন; তখন নারী চলে যেতে উদ্যত হলেন। তারপরে ঠিক হল যে এরা অন্তঃপুরের বাইরে রাজার পরিচর্য করবে এবং পরে এদের ‘গণ’ বা গোষ্ঠীর কাছে দেওয়া হবে; তখন এরা গণিকা হবে। এ যেন গণিকা শব্দের বুৎপত্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি উপাখ্যান রচনা করা হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতে গণিকার নানা ভুমিকার কথা পড়ি। যুদ্ধযাত্রার সময়ে পাণ্ডবসেনার সঙ্গে যুদ্ধের উপকরণ ও বহু গণিকা গাড়িতে ছিল। (মহাভারত উদ্যোগপর্ব ১৯৫:১৮-২৯) যুদ্ধের আগে যুধিষ্ঠির গণিকাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। (উদ্যোগপর্ব ১৫:৫১-৫৮)

বনে যাওয়ার সময়েও পাণ্ডবদের সঙ্গে রথী, পণ্যদ্রব্য ও গণিকারা ছিল, সম্ভবত সৈন্যদের বিনোদনের জন্যে। (বনপর্ব ২৩৮ থেকে) যুদ্ধে জয়লাভ করবার পরে বিরাট রাজা সুন্দরী নারীদের সুসজ্জিত হয়ে এসে সমাবেত জনতার মনোরঞ্জন করার নির্দেশ দেন। (বিরাটপর্ব ৬৪:২৪-২৯) স্পষ্ট যে, এ ধরনের মনোরঞ্জন করার আদেশ কুলনারীকে দেওয়া সম্ভব ছিল না, শুধু গণিকাকেই দেওয়া চলত। কৃষ্ণ যখন যুদ্ধনিরোধের চেষ্টায় হস্তিনাপুরে গেলেন, দুর্যোধন। তার আপ্যায়নের যে ব্যবস্থা করেছিলেন তার মধ্যে ছিল একটি বিরামাগার ও সেখানে পরিচর্যারিত বহু নারী। এবং, ধৃতরাষ্ট্র আদেশ দেন যেন বেশ্যারা তার পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণকে প্রত্যুদগমন করে। রামায়ণে বিলাসের উপকরণের তালিকায় বেশ্যা ও গণিকার নামের উল্লেখ আছে। স্পষ্টই বোঝা যায় গণিকা ছিল ঐশ্বর্যের পরিচায়ক এবং তাদের সংখ্যাও থাকত গৃহস্বামীর সম্পদের অনুপাতে এবং এটা সম্ভব হয়েছিল সমাজে এক শ্রেণির বিত্তবান লোকের হাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত অর্থের সঞ্চায়ের দ্বারা। নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ও বাণিজ্যের প্রসার হওয়ার আগে এ অবস্থা আসা সম্ভব ছিল না। শস্য, গোধন, সোনাদানা যেমন ধনীর বিজ্ঞাপন, ক্রীতদাস ও ভোগ্য নারীর সংখ্যাও তেমনই আর একটি বিজ্ঞাপন। রাজার বা ধনীর প্রাসাদে এই যে শত শত নারী থাকত তারা সকলেই মুখ্যত বেশ্যাপরিচয়ে থাকত না, নানা রকম বৃত্তিই ছিল তাদের সামাজিক পরিচয়। কিন্তু, তারা ভুজিষ্যা, যার শ্রম ভোগ করে তারা প্রভু; এবং সে শ্রম শুধু বৃত্তিরই হত না। ছত্রধারিণী, চামরগ্রাহিনী, সংবাহিকা, তাম্বুলকরাঙ্কবাহিনী ছাড়াও এরা গৃহস্বামীর এবং পরিবারের অন্যদেরও স্নান, অভ্যঞ্জন, বস্ত্রালংকারধারণ, ইত্যাদিতে পরিচর্যা করত। শিল্পদারিকা, সৈরিন্ধ্রী, কৌশিকস্ত্রী, কুম্বদাসী, ইত্যাদি দানা বৃত্তি অবলম্বন করে এরা রাজা বা ধনীর অন্তঃপুরে আসত।

গণিকার ভূমিকা সম্বন্ধে কামশাস্ত্র-তে পড়ি যে, রাজা অথবা ধনী নাগরিকের দলবলের সঙ্গে কাব্য নাটক শিল্প ইত্যাদির আলোচনা করা; ধনীর গৃহে

অনুষ্ঠিত উৎসব ‘গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ করা–এ সব ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। ভিন্ন ভিন্ন বণিক বা ধনী নাগরিকের গৃহে এই গোষ্ঠীর আয়োজন হত। সেখানে প্রচুর পানভোজনের ব্যবস্থা থাকত এবং গণিকদেরই প্রথমে পরিবেশন করা হত–যেন তারাই প্রধান অতিথি। মাঝে মাঝে সমস্ত দলটাই যানবাহনের সাহায্যে নগরের বাইরে যেত। সেখানে মোরগের বা ভেড়ার লড়াই অথবা অভিনয় হত; সন্ধেয় সকলে ফিরে আসত। গ্রীষ্মকালে জলক্রীড়া, বসন্তে বসন্তোৎসব, ইত্যাদি বিভিন্ন ঋতু উপযোগী উৎসব হত। (কামসূত্র ১:৪:৩৪-৪১, ৪২) গ্রামবাসীরা এদের উৎসব দেখে বর্ণনা করবে ও অনুকরণ করবে। (কামসূত্র ১:৪:৪৯) এই সব উৎসব গণিকারও নিশ্চয়ই উপভোগ করত; কিন্তু এগুলো অনুষ্ঠিত হত প্রধানত রাজা, বণিক বা ধনী নাগরিকের স্বার্থে ও নির্দেশে। গণিকারা ছিল কতকটা অলংকরণ, কতকটা মার্জিত বিনোদনের উপকরণ।

এ কথা ভুললে চলবে না যে, সমাজে কুলনারীর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না; মনুসংহিতায় পড়ি নারীর পক্ষে বিবাহই উপনয়ন, পতিসেবা বেদধ্যয়ন এবং পতিগৃহে বাস হল গুরুগৃহে বাস। (২:৬৭) অতএব বিদ্যাশিক্ষার কোনও সুযোগই কুলনারীর ছিল না, গৃহকর্ম ও সন্তানের জন্ম দেওয়া, শ্বশুরবাড়ির সকলের এবং স্বামী ও সন্তানদের পরিচর্যায়। তার দিন কাটিত। ফলে, রূপযৌবন চলে গেলে তার সাহচর্য হয়তো অনেক স্বামীর পক্ষে চিত্তাকর্ষক হত না। অন্য দিকে গণিকার শিক্ষাতালিকা প্রকাণ্ড–স্বয়ং কাব্যনাটক রচনা, গীতবাদ্য অভিনয় এবং সকল শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা করার ক্ষমতাও তার থাকত। কাজেই ফ্রান্সের সালগুলির অধিকর্ত্রীর মতো বা জাপানের সুশিক্ষিত ‘গেইশা’ নারীদের মতো এদের মানসিক উৎকর্ষ পুরুষকে আকর্ষণ করত। উপযুকক্ত শিক্ষাদীক্ষার অভাবে এ ভাবে আকর্ষণ করার যোগ্যতা কুলনারীর থাকত না। গণিকার শিক্ষা হত রাষ্ট্রের ব্যয়ে এবং সে শিক্ষার মানও যথেষ্ট উন্নত থাকত, অর্থাৎ রাষ্ট্রের পরিচালকদের উদ্দেশ্যই ছিল

মার্জিত রুচি এবং শিক্ষার অধিকারী যে মানুষ সে যেন গণিকার কাছেই মানসিক সাহচর্য পায়, বন্ধুর কাছে নয়। প্রথমত, রাষ্ট্র গণিকার কাছে উচ্চহারে রাজস্ব পেত, দ্বিতীয়ত, গণিকারা রাষ্ট্রের চরের কাজও করত। শিক্ষাদীক্ষা-রুচির উৎকর্ষে রূপ যৌবনের মাদকতায় শত্রুপক্ষীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করে গুপ্ত সংবাদ জেনে গণিকাধ্যক্ষ মারফত রাষ্ট্রের মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া, প্রয়োজন মতো শত্রুকে ধরিয়ে দেওয়াও এদের করণীয়ের অন্তর্গত ছিল। কাজেই গণিকা এবং গণিকালয় রাষ্ট্রের স্বার্থই সিদ্ধ করত।

এ ছাড়াও ধর্মগ্রন্থে ও সাহিত্যে বারে বারে দেখছি দক্ষিণার বস্তুসম্ভারের তালিকায় হস্তী, অশ্ব, রথ, ভূমি, অলংকারের সঙ্গেই উল্লেখ নারীর। লক্ষণীয় এ দক্ষিণা দেওয়া হত যজ্ঞের পুরোহিতকে এবং দেওয়া হত। শয়ে শয়ে, হাজার হাজারে। এর নানা পৃথক শ্রেণিও ছিল, যেমন, সন্তানবতী, নিঃসন্তানা, বিবাহিতা ও কুমারী। মনে প্রশ্ন আসে ঋত্বিক পুরোহিত কী করত। এতগুলি নারী নিয়ে? অবশ্যই কিছু সংখ্যককে ভোগ্যবস্তুর মতোই ভোগ করত, কিন্তু বাকিরা? ক্রীতদাসী বা গণিকায় পরিণত হওয়া ছাড়া কি গতি ছিল তাদের?

উদ্যোতন সুরির রচিত কুবলয়মালা গ্রন্থে দেখি স্বর্গেইন্দ্রের অপ্সরারা ভৃঙ্গারবহন করত; ছত্র, মুকুর, ব্যজন, বীণা, বস্ত্র, মুরজ, ইত্যাদিও বহন করত। ললিত বিস্তার বইতে পড়ি পূর্ণকুম্ভ, মাল্য, অলংকার, সিংহাসন, ছত্র, চামর, গন্ধবারিকুম্ভ, ইত্যাদি বহন করছে প্রাসাদের গণিকারা। বাণভট্টে গণিকারা রাজাকে স্নান করাচ্ছে। নানা স্থানে এদের নানা নাম: মন্দিরে দেববেশ্যা, প্রাসাদে রাজবেশ্যা, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবেশ্যা, তীর্থে তীর্থগা। ব্রহ্মপুরাণ-এ পড়ি একাম্রতীর্থে বহুসংখ্যক বেশ্যার বাস। (৪০:৩০-৩৫) বৌদ্ধ সমাজ বা উৎসবে, যুদ্ধ যাত্রায়, বিজয়োৎসবে, রাজার বিবাহ বা পুত্রজন্ম, যজ্ঞ বা অন্য উপলক্ষে সব সময়েই গণিকারী দলে দলে সমবেত অতিথিদের

বিনোদনে নিযুক্ত থাকত। যুধিষ্ঠির যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন তখন অন্যান্য বন্ধুরাজারা যজ্ঞের নানাবিধ উপকরণের সঙ্গে বহু নারীও পাঠালেন। (আশ্বিমেধিক পর্ব৮৫:১৮) যুধিষ্ঠির নিজেও সেই যজ্ঞে দানে দক্ষিণায় বহু শত নারীকে দিচ্ছেন অতিথিরাজাদের আপ্যায়নেও। (আশ্বিমেধিক পর্ব ৮০:৩২) রাজা শশবিন্দু তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে হাজার হাজার নারী দান করেছেন। (দ্রোণপর্ব ৬৫:৬)। ভগীরথও হাজারে হাজারে সুসজ্জিত সুন্দরী নারী দক্ষিণা দিয়েছিলেন। (দ্রোণপর্ব ৬০:১, ২; শান্তিপর্ব ২৯:৬৫) শ্রাদ্ধের দক্ষিণার তালিকাতেও বহু নারী দেওয়ার কথা আছে। (আশ্রিমবাসিকপর্ব ১৪:৪; ৩৯:২০, মহাপ্রস্থানপর্ব ১ স্বর্গারোহণ পর্ব ৬:১২, ১৩) বীরের মতো যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলে স্বর্গে পুরস্কার পাওয়া যায় অসংখ্য সুন্দরী। (বনপর্ব ১৮৬৮৭, কর্ণপর্ব ৪৯:৭৬-৭৮; শান্তিপর্ব ৬৪:১৭, ৩০; ৯৬.১৮, ১৯, ৮৩, ৮৫-৮৬, ৮৮, ১০৬, রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৭১.২২, ২৫, ২৬; সুন্দরকাণ্ড ২০:১৩) পরবর্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্যেও এ ধরনের কথা বিস্তর পাওয়া যায়। (কুমারসম্ভব। ১৬:৩৬, ৪৮; রঘুবংশ ৭:৫০; কিরাতার্জুনীয় ৯:৫১; শিশুপালবধ ১৮:৬০, ৬১) এছাড়া সুবন্ধুবাণ এবং অন্যত্র এর বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

গণিকার পরিবারের অণুক্রম কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। গণিকার মাতাই হল গণিকালয়ের কর্ত্রী; তার বোন হত প্রতিগণিকা, অর্থাৎ প্রয়োজন হলে তার বিকল্প। ভাইকে গীতবাদ্যে কুশল অথবা অভিনেতা হতে হত এবং রাষ্ট্রের পরিচালিত মঞ্চে অন্তত আট বছর অভিনয় করতে অথবা সংগীতে বাদ্যে অংশগ্রহণ করতে হত; তার শিক্ষার ব্যবস্থা এবং আর্থিক দায়িত্বও রাষ্ট্রই বহন করত। তার মুক্তির মূল্য গণিকার চেয়েও বেশি, তার অবস্থা গ্রিক বা রোম সাম্রাজ্যের ক্রীতদাসের মতোই ছিল— অন্তত ওই আট বছর। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গণিকার বিবাহের কথাও পাওয়া যায়; গণিকার স্বামীকেও সংগীতে ও

অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে হত; এ অভিনয় গণিকালয়ে রাষ্ট্রের ব্যয়ে ও নির্দেশনাতেই হত (কামসূত্র ৭:২৩, ২৪)। কখনও কখনও গণিকার বিবাহ শুধুমাত্র একটা প্রতীকী অনুষ্ঠান মাত্রেই পর্যবসিত হত। নারদস্মৃতি বলে অব্রাহ্মণের পক্ষে নিম্নবর্ণের স্বৈরিণী, বেশ্যা, দাসী বা নিকাশিনীর (অর্থাৎ যে অন্তঃপুরচারিণী নয়) সঙ্গে সম্পর্ক–যদি তারা অন্যের স্ত্রী না হয়–দোষের নয়; (৭৪, '৭৯) অর্থাৎ, তারা অন্যের স্ত্রী হতে পারত। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিও এতে কোনও দোষ দেখে না। (২:২৯০) স্কন্দপুরাণ বলে বেশ্যা এক স্বতন্ত্র জাতি, তার স্ববর্ণের বা উচ্চতর বর্ণের কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটলে সে ক্ষেত্রে পুরুষটি দণ্ডনীয় নয়, যদি না সে অবরুদ্ধা অর্থাৎ একটি পুরুষের রক্ষিত হয়। যদি হয় তারও প্রায়শ্চিত্ত এবং কোনও বেশ্যাগামীর প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করার কোনও নজির সাহিত্যে মেলে না। বাৎস্যায়নের কাছে গণিকার জীবনে প্রেমের সম্ভাবনাও তাত্ত্বিক ভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। (কামসূত্র ১:৬২-৬৫) অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেও তার মধ্যে মানবীসুলভ আবেগের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া হয়নি, যেমনটা হয়েছে। পরবর্তীকালের শাস্ত্রে। অশ্ব ঘোষের একটি অংশত প্রাপ্ত নাট্যখণ্ডে এবং শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকে গণিকার প্রেমের কথা আছে এবং সে প্রেম যথার্থ খাঁটি আবেগ, তাতে কোনও সন্দেহে অবকাশ থাকে না। আরও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাহিত্যে, কথাসরিৎসাগর, কলাবিলাস এবং অন্যত্রও এ কথা আছে।

কলাবিলাস-এ একটি উপাখ্যান আছে। রাজ্যচ্যুত রাজা বিক্রম নিরাশ্রয় হয়ে অবশেষে এসে পড়লেন গণিকা বিলাসবতীর কাছে। দুজনের প্রেমের বর্ণনা আছে সবিস্তারে। বিলাসবতী বিত্তশালিনী, সে তার সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে বিক্রমকে তাঁর লুপ্ত রাজ্য ফিরে পেতে সাহায্য করল। কৃতজ্ঞতায় বিক্রম তাকে বিবাহ করলেন। একদিন তাকে বিমর্ষ দেখে বিক্রম তার কারণ জানতে চাইলে বিলাসবতী স্বীকার করল তার এক পূর্বপ্রণয়ী আছে, তাকে পাওয়ার জন্যেই তার চিত্ত ব্যাকুল। রাজার আনুকূল্যে প্রেমিকযুগল মিলিত হল। কিন্তু

তারপরে রাজার মনে পড়ল। মন্ত্রীর সতর্কবাণী; গণিকাকে কখনও বিশ্বাস কোরো না। এ কাহিনিতে গণিকার প্রতি সমাজের তাচ্ছিল্য, বিদ্বেষ ও বিরূপতা তার চিত্তচাঞ্চল্য সম্পর্কে দ্বিধাহীন বিশ্বাস সবই প্রকাশ পেয়েছে, পায়নি। শুধু কাহিনির পূর্বার্ধে রাজার মঙ্গলের জন্য তার অকুণ্ঠিত এবং অযাচিত স্বার্থত্যাগ; শেষ পর্যন্ত রাজা তার মনস্কামনা পূর্ণ না-ও করতে পারেন এই সম্ভাবনা মনে রেখেও সে অকৃপণ ভাবে রাজার জন্যে আত্মত্যাগ করেছিল। সমাজের স্বার্থসর্বস্ব অকৃতজ্ঞতার এটি একটি ভাল নিদর্শন।

গণিকালয়ের কর্ত্রী গণিকামাতার কাজ ছিল গণিকা যাতে কোনও ভাবে প্রতারিত বা লাঞ্ছিত না হয় তা দেখা। এবং যথাসম্ভব সর্বপ্রকারে তার স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা। নানা গ্রন্থে (যেমন কুট্টনীমত, দেশে পদেশ) এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে যার অনেকটাই হল সাধ্যমত প্রার্থীকে বঞ্চিত করা–কন্যা অসুস্থ, পরিশ্রান্ত, বিমর্ষ, ইত্যাদি বলা বা অন্য কেউ আরও বেশি পারিশ্রমিক বস্ত্রীলংকার দিতে প্রস্তুত সে কথা জানানো কিংবা কন্যার ঋণ, অভাব, অসুবিধার খবর দেওয়া। (দশৰূপক ২:৩৪, সময় মাতৃকা ১:৪-০, ৪৫, কামসূত্র ৭:১:১৩-১৭)। এ ছাড়াও ছিল কুট্টনী, সে গণিকামাতা না হলে বৃদ্ধ গণিকাও হতে পারত। তার প্রধান কর্তব্য ছিল উপযুক্ত ধনী, উদার, সৎ এবং বাঞ্ছনীয় প্রার্থীর সন্ধান করা— উভয়ের মধ্যস্ততা করা, কলহ ঘটানো এবং মেটানো, গণিকার স্বার্থে প্রার্থীকে বঞ্চনার ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। কুট্টনী বা শম্ভলী বিগতযৌবনা গণিকা, স্বয়ং গণিকাবৃত্তিতে উপার্জন করবার বয়স পেরিয়ে গেলেও এই বিকল্প বৃত্তিতে সে ভরণপোষণ এবং কিছু কিছু উপার্জনও হয়তো করতে পারত। কামসূত্র-তে কুট্টনীর উল্লেখ আছে চণ্ডালী, মুণ্ডিতা ও বৃদ্ধ গণিকার সঙ্গে; কুট্টনম-তেও তাই। (৫৩২) সময় মাতৃকা (৮:১০২, ৩, ১২) এবং শ্যাঙ্গা‌ের্থর পদ্ধতি-তেও এদের উপার্জন অক্ষমতা ও দারিদ্র্যের কথা আছে। সব বৃদ্ধ গণিকাই তো কুট্টনী বা শম্ভলী হতে পারত না, যারা ওই

পদ পেত না তারাই সংখ্যায় বেশি এবং তাদের দুর্দশা অকল্পনীয়। এর উপার্জনের সুদিনে কতকটা আরামে হয়তো বা অল্প কিছু বিলাসেও অভ্যস্ত ছিল, যৌবনের অন্তে যখন উপার্জনের ক্ষমতা গেছে তখন এদের জন্যে কোথাও কোনও ব্যবস্থা নেই। শুধু ওপরের দিকের কিছু সুপরিচিত রূপবতী ও গুণবতী বা ধনবতী হিসেবে যারা প্রখ্যাত ছিল সম্ভবত তাদের জন্যেই বিকল্প বৃত্তি (রান্নাঘর, পশম বা তুলো বোনার কাজ)-তে বা রাষ্ট্র থেকে অর্থদানের ব্যবস্থা ছিল। সহজেই অনুমান করা যায় রাষ্ট্র যদি এ কর্তব্যপালনে বিমুখ হয় তো জরতী গণিকারী কিছুই করবার থাকে না। একে তো সেযুগে শ্রমিকসঙ্ঘের ব্যবস্থার দ্বারা সাধারণ শ্রমিকেরই স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা দুর্লভ ছিল তার ওপরে গণিকাবৃত্তি এতই ঘৃণিত যে বৃদ্ধ গণিকাকে সমাজ আবর্জনা ছাড়া অন্য কিছুই মনে করত না। ফলে আইনে ব্যবস্থা থাকলেও তা আদায় করার উপায় তার ছিল না। আর অর্থশাস্ত্র ছাড়া অন্যত্র আইনের ব্যবস্থারও উল্লেখ নেই।

দেশোপদেশ-এ দেখি যাট বছরের বৃদ্ধ গণিকা তরুণী সেজে ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়ে নিগ্রহ ভোগ করছে। (৩:৩৩) সবচেয়ে করুণ কাহিনি পাই সময় মাতৃকা-য় দীর্ঘ একটি উপাখ্যানে।

‘কঙ্কালী নামে এক সরাইখানার মালিকের মেয়ে শৈশবে, সাত বছর বয়সেই বাজারে বিক্রি হয়ে যায়। সমস্ত যৌবনকাল কাটে হার-ফেরতা হতে হতে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে। রূপ যৌবন যখন নিঃশেষিত তখন পর পর নানা বৃত্তি অবলম্বন করে গ্রাসাচ্ছাদন করার দুশ্চেষ্টার পালা শুরু হল। সে তীর্থক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে ধরা পড়ে যায় ও জেল খাটে। সেখানে কারারক্ষীকে হত্যা করে পালিয়ে যায় এক মঠে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আয়াসের জীবনে অভ্যস্ত বলে মঠের কষ্ট সহ্য হয় না, তাই ভিক্ষা করে দিনযাত্রা নির্বাহ করতে থাকে। এমন সময়ে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ, বন্ধ হয়ে

গেল ভিক্ষা পাওয়া। তখন একটি শিশুকন্যার ধাত্রীর চাকরি নেয়। অনভ্যাসে এবং প্রৌঢ় শরীরে পরিশ্রম সইছিল। না বলে একদিন শিশুটির সোনার হার চুরি করে পালায়। হার বিক্রির টাকা ফুরোলে জুয়ো খেলার ঘুটি নিয়ে প্রতারণা করে রোজগার শুরু করে। কিছুদিন বেশ চলে, কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেল, তখন আবার ভিক্ষা। অসহ্য হলে খিদের জালায় এক মন্দিরে লুকিয়ে থেকে দেবতার নৈবেদ্য চুরি করে উদরপূর্তির ব্যবস্থা করে। সেখানেও ধরা পড়ে যায়, তখন শুরু করে মদ বিক্রি। তাতে পোষাল না। যখন তখন তাকে দেখা গেল গণৎকারের ভূমিকায়। তাতেও ধরা পড়ে, তখন অভিনেত্রী হয়ে চালায় কিছুদিন। কিন্তু তার পক্ষেও যোগ্যতা নেই বলে নিরুপায় হয়ে পাগলীর ভান করে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ মাথায় একটা কূটকৌশলের উদয় হয়; কঙ্কালী ঘোষণা করে যে শত্রুসৈন্যকে জাদুবলে পক্ষাঘাতে অসাড় করে দিতে পারে। আশ্চর্য নয়, এতে স্বয়ং রাজা তাকে সাগ্রহে প্রাসাদে স্থান দিলেন। বেশ চলল কিছুকাল, হঠাৎ খবর এল সে রাজ্য আক্রান্ত হতে চলেছে। কঙ্কালী বুঝল এখন যঃ পলায়তে স জীবতি। দেশে ফিরে অগত্যা কুট্টনীবৃত্তিতে দিনপাত করতে শুরু করল।' (সময়মাতৃকা ২.২৮-৮০)

বোঝাই যায় একাধিক বৃদ্ধ গণিকার অভিজ্ঞতার সমাহার পাওয়া যায় এই কঙ্কালী উপাখ্যানে। এ-কাহিনিতে কৌতুকের অন্তরালে একটি অসহায় বৃদ্ধর শুধুমাত্র বেঁচে থাকার চেষ্টা এবং সমাজের কোনও দরজা খোলা না পেয়ে কুট্টনীবৃত্তিতে ফিরে আসার করুণ ইতিহাসটি বিধৃত আছে। অল্প বয়সে রূপযৌবনের দিনে খানিকটা স্বচ্ছন্দ্যে থাকার তরুণ কায়িক পরিশ্রমের অভ্যাস তাদের থাকে না; বেশি বয়সে আর নতুন করে তা পারে না; ফলে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও রাস্তাই খোলা থাকে নাকুদ্ধা গণিকার। কঙ্কালীর সেদিক থেকে ভাগ্য ভাল, কুট্টনীর পদ পেল সে; কিন্তু শতকরা নিরানব্বইটি বৃদ্ধ গণিকার সহায় সম্বল, আত্মীয়বল, সঞ্চয় বা অর্থে পার্জনের উপযুক্ত বিকল্প

কোনও বৃত্তির শিক্ষা থাকে না; ফলে বার্ধক্যে জীবনসংগ্রামে তারা তরঙ্গতাড়িত কাষ্ঠখণ্ডের মতোই ভেসে বেড়ায়।

কুট্টনী ছাড়াও গণিকার সহায়ক থাকে–পীঠমর্দ ও বিট। পীঠর্মদ হল নাগরকের শিক্ষক ও সহচর; তার ইপ্সিত নারীকে লাভ করাতে সহায়তা করে। (দশরূপক ২:৮) বিট নাগরকেরও থাকত, গণিকারও থাকত। গণিকার বিট হত ধনীগৃহের সন্তান, অপচয়ের ফলে দরিদ্র; শিক্ষিত, বাগ্মী, গণিকার পরিচর্যায় কুশল, মধুরস্বভাব, বুদ্ধিমান; কোন কথা উচ্চারণ করে বলবার আর কোনটা নয় তা জানে, অনুক্ত কথাও প্রয়োজন মতো বুঝতে পারে। সে প্রার্থী ও গণিকার মিলন ঘটায়, কলহ মেটায়, গণিকার সব রকম স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সচেষ্ট থাকে, কথায় ও কাজে তার আনুকূল্য করে। চতুর্ভণী ও অন্যান্য ভাণ গোত্রের একাঙ্ক একচরিত্রক নাটকে বিটের ভূমিকা বেশ বোঝা যায়। মৃচ্ছকটিক নাটকেও বসন্তসেনার বিট এক তাৎপর্যপূর্ণচরিত্র। বৈদিক যুগ থেকেই সাহিত্যে গণিকার দেখা পাওয়া যায়; শ্যাণ্ডায়ন আরণ্যক-এ পুংশচলী ও ব্রহ্মচারীর আলাপ ও অথর্ববেদ-এর ব্রাত্যসূক্তে পুংশচলীর সঙ্গে মাগধের উপস্থিতির কথা আছে। পরবর্তী সাহিত্যে গণিকার উৎপত্তি বিষয়ে নানা কাল্পনিক উপাখ্যান পাই। মহাভারতের মৌষলপর্বে দেখি যাদব-বৃষ্ণিবংশের নারীদের দসুযরা হরণ করে নিয়ে যায়, ফলে তারা গণিকা হয়ে যায়। ঋষি দালাভচৈকিতায়ন ও শ্বেতকেতুর ভ্রাতুষ্পপুত্র অষ্টবক্র মদ্র-আধুষিত কুরুপাঞ্চাল ও সিন্ধাসেবীর অঞ্চলে কামশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, এর একটি অংশ গাণিক্য বা গণিকাবিষয়ক। মহাভারত-এ (কর্ণপর্ব ২৭:৩০, ৫৭:৫৯) ও মৎস্যপুরাণ (৭০ অধ্যায়)-এ গণিকার উদ্ভব সম্বন্ধে অন্য উপাখ্যান পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর সময় মাতৃকা গ্রন্থে বলেছেন দুশচরিত্রা জননীরা পরপুরুষের দ্বারা ভুক্ত তাদের কন্যাদের অন্যদেরকে দান করত; এরাই গণিকা হয়ে যেত। (সময় মাতৃকা ৩:১৮)

ঠিক কেমন করে গণিকা সমাজে গণিকারূপে দেখা দিল তা আজ নির্ণয় করা কঠিন; তবে সাহিত্যে কিছু কিছু সূত্র পাওয়া যায় যার থেকে অনুমান করা যায় গণিকারা সমাজের কোন কোন পথ ধরে আসত। যেমন বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্র-তে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন কেমন করে কুলকন্যাকে কোনও পুরুষ প্রলুব্ধ করে নিজের অনুকূলে এনে ভোগ করতে পারে। (কামসূত্র ৩:৫:১৪-১৬) ভোগের পরে এই কন্যাদের সমাজে কী স্থান হতে পারে? সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাদের অধিকাংশই গণিকালয়ে যেতে বাধ্য হত। সংস্কৃতে দুটি শব্দ আছে; জায়াজীবী ও জায়োপজীবী, অর্থাৎ যে পুরুষ স্ত্রীর উপার্জনে দিনপাত করে। এ উপার্জন গণিকাবৃত্তি থেকে। জায়াজীবীর পা েপটা গুরুতর নয়, উপপাতক মাত্র। সামান্য চন্দ্রোয়ণ ব্রতেই তার প্রায়শ্চিত্ত হত। (বিষ্ণুপুরাণ ৩৭ অধ্যায়; যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ২৪০) এই স্ত্রীরা বাড়িতে থেকেই গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে উপার্জন করে পরিবারের ভরণপোষণ করত। উৎসবে, যুদ্ধজয়ে, যজ্ঞে, দানে, দক্ষিণায়, নারীকে বস্তুর মতোই দান করা হত। এদের মধ্যে এমনও দুর্ভাগিনী আছেন যাঁদের দেহের বিনিময় মূল্যে অন্য একজন পুণ্য অর্জন করছে (মহাভারতে উদ্যোগপর্বে ১১৪-১৮)। আবার এক ধনী শ্রেষ্ঠীর কথা শুনি তাঁর অসামান্য রূপবতী কন্যারা একরাত্রে যে মূল্য নিরূপণ করেন তা সমগ্র কাশীরাজ্যের রাজস্ব; ফলে কোনও প্রার্থই পাওয়া যায় না। শেষে কন্যা তার মূল্য অর্ধেক বলে ঘোষণা করায় তার নাম হল অর্ধকাশী’। কাজেই দেখছি শুধু জায়াজীবীর স্বামী নয়, দুস্থ, হতভাগ্য বা অর্থলোভী, নিষ্ঠুর পিতাও গণিকাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে দেখলে দেখি দানে দক্ষিণায় যাদের বিতরণ করা হত তারাই যথার্থভাবে গণিকাবৃত্তির সংখ্যাবৃদ্ধি করত। কারণ এরা সত্যিই অগণ্য। নারীকে, প্রধানত সুন্দরী তরুণীকে, যজ্ঞে, যৌতুকে, শ্রাদ্ধে, যুদ্ধজয়ে, দানে ও দক্ষিণায় দেওয়ার অসংখ্য উল্লেখ রামায়ণ-এ আছে। (অযোধ্যাকাণ্ড ১১, ২২, ২৫, ২৬; কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২০:১৩, ২৪, ৩৪) মহাভারত-এও (বনপর্ব ১৮৬:৭, কর্ণপর্ব ৪৯:৭৬-৭৮;

শান্তিপর্ব ১৮:৪৫; অনুশাসনপর্ব ১৬:১৮, ১৯, ৮২) গণিকা সভামণ্ডন এবং যুদ্ধে ও মৃগয়ায় বিনোদিনী। অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ দ্বিতীয় অঙ্কে দুষ্যন্তের মৃগয়াসহচারিণী যবনীদের কথা পাই। কুমারসম্ভাব-এ (১৬:৩৮, ৪৮) রঘুবংশ-তে (৭:৫০) এবং পরবর্তীকাব্যে বিলাসের উপকরণ রূপে বহুবার নারীকে দেখা যায়। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরাজিতপক্ষের নারীদের জয়লব্ধ অন্যান্য সম্পদের মতোই নিয়ে আসেন। (বনপর্ব৮:২৭) বিরাটরাজা অর্জুনের শৌর্যে এবং জয়ে প্রীত হয়ে পারিতোষিক দিয়েছিলেন বহু সুন্দরী তরুণী। (বিরাটপর্ব ৩৪:৫) যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ ঘোষণা করেছিলেন, যে অর্জুনকে চিনিয়ে দেবে তাকে একশত সুন্দরী দান করবেন। (দ্রোণপর্ব ৩৮৪ থেকে) যে রাজা সুন্দরী নারী দান করেন না তাঁর নিন্দাসূচক নাম 'রাজকলি', অর্থাৎ রাজাদের মধ্যে কলিস্বরূপ (শান্তিপর্ব ১২:৩৬৬)। দ্রৌপদীর বিবাহে যৌতুকের সঙ্গে একশত সুন্দরী তরুণী ছিল; (আদিপর্ব ১৯৮:১৬) সুভদ্রার বিবাহে এক হাজার সুন্দরী তরুণী অতিথিদের স্নান, সুরাপান, ইত্যাদির সহচরী ছিল। (আদিপর্ব ২২১:৪৯, ৫০) যুধিষ্ঠির, শশবিন্দু, ভগীরথী, সগর,–সকলেই সুন্দরী কন্যাদের বিতরণী' করেছিলেন। এমন কথাও শুনি যে, সুন্দরী তরুণী ব্রাহ্মণদের দান করা অতি প্রশস্ত। (বনপর্ব ৩১৫:২, ৬; ২৩:৩:৪; বিরাটপর্ব ১৮-২১; শান্তিপর্ব ৬৮:৩৩, ১৭১:৫, ১৭৩:১৬) এর দ্বারা দাতা স্বর্গে প্রচুর পুরস্কার লাভ করে, অর্থাৎ স্বর্গে বহুসংখ্যক অপ্সরা তার তৃপ্তিবিধান করে (অনুশাসন পর্ব ১৪৫.২)।

স্পষ্ট, এই ধরনের পুণ্য ও পুরস্কারের লোভ দেখানোর দ্বারা ব্রাহ্মণরা বহু সুন্দরী নারীকে দান হিসেবে লাভ করতেন; দাতাকে অবশ্য প্রতীক্ষা করতে হত মৃত্যু পর্যন্ত স্বর্গের অপ্সরার সঙ্গ লাভের জন্যে। সহজেই বোঝা যায়, পৃথিবীর গণিকার কাল্পনিক রূপায়ণ স্বর্গের অপ্সরার মধ্যে। পিতা বা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধেও দানসামগ্রীর তালিকায় হাজারে হাজারে সুন্দরী তরুণীর

উল্লেখ আছে। পেতেন পুরোহিত ব্রাহ্মাণেরা। (আশ্রিমবাসিবপর্ব ১৪:৪, ২, ৩৯; মহাপ্রস্থানপর্ব ১:৪; স্বর্গারোহণ পর্ব ৬:১২, ১৩) সহজেই বোঝা যায়। এই সব অগণিত নারীর কী পরিণতি হত। বোঝা যায় ঋত্বিক-পুরোহিতদের সাধ্য ছিল না। এতগুলি নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়ার। অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও তো এদের সংখ্যা শঙ্কাবহরূপে বেশি, কাজেই কিছুদিন পরেই এরা ক্রীতদাসী বা গণিকায় পরিণত হত। এবং ব্যাপারটা ঘটত ধর্মযাজকদের মাধ্যমেই, কারণ, এ সব দক্ষিণার গ্রহীতা তারাই। অন্য যাঁরা, অতিথি বন্ধু প্রিয়জন, উৎসবে বা কোনও উপলক্ষে দানস্বরূপে অনেক নারী লাভ করতেন তারাও নিশ্চয়ই এদের অনেককেই বিক্রি করতেন দাসীত্বে বা গণিকাত্বে। এ ছাড়াও অন্য বহু সূত্র ধরে নারী আসত গণিকালয়ে। বিবাহে নারীর কৌমার্য– পুরুষের নয়(!)— যখন অত্যাবশ্যক মানদণ্ড হয়ে উঠেছে তখন যে কোনও কারণে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে তরুণীর কৌমার্য নষ্ট হয়েছে সে বিবাহের অযোগ্য বলে পরিগণিত হত। এবং বিবাহ যে নারীর পক্ষে কেমন অলঙ্ঘনীয় বিধান হয়ে উঠেছিল–খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক বা তারও বহু আগে থেকে–তার প্রমাণ মহাভারতের বহু কাহিনিতে আছে, যেখানে বৃদ্ধা তপস্বিনীকে শুনতে হয়েছে অন্তত একরাত্রির জন্যে কোনও পুরুষের ভার্যাত্ব না। স্বীকার করলে স্বর্গে তার প্রবেশও নিষেধ। এ ক্ষেত্রে বিবাহিত জীবনের বাইরে নারীর কোনও ভূমিকাই ছিল না; দু-একটি ব্রহ্মবাদিনী বা পণ্ডিতকৌশিকীর উল্লেখ করে এ সত্য খণ্ডন করা যায় না। অতএব যে হাতকৌমার্য নারী বিবাহের জগতে অচল বলে গণ্য হল, তার অন্য যে প্রশস্ত পথটি খোলা ছিল তা গণিকালয়ের অভিমুখে। যে সমাজ নারীর সতীত্ব’ সংরক্ষণে এতই তৎপর সেই সমাজই এ ভাবে অনিবার্য করে তুলেছিল নারীর গণিকত্ব স্বীকার করা। এর পিছনে তার স্বার্থও ছিল, তা পরে আলোচনা করছি। এ ছাড়াও, রাজারও অধিকার ছিল গ্রামের বা শহরের সুন্দরী তরুণীকে যথেচ্ছ ভোগ করার। বিন্দর্ভে রাজারা কয়েক দিনের জন্যে সুন্দরী তরুণীদের ভোগ করে পাঠিয়ে দিত; বৎসগুল্ম রাজ্যে মন্ত্রীপত্নীদের রাজা প্রাসাদে ডেকে পাঠলেই যেতে হত। এরা ফিরে এলে,

ধরে নেওয়া যায় কখনও কখনও রাজার অনুগত কেউ কেউ এদের বিয়ে করত; কিন্তু বাকি অধিকাংশের পরিণতি কী হত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সুন্দরী নারী কিনে দেবালয়ে উপহার দিলে দাতার পুণ্য হয়; অতএব দেবদাসী দানের পুণ্য অর্জনের জন্যে দুস্থ পিতামাতার কন্যাদের কিনে দলে দলে মন্দিরে পাঠিয়ে পুরোহিতের ভোগ্যা করে তুললে দু'বার পুণ্য হয়: দেবতা প্রীত হন, পুরোহিতও। যুদ্ধে পাওয়া বন্দিনী নারী অনাদিকাল থেকে সকল সমাজেই গণিকালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। অবশ্য এরা অনেক সময়েই অনেকটা ঘুরপথে এসে পৌঁছত। প্রথমে সেনাপতি বা রাজার অন্তঃপুরে অন্যান্য বহু নারীর সঙ্গে একান্ত একটি পুরুষের ভোগ্যবস্তু হয়ে দিনকটাত; পরে গৃহস্বামীর অন্যান্য পুরুষ আত্মীয়দের; এবং সবশেষে গণিকালয়ে এসে পৌঁছত এরা। যুদ্ধ ছাড়াও দেশের দুদিনে দুর্ভিক্ষে বা রাষ্ট্রবিপ্লবে দুস্থ পিতামাতা ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে কখনও কখনও কন্যা বিক্রয় করতেন প্রথমে তারা ধনীগৃহে, রাজঅন্তঃপুরে, মন্দিরে স্থান পেত এবং রূপযৌবন খানিকটা ম্লান হলে গণিকালয়ে আসত। আবার সরাসরি গণিকালয়েও কন্যা বিক্রয় করার ব্যবস্থা ছিল। গণিকার কন্যারাও গণিকাই হত। পুত্ররা বন্ধুল। মৃচ্ছকটিক নাটকে বড় করুণ ভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছে বন্ধুলারা: 'পরের গৃহে লালিত, পরের অন্নে পুষ্ট, পরপুরুষের দ্বারা পরনারীতে জন্ম আমাদের।' এ পরিচয় গণিক কন্যারও; কাজেই তার কাছে সমাজে সদর রাস্তা সবই বন্ধ, গণিকাবৃত্তিই তার জীবনধারণের একমাত্র উপায়। কখনও সে গণিকা, কখনও রূপাজীব, কখনও অবরুদ্ধা এবং রূপ-যৌবন বিদ্যা গুণ না থাকলে সাধারণ বেশ্যা।

যে সমাজে 'সতী' শব্দের পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ ছিল না, যেখানে চরিত্র' বলতে শুধু যৌন শুচিতাই বোঝায় এবং যেখানে চিরকাল পুরুষের যৌন মাধুকরীবৃত্তিকে

বহু ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে এসেছে, সেখানে নারীর সামান্যতম পদস্থলেন বরাবরই চূড়ান্ত ভাবে দণ্ডিত হয়ে এসেছে। সমাজের কঠোর দণ্ডে, আত্মধিকারে পিতৃগৃহ ও স্বামীগৃহের দরজা যখন সহজেই বন্ধ হয়েছে তথাকথিত ভ্রষ্ট' নারীকে সেখানে মুহূর্তের ভ্রান্তির চড়া দাম শোধ দিতে হয়েছে গণিকালয়ে জীবন অতিবাহিত করে। বিশেষত, সমাজ যেখানে প্রায় দু হাজার বছর ধরে নারীকে অর্থকরী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে এসেছে, এবং ফলে, সসম্মানে সৎপথে থেকে জীবিক অর্জন তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেখানে এই বৃত্তি তাকে গ্রাসাচ্ছাদনের একটা আশ্বাস দিত। দানে দক্ষিণায় যৌতুকে (স্মরণীয়, শর্মিষ্ঠা দেবযানীর উপাখ্যান) যে নারী অন্যের ভোগ্য হয়ে উঠত। সেখানে গ্রাসাচ্ছদন ছাড়া আর কিছু পাওয়ার তার অধিকার থাকত না, একমাত্র গণিকারূপেই সে অর্থমূল্য পেত।

কিন্তু মানুষ হিসেবে সমাজের কাছে তার পাওনা ছিল অবিমিশ্র অবজ্ঞা, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য। ধরা যাক মৃচ্ছকটিক-এর নায়িকা বসন্তসেনার কথাই (একমাত্র তারই পূর্ণাবয়ব চিত্র আমরা সাহিত্যে পাই)। রূপে যৌবনে সে অতুলনীয়া, শিক্ষাদীক্ষায়, রুচিতে চরিত্রে মহানুভবতায় সে অনন্যা–উজ্জয়িনীর নগরলক্ষ্মী। কিন্তু তার নিজের অনুচর বিটই বারে বারে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, সে শ্মশানের জুই গাছের ফুলের মতোই, কোনও শুভকাজে লাগে না; সে বেশ্যা, সর্ব্বজনভোগ্য, পণ্যদ্রব্যের মতোই, তার পছন্দ-অপছন্দ ভাললাগা-মন্দলাগা থাকতে পারে না। এই তাচ্ছিল্য যদি গণিকাশ্রেষ্ঠা বসন্তসেনার প্রাপ্য হয়। তবে অন্যদের কথা না বলাই ভাল। যার নাম নগরশোভনা, নগরমণ্ডনা, জনপদকল্যাণী তার অন্যান্য নামগুলির মধ্যে প্রগাঢ় অবজ্ঞা ঘৃণা প্রকাশ পায়। গণিকা সম্বন্ধে সমাজের এ দ্বৈধমনস্কতা একটা লক্ষ্ণীয় ব্যাপার।

গণিকাগমনে পাপ, যদিও প্রায়শ্চিত্ত যৎসামান্য। গণিকা,সংসর্গের পাপের জন্যে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান অনেক ধর্মশাস্ত্রকারই দিয়েছেন। (বিষ্ণুপুরাণ ১০৩:৪; অত্রিসংহিতা। ২৬৭; সংবর্তসূত্র ১৬১; পরাশর সংহিতা ১০:১৫) মহাভারত-এও শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্বে গণিকা সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা আছে এবং গণিকা সংসর্গে পাপ হয় এ কথাও বলা হয়েছে। গণিকার অন্নগ্রহণে পাপ, গণিকাস্পর্শ বিজনীয়। লেখা আছে নগরের দক্ষিণ দিকে, যমের দিকে গণিকালয় নির্মাণ করতে হবে; মানসোল্লাস নামে মধ্যযুগের এক গ্রন্থ বলে, গ্রাম বা নগরের প্রত্যন্তদেশে, অর্থাৎ লোকালয়ের সীমান্তের বাইরে থাকবে গণিকালয়। (গ্রিসে কিন্তু নগরের সুন্দরতম অঞ্চলে থাকত গণিকালয়। মৃচ্ছকটিক নাটকেও মনে হয়, নগরের মধ্যেই ছিল বসন্তসেনার সাতমহলা প্রাসাদ; চতুর্ভাণী-তেও সেই ধারণা হয়।) ‘গণিকা’ পদ পাওয়া যেত। রূপ গুণ বিদ্যাবুদ্ধি আকর্ষণী মাধুরী ইত্যাদির সমন্বয়ে। (কামসূত্র ১:৩:২০) কৌটিল্য বলেন, মার্জিত, গুণবতী সুন্দরী তরুণীকেই গণিকাধ্যক্ষ ‘গণিকা’ আখ্যা দেবেন। (অর্থশাস্প ২:২৭) সেই গণিকারই সমাজের দৃষ্টিতে এই স্থান, তাহলে রূপাজীবা বেশ্য স্বৈরিণীদের কী চোখে দেখা হত তা তো স্পষ্টই বোঝা যায়।

গণিকার প্রধান প্রত্যক্ষ অপরাধ হল এই যে সে তার রূপেগুণে শিক্ষাদীক্ষায় কুলপুত্রকে প্রলুব্ধ করে। দ্বিতীয় অপরাধ হল সে কুলপুত্রের অর্থ শোষণ করে নানা ছলে ও কৌশলে। প্রায় সব বৈশিকতন্ত্র জাতীয় গণিকাসম্বন্ধীয় গ্রন্থই বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে কী ভাবে ছলনা। করে গণিকামাতা বা গণিকালয়ের কর্ত্রী বা গণিকা স্বয়ং তার প্রার্থীর কাছ থেকে অর্থ নিষ্কাশন করে নিতে পারে। কামসূত্র-তে বাৎস্যায়ন স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন গণিকা নাগরকের কাছে নিজের এবং নাগরকের বস্ত্র ও অলংকার চুরি হয়ে যাওয়ার মিথ্যা গল্প করবে; সে যে অভাবগ্রস্ত তা বারে বারে বলবে; অন্য নাগরিক তাকে আরও বেশি অর্থ, বস্ত্র ও অলংকার দিতে প্রস্তুত এ কথাও সুযোগ মতো শোনাবে, যাতে

নাগরিক তাকে এমনিতে যা দিত। তার চেয়ে বেশি দেয়। (৬:২:৩-২৩) এ সব শিক্ষা পুরুষের রচিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, বাৎস্যায়নের এই সুদীর্ঘ নির্দেশাবলির পিছনে যে চেতনা সক্রিয় তা হল গণিকার প্রবঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা–তাকে যে নিজের স্বার্থ নিজেকেই দেখতে হবে সর্ব উপায়ে যথাসম্ভব বেশি অর্থাগমের চেষ্টা করতে হবে তার বর্তমানের দিনপাতের জন্যে এবং অসমর্থ বাধক্যের জন্যেও এই বোধ।

গণিকাবৃত্তির মূল কথাটা একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং অর্থশাস্ত্র-তে বণিককে তার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে যে ভাবে উপদেশ দেওয়া যেতে পারত, কামশাস্ত্র-তে গণিকার স্বার্থরক্ষার জন্যে সেই রকমই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ সব গ্রন্থ গণিকার রচিত নয়, পুরুষেরই রচিত এবং বহু-অনুপুঙ্খাযুক্ত নির্দেশাবলির একটিই উদ্দেশ্য: প্রার্থীকে প্রতারণা করে বা যথাসম্ভব বঞ্চিত করে অর্থ সংগ্রহ করা। গণিকা যখন এই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করে তখন তার ওপরে বর্ষিত হয় ভর্ৎসনা ও নিন্দা। অন্য দিকে আইনের দিকে যখন তাকাই তখন দেখি গণিকার স্বার্থরক্ষার জন্যে যে আইন আছে অর্থদণ্ডের তার ভিন্ন ভিন্ন ধারায় কত নির্যাতনের কথা আছে। গণিকা এবং তার কন্যাকে অনিচ্ছায় ধর্ষণ থেকে শুরু করে, অপমান, লাঞ্ছনা, অঙ্গচ্ছেদ (হাত বা কান কেটে দেওয়া), অন্যান্য শারীরিক অত্যাচার, সম্পত্তিহরণ, ইত্যাদি। নানা রকম নির্যাতন ও লাঞ্ছনাই তার কপালে জুটত। সমাজে তার মূল্য বা স্থান নেই; উপার্জনই তার একমাত্র ভরসা এবং সে উপার্জনও ধূর্ত লম্পটের কবল থেকে নিরাপদ নয়। তার রোগে দেখবার কেউ নেই, বার্ধক্যে ভরণ করবার কেউ নেই, আত্মীয়বান্ধবদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে সে যে সর্বতো ভাবে নিজের সম্পত্তিটুকু বজায় রাখবার এবং বাড়াবার চেষ্টা করবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এবং কী ভাবে সে তা করতে পারে, নানা গ্রন্থ তাকে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছে। তার তবে করণীয় কী? নিজের স্বার্থ, ভবিষ্যৎ ও গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানের চেষ্টা না করা? এটা তো স্পষ্ট যে তাকে ঠকবার

জন্যে কুলপুত্রের কোনও দ্বিধা নেই। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটারই প্রতিষ্ঠা পারস্পরিক প্রতারণার ওপরে, কিন্তু গঞ্জনা জোটে গণিকারই ভাগ্যে, কুলপুত্রের নয়।

সময়প্রদীপ গ্রন্থে অনুকূল যাত্রার যে সমস্ত লক্ষণ দেওয়া আছে তার মধ্যে বৎসযুক্তা ধেনু, বৃষ, অশ্ব, রথ, দক্ষিণাবর্তবহ্নি, দেবীপ্রতিমা, পূর্ণকুম্ভ, মাল্য, পতাকা, শ্বেততণ্ডুল,ইত্যাদির সঙ্গেই আছে দ্বিজনৃপগরিকঃ'। এ গুলি দ্রষ্ট্র বা শ্রুত্বা পতিত্বাচ, ফলমিহ লভতে মানবো গন্ত কামঃ–দেখে, শুনে, পড়ে, যাত্রায় উদ্যত ব্যক্তি ফললাভ করে' (বিষ্ণুস্মৃতি ২৯-এও আছে)। তেমনই দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণের জন্যে যে যে স্থানের মৃত্তিকা সংগ্রহ করতে হয় তার মধ্যে গণিকাগৃহের মৃত্তিকা একটি আবশ্যিক উপাদান। এ রহস্যের কতকটা সমাধান হয়তো হয় যখন মনে পড়ে মহাব্রতা যাগে পুংশচলীর সঙ্গে ব্রহ্মচারীর সংলাপ কিংবা ব্রাত্যস্তোমে পুংশচলী ও মাগধ হচ্ছে ব্রাত্যের সহচর। নৃতত্ত্বের গ্রন্থে দেখি— যা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হত–ক্ষেত্রকে ফলপ্রসূ করার একটি প্রণালী হল ক্ষেত্রের ওপরেই নারীপুরুষের মিলন। যৌনশক্তির প্রতীক হিসেবেই গণিকা এই সব যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে স্থান পেয়েছে; ক্রমে সে যৌনতারই প্রতীক হয়ে উঠেছে; তাই তার গৃহস্মৃত্তিকা শস্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী দুর্গার মূর্তি নির্মাণে অপরিহার্য, এবং অন্যান্য শুভবস্তুর সঙ্গে তারও উল্লেখ যাত্রায় সুলক্ষণ হিসেবে। এই শ্লোকে মূল শব্দ কাটি লক্ষণীয়: ফলমিহ লভতে। যদিও গণিকার জননীস্বত্ব গৌণ। তবু তার যৌনত্বই উর্বরতার আবহ বহন করে বলে বেদ থেকে দুর্গাপূজা পর্যন্ত কৃষিজীবী সমাজে তার এই স্থান।

সমাজের এই দ্বৈধমনস্কতা সত্যিই খুব তাৎপর্যপূর্ণ কোনও মতেই সমাজের কর্তারা স্থির করতে পারছে না। গণিকা সম্বন্ধে তাদের মনোভাব কী হবে। কামসূত্র ও অর্থশাস্ত্র-তে দেখি রাজা, ধনী, বণিক, নাগরিক সকলে অকুন্ঠ ভাবে গণিকাসঙ্গ করেন, শাস্ত্র তার নির্দেশ দেয়। গ্রামীণ ও নাগরিকরা এই

'গোষ্ঠী' উৎসব দেখে আনন্দ অনুষ্ঠানের, ভোগবিলাসের প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করবে ও অনুকরণ করবে। পুরাণ গণিকার জন্যে স্বতন্ত্র এক ব্রতেরও বিধান দেয়, এর নাম অনঙ্গব্রত (বিষ্ণুপুরাণ ৭০ অধ্যায়) যাতে তার বৃত্তি সাফল্যযুক্ত হয়। অতএব সমাজে স্পষ্ট দুটি মনোভাব যেন বিদ্যমান। প্রথমটি হল গণিকা একটি প্রয়োজনীয় অশুভবৃত্তি আর দ্বিতীয়টি হল গণিকা সর্বতো ভাবে অশুভ ও পরিহার্য।

মানুষ তো জানে অন্য সব বৃত্তির মতোই এ বৃত্তিরও সৃষ্টি হয়েছে সমাজের একটি অংশের পুরুষের প্রয়োজন মেটাতে। কোনও শিশুকন্যাই জন্মাবধি গণিকা হয় না, সমাজই তাকে গণিকায় পরিণত করে নিজের প্রয়োজন মেটাতে। যদিও অধিকাংশ গণিকাবৃত্তিধারিণীই ছিল রূপেগুণে হীন অতএব উপার্জনে দীন, তবুও যে ক'জন শিক্ষিতা নারীর মোহে কুলপুত্র আকৃষ্ট হয় তাদের সম্বন্ধে বিদ্বেষের ভাব থাকে, কারণ গৃহে স্ত্রীপুত্রকে অবহেলা করে অর্থ ও অনুরক্তি অন্য এক নারীকে উৎসর্গ করার মধ্যে গ্লানি ও অপরাধবোধ থাকে। এর জন্যে সে নিজেকে দোষ দেয় না, দেয় গণিকাকে কারণ সে-ই নরকের দ্বার। সমস্ত প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে যে মৌলিক বহু অন্যায় নিহিত তা তার চোখে ধরা পড়ে না, যদিও সম্ভবত অবচেতন মনে সে অবহিত বলেই তার চেতন সত্তা সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব গণিকার ওপরে চাপিয়ে নিজের দোষস্খালনের চেষ্টা করে। নিজের স্ত্রীতে তৃপ্তি নেই বলে যে পুরুষ অন্য নারীর সঙ্গ কামনা করে সে-তো জানে নিজের স্বামীতে যে নারী চরিতার্থ বোধ করে না। সমাজ তার জন্যে কোনও বিকল্প ব্যবস্থা রাখেনি। ব্যবস্থা থাকলেও সম্পত্তিতে অধিকার নেই যে নারীর তার পক্ষে বাসনা চরিতার্থ করার মতো অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। কাজেই এই অসম সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও তো পুরুষের একটা আত্মগ্লানির হেতু ছিল। তৃতীয়ত, এবং প্রধানত, যে-সমাজ ব্যবস্থা একটি নারীর সুস্থ জীবনযাত্রার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে তাকে এই বিকৃত জীবনযাপনে বাধ্য করে, যে বৃত্তিতে তার সুস্থ হৃদয়বৃত্তির এবং

সর্বোপরি তার মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অপমান ঘটছে–সে সমাজ অগত্যই নিজের সমস্ত কলঙ্কের বোঝা চাপিয়েছে গণিকার প্রতিকারহীন বৃত্তির ওপরে। চাহিদা না থাকলে গণিকা সৃষ্টিই হত না; চাহিদা এসেছে পুরুষের কাছ থেকে; শুধু তাই নয় প্রধানত উদ্বৃত্তিভোগী অপেক্ষাকৃত ধনী পুরুষের কাছ থেকে। এ চাহিদা মেটানোর মধ্যে এক দিকে যেমন সম্পূর্ণ অসহায় কুলস্ত্রীর অপমান অন্যদিকে তেমনই আর একটি অসহায় নারীর-গণিকারও মনুষ্যসত্তার ঐকান্তিক অপমান ঘটেছে। সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যে এ অপমানের কোনও উল্লেখমাত্র নেই। বাৎস্যায়ন স্পষ্টই বলেছেন অর্থীর সন্ধানে যাওয়ার সময়ে গণিকা ভাল করে সাজগোজ করে যাবে কারণ সে পণ্যদ্রব্য'। (কামসূত্র ৬:১:৪) একটি ব্যক্তিকে দ্রব্যে পরিণত করার মধ্যে তো সমাজব্যবস্থারই কলঙ্ক; কিন্তু সে বোধের কোনও চিহ্নমাত্রও ছিল না। শিক্ষণ এবং অর্থের অসম বন্টনের ফলেই ব্যক্তি ও তার শ্রম হয়ে ওঠে। অপরের ভোগ্যবস্তু। এই অসাম্য এক দিকে সৃষ্টি করেছে দাস, ক্রীতদাস, অন্য দিকে গণিকা। অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য যে, কুলবধুর অবস্থাও খুব ঈর্ষা করার মতো ছিল না— বহু সুযোগ-সুবিধা ও মানবিক মর্যাদা থেকে সে-ও বহু ভাবে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু সে বঞ্চনার বিনিময়ে গণিকার এই অতিরিক্ত কলঙ্ক ও গ্লানি থেকে সে মুক্ত ছিল, তার সঙ্গ প্রায়শ্চিত্তাহ পাপ নয়, তার অন্নগ্রহণ করা চলত এবং তার স্পর্শও বর্জনীয় ছিল না (পরপুরুষের পক্ষে ছাড়া)।

গ্রিসে ও রোমে এরিস্টেফেনিস, মিনাণ্ডার বা টেরেন্সের নাটকে কিংবা সংস্কৃত ভাণগুলিতে গণিকা সম্পর্কে এত লাঞ্ছনার চিত্র নেই। কিন্তু ভাণ' হল সমাজের নিচের তলার সাহিত্য; হয়তো তাই তাদের পক্ষে যা বাস্তবে আছে, সমাজ যাকে নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছে, নিজের গরজে চালু রেখেছে তাকে স্বীকার করা আরও একটু সহজ হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের মূল সম্রাে্ন্ত ধারার মধ্যে ওই দ্বৈধমনস্কতা, গণিকার প্রতুি প্রচণ্ড ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য অথচ

সমাজে যে গণিকা আছে তার স্বীকৃতি বারেবারেই দেখা দিয়েছে— দুটি আদি মহাকাব্যে ও পুরাণে তো বটেই, কালিদাস, ভারবি, মাঘী, নৈষধ, বলহণ, ইত্যাদিতেও। অবৈধ প্রণয়ের হাজার হাজার সরস বিবরণ যেখানে অলংকারশাস্ত্রের প্রতি পৃষ্ঠা অলংকৃত করেছে সেখানে গণিকা সম্পর্কে এই কৃত্রিম উন্নাসিকতা কৌতুকাবহ। যে উচ্চতর শ্রেণির স্বার্থে সন্ত্রান্ত সাহিত্য সৃষ্টি হয়, গণিকালয়ে যাওয়ার মতো বিত্ত তাদেরই আয়ত্তে এবং তারা তার প্রভুত্ব সদ্ব্যবহার করত। এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ আছে।

এই দ্বৈধমনস্কতার আর এটি প্রমাণ হচ্ছে, গণিকা যদি পাপীয়সীই হয় তো তার পাপের অর্থে দেওয়া দান তো সমাজের প্রত্যাখ্যান করাই উচিত–পাপের সংস্পর্শ পরিহার করার নীতিতে। কিন্তু বাস্তবে দেখি তার অর্থের ফল ভোগ করতে সমাজের কোনও দ্বিধা নেই। গণিকা অর্ধকাশীবহু জনহিতকর কাজে তার বিপুল সম্পত্তিদান করে এবং বহুঅর্থ এনে বুদ্ধের পদতলে অর্পণ করে। বুদ্ধ বা উপকৃত জনতা কেউই কিছু প্রত্যাখ্যান করেনি। জৈন গ্রন্থ বৃহৎকল্পভাত-এ দেখি এক গণিকা একটি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করেন, অন্যেরা দরিদ্রদের এবং জৈন মঠে প্রচুর অর্থ দান করেন। ধনী গণিকারা সেতু, কুপ, উদ্যান, মন্দির, মঠ, চৈত্য, কুঞ্জ, পুষ্করিণী, ইত্যাদি দিয়ে দেবদাসীর উপকার করেন। দেবদাসীরাও অনেকে জনহিতকর অনেক কাজ করেছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে গণিকা আম্রপালী বুদ্ধ ও তাঁর ভক্তদের উদ্দেশ্যে আম্রকানন দান করেন। বলাই বাহুল্য। এ সবই সমাজের লোক যথাবিধি ভোগ করেছে যদিও এদের সম্পর্শ করলে তাদের পাপ হত, এদের অন্ন গ্রহণ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত।

অসম্মান বঞ্চনা অত্যাচার ও লাঞ্ছনার মধ্যেই যারা জীবননির্বাহ করত তাদের পুরোপুরি মানুষ বলে কখনও গ্রহণ করা হয়নি। অথচ যে পুরুষ এত ধামিকমন্য, এত পুণ্যচরিত্র যে সে বারেবারে গণিকাকে পরিহার করার নির্দেশ

দিয়েছে সেই পুরুষেরই অপ্রতিহত কামনা নারীকে গণিকায় পরিণত করেছে। বহির্বাণিজ্যের দীর্ঘ পথটির ধারে ধারে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ জনপদ ও নগর। বিত্তবান ধনিকের হাতে সঞ্চিত হয়েছে উদ্বৃত্ত অর্থ। বিশেষত বাণিজ্য ও যুদ্ধের দায়ে যে পুরুষকে দীর্ঘদিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রবাসে থাকতে হয় সে তার উদ্বৃত্ত কঁচা টাকার বিনিময়ে যেমন বিদেশে খাদ্যবস্তু ক্রয় করে তেমনই ভোগ্য নারীও ক্রয় করে। তারই আনাগোনার পথের দু'ধারে সমৃদ্ধ রাজধানী ও নগরে প্রতিষ্ঠিত হয় বিলাসের সাহচর্যে, তাকে নাম দেয় মুহূর্তিকা, ক্ষণকালের সঙ্গিনী। এবং এ সব প্রখ্যাত গণিকাপল্লীর থেকে অনেক দূরে নগরের ও গ্রামের প্রত্যন্তদেশে ছিল অপেক্ষাকৃত রূপযৌবনহীনা শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিত কুলটা স্বৈরিণী বারাঙ্গনা। এদের আকর্ষণও যেমন কম উপার্জনও তেমনই কম। নিরাপত্তাও অনিশ্চিত। নিরাপত্তার জন্য যে সব আইন জরতী গণিকার জন্য সেই ভূতির বা বৃত্তির ব্যবস্থা ওই অসহায় দরিদ্র উপহাস্য গণিকার হয়ে রাষ্ট্রের কাছ থেকে কে তাদের প্রাপ্য আদায় করবে? কাজেই ধরে নেওয়া চলে যে, এই প্রান্তবাসিনীদের জীবনে জীবনসংগ্রাম কঠোরতম রূপে দেখা দিত। যে দেশে কুলকামিনীর স্থান ছিল পুরুষের পায়ের তলায় সেখানে রূপযৌবনে ও শিক্ষাদীক্ষায় সমৃদ্ধ গণিকা যদিবা পেত ঘৃণামিশ্রিত এক জটিল আকর্ষণ, কিন্তু সহায় সম্বলহীন কুবুপা বা বর্ষীয়সী বেশ্যার ভাগ্যে ছিল সমাজের পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও অবজ্ঞা এবং এরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। যে বৃত্তি কুলপুত্রের বা অন্য স্বাধীন পুরুষের কামনায় সৃষ্টি এবং তাদের নিরন্তর সাহচর্য ছাড়া সম্পূর্ণই অচল হয়ে উঠত, সেই পুরুষেরা সমাজে অর্থে শিক্ষায় ও প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠিতই থাকত বরং গণিকাসাহচর্য তাদের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলত, কিন্তু তারা যে গণিকার সাহচর্যকরত তার ভাগ্যে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। রোগে, শোকে, নিঃসঙ্গতায়, বার্ধক্যের অক্ষমতায় নিরাপত্তার কোনও আশ্বাসই তার ছিল না, তার ওপরে ছিল সমাজে প্রায় অস্পৃশ্যতা এবং দুরপনেয়। গ্লানি। সমাজ যেখানে নিজের স্বার্থে এই অত্যন্ত অসুস্থ এবং

অপমানজনক বৃত্তিটিকে জিইয়ে রেখেছিল। সেখানে গণিকা সম্বন্ধে তার কিছু দায়িত্বও ছিল যা সমাজ পালন করেনি।

টীকা

১. দীঘণিকায়ার রাহুল সাংকৃত্যায়নকৃত হিন্দি সংস্করণ; বারাণসী, ১৯৩৬, পৃ. ৭৩-৭৪। মঞ্জিমনিকায়, ঐ ১৯৬৪, পৃ. ২০-২৫, সংযুক্তনিকায় ৪৭:২০:২৩

২. ধম্মপাদটীকা, পালি টেক্সট সোসাইটি, লন্ডন, ১৯০৬-১৪, পৃ. ৩০৮-৯

৩. শ্রী পি এল বৈদ্যের সংস্কবণের দিব্যাবদান, ২.১৮ পৃষ্ঠা ‘

8. There is every likelihood that their palatial establishments and gardens were state property with life interest. Moti Chandra, 1973. The World of Courtesous, HBombay, Vikash. p-48

মহাকাব্য মহাভারত

এ আলোচনার মুখ্য লক্ষ্য হল পৃথিবীর মহাকাব্যগুলির মধ্যে মহাভারত-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। আলোচনার প্রধান অংশটিতে এই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নির্ণয়ের চেষ্টা আছে। কিন্তু তার আগে কতকগুলি প্রাথমিক কথা আছে, মূলত মহাভারত রচনা প্রসঙ্গে। গত চল্লিশ বছর ধরে পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন যে, মহাভারত রচনায় অন্তত তিনটি স্তর আছে। এর প্রথমটি হল মূল

ক্ষত্রিয়কাহিনি। তার পরে তার সঙ্গে সংযোজিত হল কতকগুলি চিরন্তন নৈতিক কাহিনি: দয়া, ক্ষমা, অহিংসা, আশ্রিতবাৎসল্য, সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংযম, ইত্যাদি চিরন্তন মানবিক গুণগুলিকে প্রতিপাদন করে এমন কিছু কাহিনি ক্ষত্রিয়কাহিনিতে সন্নিবিষ্ট হল। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকাহিনি যথেষ্ট পরিমাণ যশ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করার পরে মূল কাহিনিটিকে জনশিক্ষার বাহিনীরূপে ব্যবহার করার উদ্দেশেই এই কাহিনিগুলির সংযোজন। এ কাহিনিগুলি বহু শতাব্দী ধরে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতস্তত গাথা ও আখ্যানরূপে লোকমুখে সঞ্চারণ করছিল; সেই কারণে সামান্য রূপান্তরে এদের দেখা পাই বৌদ্ধ ও জৈন ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে।

পণ্ডিতেরা বলেন মহাভারত রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের মধ্যে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল (যদি বাস্তবে সে যুদ্ধ কখনও ঘটে থাকে) মোটের উপর খ্রিস্টপূর্ব নবম শতকে। আখ্যানে গাথায় কাহিনিটি যখন ছোট ছোট খণ্ডে সাহিত্যিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল তখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, উপনিষদের ভাবধারা এবং নানা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানে ও বৈদেশিক আক্রমণে ভারতবর্ষের অন্তর্জগতে প্রকাণ্ড কতকগুলি ঢেউ এসে লাগছিল। এরই মধ্যে এক সময়ে মূল যুদ্ধকাহিনি মহাকাব্য রূপ পেল এবং নৈতিক কাহিনিগুলির সংযোগে নিটোল একটি আকৃতি ও প্রকৃতি লাভ করল, কারণ নৈতিক কাহিনি তো কোনও শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের নয়, চিরন্তন ও মানবিক; ফলে তার দ্বারা ক্ষত্রিয় কাহিনির স্বতন্ত্র চরিত্রটি নষ্ট হল না। মনে হয়, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের পূর্বেই এ দুটি মিলে একটি পূর্ণাবয়ব মহাকাব্য হয়ে ওঠে। খ্রিস্টিয় প্রথম ও চতুর্থ শতকের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের এক বিপুলায়তন সংযোজন শুরু ও শেষ হয়, একে বলা হয় ব্রাহ্মাণ্য সংযোজন। কলেবরগত ভাবে যুদ্ধকাহিনি ও নৈতিককাহিনি মিলে সম্পূর্ণ মহাভারত-এর এক তৃতীয়াংশেরও কম, ব্রাহ্মণ সংযোজন দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি। এই শেষতম অংশে কিছু কিছু আছে মানুষের মুখে চলে আসা কয়েকটি অমর

কাহিনি, যেমন রুরু-প্রমদ্বারা, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনি, রামোপাখ্যান, শকুন্তলা, দুষ্যন্ত কথা ইত্যাদি; এগুলি রসোত্তীর্ণ এবং সাহিত্যিক গৌরবে সমৃদ্ধ। কিন্তু পরিমাণগত ভাবে এ ধরনের উপাখ্যান পুরো ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের খুব বড় অংশ নয়। বাকি অধিকাংশ কাহিনি সাম্প্রদায়িক দেবতার মহিমা, তীর্থমাহাত্ম্য, আচার অনুষ্ঠান, পতিব্রতাধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, কিছু দর্শন, দৈব, কর্ম ও জন্মান্তরবাদ এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণের মহিমাকীর্তন; অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে রুষ্ট করলে কী ভয়াবহ পরিণতি হয় এবং তুষ্ট করলে ইহলোকে-পরলোকে কী রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য হয় তার বিবরণ। সাহিত্যিক নিরিখে এ অংশের রচনা নিকৃষ্ট, বিষয়গত ভাবে একে বলা যায় অভিপৌরাণিক, অর্থাৎ যে ধরনের কথা পরবর্তীর্ণ যুগে পুরাণ নামে স্বতন্ত্র সাহিত্য হয়ে উঠবে তারই সূচনা এতে।

পুনের সংশোধিত সংস্করণে মহাভারতে পাঁচাশি হাজারেরও বেশি শ্লোক আছে, আঞ্চলিক সংস্করণের কোনও কোনওটিতে তার চেয়ে অনেক বেশি শ্লোক ছিল, তাই মহাভারতের একটি নাম শতসাহসী বা লক্ষশ্লোকী। (২১৪ গুপ্ত সনে অর্থাৎ ৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাগোলখণ্ডে রাজা সর্বনাথের খোহ শিলালিপিতে মহাভারত-কে শতসাহসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফ্লিট-এর কর্পস অব ইনস্ক্রিপশন্স, ৩য় খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)। মহাভারত রচনা যে তিনবার সম্পূর্ণ হয় সে কথা মহাভারতেই আছে: চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম/ উপাখ্যানৈর্বিনা তাবজ্ঞাতরং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।। (১:১:৬১) ক্ষত্রিয় কাহিনির আদি সংস্করণে চব্বিশ হাজার শ্লোক ছিল (লক্ষ্যণীয়, রামায়ণ-এও চব্বিশ হাজার শ্লোক)। অন্যত্র শুনি:: মন্বাদি ভারতং কোচিতাস্ত্রীকাদি তথাপরে/তথ্যোরিচর্যাদন্যে বিপ্রাঃ সমগধীয়তে। (১:১:৫০) দেখতে পাচ্ছি, মনুর কাহিনি দিয়ে আরম্ভ বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে আস্তিকের কাহিনি দিয়ে শুরু আদিপর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে এবং উপরিচর থেকে

শুরু ছাপ্পান্ন অধ্যায়। থেকে; তিনটি আরম্ভ তিনবারের। অধ্যাপক সুখথংকর বলেন, শেষবারের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের রচয়িত ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণরা। (ভি এস সুখথংকর: ক্রিটিকল স্টাডিজ ইন দ্য মহাভারত। পুনা/১৯৪৪)

প্রথম ক্ষত্রিয়কাহিনি–যেটি আদি ও অকৃত্রিম বীরকথা— তার নাম ছিল জয়, এটি ছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটি কাব্যময় ইতিহাস। অথবা, রচুনার পরে যখন ইতিহাসটি কাব্যগুণে ভাস্বর হয়ে উঠল তখন মানুষ তার নাম দিল জয়: ‘জয়ো নামেতিহাসোহয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা–যিনি জয়কামনা করেন এই জয় নামক ইতিহাস তাঁর শোনা উচিত।’ (১:৫৬:১৯) কিছু পরে শুনি: যথা সমুদ্রে ভগবান যথা চ হিমবান গিরিঃ/খ্যাতুবুভৌরত্ননিধি তথা ভারতমুচ্যতে।–ভগবান সমুদ্র ও হিমাচল যেমন রত্ননিধি, তেমনই রত্ননিধি ভারত।’ (১:৫৬:২৭) মনে হয় ক্ষত্রিয়কাহিনি ও নৈতিককাহিনির সংযোগে মহাকাব্য যো-রূপটি পরিগ্রহ করে তাকেই ভারত নাম দেওয়া হয়েছে। বাকি সর্বত্রই এর নাম মহাভারত: ত্রিভির্বর্ষৈঃ সন্দোখায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ/মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিন্দমুত্তমম।–তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি এই উত্তম মহাভারত রচনা করেন।’ (১:৫৬:৩২)

নানা ভাবেই মহাভারত-এর তিনটি পর্যায়ের কথা উঠেছে এবং মিলিয়ে দেখলে মনে হয় চব্বিশ হাজার শ্লোকে জয় নামক যুদ্ধকাহিনি রচনা করে ব্যাস তার চার শিষ্যকে শোনান ও প্রধান শিষ্য শূক বৈশম্পায়নকে বিশেষ করে শেখান (বিশম্পার পুত্র শুক; ভাবে কন্ঠস্থ করতে পারতেন বলেই কি শূক নাম?)। তার পরে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে ঋষি ও ব্রাহ্মণদের অনুরোধে বৈশম্পায়ন সে কাহিনি বিবৃত করেন। মনে হয়, এই সময় মহাকাব্যে যুক্ত হয়েছিল ঋষিকাহিনিগুলি–যেগুলি চিরন্তন মানবিক গুণ ও নীতিকে প্রতিষ্ঠা করার উদেশে রচিত। যুদ্ধ তখন দূর অতীতের স্মৃতি, কিন্তু সেই জনপ্রিয় যুদ্ধকাহিনির সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের কাহিনিগুলোকে যুক্ত করে সমগ্র

কাব্যটিকে জনশিক্ষার বাহন করে তোলা হল; এবার তার নাম হল ভারত, ভারতবংশের ইতিহাস। এই কাব্যটি রসোত্তীর্ণ সুসংহত একটি কাহিনি, এটি লোকমুখে ছড়াতে লাগল। কয়েক শতাব্দী ধরে। গুপ্তযুগের সূচনার দুই এক শতাব্দীর মধ্যে এর শেষতম, অর্থাৎ বর্তমান রূপটি নির্মিত হয়। ভৃগুবংশীয় উগ্র ব্রাহ্মণদের হাতে; সাম্প্রদায়িক দেবতা ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাঠের অনুশাসন-সংবলিত দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট রচনা এই ব্রাহ্মণ সংযোজন। এ অংশে উগ্র ব্রাহ্মণ্যতার নীরস অংশ পরিণামে এত বেশি যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকেই অবজ্ঞাভরে মহাভারত-কে শিথিল কলেবর অপাঠ্য গ্রন্থ’ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আগেই বলেছি, এই প্রক্ষেপেরও একটি অংশে আছে কয়েকটি অমর কাহিনি যা শিল্পোত্তীর্ণরূপে জনমানসে দীর্ঘকাল প্রোথিত ছিল, এবার গাথা-উপাখ্যানের বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করে মূল কাহিনির সঙ্গে তাদের গেথে দেওয়া হল। এই সংযোজন খ্রিস্টিয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকেই মোটের ওপর শেষ হয়েছিল, যদিও আঞ্চলিক প্রক্ষেপ হয়তো আরও কিছু কাল ধরে চলেছিল। এই শেষ কাব্যরূপটির আখ্যাত সৌতি উগ্রশ্রবা লোমহর্ষণি (লোমহর্ষণের পূত উগ্রশ্রবা), যিনি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়নের ভারত-কাব্য আবৃত্তিকালে একজন শ্রোতা ছিলেন। শৌনকের দ্বাদশবর্ষব্যাপী সোমযাগ সত্রে সমবেত জনতার অনুরোধে ইনি এই বিপুলকলেবর কাব্যটি শোনান; তখন এর নাম মহাভারত। মোটের ওপরে আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বের সামান্য অংশ এবং উদ্যোগ থেকে স্ত্রী পর্ব পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণভাবে হল জয়, অর্থাৎ প্রথম ক্ষত্রিয় মহাকাব্যের রূপ। ভরত অংশে এই পর্বগুলির মধ্যে এবং হয়তো শান্তিপর্বের কিছু অংশের নৈতিক কাহিনিগুলি অনুপ্রবিষ্ট হয়। আদি থেকে বিরাটের বাকি অংশ এবং শান্তি থেকে স্বর্গারোহণ সম্পূর্ণতই দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের সংযোজন, তার পরে এর নাম মহাভারত।

মহাভারত নিজেকে অন্য অনেক নাম দিয়েছে, কিন্তু কখনও মহাকাব্য বলেনি; একবার শুধু বলেছে, কাব্যং পরমপূজিতম (১:১:৬১); মহাকাব্য আখ্যাটি পরবর্তীর্ণযুগের প্রণতি সূচিত করে। মহাভারত নিজের সম্বন্ধে বলেছে, অর্থশাস্ত্রমিদং পুণ্যং ধর্মশাস্ত্রমিদং পরাম/মোক্ষশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতে বুদ্ধিনা। মহাভারত নিজেকে অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও মাোক্ষশাস্ত্র বলে অভিহিত করেছে।' (১:৫৬:২১) নিজেকে পুরাণও বলেছে: দ্বৈপায়নেন যৎ প্রোক্তং পুরাণং পরমর্ষিণ; (১:১:১৫) বলেছেইতিহাস, ভারতস্যেতিহাস্য পুণ্যাংগ্রস্থার্থসংযুতাম; (১:১:১৭) অথবা, ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসূতঃ; (১:১:৫২) বলেছে সংহিতা, সংহিতা শ্রোতুমিচ্ছামো ধর্মাং পাপভয়াপহাম; (১:১:১৯) বলেছে বেদ, বেদমিমং বিদ্বান; (১:১:২০৫) বলেছে উপনিষদ, আত্রোপনিষদং পুণ্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোহব্রবীৎ (১:১:১৯১); আর বলেছে আখ্যান, যোবিদ্যাচ্চতুরো বেদান সাঙ্গোপনিষদনদ্বিজঃ/নচাখ্যনমিমং বিদ্বান্নৈবসস্যাদ্বিচক্ষণঃ। (১:১:২৩৫) কিংবাইদং সর্বৈঃ কবিবৈরাখ্যানমুপজীব্যতে (১:১:২৪১), অর্থাৎ শাস্ত্রগ্রন্থ ও ইতিহাস্যরূপেই মহাভারত পরিচিত হতে চেয়েছে। কারণ, তখনকার ভারতবর্ষজ্ঞান ও উপলব্ধির যে দুটি প্রকাশকে চিনত–শাস্ত্র ও ইতিহাস, সেই দুটি আখ্যাই সে মহাভারতকে দিয়েছে। কয়েকশতাব্দী পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন স্মৃতিও কিংবদন্তীতে পর্যবসিত ও শতশত উপাখ্যানে পল্লবিত, তখন স্বভাবতই সমস্ত মহাকাব্যটিকেই একটি সুবিস্তৃত আখ্যান বলে মনে হবে; আখ্যান ছিল ইতিহাসেরই অঙ্গ।

মহাভারত রচনা করে ব্যাস তার চার শিষ্য পৈল, জৈমিনি সুমন্ত ও বৈশম্পায়নকে শোনান ও বৈশম্পায়নকে বিশেষ ভাবে শেখান। ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্বং শুকমধ্যাপয়দিবজঃ; (১:১:৬৩) নারদ শোনান দেবতাদের, অসিত দেবল পিতৃপুরুষদের, আর শুক গন্ধর্ব্বযক্ষ রাক্ষসদের– নারদেহশ্রাবয়দেবানসিতো দেবলঃ পিতৃন/গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষাংসি শ্রাবয়ামাস বৈ

শূকঃ।। (১:১:৬৪)/এ গ্রন্থের মহিমা বোঝাতে বলা হয়েছে, চত্বর একতো বেদা ভারতং চৈবমেকতঃ–‘একদিকে চারটি বেদ আর একটি মহাভারত’ (১:১:২০৮); অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বেদ ও মহাভারততুল্যমূল্য। এতে কী আছে? ভারতানাং মহজন্ম মহাভারতমুচ্যতে; (১:৫৬:৩১) অথবা, কুরুণাং চরিতং মহৎ–ভারতবংশের বা কুরুকুলের মহনীয় চরিতকথাই মহাভারত।’ (১.৫৬/১)

মাত্র একটি স্থানে মহাভারততার নামের বুৎপত্তি বলেছে: মহত্বস্তুরতুচমহাভারতমুচ্যতেমহত্ব এবং ভারততত্ব থাকার জন্যেই এর নাম মহাভারত।’ (১:১:২০৯) স্পষ্টতই বুৎপত্তি নির্বাচন বা ব্যাকরণশাস্ত্রমতে এটা ভুল, কারণ ভারবত্ব থেকে ‘ভারত’ হতে পারে না। তবে কেন একথা বলা হয়েছে? এখানে ছন্দে, কিছু গদ্যেও সংলাপে, বর্ণনায়, আখ্যানে, নাটকীয় ঘটনার বর্ণনায় কাহিনির বিবরণে, তর্কে, উপদেশে, প্রহেলিকায়, তত্বলোচনায়, নানা ভঙ্গি ও বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তুর সমাবেশ। এছাড়া কলেরবগত ভাবে, বিষয়মাহাত্ম্যে, স্থানের পরিসরে, কালের ব্যাপ্তিতে, নানা জাতি উপজাতির উপাখানে মহৎ এক যুদ্ধবর্ণনায়, মহৎ এক বংশের অভুযুত্থান, সমৃদ্ধি ও অবক্ষয়ে বর্ণনায় এর মহত্ত তো স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু ভারবত্ব? এও কি সেই বিস্তার, ইত্যাদিরই ভার? তা মনে হয় না; মনে হয় এত ভারা–গুরুত্বের, গৌরবেরা, ব্যাপ্তির গভীরতার-পৃথিবীর আর কোনও মহাকাব্যেই নেই। সেই জন্যে ভ্রাপ্তি বুৎপত্তি দিতেও দ্বিধা নেই কবির। তাঁর এ সাহসের কারণ হল, ব্যাকরণে না হোক অন্য স্তরে এই ভারবত্ব শব্দটি চূড়ান্ত সার্থকতায় মণ্ডিত।

মহাকাব্য কাকে বলে সে সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই খানিকটা ধারণা আছে। তবু সামান্য সমালোচনার প্রয়োজন। এই জন্যে যে রঘুবংশ, প্যারাডাইস লস্টও মহাকাব্য, আবার মহাভারতও মহাকাব্য। অথচ এদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য আছে এবং হয়তো সে পার্থক্যেরও নানা পর্যায় আছে। পরবর্তীকালের

মহাকাব্যগুলির মধ্যে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, রাবণবধ, কিরাতার্জুন, শিশুপালবধ, বেও উলফ, প্যারাডাইস লস্ট, ফাউস্ট ও দ্বাদশ শতকের স্পেনের (রাড়িগো ডিয়াথ অব হিস্থার-এর) এলসিডি, ইত্যাদি একটি স্তরের, পরস্পরের মধ্যে বেশি কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও। এগুলির ঊর্ধ্বে হয়তো দ্বাদশ শতকে অস্ট্রিয়ায় রচিত জার্মান মহাকাব্য নিবেলুঙ্গেনলিড, কয়েক শতাব্দী পরের ফিনল্যান্ডের কালেহ্বরা, নরওয়ের সাগাগুলি, দশম শতকের স্ক্যান্ডিনেভিয়ার গদ্য এজন ও পরবর্তী কালের ছন্দ-এড়া। এগুলির ঊর্ধ্বে স্থান হয়তো খ্রিস্টপূর্বপ্রথম শতকের ভাজিলের ঈনীড এবং কাব্যমূল্যে এরই সগোত্র হয়তো খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে রচিত পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য সুমেরীয় গিলগামেশ্য। কাব্যের দিক থেকে বাল্মীকির রামায়ণ ও হোমারের অডিসি সম্ভবত এগুলির উর্ধ্বে স্থান পায় এবং তাদের উর্ধ্বে ইলিয়াড। কিন্তু মনে হয়, তারও বহু উদ্ধের্ব অবস্থিত মহাভারত। জানি, এ স্তরবিন্যাস নিরাপদও নয়, নিরঙ্কুশও নয়; শুধু বলতে চাই, মহাকাব্য হিসেবে মহাভারত পৃথিবীর আর সব মহাকাব্যের বহু ঊর্ধ্বে। কিসে? মহাত্ত্বজ্ঞারবত্ত্বাষ্চ।

বিষয়গাম্ভীর্য বর্ণনাকৌশল, চরিত্রচিত্রণ ইত্যাদিতে অন্যান্য দেশের মহাকাব্যও যথেষ্ট উৎকর্ষের পরিচয় দেবে। প্যারাডাইস লস্ট-এ স্যাটান ও ঈশ্বরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে অবশ্যই যথেষ্ট মহনীয়তা আছে; দুটি চরিত্রই বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। রঘুবংশ-তে একটি বংশের বিমূর্ত কল্পনা নায়কের স্থান নিয়েছে এবং ধীরে ধীরে বীররস পৌঁছেছে। উদাস শোক ও চূড়ান্ত অবক্ষয়ের গ্লানি ও বিষন্নতায়। নিবেলুঙ্গেনলিড-এ, শৌর্য, সম্মানবোধ, প্রতিহিংসা ইত্যাদি বীরকাহিনির উপজীব্যের মাধ্যমে একটি গৌরবযুক্ত জীবনবোধ ফুটে উঠেছে। গদ্য এড়া ও গিলগামেশ-এ সৃষ্টিতত্ত্ব ও মানুষের জীবন সম্বন্ধে ভুয়োদর্শিতা ও কাব্যগত মহিমা অবশ্যই আছে। দান্তের দিহিনা কম্মেদিয়া ও ইনফেনো-তে মরণোত্তর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নৈতিক মূল্যয়বোধ ও জীবনের নানা উপলব্ধির সার্থক তাৎপর্যপূর্ণ রূপায়ণ আছে।

যেমন ঈনিড-এ রোম রাজ্য গঠনের প্রাক-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বীর ঈনিয়াসের নিঃসঙ্গ, আপাতবঞ্চিত জীবনপরিক্রমার কাহিনি গভীর তাৎপর্যেমণ্ডিত। রামায়ণ-এ এবং অডিসি-তেও নানা বঞ্চনার আবহের মধ্যে দুটি বীরের চরিতকথায় আশ্রয় পেয়েছে বেশ কিছু চিরন্তন উপাদান। ইলিয়াড তাৎক্ষণিক আবেদনগুলিকে অতিক্রম করে আমাদের নিয়ে যায় নানা বীরের জীবনের উত্থানপতনের অন্তরালে নিহিত কয়েকটি মানবিক সত্যের সীমানায়।

আর মহাভারত? কাব্যমূল্যেই সে অনন্য। মনে রাখতে হবে, দুই তৃতীয়াংশের বেশি যে ব্রাহ্মণ্য সংযোজন তার অধিকাংশই কাব্যমূল্যে যৎসামান্য; তা সত্ত্বেও মহাভারতকাব্যমূল্যেই অনুপম। সেই কাব্যমূল্যের কয়েকটি দিক দেখাবার চেষ্টা এ প্রবন্ধে। প্রকৃতিবর্ণনাই হোক আর মানুষের রূপবর্ণনাই হোক, শুধু বর্ণনামাাহাত্ম্যে কোনও কাব্য মহাকাব্য হয়ে ওঠে না। তবু বর্ণনার বিভিন্ন ধরনের উৎকর্ষ সব মহাকাব্যেই আছে। রামায়ণ, মহাভারত ও হোমারে এর একটি স্বতন্ত্র স্বাদ আছে: বর্ণনা সেখানে সতেজ, স্পষ্ট, সবল; ঋজুতাই তার বৈশিষ্ট্য। কখনও কখনও বিচিত্র অভিজ্ঞতার একত্র সমাবেশের ফলে এই বর্ণনাগুলিতে নতুন একটি মাত্রা আসে। মহাভারত-এর প্রকৃতি বর্ণনায় এমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই যা রামায়ণ-এ বা পুরাণে অনুপস্থিত। নদীগিরিবন, সূর্যচন্দ্রের উদয়-অস্ত, দুর্গম, ভয়াল অরণ্য, উত্তুঙ্গ পর্বত এবং প্রকৃতির কান্তকোমল রূপ প্রসঙ্গক্রমে বহুবার মহাভারত-এ বর্ণিত হয়েছে। কখনও কখনও দু-একটি বর্ণনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে; যেমন, 'দেবদারুবনরাজি যেমন মেঘকে ধরবার জন্যে পাতা একটি জাল–বনানি দেবদারুণআং মেঘনামিব বাগুরা।' (৩:১৭৮:১০) হোমারের মতো মহাভারত-এও কয়েকটি অপরিবর্তিত বিশেষণ বা বিশেষণাশ্রিত বাক্যাংশ বর্ণনাকে মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত করে তোলে। ভীষ্মের শৌর্যব্যঞ্জক আকৃতি, অর্জ্জুনের বীরকান্তি,

ভীমসেনের প্রাকার-তোরণের মতো স্কন্ধাদেশ ও বলিষ্ঠ বাহু, যুধিষ্ঠিরের স্থির গভীর ভাব, গান্ধারীর তেজস্বিনী মূর্তি ছোটখাট, বিশেষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সত্যবতী আসিতালোচনা, কালো তার চোখ দুটি। প্রমদ্বারা জ্বলন্তীমির চ শ্রিয়া, সৌন্দর্যে যেন জ্বলছে তার দেহকান্তি। শকুন্তলা শ্রীরিব রূপিণী শ্রীমতী চারুহাসিনী। জুয়ায় দ্রৌপদীকে পণ রাখবার সময়ে যুধিষ্ঠির তাঁর বর্ণনা করেছেন: নৈব হ্রস্ব ন মহতী ন কৃশা নাতিরোহিণী/ নীলকুঞ্চিতকেশী চ./ শারদোৎপলপত্রাক্ষ্যাশারদোৎপলগন্ধয়া/ শারদোৎপলসেবিন্যারূপেণাসীসমানীয়া। (২:৬৫:৩৩, ৩৪)–তিনি শ্যামা পদ্মাপলাশাক্ষী নীলকুঞ্চিতমূর্ধজী।. নীলোৎপলসমো গন্ধোন্যস্যাঃ ক্রোশাৎ প্রবায়তি (১:১৫৫:৪২, ৪৩), শ্যামবর্ণা, পদ্মাপলাশনেত্রা, নীল তরঙ্গিত কেশ, নীলপদ্মের সুরভি যেন লেগে আছে তার সর্বাঙ্গে।' দুঃশাসন দূতসভায়— দীর্ঘোয়ু সীলেম্বথ চোর্মিমৎসু জগ্রাহ কেশেষু নরেন্দ্রপত্নীম— দীর্ঘ নীল ঢেউ-খেলানো কেশরাশি ধরে রাজবধুদ্রৌপদীকে আকর্ষণ করেছিলেন।' (২:১৭:২৯) এই দীর্ঘদেহ শ্যামাঙ্গী নীলকুঞ্চিতকেশা মেয়েটিকে যেন চোখে দেখা যায়। দ্রৌপদীর বর্ণনায় তার দীর্ঘ দেহ, তরঙ্গিত কেশ, নীলপদ্মের মতো চোখ, অঙ্গে পদ্মগন্ধ আর নীলপদ্মের নানা অনুষঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে। স্বর্গে গিয়ে যুধিষ্ঠির যখন তাঁকে দেখলেন তখনও তিনি কমলোৎপলমালিনী, জানালেন তিনি স্বয়ং পদ্মা। অর্থাৎ কবির মনের মধ্যে শ্যামাঙ্গী। দীর্ঘদেহা পদ্মনেত্রা দ্রৌপদীর রূপের সঙ্গে কোথায় যেন নীলপদ্মের শোভা মিশে গিয়েছিল।

মহাভারতের বর্ণনায় মাঝে মাঝে সামান্য অলংকারের স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বর্ণনীয় বস্তু: যুদ্ধের সময়ে কুরুকুল ভস্ম হয়ে যাচ্ছে অর্জ্জুনের শরবর্ষণের প্রবলতায়–মহাবনে মৃগগণা দাবাগ্নিত্রাসিতা যথা–যেন মহাবনে দাবাগ্নির ভয়ে ব্যাকুল জন্তুরা।' (৮৮:৮০:১৯) অথবা সঞ্জয় বলছেন, 'বিশাল পর্বতগাত্রে বেণুবন যেমন দাবানলে রাত্রে জ্বলে ওঠে, সশব্দে ফেটে যায়

বঁশগাছগুলো, তেমনই ধৃতরাষ্ট্র, তোমার পক্ষের সৈনিকরা শরপীড়িত হয়ে বিনষ্ট হচ্ছে–মহাগিরৌ বেণুবনংনিশি প্রজ্বলিতং যথা/তথা তব মহাসৈন্যং প্রাস্ফুটচ্ছের পীড়িতম। (৮:৮০:৮০) ভীষ্মের কাছে ভীষ্মের মৃত্যুর উপায় জানতে চাইলেন যুধিষ্ঠির; ভীষ্ম উত্তর দিলেন; মৌন ভাবে, 'যৌন পরলোকে যাওয়ার জন্য দীক্ষিত হয়ে–তথোক্তব্বতি গাঙ্গেয়ে পরলোকায় দীক্ষিতে। (৬:১০৭:৯০) সঞ্জয় যুদ্ধরত দ্রোণের বর্ণনা করেছেন দুর্যোধনের কাছে: আকর্ণপালিতশ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ/রণে পর্যচরদ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ।। 'পচাঁশি বছর। বয়স দ্রোণের কানের কাছে পর্যন্ত চুল পেকে গেছে; দুর্যোধন, এই বৃদ্ধ (তোমার জন্যে) ষোলো বছরের কিশোরের মতো যুদ্ধ করছেন। (৭:১৬৫:১০৩) কৃপা কর্ণকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ধৃষ্টতা; ডান হাত তুলে তর্জনী দিয়ে ক্রুদ্ধ বিষাক্ত সাপের মুখ খুলে তার বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে চাইছ?—-আশীবিষস্য ক্রুদ্ধস্য পারিখমুদ্যম্য দক্ষিণম/অবমুচ্য প্রদেশিন্যা দংষ্ট্রামাদাঁতুমিচ্ছসি।' (৪:৪৯:১৩) রূপকটি বিবক্ষিত বিষয়টিকে যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষগোচর করে তুলেছে। যুদ্ধে দ্রোণ নিধুম অগ্নির মতো জুলতে লাগলেন।—ররাজ স মহারাজ বিধুমোক্সিরি জ্বলন।' (৮:১৯:৩৫)

যুদ্ধ করতে করতে যখন ক্ষত্রিয়বীরের মৃত্যু হয় তখন মহাভারত-এ বারেবারেই বর্ণনা পাই–বসন্তকালে ফুলে ভরে-ওঠা একটি বনস্পতি যেন ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল। কর্ণের পুত্র বৃষসেনের মৃত্যুর বর্ণনা: স পার্থবাণাভিহিতঃ পপাত রথদ্বিবাহুবিশিরা ধরায়াম/সুপুষ্পিতো বৃক্ষবরোহকিতায়ো বাতেরিতঃ শাল ইবাদ্রিশৃঙ্গাৎ ।— নববসন্তে ফুল ফোটা প্রকাণ্ড একটি শালতারু যেন গিরিশৃঙ্গ থেকে উন্মুলিত হল।' (৮:৮৫:৩৬ বঙ্গবাসী সংস্করণ। সংশোধিত সংস্করণে বর্জিত হলেও বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় বঙ্গবাসী সংস্করণে পাঠ থেকে এ প্রবন্ধে মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন মতো উদ্ধৃতি

দেওয়া হয়েছে। বিশেষত প্রখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ এই পাঠেরই টীকা করেছেন। বঙ্গবাসী বলে উল্লিখিত নাহলে বাকি সমস্ত উদ্ধৃতিই পুনে সংশোধিত সংস্করণ থেকেই দেওয়া হয়েছে) কর্ণের মৃত্যু: তদুন্দর্য্যদাদিত্যসমানর্বচং শরন্নভোমধ্যগভাস্কারোপমম/ বরাঙ্গমূর্ব্যামপতচমুপাতেদিবাকরোহিস্তাদিব রক্তমণ্ডলঃ। (৮:৬৭:২৪). যথা কদম্বকুসুমং কেশরৈঃ সর্বতো বৃতম/চিতং শরশতৈঃ কর্ণং ধর্মরাজো দদর্শ সঃ।। (৮:৯৬:৩৩ বঙ্গবাসী)— মাঝ-আকাশ থেকে নির্মেঘ শরতের উজ্জ্বলন্ত সূর্য্যমণ্ডল যেন রক্তাক্ত হয়ে অস্তাচলে ঢলে পড়ল, যেন কেশরাচ্ছন্ন কদম ফুল মাটিতে খসে পড়ল।' ভীম ও দুর্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাক্ত দেহে যুদ্ধ করছেন: দদৃশাতে হিমবতি পুষ্পিতৌকিংশুকাবিব (৯:৫৭:৩১)–হিমালয়ে (লাল) ফুলফোটা দুটি কিংশুকতরুর মতো দেখাচ্ছে দুজনকে। বারে বারে ক্ষত্রিয় বীরের মৃত্যুর সঙ্গে বসন্তের ফুলফোটা কণিকার, কিংশুক, শাল্মলী, অশোক বা পলাশের মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপমা পাই। বসন্তের পুষ্পতরুর চূড়ান্ত সার্থকতা তার রক্তপুষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে বিকশিত হয়ে ওঠার লগ্নে, তেমনই ক্ষত্রিয়বীর যখন সর্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাতের রক্তাক্ত চিহ্ন নিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে দিন তারও চরম সার্থকতার লগ্ন।

ভরদ্বাজের শরবর্ষণে পীড়িত পাণ্ডবরা কঁপিছে, 'যেমন কঁপে শীতকালে কৃশ গাভীরাশিশিরে কম্পমান বৈ কৃশ গাব ইব প্রভো। (৭:১৩০:৬)। ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জপর্বর নিষ্প্রাণ দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে গেল, 'যেন দুর্ভাগার ব্যর্থ মনোরথের মতো— অভাগ্যস্যেব সংকল্পস্তন্মোঘমপতর্ভুবি। (৭:১৫৪:৭৯ বঙ্গবাসী) যুদ্ধে সেনাপতি কর্ণের ওপরেই যখন কৌরবদের সমস্ত ভরসা তখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হলে সকলে তাঁকে দেখল 'যেমন করে শীতে কাতর মানুষ দেখে সূর্যকে–শীতার্তা ইব ভাষ্করম। (৮:২২:১৪) এর মধ্যে সূর্যের উপমাটিতে ব্যঞ্জনাও আছে, কারণ কর্ণ সূর্যেরই সন্তান। অর্জুন কর্ণকে বিদ্রুপ

করে বলছে, ‘শৃগোলও যদি বনে শশ-পরিবৃত হয়ে বাস করে তবে সে নিজেকে সিংহ বলে মনে করে; কিন্তু কতক্ষণ? যতক্ষণ সিংহকে না দেখে–শৃগালোহপি বনে কর্ণাশশৈঃ পরিবৃতো বসন/মন্যতে সিংহমাত্মানং যাবৎ সিংহং ন পশ্যতি।’ (৮:২৭:৪৫)। নকুল বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে দুঃখসন্তপ্ত হয়ে সরবে। নিঃশ্বাস নিচ্ছেন ‘যেন কলসীর মধ্যের সা েপ–কুম্ভস্থ ইব পান্নগঃ।’ উদ্যোগপর্বে বিদুর উপাখ্যানে বিদুর তাঁর নিশ্চেষ্ট পুত্র সঞ্জয়কে ধিক্কার দিয়ে বলছেন, ‘অলাতং তিন্দুকসো েব মুহূর্তপতি হি জুল/মা তুষাগ্নিরিবানির্চিষ্কুমায়স্ব জিজীবিষ্কু।—তিন্দুক (কেন্দু) কাঠের আগুনের মতো অন্তত এক মুহূর্তও সতেজে জ্বলে ওঠ, শুধু বেঁচে থাকতে চেয়ে তুষের আগুনের মতো স্ফুলিঙ্গহীন ভাবে দীর্ঘকাল ধূমায়িত হয়ে না।’ (৫:১২৬:১৮) ক্ষত্রিয়পুরুষের নিশ্চেষ্টতায় ক্ষত্রিয়নারীর ক্ষুদ্ধহৃদায়ের সমস্ত ধিক্কার ওই দুটি উপমায় প্রকাশিত। স্ত্রীপর্বে মৃত দ্রোণাচার্যকে দেখে গান্ধারী বলছেন, ‘প্রচণ্ড অগ্নির মতো যিনি শত্রুসেনা দহন করতে করতে এগিয়ে যেতেন, তিনি আজ নিহত হয়ে ভূপতিত, যেন নির্বাপিত অগ্নি–শান্তচিরিব পাবকঃ।’ (১১:২৩:৩০) স্বর্গারোহণপর্বে মৃত যোদ্ধাদের বিষয়ে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রকে প্রশ্ন করছেন, আর সেই সব মহারথ যোদ্ধারা কোথায় যাঁরা যুদ্ধের আগুনে শরীর আহুতি দিলেন?–জুতুবুর্যে শরীরানি রণবহ্নৌ মহারথাঃ।’ (১৮:২:২) যুদ্ধের সঙ্গে বারেবারেই অগ্নি, অগ্নিকাণ্ড ও দাবানলের উপমা দেখা দিয়েচে, এর তাৎপর্য পরে আলোচনা করছি।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দুর্যোধন এক নিরস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধ করতে করতে বলছেন সর্বো েপকরণৈহীনং বর্মশাস্ত্রান্দিবর্জিতম/একাকিনং যুধ্যমানং পশ্যন্তু দিবি দেবতাঃ।-বর্ম, অস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত উপকরণ চলে গেছে, তবু আমি একাকী যুদ্ধ করছি, আকাশের দেবতারা চেয়ে দেখুন। আমাকে।’ (৯:৩৩:৫৩) এই শৌর্যে দুর্যোধন সে দিন যেন দেবতাদেরও অতিক্রম করে গেলেন। শিখণ্ডির আড়াল

থেকে অর্জ্জুন শরনিক্ষেপ করছেন, ভীষ্ম অস্ত্রত্যাগ করে বললেন, ‘এ বাণ ত শিখণ্ডীর নয়, এ অর্জ্জুনের; কাঁকড়াবিছের ছানা যেমন করে মাকে দংশন করে মেরে ফেলে সেই ভাবে এ বাণ আমার মর্মমূল বিদ্ধ করছে।’ (১২:১১৯:৬৫ বঙ্গবাসী)। অপত্যধর্ম পদদলিত, আড়াল থেকে অর্জ্জুন পিতামহকে মৃত্যুবাণ হানছেন, তাই এ বাণের বিষ শুধু ভীষ্মের শরীরকে নয়, তার হৃদয়কেও বিদ্ধ করছে দুঃসহ জ্বালার যন্ত্রণায়।

সম্পূর্ণ নিরালংকার কবিত্ব, হৃদয়াবেগের কাছে যার সরাসরি আবেদন নেই, তেমন নিদর্শনও মহাভারতে প্রচুর পাই। শল্যপর্বে বলরাম অর্জ্জুনকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন: ‘অন্যায় ভাবে ধার্মিক রাজা দুর্য্যোধনকে হত্যা করে তুমি পৃথিবীতে অপযশস্বী হবেশঠযোদ্ধা বলে-হত্বাধর্মেণ রাজনং ধর্মাত্মানং সুযোধনমা/ জিহ্মযোধীতি লোকোহমিনখ্যাতিং যাস্যসি পাণ্ডব।’৯:৫৯:২৩) যুদ্ধকালে দ্রোণ অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ শুনে যখন উন্মাদের মতো পাণ্ডবদের হত্যা করে চলেছেন তখন ভীম তাকে বলেছেন: ‘একটি পুত্রের মৃত্যুর প্রতিহিংসায় অধর্মপথে বহু সৈন্য হত্যা করছেন, ক্ষত্রধর্মে থেকে যাঁরা যুদ্ধ করছেন আপনি ব্রাহ্মণ হয়েতোদের বিরুদ্ধে।অস্ত্রধারণ করছেন, আপনার লজ্জা হয় না, আচার্য?–একসার্থেবহুনহত্বা পুত্রসাধর্মবিদ্যয়/স্বকর্মস্থান বিকর্মস্থোন ব্যাপত্রপসে কথম।’(৭:১৬৫:২১)। যুদ্ধের শেষদিন দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন: গচ্ছ ভুলক্ষ ত্বং রাজেন্দ্র পৃথিবীং নিহতেশ্বরাম/হতযোধাং নষ্টরত্নাং ক্ষীণবপ্রাং যথাসুখম।Hপৃথিবীর যশস্বী রাজারা ও যোদ্ধারা আজ মৃত্য। বসুন্ধরার ঐশ্বর্যনিঃশেষিত, এর পরিখাও নষ্ট হয়ে গেছে; যাও মহারাজ, এই পৃথিবীকে যথেচ্ছ ভোগ করে সুখী হও’ (৮:৩১:৫১) এ কথায় কি শুধুই শ্লেষ? এক ধরনের অতলান্তি বিষাদ, গ্লানি ও আত্মধিকারও তো এতে ধবনিত হচ্ছে; জয়ী হলে এই পৃথিবীকেই তো কৌরবরা নিজেরা পেতেন, যাতে ভোগ করবার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, যার কোনও ঐশ্বর্য, কোনও গৌরব নেই।

আশ্রমবাসিক পর্বে বনে চলে যাওয়ার আগেনিজের ও গান্ধারীর হয়ে ধৃতরাষ্ট্রযুধিষ্ঠিরকে বলছেন: বৃদ্ধোহয়ংহিতপুত্রোহয়ং দুঃখিতোহংয়ানরাধিপঃ/পূর্বরাজ্ঞাশ্চ পুত্রোহয়মিতি কৃত্বানুজানথি। ইয়ঞ্চ কৃপণা বৃদ্ধ হাতপুত্রা তপস্বিনী/গান্ধারী পুত্রশোকার্তা যুন্মান যাচতি বৈ ময়া। তেষামস্থিরবুন্ধীনাং লুব্ধানাং কামচারিণাম/কৃতে যাচেহাদ্য বঃ সর্বান গান্ধারীসহিতোহনঘান।— এই হাতপুত্র বৃদ্ধ রাজা, আমি পূর্ব রাজাদের বংশধর; এ কথা মনে রেখে আমাকে বনে যাওয়ার অনুমতি দাও। দুর্ভাগিনী অসহায় পুত্রশোকার্তা বৃদ্ধা গান্ধারী ও আমি, নির্দোষ তোমাদের কাছে মিনতি করছি।' (১৫:৯:৭-৯৯, বঙ্গবাসী) এখানে কবিত্বের সূত্রটি আছে প্রকরণে: অন্ধ বৃদ্ধ, রাজা ও রুদ্ধানয়না গান্ধারী, দুজনেই শতপুত্রের মৃত্যুতে মুহ্যমান, জীবনে বিতৃষ্ণ, পুত্রদের স্বেচ্ছাচারের গ্লানিতে পরম কুণ্ঠিত, বিজয়ী ভ্রাতুষ্পপুত্রদের কাছে দীন ভাবে শুধু একটি প্রার্থনাই করছেন: বাকি কটা দিন অরণ্যে বাস করব, সেই অনুমতিটুকু দাও। এর আর্তিও যেমন মর্মস্পর্শী, প্রার্থনার অকিঞ্চিৎকর দৈন্যও তেমনই।

মহাভারত-এর বহু চিরন্তন সত্যের প্রকাশ আছে অসংখ্য শ্লোকে; এগুলি নানা যুগের নানা অঞ্চলের ভূয়োদর্শিতার ফসল। এ প্রাজ্ঞভাষিতের কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বাঝা যাবে এক ধরনের নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনকে যাঁরা দেখতে পেরেছিলেন তাঁরাই সমকালের ক্ষুদ্র সমস্যাকে পেরিয়ে জীবনে কিছু মৌলিক সত্যে পৌঁছতে পেরেছিলেন। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির ভীমকে বলেন, 'যে রাজা অখিল পৃথিবীকে শাসন করবেন তীরও তো মাত্র একটিই উদর; কী তুমি যুদ্ধের প্রশংসা করছি, ভীম?–য ইমামখিলাং ভূমিং শিষ্যদেকো মহীপতিঃ /তস্যাপুদেরমেকং বৈ কিমিদং ত্বং প্রশংসসি।' (১২:১৭:৩) 'পাপ করে ফেলে নিজেকে অমানুষ মনে করা উচিত নয়; সূর্য যেমন রাত্রিশেষে উদিত হয়ে অন্ধকারকে বিনষ্ট করে তেমনই সৎকর্মের দ্বারা দুষ্কর্ম বিনষ্ট করা যায়।'

(১২:১৪০:৩১-৩৩) ‘কেউ এক খণ্ড কাঠের ওপর ভর করে গভীর মহানদী পেরিয়ে যাচ্ছে, সে তো কাষ্ঠখণ্ডটিকেও নদী পার করাচ্ছে।’ (১২:১৩৬:৬০) মহাসমুদ্রে যেমন দুটি কাষ্ঠখণ্ড ভাসতে ভাসতে কাছাকাছি আসে, আবার একটু পরে ভাসতে ভাসতে দুদিকে চলে যায়, এ পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগও সেই রকম–যথা কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতং মহোদধৌ/সমেত্য চ ব্যাপেয়তা তদ্বভুতঃ।। (১২:২৮:৩৬)

যুদ্ধের মহাকাব্য, যেখানে বিপদকে শিরে নিয়ে ক্ষত্রিয়ের জীবন কাটে সেখানে স্বভাবতই শুনি, ন সংশয়মনরুহ্য নরো ভদ্রাণি পশ্যাতি/সংশয়ং পুনরাবুহ্য যদি জীবতি পশ্যাতি।—সশংয়কে স্বীকার না করে কেউ মঙ্গল লাভ করে না; সংশয় পেরিয়ে যদি বেঁচে থাকে। তবেই মঙ্গলের দেখা পায়।’ (১২:১৩৮:৩৪) কোন শত্রু সবচেয়ে ভয়াবহ এ বিষয় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, ‘সাহস ভরে যারা যুদ্ধে উদ্যত, যারা প্রাণের আশা একেবারে ছেড়েছে, তাদের সামনে দাঁড়বার সাধ্য স্বয়ং ইন্দ্রদেবেরও নেই–সাহাসোৎপতিতানাঞ্চ নিরাশানঞ্চ জীবিতে/ন শক্যমগ্রতঃ স্থাতুং শত্রুণাপি ধনঞ্জয়। (৯:৫৯:১৬ বঙ্গবাসী) অনুরূপ কথা, পুনে সংশোধিত সংস্করণে উশনা-গীতায়: পুনরাবর্তমানাং ভগ্নানাং জীবি তৈষিণাম/ ভেতব্যমরিশেষাণামেকায়নগতা হি তে।’ (৯:৫৭:১৩)। পিতৃহত্যায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ অশ্বত্থামাকে কৃপ যখন রাত্রে ঘুমোতে বললেন তখন অশ্বত্থামা বললেন, ‘আতুর, ক্রুদ্ধ, অর্থচিন্তাকারী বা প্রেমার্ত মানুষের ঘুম কই?–আতুরস্য কুতো নিদ্রা নরস্যামর্ষিতস্য চ/অর্থাংশ্চিন্তয়তশচাপি কাময়ানস্য বা পুনঃ।। (১০:৪:২১) দ্রোণপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের অনুশোচনা শুনে সঞ্জয় বললেন, ‘এখন অনুতাপে কী হবে? প্লাবন ভেঙে আসবার পর সেতু বাঁধবোদর চেষ্টার মতোই নির্ম্মফল এ বিলাপ—গতোদিকে সেতুবন্ধো যাদৃগয়ং তব/বিলাপে নির্ম্মফলো রা েজন মা শুচ ভারতীর্ষভ।’ (৭:৬২:২) জনক রাজা বলেন, ‘আমার সম্পদ অনন্ত, কারণ

আমার কিছুই নেই; আমার রাজধানী মিথিলা নগরী দগ্ধ হলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না–অনন্তং বাত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন/মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহতি কিঞ্চন।’ (১২:২৩:১৫ বঙ্গবাসী) ‘অন্যমনস্কে ফুল তুলছে যে মানুষটি, মৃত্যু তাকেও সহসা গ্রাস করে, যেমন নেকড়ে বাঘ টেনে নিয়ে যায় ভেড়ার ছানাকে–পুষ্পাণীব বিচিন্বন্তমন্যত্র গতমানসম/বৃকীবোরণমাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি।’ (১২:১৭৫:১৩ বঙ্গবাসী) ‘বুড়ো মানুষের চুল, দাঁত, চোখ, কান জীর্ণ হয় না, জীর্ণ হয়। শুধু তৃষ্ণ–জীর্যন্তি জীর্যতঃ কেশা দন্তী জীর্যন্তি জীর্যতঃ/চক্ষুঃশ্রোত্রে চ জীর্য্যেতে তৃষ্ণৈক নতু জীর্যতে।’ (১৩:২০:২১ বঙ্গবাসী) অপ্রিয় অথচ হিতকর কথার বক্তাও দুর্লভ, শ্রোতও দুর্লভ— প্রিয়স্য হি পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ’ (২:৬৪:১৭ বঙ্গবাসী) বাল্যবন্ধু দুপদ রাজা হলে পর দ্রোণ রাজসভায় গিয়ে তাঁকে ‘সখা’ সম্বোধন করে কথা বলতে শুরু করতেই দ্রুপদ থামিয়ে দিয়ে বললেন: ‘ন দরিদ্রো বসুমতো নাবিদ্বান বিদুষঃ সখা/কুরস্য ন সখা কীবঃ সখিপূর্বং কিমিষ্যতে।।–দরিদ্র কখনও ধনীর বন্ধু হয় না, অপণ্ডিত পণ্ডিতের বা নিবীর্যবীরের সখা হয় না; তুমি সখা’ সম্বোধন করতে চাইছ কেন?’ (১:১২২:৭) জীবনে মানুষকে অনুরূপ অভিজ্ঞতার সামনে রবার আসতে হয়, কিন্তু এখানে কী নিরাবরণ নিষ্ঠুর প্রকাশ সে সত্যের। এমনই জীবনের নানা ক্ষেত্র, নানা সংকট ও অবস্থা সম্বন্ধে ভুয়োদশীদের অসংখ্য প্রাজ্ঞভাষিত ছড়িয়ে আছে সারা মহাভারত-এ।

এ পর্যন্ত দেখা গেল মহাভারত-এ নানা ধরনের কবিত্ব পরিমাণগত ভাবে কত প্রচুর এবং কাব্যমর্যাদায় কত সমৃদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এত অজস্র উদাহরণ আছে যে নির্বাচন করাই দুঃসাধ্য, তাই অল্প কয়েকটি উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হতে হল। এই যে এ পর্যন্ত যা দেখানো হল তা প্রায় মহাকাব্যেই অল্পবিস্তর আছে এবং তার দ্বারা মহাভারত-এর কাব্যত্বই প্রতিপন্ন হয়, মহাকাব্যত্ব নয়। মহাভারত-এর প্রকৃত উৎকর্ষ অন্যত্র।

এই উৎকর্ষের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলে প্রথমেই চোখে পড়ে যে মহাভারত-এ মূল ক্ষত্রিয়কাহিনিতে ঘটনার মধ্যে অতিলৌকিকতার কোনও প্রভাবই নেই। ইলিয়াড-এর সঙ্গে এখানে মহাভারতে প্রকাণ্ড একটা প্রভেদ আছে। যদিও ইলিয়াড-এর ঘটনার গতি অতিলৌকিকতাকে বাদ দিয়েও একই খাতে প্রবাহিত হতে পারত তথাপি ইলিয়াড-এর কাহিনির মধ্যে দেবতাদের হস্তক্ষেপ ওতপ্রোত ভাবে অনুসূদৃত হয় আছে। মহাভারত-এ তৃতীয় অংশে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে দেবতারা খুব প্রত্যক্ষ ভাবেই বিদ্যমান এবং কখনও কখনও নেপথ্য থেকে ঘটনার কর্ণধারের ভূমিকাতেও দেখা দিচ্ছেন। কিন্তু যেহেতু মূল মহাকাব্য রচনার অনেক পরবর্তী কালের সংযোজন। এ অংশ, সে জন্যে এই অতিলৌকিক উপাখ্যানগুলি কাহিনির মর্মে প্রবেশ করেনি। তাই মূল (ক্ষত্রিয়) কাহিনি একান্ত ভাবে দেবতানিরপেক্ষ ও মানবিক সীমার মধ্যে নিহিত। ফলে দেবতার ভূমিকা মূল কাহিনির ক্ষেত্রে আগন্তুক বা আপতিক এবং সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য। মানুষের চরিত্রের অন্তর্নিহিত শুভ ও অশুভবুদ্ধি, নৈতিক জয়পরাজয়ই কাহিনিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। শেষতম ব্রাহ্মণ্য সংযোজনেই কৃষ্ণ প্রবেশ করেন মহাভারত-এ, প্রধান দেবতারূপে। মূল মহাকাব্যে তিনি পাণ্ডবদের সখা, অর্জুনের পরম সুহৃদ ও যুদ্ধক্ষেত্রে সারথি। এ কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা, যদুবংশের বৃষ্ণিবীর; মানবিক পরিসরের বাইরে এর কোনও অস্তিত্ব তখনও ছিল না, এবং ক্ষত্রিয়কাহিনিতে তার কোনও প্রয়োজনও ছিল না (লক্ষণীয় অপর ক্ষত্রিয় মহাকাব্য রামায়ণ-ও তার আদিমতম রূপে সম্পূর্ণ ভাবে মানবিক। আদিকাণ্ডে তার নায়ক নির্বাচন প্রসঙ্গে শুনি, যে সব গুণ এ নায়কের প্রয়োজন তা দেবতাদের মধ্যেও দুর্লভ, তাই এতে রইল নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রের কাহিনি)। মহাকাব্যের প্রকৃত তাৎপর্যই তো এখানে; সে মানুষের সমস্যা মানুষেরই নৈতিক আত্মিক ও আবেগনিষ্ঠ উপলব্ধির সাক্ষ্য বহন করে, সেই জন্যেই এক যুগের কাহিনি সর্বযুগের আত্মিক সম্পদের ভাণ্ডার হয়ে ওঠে। মহাভারতে কৃষ্ণ প্রধান দেবতারূপে অবতীর্ণ

হওয়ার পর জয়-পরাজয় আর বীরনিষ্ঠ রইল না, কৃষ্ণনিষ্ঠ হয়ে উঠল: যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ। ক্ষত্রিয়ের নীতি পদদলিত হল; কৃষ্ণের পরামর্শে প্রত্যেকটি কৌরব মহারথীকে অন্যায়-সমরে প্রাণ দিতে হল। মানবিক ও ক্ষত্রনীতির ওপরে আরোপিত হল অন্য এক নীতি: কৃষ্ণই পরিমাপক হলেন ন্যায়-অন্যায়ের, নিয়ামক হলেন শুভ-অশুভের। মানবায়ত্ত মূল্যবোধ কৃষ্ণে প্রতিহত হল। বর্তমান প্রবন্ধ মূল ক্ষত্রিয় কাহিনিকে অবলম্বন করে রচিত, তাই কৃষ্ণ মহাকাব্যে দেবাতিদেব ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহাভারতের যে রূপটি ছিল তারই বিশ্লেষণ। এ প্রবন্ধে।

যদিও মহাকাব্যটি যুদ্ধকেন্দ্রিক তবু এর অন্তর্গঢ় রসটি বীর বা রৌদ্র নয়। আনন্তবর্ধন বলেছেন মহাভারতের মূল রসটি শান্তরস (এই তথ্যটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি অধ্যাপক হেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী)। এ কুব্যের এতটা অংশ জুড়ে যুদ্ধ-হানাহানি আছে যে এর মূল রসকে শান্ত বললে সহসা বিস্মিত লাগে। কিন্তু তলিয়ে ভাবলেই এ কথার তাৎপর্যস্পষ্ট হয়। মূল মহাকাব্যের ঘটনাতে যুদ্ধ, কিন্তু ক্রান্তদশী কবির যে নির্ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কাব্যটি জন্ম নিয়েছে যুদ্ধ সেখানে নিতান্তই বহিরঙ্গ, যে ধীর ও গভীর দৃষ্টিতে সেখানে জীবন-পর্যবেক্ষণ তা শাস্তবসেই গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আপাত-প্রতীয়মান স্তরে যুদ্ধ এখানে নিন্দিত এবং আরও গভীর স্তরে কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম যেখানে মানুষের চিত্তপটে শ্রেয় ও প্রেয়ের সংঘাতের প্রতীক, সেখানেও শেষ পর্যন্ত রস তো শান্তই। এ সংগ্রাম চিত্তের গভীরে অনুষ্ঠিত হয়, এর জয় পরাজয় নৈতিক এবং যে সমাহিত জীবনবোধে এর পর্যবসান তা যথার্থই শান্তরসেরই অনুষঙ্গ বহন করে।

মহাভারত-এর চবিত্রচিত্রণে কয়েকটি বৈশিষ্ট চোখে পড়ে। প্রথম বৈশিষ্ট্যটিকে এক কথায় বলা যেতে পারে বাস্তবানুগতি; কারণ জীবনে যেমন, মহাভারত-

এও তেমনই, অবিমিশ্র ভাল বা অবিমিশ্র মন্দ চরিত্র নেই। দুটি মাত্র ব্যতিক্রম; বিদুর ও শকুনি; যেমন জীবনেও লক্ষ্যে এমন ব্যতিক্রম হয়তো বা দু একটি দেখা যায়। নায়কের ভূমিকায় আমরা হয়তো নিজের অগোচরে অবিমিশ্র ভাল চরিত্রই আশা করি; কিন্তু মহাভারত-এ তেমন চরিত্র নেই। না, যুধিষ্ঠীরও নয়; যদিও ব্রাহ্মাণ্য সংযোজনের গ্রন্থকার একমাত্র তাকেই সশরীরের স্বর্গে নিয়ে গেছেন। শাস্ত্রে দূতক্রীড়াকে ব্যাসন বলা হয়েছে; সে দিক থেকে পাশা খেলায় আসক্তি তার অপরাধ। তাছাড়াও শুধু যে দ্রোণাচার্যকে প্রাণঘাতী মিথ্যা বলেছিলেন তা নয়, পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রীকে এক পণ রাখবার অধিকারও তার ছিল না। এ সব ছাড়া আরও ছোটখাট ত্রুটি হয়তো তার চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়; অন্যদের ক্ষেত্রে এ কথা আরও সত্য। কিন্তু ভাল-মন্দে দোষেগুণে মিলিয়ে চরিত্রসৃষ্টি এ তো রামায়ণ, ইলিয়াড ও অন্যান্য কয়েকটি মহাকাব্যেও আছে। কারণ এ ভাবে উপস্থাপিত করলে তবেই চরিত্রগুলি শ্রোতা বা পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, পাঠকের বুদ্ধি এবং আবেগের সংবেদন সহজে চরিত্রগুলিকে ঘিরে আবর্তিত হতে পারে।

মহাভারত-এ চরিত্রচিত্রণের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর প্রত্যেক মুখ্য চরিত্রই দ্বিধাগ্রস্ত। এখানেও ব্যতিক্রম ওই বিদুর ও শকুনি। অন্যান্য মুখ্য চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন এবং প্রত্যেকেই এক নিজের বোধ ও বুদ্ধি দিয়ে সমস্যার সমাধান করেছে। এই দ্বিধা কোথাও ভাল ও মন্দের মধ্যে, শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে, কোথাও বা শ্রেয় ও শ্রেয়স্তরের মধ্যে। ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব পুত্রস্নেহ ও ন্যায়বিচারের মধ্যে, অর্থাৎ শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে। তিনি হেরে গেছেন নৈতিক সংগ্রামে; সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় পরাজয় মেনে নিয়েছেন। গান্ধারী একই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে হার মানেনি; বিদুর ও সঞ্জয়ের মতো তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রকে কর্তব্য সচেতন করে দিতে চেয়েছেন। পারেননি–এই তাঁর মর্মন্তুদ ব্যর্থতা ও বেদনা। বিদুর, সঞ্জয়, গান্ধারী ও যুধিষ্ঠির মিলে মহাভারত রচনার প্রথম পর্বে ধর্মের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে এলেন কৃষ্ণ; সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের এক মাত্রা যুক্ত হল মহাভারত-এ। যুধিষ্ঠিরের দ্বন্দ্ব ক্ষত্রিধর্ম ও মানবধর্মের সংঘাত, অর্থাৎ শ্রেয় ও শ্রেয়স্তরের সংঘাত। দুটিই ধর্ম, কোনও একটিকে বেছে নিলেই তিনি নিন্দনীয় হন না, অপরাধীও হন না। কিন্তু বুদ্ধোত্তর ভারতে বেছে নেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে: ক্ষত্রিয়কুলে জন্মে যিনি মনেপ্রাণে যথার্থ অহিংস এবং অহিংসাকেই যিনি শ্রেয়স্তর জ্ঞান করেন তার অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্যিই মর্মস্তিক। সিংহাসনে অধিকার যতই বিসংবাদিত হোক সে অধিকার সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্যকর্তব্য। এতাবৎকাে‍ল সব ক্ষত্রিয়ই এই নীতি মেনে বিনা দ্বিধায় যুদ্ধ করেছেন; কেউ জিতেছেন, কেউ বা হেরেছেন, তবে দুটিই শুভ পরিণতি, কারণ, জয়ে স্যাদ্বিপুল পৃথী/ধ্রুবঃ স্বর্গং পরাজয়ে।'' (৮:৮৪:১৫) কালেকুলা, এলসিডি, নিবেলুঙ্গেনলিড, ঈনীড, ইলিয়াড, এমনকী অডিসি-তেও এই অধিকারের জন্যে সংগ্রাম এবং শৌর্য্যধর্মে এ সংগ্রাম অবশ্যকর্তব্য। যুধিষ্ঠিরের সমস্যা হল তার অন্তর্নিহিত মানবিকতা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী এবং আত্মীয়কুলের রক্ত পেরিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করাটাকে কোনও মতেই ন্যায়ধর্ম বলে স্বীকার করতে পারছে না। রাজ্যে অধিকার তাই তার কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে। তাই উভয়পক্ষ যখন যুদ্ধে উদ্যত, শুধু শঙ্খধ্বনি হলেই যুদ্ধ শুরু হবে, তখন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, জয়লাভ হলে যিনি সিংহাসনটি পাবেন তিনি ছুটে গিয়ে আচার্যদের পায়ে পড়ছেন: এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করুন। পারলেন না রক্তপাত রোধ করতে; তাই যুদ্ধের শেষে দুর্যোধনের মৃত্যুর সময়ে অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে দুর্যোধনকে বলছেন: 'নাত্মানুশোচনীয়স্তে শ্লাঘ্যো মৃত্যুস্তবাধুনা/ বয়মেবাধুনা শোচ্যাঃ সর্বাবস্থাসু কৌরব।—'দুর্যোধন, তুমি অনুশোচনায় কষ্ট পেও না, তোমার মৃত্যু তো বরণীয়, এখন আমরাই সর্ব অবস্থায় শোচনীয় হয়ে রইলাম।' (৯:৫৯:২৭ বঙ্গবাসী) এই অন্তর্দ্বন্দ্ব অল্পকালের জন্যে অর্জুনকেও স্পর্শ করেছিল, যুদ্ধের

অব্যবহিত পূর্বক্ষণে। শ্রীকৃষ্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা ও অতিলৌকিক জাদু দিয়ে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে অর্জুনের অন্তঃ সংঘাতের অবসান ঘটান।

কুন্তীর অন্তর্দাহের গভীর যন্ত্রণা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলে এসেছিলেন জ্যেষ্ঠ কানীন পুত্র কর্ণের কাছে, যাঁর সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত তাঁর পাণ্ডব পুত্ররা; কর্ণ তাঁর অনুরোধ রাখেননি। তাই কি যুধিষ্ঠির সিংহাসন লাভ করলে হাতপুত্রা কর্ণমাতা হাতপুত্রা গান্ধারীর সঙ্গে আশ্রমবাসে গেলেন? কর্ণ তাঁর সূতকুলে জন্ম যেন মনে থেকে মেনে নিতে পারেননি। তার অন্তরে বহুবিধ সংঘাত, দুর্যোধনের থেকে তিনি নিজেকে শৌর্যবান ও কৃতী মনে করতেন, অথচ জন্মসত্ত্বে তার হীন পরিচয়, পদে পদে তা নিয়ে লাঞ্ছনা। ভীষ্মের চেয়ে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলে মনে করতেন, অথচ ভীষ্ম, দ্রোণের মৃত্যু না হলে সেনাপতি হতে পারবেন না। সহজাত কবচকুণ্ডল ইন্দ্র হরণ করলেন, দানবীররূপে কর্ণের অভিমানের সুযোগ নিয়ে, তার মাথার ওপরে খঙ্গের মতো উদ্যত ছিল গুরু পরশুরামের অভিশাপ। কর্ণ যেন নিজের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা জানতেনই এবং এই জানার পরিপ্রেক্ষিতেই উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। তাঁর অতুলনীয় বীরত্ব। পরাজয় আসন্ন জেনেও দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ না করাতেই নৈতিক সংগ্রামে তাঁর জয়ের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। কর্ণতাঁর দানবীরত্বের, যোদ্ধা হিসেবে তাঁর যোগ্যতার বা শৌর্যের কোনও মর্যাদাই পাননি।

দ্রোণ শক্তিমানের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন দ্রুপদের ওপরে প্রতিশোধ নিতে; পরে শক্তিমান অন্যায়কারী জেনেও আর পক্ষত্যাগ করতে পারেননি। প্রিয়শিষ্য অর্জুনের অভিমান দূর করতে একলব্যকে নিষ্ঠুর শাস্তি দেন, হয়তো বিবেকের বিরুদ্ধেই। যুদ্ধের আরম্ভে তাঁকে অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত হতে দেখি।

ভীষ্ম প্রথম জীবন থেকেই নৈতিক সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছিলেন; পিতাকে সুখী করতে নিজের সব সুখের সম্ভাবনা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন, শ্রেয় এবং প্রেয়ের দ্বন্দ্বে জয়ী হন। পরে সত্যবতীর অনুরোধেও প্রতিজ্ঞাচ্যুত হননি। জীবন তাঁকে বিশেষ কিছুই দেয়নি, ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদের অভিভাবকের পদটি ছাড়া এবং এখানেই তার ব্যর্থতার সূচনা–দুর্যোধন যে ন্যায়নীতি বর্জন করেছেন, ধৃতরাষ্ট্র যে অন্ধ পিতৃস্নেহে অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছেন এ সব জেনেও তিনি তাঁদের সঙ্গেই রইলেন। কৌমার্যটুকু অক্ষুন্ন রাখা ও মাঝে মাঝে সৎপরামর্শ দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনও কৃতিত্ব নেই। মহাকাব্যে তাঁর ভূমিকা প্রায় নেপথ্যেই রইল, তাঁর সৎপরামর্শে কেউ কোনও দিন কর্ণপাতও করেনি। বস্তুত, আশ্রমবাসই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, তাতে তিনি অন্যায়ের সাহচর্য এড়াতে পারতেন। সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থেই তিনি দুর্যোধনের সহকারী হলেন, ধৃতরাষ্ট্রের নৈতিক অন্ধত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন। এই সব অপরাধের তীক্ষ্ণ অনুশোচনায় তাঁর শরশয্যা তো পাতা হয়েছে বহু দিন পূর্বেই।

কুন্তী রাজমাতা রাজবধু, কিন্তু তীরও জীবন কেটেছে গ্লানি ও বঞ্চনায়। মাদ্রী ব্যর্থযৌবনা তরুণী, সুন্দরী রাজবধূ; অকালে সহমৃতা হলেন বিনা দোষে, কিন্তু স্বেচ্ছায়। মহাকাব্যের আদিতেই সত্যবতীকে কেন্দ্র করে ভাগ্যের নিষ্কারুণ পরিহাস সুপরিস্ফুট। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা যা নিয়ে ঘটল–সিংহাসনে অধিকার—-আরম্ভ থেকে সে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলে ভাগ্যের বিদ্রুপ বোঝা যায়। সত্যবতীকে কামনা করলেন শান্তনু; সুযোগ বুঝে সত্যবতী দাবি করলেন, তাঁর পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হবে। শান্তনু ক্ষুব্ধ হলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবব্রতকে কোন অপরাধে বঞ্চিত করবেন তার ন্যায্য অধিকার থেকে? এ সমস্যার সমাধান করলেন দেবব্রত নিজেই, আমরণ কুমার থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এই নিষ্ঠুর মূল্যে পাওয়া অধিকার কী ভোগ করতে পারলেন

সত্যবতী? চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্যের জননী কত দিন দুটি তরুণী বিধবা পুত্রবধু নিয়ে প্রাসাদে ব্যর্থ দিন যাপন করলেন। কিন্তু কী অদম্য আকৃতি তাঁর রাজমাতা হওয়ার! সংকোচ ত্যাগ করে সেই বঞ্চিত ভীষ্মকেই অনুরোধ করলেন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী দিতে; ভীষ্ম অসম্মত হলে ব্যাস। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বা পাণ্ডু কারও ঔরসপুত্রই তো শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে এলেন না, এলেন কুন্তীর গর্ভের ক্ষেত্রজ পুত্র যুধিষ্ঠির।

দ্রৌপদী রাজনন্দিনী, রাজকুলবধু, পঞ্চ মহাবীরের পত্নী, দুরুহ এক সমদর্শিতার পরীক্ষা তাকে দিতে হয়েছে। সারা জীবন ধরে। তাঁর মনে ক্ষত্রিয় বীর সম্বন্ধে যে আদর্শ ছিল স্বামীদের আচরণে তার নানা ব্যত্যয় দেখে তিনি বারে বারে প্রতিবাদ করেছেন, ফলে প্রচলিত অর্থে পতিব্রতা ধর্মের সঙ্গে তাঁর চরিত্রগত বিরোধ ছিল। প্রয়োজন মতো স্বামীদের, এমনকী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও, তিনি ভর্ৎসনা করেছেন। প্রচণ্ড অপমান সহ্য করেছেন অসাহায়ের মতে: নাথবতী অনাথবৎ। জীবন কি অর্থহীন বোধ হয়নি এই তেজস্বিনীবীরাঙ্গনার কাছে? তার বহু উক্তিতে তাঁর অন্তর্দাহের তীব্র জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে।

দেখতে পাচ্ছি, মহাভারত-এ কোনও চরিত্রই চরিতার্থ নয়। যা তারা চেয়েছেন তা কেউই পাননি, অথবা যখন যেমন ভাবে চেয়েছেন তখন তেমন ভাবে পাননি। সেই দিক থেকে দুর্যোধনের মৃত্যুবরণ যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন লাভের চেয়ে অনেক সহজ ছিল। দুর্যোধন প্রথম থেকেই জানতেন জয়ের কোনও আশাই নেই তাদের পক্ষে। শৈশব থেকেই ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র বারংবার পাণ্ডবদের কাছে শৌর্যে পরাহত হয়েছে। দুর্যোধন রাজপুত্র, সিংহাসনে তাঁর এ রকম দাবি ছিলই। সে দাবির স্বীকৃতির জন্যে তিনি আমরণ যুদ্ধ করে গেছেন। দ্যুতসভার প্রকাণ্ড অন্যায় অনুষ্ঠানের পর থেকেই তাঁর বিবেক নীরব হয়েছে, কাজেই যুদ্ধক্ষেত্রে তার নতুন কোনও নৈতিক সমস্যা ছিল না, ক্ষত্রিয়বীরের মতো যুদ্ধ করেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন এবং প্রত্যেক কৌরব

মহারথীর মতো অন্যায় সমরেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। যুদ্ধের পূর্বে দু'পক্ষই প্রতিশ্রুত ছিলেন, প্রতিপক্ষ সময় চাইলে তাকে আক্রমণ করবেন না এবং কখনওই অধোনাভি আঘাত করবেন না। কর্ণ সময় চেয়ে পাননি; ভীষ্ম অস্ত্রত্যাগ করলেন অর্জুনের রথে শিখণ্ডিকে দেখে, কারণ ক্ষত্রিয় স্ত্রীহত্যা করে না; দ্রোণ পুত্রের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে অস্ত্রত্যাগ করেন; ক্লান্ত দুর্যোধনকে দ্বৈপায়ন হ্রদ থেকে বিদ্রাপবাণে জর্জরিত করে তুলে এনে অধোনাভি আঘাত করে হত্যা করা হল।

বিদুর ও সঞ্জয়ও ব্যর্থ চরিত্র, ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠাকল্পে এঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থকাম হন। শকুনিও ব্যর্থ; সিংহাসনে দুর্য্যোধনের অধিকার প্রতিষ্ঠা তো হলই না, সমগ্র কুরুকুলই ধ্বংস হল। ব্যাসের পৌত্ররাই কৌরব-পাণ্ডবদেপে দু'পক্ষে যুধ্যমান এবং ব্যস নিজে সে কাহিনি রচনা করেছেন! সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনে কী দুঃসহ গ্লানি। সব মুখ্য চরিত্রের জীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত এবং এইখানে রামায়ণ, অডিসি, ইলিয়াড, নিবেলুঙ্গেনলিড ও গিলগামেশ-এর সঙ্গে মহাভারত-এর মিল: স্বল্প সুখভোগের পরেই দুঃখের ছায়া নেমে আসে প্রত্যেকটি নায়কের জীবনে। কারণ, মহৎ কাব্য সুখ দিয়ে সৃষ্ট হয় না, সুখে জীবনজিজ্ঞাসা নেই। এবং এই জীবনজিজ্ঞাসাতেই কাব্য প্রকৃত তাৎপর্য লাভ করে, সমকালকে অতিক্রম করে সর্বদেশের, সর্বকালের মানুষের কাছে কথা বলতে পারে।

কী সেই কথা? না, জীবনের অর্থ কী, কেন বাঁচি। তলিয়ে ভাবলে জীবনের নিজস্ব ও আত্যন্তিক কোনও মূল্যই নেই। কিন্তু এ কথা স্বীকার করা মাত্রই মানুষ অন্য একটি দুরতিক্রম্য দায়িত্বের সম্মুখীন হয়, তা হল: জীবনকে অর্থবহ করে তোলাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। এই দায়িত্ব যে যত পরিমাণে পালন করতে পেরেছে, তার মনুষ্যজীবন ততটাই সার্থক। মনে পড়ে, মহাভারত-এর

বনপর্বের সেই উপাখ্যান, যেখানে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবীর সন্ধানে বেরিয়ে চিরঞ্জীব মার্কণ্ডেয় এলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে। তাঁর নির্দেশে প্রাবারকর্ণ উলুকের কাছে। সেখান থেকে নাড়ীজঙ্ঘ বকের কাছে এবং তার নির্দেশে অকুপার কচ্ছপের কাছে। অবশেষে অমরতার একটি সংজ্ঞা পাওয়া গেল: দিবং স্পশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যস্য কর্মণঃ/যাবৎ স শব্দে ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে।–পুণ্যকাজ বা সুকৃতির যশোধ্বনি আকাশ ও পৃথিবীকে স্পর্শ করে, সে শব্দ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই পুরুষ পুরুষ বলে অভিহিত হয়।' (৩:১৯৮:১৩) শুভকাজ, মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর কাজের দ্বারাই মানুষ অমরত্ব লাভ করে এবং সে পুণ্য বা শুভকর্মের স্মৃতি যতদিন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে ততদিনই শুভকারী অমর।

চরিত্রচিত্রণে মহাভারত-এর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, প্রত্যেক মুখ্য চরিত্রই ব্যর্থকাম, ভাগ্যের হাতে নিপীড়িত, অনেকটা গ্রিক নাটকের নায়কের মতো। অথচ গ্রিক মহাকাব্যের মতো দেবতারা এখানে মুখ্য ঘটনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সক্রিয় নন; অন্তত মূল ক্ষত্রিয়কাহিনিতে তো নয়ই। এখানে মানুষ নিজের কৃত ন্যায়-অন্যায়ের ফল ভোগ করে, জয়-পরাজয় দেবতাদের পক্ষপাতিত্বে নির্ণীত হয় না। দেবতাদের মধ্যস্থতা বা হস্তক্ষেপের সব কটি কাহিনিই পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে আছে। কিন্তু মূল কাহিনির সব মুখ্য চরিত্র সম্বন্ধেই বলা চলে তারা যা চেয়েছিলেন তা পাননি এবং প্রত্যেকেই গভীর নিষ্প্রতীকার মর্মযন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন। ভবভূতির ভাষায় আমাদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, ভগবান ব্যাস, এবং কিং তে কাব্যার্থঃ?' এই কি তোমার কাব্যার্থ? এই নিরন্ত অতল ব্যর্থতা দেখাবার জন্যেই কী এ মহাকাব্যের অবতারণা? এক অর্থে সত্যই এ-ই মহাভারত-এর প্রতিপাদ্য। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে, 'মানুষের জীবনকে দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে/ডান হাতে পূর্ণ কর, সুধা/বামহাতে চুর্ণ কর পাত্র/দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে/মহৎ জীবনে যার অধিকার।' (পৃথিবী, পত্রপুট)

কিন্তু মহাভারত শুধু ব্যর্থতাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে আড়াই হাজার বছর ধরে এই অমান মহিমায় এ কাব্য ভারতবর্ষের চিত্তলোকে বিরাজ করত না। এই অতল ব্যর্থতার সঙ্গে আরও দুটি বস্তু আছে। একটি হল, প্রত্যেক মুখ্য চরিত্রই একান্ত নিঃসঙ্গ। অর্জুন, চরিত্রের দিক থেকে যাঁর গৌরব বেশি নেই, একমাত্র তিনিই পেয়েছিলেন একটি অন্তরঙ্গ সুহৃৎকে, কৃষ্ণকে তিনি মনের কথা বলতে পারতেন। কিন্তু আর সকলেই একাকী; ইংরেজিতে যাকে বলে ট্র্যাজিক আইসোলেশন, তা এদের জীবনের প্রথম থেকেই আছে। কুন্তী প্রথম দিকেই পাণ্ডু ও মাদ্রীকে হারালেন, আর সকলেই মনের দিকে তার দূরের মানুষ। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর মধ্যে বিবেকের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, তার দু'পারে দু'জনেই একা। দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ আপনি আপন ভূমিকায় স্বতন্ত্র ভাবে নিঃসঙ্গ; তাঁদের মনের কাছাকাছি কেউ নেই। যুধিষ্ঠির যে-অন্তর্দ্বান্দ্বে বিক্ষত তাকে বোঝবার সাধ্যই তাঁর আশপাশের কারও ছিল না, সাহচর্য দেওয়া তো দূরের কথা। পঞ্চ মহাবীরের বধু দ্রৌপদী স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ্যভেদী অর্জুনের কণ্ঠে মাল্যদান করবার সময়ে ওষ্ঠে স্মিতহাস্য ও হাতে শ্বেতপুষ্পমালাটি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তার চাওয়া ও পাওয়ার মিল হল না, তার নিঃসঙ্গতা হয়ে রইল অপরিমেয়।

এই ব্যর্থতাবোধ, এই গভীর নিঃসঙ্গতা এর অবতারণা করবার সার্থকতা কী? নিঃসংশয়ে বলা চলে মহাকবি এ সব দেখাতেন না। যদি না এ সব অতিক্রম করে আরও কিছু দেখাবার অভীপ্সা ও সাধ্য তার থাকত। মহাকাব্যটি যে স্তরে গিয়ে এ সবকে অতিক্রম করেছে। সেখানেই সে মহত্ব ও ভারবত্ব অর্জন করে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। শান্তিপর্বে নিঃসঙ্গতার প্রসঙ্গে একবার শুনি, শুয়তে ত্রিলোককৃত ব্রহ্মা প্রভুরোকাকী তিষ্ঠিতী–'শোনা যায় ত্রিভুবনের স্রষ্টা ব্রহ্মা একাকী বিরাজ করেন।' এ হল তুষারমৌলি হিমালয়ের একাকিস্তত্ব; যে-মানুষ পৃথিবীকে বরণীয় কিছু দেয়। তারও নিত্যসঙ্গী এই একাকিত্ব। একাকিত্ব দেখানোর একটি স্মরণীয় প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে: যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির নৈতিক

দ্বিধায় দোলাচলচিত্ত, রাজা হয়ে সিংহাসন ভোগ করতে অনীহা তার। নিজের অপরাধবোধ ও রাজত্বে অনীহা প্রকাশ করলে ভীমসেন তাকে বললেন: 'যত্র নাস্তি শরেঃ ন মিত্রৈনাচ বন্ধুভিঃ/আত্মনৈকেন যোদ্ধব্যং তত্ত্বে যুদ্ধং সমায়াতম.এতজ্জিত্বা মহারাজ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি।–'যে যুদ্ধেশরনিক্ষেপ নিস্ফল, মিত্র, বন্ধু থেকেও লাভ নেই, সে যুদ্ধ উপস্থিত। এ যুদ্ধে জয়লাভ করে তবেই তুমি কৃতকাম্য হবে।' (১২.১৬.২১, ২২)

চরিতার্থতার এই সংজ্ঞা মহাভারত-এ: সকলের অলক্ষ্যে নিজের বিবেকের সঙ্গে একক সংগ্রামে জয়লাভ করা। এই যুদ্ধই এ মহাকাব্যে চরম ও অন্তিম যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে যুধিষ্ঠির এ যুদ্ধের সম্মুখীন হলেন; আগেও হয়েছিলেন, কিন্তু এই শেষবার। প্রত্যেক প্রধান চরিত্রের জীবনেই বাইরে রণক্ষেত্রের যুদ্ধের চেয়ে এটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম। প্রতিপক্ষ এখানে নিজের মধ্যেই বাস করে: লোভ, দম্ভ, ঈর্ষা, অহমিকা, নৈতিক অন্ধত্ব এসবের সঙ্গে যে সংগ্রাম সেখানে মানুষ সম্পূর্ণ একা; সে সংগ্রাম কঠোর, মরণাস্তিক। এই সংগ্রামের রূপায়ণের মধ্যে মহাভারত কাব্যমূল্যে চিরন্তন সমুজ্জ্বলতা অর্জন করেছে। সম্পূর্ণ অন্য এক ধরনের কাব্য নিহিত আছে এই স্তরে।

যুদ্ধের সময়ে ভীষ্ম কৌরব পক্ষ সমর্থন করেছেন, নিজে বীরের মতো যুদ্ধ করে বহু পাণ্ডব বীরকে হত্যা করেছেন। সেই ভীষ্ম মৃত্যুকালে দুর্যোধনকে বলছেন, 'যুদ্ধং মদন্তমেবাস্তু তাঁত সংশাম্য কৌরবৈঃ–আমার মৃত্যুর সঙ্গেই যুদ্ধ শেষ হোক, বৎস, কৌরবরা শান্ত হোক।' (৬:১১৬:৪৬) আরও বলেছেন– 'পৃথিব্যাং সর্বরাজানো ভবত্বদ্য নিরাময়াঃ–পৃথিবীর সব রাজা আজ রোগমুক্ত হোক।' (৬:১১৭:২) রোগ হল যুদ্ধের বাসনা। পিতামহ ও প্রথম সেনাপতি বৃদ্ধ ভীষ্ম ক্ষমা চাইলেন কর্ণের কাছে, রুষ্ট ভাবে তাকে কঠোর কথা বলার জন্যে; কর্ণ যুদ্ধ করার অনুমতি চাইলে বললেন, 'বলবীর্যকে আশ্রয় করে যুদ্ধ কর,

কিন্তু মনে কোনও অহংকার রেখো না–যুদ্ধস্ব নিরহংকারো বলবীর্যব্যপাশ্রয়ঃ'। ৬:১১৭:৩২) যুদ্ধে লোকক্ষয় দেখে আত্মগ্লনিতে তাঁর নিজের অহংকার চলে গেছে, সমস্ত বৈরভাব ঘুচে গেছে। জিঘাংসা, লোভ ও প্রতিহিংসাকে স্বরূপে দেখেছেন বলেই নম্র ভাবে উদ্ধত কর্ণের কাছে ক্ষমা চাইতে আজ তার বাধল না।

দ্রোণ মৃত্যুর আগে বলছেন, 'পাণ্ডবদের মঙ্গল হোক, আমি শস্ত্রত্যাগ করলাম।' (৭:১৬৫:২৫২) যিনি প্রবল বিক্রমে কৌরব সেনাপতির ভূমিকায় যুদ্ধ করেছেন দিনের পর দিন তিনি মৃত্যুর আগে 'একাগ্রচিত্ত হয়ে সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করলেন–অভয়ং সর্বভূতানাং প্রদোদ যোগযুক্তবান।' (৭:১৬৫:২৫) কর্ণের রথচক্র কাদায় বসে গেছে, সময় চেয়ে পেলেন না, 'ক্রোধে তাঁর চোখে জল এল— গ্রস্তচক্রস্তু রাধেয়ঃ কোপাদিশুণ্যবর্তয়াৎ।' (৮:৬৬:৬০)। দুর্যোধন নিজের সুখী ও কৃতী জীবন স্মরণ করে মৃত্যুকালে বারবার বললেন, 'আমার চেয়ে ভাল মৃত্যু আর কার?—কো নু স্বস্ততরো ময়া।' (৯:৬৩:১৯-২৫) কিন্তু প্রচণ্ড লোকক্ষয়ে তারও মনে দুঃখগ্লানি এসেছিল, তাই মৃত্যুর পূর্বাহ্নে জীবিত আত্মীয়দের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার সৌভাগ্য এই যে এই জনক্ষয় থেকে তোমরা কজন বেঁচে আছে দেখে যেতে পারছি।' (৯:৬৪:২৬) ধৃতরাষ্ট্র আগেই জানতেন যে পাণ্ডবদেরই জয় হবে। আদিপর্বে তার সেই দীর্ঘ বিলাপের ধ্রুবদই ছিল, 'তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।' কিন্তু যেটা জানতেন না তা হল যুদ্ধের অবসানে তার নিজের জীবনটাই তার কাছে অর্থহীন ও দুর্বহ হয়ে উঠবে। বলছেন, 'কিং নু বন্ধুবিহীনস্য জীবিতেন মমাদ্য বৈ/লুনপক্ষস্য ইব মে জরাজীর্ণস্য পক্ষিণঃ।–বন্ধুবিহীন অবস্থায় এই প্রাণটা দিয়ে আমার আর কী হবে? আমি যেন আজি ডানা-ভাঙা একটা বুড়ো পাখি।' (৯:১:১১)

অত্যন্ত দৃপ্ত, বলগর্বিত ভীম যুদ্ধের শেষে অধোনাভি আঘাত করে দুর্যোধনকে হত্যা করার জন্য গান্ধারীর কাছে ক্ষমা চাইছেন: 'অধর্মে যদি বা ধর্মন্ত্রাসাত্তাত্র ময়া কৃতঃ। আত্মানং ত্রাতৃকামেন তন্মে তং ক্ষপ্তমর্হাসি।–ধর্মই হোক। অর্ধমই হোক তখন যা করেছি তা ভয়ে, আত্মরক্ষার জন্যেই করেছি। আমার সে অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।' (১১:১৪:২) শৌর্যে দাম্ভিক ভীম আজাতাঁর প্রাণভয়ে আত্মরক্ষার জন্য কৃত অপরাধ স্বীকার করছেন, ক্ষমা চাইছেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির গান্ধারীকে বলছেন: 'পুত্রহস্তা নৃশংস হোহম। তব দেবি যুধিষ্ঠিরঃ/শাপার্হঃ পৃথিবীনাশ হেতুভুতঃশপস্ব মাম।— আমি নৃশংস, আপনার পুত্রদের হত্যাকারী যুধিষ্ঠির, পৃথিবীর ধ্বংসের নিমিত্ত আমি, আমি অভিশাপের যোগ্য, আমাকে অভিশাপ দিন।' (১১:১৫:৩) কোথায় রইল সারা জীবনের সঞ্চিত একটিমাত্র অভিমান— ধর্মপুত্রত্বের? নিজের পক্ষের রাজ্যলোভ দমন করতে না পারার সমস্ত দায় একা মাথা পেতে নিলেন। এই স্বীকারোক্তি বক্তা শ্রোতা উভয়ের পক্ষে মর্মন্তুদ; জীবনের নিরাবরণ রূপ যেন উদঘাটিত হল ধর্মপুত্রের আত্মসমালোচনার মধ্যে। যাঁকে পরম ধামিক বলে সকলে জেনেছিল, নিজেকে তিনি আজ অপরাধী বলে মেনে নিলেন। এ হল সত্যের নিরঞ্জন রূপ, যেমন কঠিন তেমনই উজ্জ্বল।

দ্রৌপদী, যিনি বীর ক্ষত্রিয় স্বামীদের নিরুদ্যম দেখে বারেবারে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়েছেন, পরুষবাক্যে তাঁদের ধিক্কার দিয়েছেন তিনিও আগে বুঝতে পারেননি যে যুদ্ধে জয় হলেও, পাঁচটি স্বামী জীবিত থাকলেও, সম্রাজ্ঞীপদে তাঁর প্রতিষ্ঠা আসন্ন হলেও জীবন তাঁর কাছে সর্বরিক্ততায় বিবর্ণ, মলিন হয়ে যাবে! গান্ধারীকে বলেছেন, 'কিং রাজ্যোন বৈ কার্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্মম–পুত্রহীনা আমার রাজ্য দিয়ে কী হবে?'(১১:১৫:১৩) সমস্ত কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার অন্তরালেও কী মর্মান্তিক বঞ্চনা ও ব্যর্থতা। মৃত দুর্যোধনের দেহের পাশে দাঁড়িয়ে গান্ধারী বলছেন, 'যুদ্ধে যাওয়ার আগে সে আমার কাছে জয়ের

আশীর্বাদ চাইতে এসেছিল— অস্মিন জ্ঞাতিসমুদ্ধর্ষে জয়মস্বমা ব্রবীতু মে।' (১১:১৭:৫) আমি পারিনি দিতে; বলেছিলাম যে পক্ষ ধর্ম, জয় সেই পক্ষেই। সেই সত্যনিষ্ঠা আজ মৃত পুত্রের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবার সময়ে মাতৃহৃদয়কে দুঃসহ যন্ত্রণা দিচ্ছে। যুদ্ধশেষে ধর্মনিষ্ঠা গান্ধারী।আজি কৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনও সংকোচ রাখলেন না। দুর্যোধনের সত্যকার স্বার্থও ছিল, দাবিও কতকটা ছিল, কিন্তু কৃষ্ণের তো তা ছিল না, তাই গান্ধারী বললেন: 'ব্যস্মাৎ পরম্পরং ঘ্নতো জ্ঞাি তয়ঃ কুবুপাণ্ডবাঃ/উপেক্ষিতাস্তে গোবিন্দ তস্মাদজ্ঞাতীন বধিষ্যষি।/হতজ্ঞাতির্হতামাত্যোহতপুত্রোবনেচরঃ/কুৎসিতেনভূপায়েননিধনং সমবাপ্স্যাসি।–জ্ঞাতি কুরুপাণ্ডবরা সকলে মারা যাবে। তোমরা জ্ঞাতিরা মৃত, অমাত্যেরা মৃত, পুত্রেরা মৃত এমন অবস্থায় বনে বিচরণ করতে করতে কুৎসিত ভাবে তোমার মৃত্যু হবে।' (১১:২৫:৪০, ৪১) এত কঠিন কথা গান্ধারী কখনও বলেননি। পাণ্ডবদের তিনি ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে ক্ষমা করেননি। তাঁর অভিযোগ যে সম্পূর্ণ সত্য সেকথা মহাভারতকার প্রতিপাদন করেছেন: অভিশাপটি অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। শতপুত্রের মৃত্যুতে নয়, স্বজনহত্যার মতো নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে কৃষ্ণের প্রতি তাঁর এই অসহিষ্ণু উষ্মা। তার চিত্তে এই হত্যাকাণ্ডের হেতু, অনিবার্যতা, এর অপরিমাণ নৃশংসতা, ইত্যাদি আবেগ গভীর ভাবে মথিত হচ্ছিল, তাই কতকটা যেন স্বভাববিরুদ্ধই তাঁর এই ক্রুর অভিশাপ, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভাবে ন্যায়সঙ্গতও বটে। দেখছি, মুখ্যচরিত্রগুলির মধ্যে বাইরের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় অন্তলোকে এক প্রবল বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল।

এই হল জীবনের পুনর্মূল্যায়ন, যার চেয়ে মহত্তর উদ্দেশ্য সাহিত্যের আর হতে পারে না। এই মূল্যায়ন ঘটে কঠিন তাপে, বেদনায়; এতে মানুষের চরিত্রের, তার শ্রেষ্ঠ সত্তার রূপান্তর ঘটে। কারণ, অসন্তপ্তস্তু যদতরু প্রত্যেুতি প্রকৃতিং পুনঃ–যে কাঠ সন্তপ্ত হয়নি। সে তার পূর্বরূপে পুনর্বার ফিরে যায়; পরিবর্তিত

বা বিবর্তিত হয় না।' (২৩:১০২:৩১, বঙ্গবাসী) জয়দ্রথ দ্রোণাচার্যকে প্রশ্ন করছেন, কুরুপাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষণ ও অস্ত্রগুরু তো একই, তবু পাণ্ডবরাই সর্বদাই জয়ী হয় কেন? দ্রোণাচার্য বললেন: সমমাচার্যকং তাঁত তব চৈবার্জ্জুনস্য হি। যোগাদ্দুঃখোচিতত্বাচ্চ তন্মত্ত্বেতোত্তাধিকোহর্জ্জুনঃ।–তোমার ও অর্জ্জুনের আচার্য একই, কিন্তু, অর্জ্জুনের শিক্ষার সঙ্গে আছে যোগ, আর বিদ্যাকে সে অর্জন করেছে দুঃখের মূল্যে, এইখানেই অর্জ্জুন তোমার চেয়ে বড়।' (৭:৭২:২৩ বঙ্গবাসী) সঞ্জয় নিরন্তর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন, 'তোমার আত্মীয়বিনাশ বর্ণনা করছি, তুমি শান্ত হয়ে দুর্ধর শোককে ধারণ করাহন্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি সর্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান/শুশ্রুষস্ব স্থিরো ভূত্বা তব হ্যাপনয়ো মহান।' (৭.৬২.১)

এই ভাবে সমস্ত যুদ্ধের বর্ণনা, কৌরবপক্ষের বীরপুত্র ও আত্মীয়বন্ধুদের বিনাশের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের প্রায়শ্চিত্ত চলছিল। আঠারো দিন ধরে। মোহ ছিন্ন হলে, যুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির তাঁকে সসম্মানে প্রাসাদে রাখলেও তার মনে হল অরণ্যই এখন তার যথার্থ আশ্রয়। তার অন্তর্দাহ বাড়িয়ে তুলবার জন্য সঞ্জয় তাঁকে বলেছিলেন, 'স্বয়ং পীত্বা মহারাজ কালকূটং সুদুর্জয়ম/তস্যোদানীং ফলং কৃৎস্নমবাপ্নুহি নরোত্তম।–দুঃসহ কালকূট বিষ তুমি স্বেচ্ছায় পান করেছ, মহারাজা এ বারে তার ফল ভোগ কর।' (৭:১৩৩৩:২ বঙ্গবাসী) আবার স্ত্রীপর্বে যুদ্ধের অবসানে, 'জনপদিকং দুঃখমোকঃ শোচিতুমহাঁস–সমস্ত জনপদের এ শোক, এ কি তুমি এক বহন করতে পা ের মহারাজ? সে চেষ্টাও কোরো না।' (১১:২:১৬) দ্রোণপর্বে শুনি, 'পৃথিবীকে পাওয়ার জন্যে পৃথিবীপতি রাজারা যুদ্ধ করেছেন, আজ মৃত্যুর পরে সেই পৃথিবীকে প্রিয়বন্ধুর মতো আলিঙ্গন কবে নিদ্রিত আছেন–পৃথিব্যাং পৃথিবীহেতোঃ পৃথিবীপতয়ো হতাঃ/পৃথিবীমুপগৃহ্যাঙ্গৈঃ সুপআঃ কস্তামিব প্রিয়াম।' (৭:১৪৬:৪৭ বঙ্গবাসী) কী নিষ্ঠুর শ্লেষ! এই কী তাদের পৃথিবীকে লাভ করা?

যুদ্ধে কার লাভ? যথা বরাহস্য শুনশ্চ যুধ্যতোস্তয়োরভাবে শ্বপচস্য লাভঃ– বরাহ ও কুকুর যুদ্ধ করে মরলে লাভ চণ্ডালের।' (৭:১৮০:৮ বঙ্গবাসী) কোনও মোহ নেই কবির। যুযুধান জাতিরা চিরকালই ভুলে যায় যে, যুদ্ধে লাভ সম্পূর্ণ অন্য এক শ্রেণির মানুষের। তাই ভীষ্ম ও দ্রোণ দুর্যোধনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'পৃথিবীং ভ্রাতৃভাবেন ভূজ্যতাং বিজুরো ভাবপৃথিবীকে ভ্রাতৃ ভাবে ভোগ কর, তোমার জ্বর ছেড়ে যাক ' (৫:১২৬:১৮), লক্ষ করি লোভকে জ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, অর্থাৎ এটা সুস্থ অবস্থা নয়। 'যে একা, ভাল খায়, ভাল পরে, ভূত্যাদের তার ভাগ দেয় না, তার চেয়ে নৃশংসতার আর কে আছে?–একঃ সম্পন্নমগ্নাতি বস্তে বাসশাচ শোভনম/যোহসংবিভাজ্য ভূত্যেভ্যঃ কঃ নৃশংসতরস্ততঃ।' (৫:৩৩:৪৫) এই লোভ থেকেই সে দিন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছিল, আজও জ্বলে। ক্ষত্রিয় মহাকাব্যে স্বগের কল্পনা হল, 'যেখানে শত্রুতা নেই'–স্বগোহয়ং নেহ বৈরানি ভবন্তি মানুষাধিপ।' (১৮.১.১৮)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রথম দিন দু'পক্ষ সসজ ভাবে উপস্থিত, শঙ্খধ্বনি হলেই যুদ্ধ শুরু হবে; হঠাৎ যুধিষ্ঠির ছুটে গিয়ে একে একে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য সকলের পায়ে ধরে শান্তিভিক্ষা চাইলেন। বললেন, বন্ধ করুন। এ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। প্রত্যেকে সে দিন তাকে একই উত্তর দিলেন: অর্থস্য পুরুষো দাসে দাসত্বর্থেন কস্যচিৎ/ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোহস্ম্যর্থেন কৌরবেঃ/অতত্বাং কীববিদ্ধাক্যং ব্রবীমি কুবুনন্দন/তৃতোহাম্ম্যর্থেন কৌরব্য যুদ্ধান্দন্যৎ কিমিচ্ছসি।–'পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়; এইটিই সত্য; মহারাজ, অর্থের জন্যে বঁধা পড়েছি কৌরবদের কাছে। তাই, যুধিষ্ঠির, কীবের মতো এ কথা তোমাকে বলছি, অর্থে কৌরবরা আমাদের ভরণ করেছে, যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু চাও তো বল।' (৬:৪:৪১, ৪২) এরা প্রত্যেকেই শস্ত্রবিৎ, শাস্ত্রবিৎ, বিচক্ষণ ও শ্রদ্ধেয়, কিন্তু কোনও না কোনও স্বার্থে এঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন

ধৃতরাষ্ট্রের সভায়। দ্রোণ প্রতিহিংসা চরিতার্থকরতে, ভীষ্ম স্ববংশের টানে, কৃপা শিষ্যবাৎসল্যে–এবং পরে অন্যায় জেনেও আর কৌরবপক্ষ ত্যাগ করতে পারেননি। কাজেই দুস্তর নৈতিক সংকট যখন উপস্থিত তখন যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত অনুরোধ রাখতে পারলেন না। কীবের মতো বলতে বাধ্য হলেন, টাকায় বঁধা পড়েছি, কৌরবরা ভারণ করেছে, আমরা তাদের অন্নদোস; এখন পরাজয়, মৃত্যু তাদের সঙ্গেই হবে। আমাদের; সমস্ত অন্যায় জেনেও সেখান থেকে আর সরে আসতে পারব না। ক্ষুদ্র ঐহিক স্বার্থে একবার বিবেক বিসর্জন দিলে কি মর্মস্তিক গ্লানির মধ্যে তার মূল্য শোধ করতে হয় এর চেয়ে তার ভাল উদাহরণ আর চোখে পড়ে না। দুটি কর্তব্যের বিরোধ: এক দিকে অন্নঋণ ও আনুগত্য আর ন্যায়, ধর্ম, শাস্তির চেষ্টা আর এক দিকে। কিন্তু পূর্বকৃত অপরাধ তাদের সৎপথে ফেরার পথ রুদ্ধ করেছে। জীবনের পুনর্মূল্যায়নে এঁদের জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের ও সমস্যার কত বিবর্তনই দেখতে পাওয়া গেল।

শিখণ্ডির আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করছেন অর্জুন; তখন, ‘শ্মীয়মানন্তু গাঙ্গেয়স্তান বাণানজগৃহে তদা-উষ্ণার্তে হিনরো যদ্বজ্জলধারাঃ প্রতীচ্ছতি। তথা জাগ্রাহ গাঙ্গেয়ঃ শরধারাঃ শিখণ্ডিনঃ ॥–প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবীদাহের পরে যে দিন প্রথম বৃষ্টি নামে তখন মানুষ যেমন (ছুটে বাইরে গিয়ে) সারা দেহে সে-ধারাপাতের আরাম উপভোগ করে তেমনই করেই ভীষ্ম ঈষৎ হেসে সারা দেহ পেতে দিয়ে অর্জ্জুনের শরধারা গ্রহণ করলেন।’ (৬:১১৭:২৩, ২৪) দেখতে পাচ্ছি, পালিতকেশ বৃদ্ধের কী মর্মান্তিক উপলব্ধি, জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে। পুত্রপৌত্রপ্রতিম যোদ্ধাদের হত্যা করতে হচ্ছে দিনের পর দিন; অথচ এ স্বজনঘাতী যুদ্ধ তো অনিবার্য ছিল না। সভাপর্বে বৃদ্ধ পিতামহ কীবের মতো রাজকুলবধু দ্রৌপদীর নির্মম লাঞ্ছনা দেখেছেন নিস্প্রতিবাদ নীরবতায়, যুদ্ধের পূর্বক্ষণে যুধিষ্ঠিরের ঐকান্তিক মিনতি প্রত্যাখ্যান করেছেন কীবের মতো

দৈন্যে; তাই যেন ক্লকীবাবৎ শিখণ্ডির আড়াল থেকে আজ মৃত্যুবাণ আসছে। জীবনের রৌদ্রদাহে তপ্ত ভীষ্ম আসন্ন মৃত্যুকে দেখছেন কাঙ্ক্ষিত দাহশান্তির মতো, পরমা মুক্তির মত। জীবনের যে সব অমীমাংসিত নৈতিক সংঘাতে তিনি পরাস্ত আজ মৃত্যু তার সমাধান আনছে। ইচ্ছামৃত্যুর বর সফল হতে চলল; মৃত্যু আজ তার কা্ম্য, জীবনই দুর্বহ। ভীষ্মের জীবন যেন কুরুকুলের প্রতীক; নিঃশেষ হয়ে তবে সে জীবনের সব ঋণ শোধ করে দেবে।

যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র, তার ধর্মবুদ্ধিকে সকলে আদর্শস্থানীয় মনে করেছে, অথচ অন্তরের দিকে কত বিধ্বস্ত এই মানুষটি। গীতায় শুনি, 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাঁত গচ্ছতি'কল্যাণকারীর কখনও দুর্গতি হয় না।'(৬:৬:৪০) আপাত অর্থে এ কথা তো সত্য হতেই পারে। না: কুন্তী, দ্রৌপদী, পঞ্চপাণ্ডব, গান্ধারী এরা সকলেই তো কল্যাণকারী, অথচ জীবনে এঁরা কী পেলেন? মনে হয়, মহাভারত দুর্গতির অন্য এক সংজ্ঞা মেনেছে; বলেছে, 'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ/আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী কৃতস্যাপাকৃতস্য চ।।– মানুষের অন্তরাত্মাই তার বন্ধু, শত্রুও সে, তারকৃত ও অকৃত কাজের সাক্ষীও তার অন্তরাত্মা।'(১৩:৭:২৪) অর্থাৎ মানুষের শেষ জবাবদিহিটা তার নিজের কাছেই। এইখানে যে কল্যাণকারী তার দুর্গতি নেই। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি: অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে/সে পায় তোমার হাতে/শান্তির অক্ষয় অধিকার।' সমস্ত কল্যাণকারীই এই শান্তিতে অবিচল। শ্রেয় ও প্রেয়ের সংঘাতে যে মানুষ সমষ্টির স্বার্থের কাছে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বর্থকে বলি দিতে পেরেছে বলে নির্মল বিবেকের অধিকারী, তার লাভ চূড়ান্ত ও অনিঃশেষ। যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন স্থিত্বান দুঃখেন গুরুণাপিবিচাল্যতে।— যে বস্তু লাভ করে মানুষ অন্য কোনও লাভকে তার চেয়ে বড় মনে করে না, যাতে স্থিতিলাভ করে সে গুরুভার দুঃখেও বিচলিত হয় না।' (৬.৬.২২)

মহাভারত যদি ধর্মের অন্বেষণ করে থাকে, যে ধর্ম মানুষকে ধারণ করে তার সুখেদুঃখে। সর্বসঙ্কটে; সকল নৈতিক সংশয়ে, শ্রেয় ও প্রেয়ের সংঘাতে তার পথ আলোকিত করে ও তার আত্মাকে আশ্রয় দেয়। তবে এই সে ধর্ম। বাকি সবই এ মহাকাব্যে বহিরঙ্গ। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পয়ৈ মহতো জনকায়স্যার্থায়...' ললিতবিস্তার-এ সত্যসন্ধানী বুদ্ধ ধর্মের এই মানদণ্ড স্থাপনা করেছেন, 'বহুজনের মঙ্গলে, বহুজনের সুখে, লোকের প্রতি অনুকম্পায় সকল মানুষের কল্যাণে যা নিযুক্ত।' এই ধর্মের জন্যে সংকীর্ণ স্বার্থকে যে ত্যাগ করতে পেরেছে সে বাইরে যতই বঞ্চিত হোক না কেন, কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে/শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে/আপন ভাণ্ডারে।'

ধৃতরাষ্ট্র উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠেছেন যুদ্ধের পূর্বরাত্রে, ব্যাস। তাঁকে দিব্যদৃষ্টির বর দিতে চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন, 'ন রোচিয়ে জ্ঞাতিবধং দ্রুন্টুং ব্রহ্মার্ষিসত্তমজ্ঞাতিবধ দেখার অভিরুচি আমার নেই।' সে রাত্রে ঘুম আসছে না, সঞ্জয়কে বললেন, দিব্যদৃষ্টি পেয়েছ, সঞ্জয়, বল এই সপ্তদ্বীপা বসুমতীর কথা। জম্বুদ্বীপের প্রসঙ্গে একে একে বর্ষগুলির কথা উঠতে বললেন, 'যদিদং ভারতং বর্ষং যত্রেদং মুচ্ছিতং বিলম/যাত্রাতিমাত্রলুদ্ধোহয়ং পুত্রো দুর্য্যোধনো মম। যাত্র লুদ্ধাঃ পাণ্ডুপুত্রঃ–এই যে-ভারতবর্ষ যেখানে বাহুবল অস্ত্রবল নিজেকে প্রকাশ করেছে, যেখানে আমার পুত্র দুর্যোধন অতিমাত্র লুব্ধ। যেখানে পাণ্ডুপুত্ররাও লুব্ধ।' এই পর্যন্ত শুনে মনে হয় ধৃতরাষ্ট্র এ বার ধিক্কার দেবেন। এই দেশকে যেখানে বাহুবল, অস্ত্রবল এবং লোভের এত নির্লজ প্রকাশ। কিন্তু তিনি কথা শেষ করলেন কী বলে? 'যত্র মে সাজতে মনঃ–যেখানে আমার মন আসক্ত।' কী দুঃসাহসিক সত্যনিষ্ঠা! সমস্ত অন্যায় ও অমঙ্গল এখানেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তবু এই আমার দেশ, মন আমার এখানেই আসক্ত।

স্বর্গারোহণ পর্বে যুধিষ্ঠির কৌরব পাণ্ডব ভাইদের দেখতে চাইলে ইন্দ্র বিদ্রুপ করে বললেন, 'কিং মানুষং স্নেহমদ্যপি পরিকর্ষসি'–পৃথিবীর মানুষের প্রতি মানুষের যে টান তাকে তুমি স্বর্গেও টেনে এনেছ?' (১৮:৩:৩১) যুধিষ্ঠির বললেন, তারা যেখানে সেই আমার স্বর্গ, তাদের ছেড়ে এ স্বর্গে আমার বিন্দুমাত্র রুচি নেই। মহাপ্রস্থানের সময়ে ভক্ত সহচর কুকুরটিকে ছেড়ে আসবার প্রস্তাবে যুধিষ্ঠির বললেন, 'সবাই জানে মৃতের সঙ্গে জীবিতের সন্ধিও নেই, বিগ্রহও নেই; এটি তো আমার জীবিত ভক্ত, একে ছাড়ব কেন?—ন বিদ্যতে সন্ধিরথাপি বিগ্রহো মৃতৈমর্ত্যৈারিতি লোকেষু নিষ্ঠা।' (১৭:৩:১১) 'তেমন শ্রীবৃদ্ধি যেন আমার না হয়। যার জন্যে অনুগতজনকে পরিত্যাগ করতে হয়— মা মে শ্রিয়া সংগমনমস্তু যস্যাঃ কৃতে ভক্তজনং ত্যজেয়ম।' (১৭:৩:৯) এ হল পৃথিবীর চোখে স্বর্গ দেখা, পৃথিবীর স্নেহমমতার বন্ধন এখানে চূড়ান্ত স্বীকৃতি পেয়ে জয়যুক্ত হয়েছে; এ হল প্রাণীর প্রতি প্রাণের টানের জয় ঘোষণা। এর ঊর্ধ্বে যুধিষ্ঠির উঠতে চাননি এবং দেবদূত বা ইন্দ্র শেষ পর্যন্ত তাঁর মানবিক আকর্ষণ ও আনুগত্যের মর্যাদা দিতে বাধ্য হলেন। মহাকাব্যের ভাষায় কুকুরটি সাক্ষাৎ ধর্ম। মানুষ যাকে আত্যন্তিক প্রয়োজনে জীবনের শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সঙ্গে রেখে গৌরবান্বিত করে এবং নিঃশেষ মূল্যে মর্যাদা দেয়। তাই তো ধর্ম।

পরিশেষে মহাভারত-এর কয়েকটি রূপকের আলোচনা করব যেগুলি সবই প্রত্যক্ষ ভাবে রূবক না হলেও রূপক ব্যঞ্জনা বহন করে। প্রথমত দ্যূতসভা। বৈদিক যুগে রাজসূয় যজ্ঞের আগে ভাবী রাজাকে জুয়া খেলতে হত; এই আনুষ্ঠানিক কৃত্যটি মহাভারতে অন্য তাৎপর্য নিয়ে আসে। ক্ষত্রিয় যোদ্ধার কাছে সমস্ত জীবনটাই একটা বড় রকম জুয়াখেলা, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর; পরিণত বয়সে আত্মীয়বন্ধু পরিবৃত শয্যায় দেহত্যাগ করা তার ভাগ্যে কমই ঘটত। তাকে সারা জীবন প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হত, যা তার ন্যায্য প্রাপ্য তা অর্জন করতে, যা তার শক্তির আয়ত্ত তা জিতে নিতে এবং যার ভোগ্য তা

রক্ষা করতে। এতে কখনও জয়, কখনও বা পরাজয় এবং মৃত্যু। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্তলীন ভাগ্য পরীক্ষা ও তার অনিশ্চিত ফলাফলের ছায়া দেখা যায় এই দ্যুতসভায়। এটি ঘটনাও বটে, প্রতীকও বটে।

মৌষলপর্বে এক গর্হিত কৌতুকের অপরাধে যদুবংশ ধ্বংস হল, লৌহ মুষলের আঘাতে। লক্ষণীয়, মুষল এখানে যেন স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রের ভূমিকা নিয়েছে। এর পিছনে অবশ্যই গান্ধারীর অভিশাপ আছে, কিন্তু বর্ণনাটি প্রতীকী। যদুবংশীয়েরা উন্মত্তের মতো নিজেদের আত্মীয়বন্ধুদের নিজেরাই হত্যা করতে লাগল; অস্ত্র যেন এখানে অস্ত্রধারীর ভূমিকায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও তো ভ্রাতৃঘাতী, সেখানে কৃষ্ণের প্ররোচনায় পাণ্ডবরা ক্ষত্রিয়োচিত এবং বীরোচিত সমস্ত প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে কৌরব মহারথীদের হত্যা করেছিল। মনুষ্যত্ব সে দিন অবনমিত হয়েছিল। মৌষলপর্বে মারণাস্ত্র যেন প্রাণবন্ত হয়ে গান্ধারীর অভিশাপ সফল করল আর এক ভ্রাতৃঘাতী হত্যাকাণ্ডে; কৃষ্ণের বংশের বিনাশেই যেন কুরুক্ষেত্রের যথার্থ উপসংহার।

শান্তিপর্বে একটি কাহিনি আছে: সৃষ্টির পরে ব্রহ্মা যখন সৃষ্টিরক্ষা নিয়ে চিন্তিত তখন একটি নারী দেখা দিল। ব্রহ্মা তাকে সৃষ্টি ধ্বংস করতে বললে সে অশ্রুপাত করল। ব্রাহ্মা করপটে সে অশ্রু ধারণ করলেন, এগুলি ব্যাধি। নারীটি তপস্যায় গেল, ব্রহ্মা তাকে আবার সৃষ্টি ধ্বংসের ভার দিলেন। সে মৃত্যু ভিক্ষা চাইল: মানুষের রিপুই যেন তার ধ্বংসের কারণ হয়, ব্রহ্মা বললেন, তথাস্তু। (১২:২৪৮-২৫০ বঙ্গবাসী) এ-কাহিনি নিশ্চয়ই সব মৃত্যুর ব্যাখ্যা নয়, তবু এই বুপকের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সর্বব্যাপী ধ্বংসের একটি রূপক সূত্র নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

তৃতীয় একটি রূপক অগ্নিদাহ; এটি তিনবার এসেছে। প্রথমে জতুগৃহ দাহে, সেখানে উদ্দিষ্ট দাহ্যব্যক্তি অর্থাৎ পাণ্ডবরা ও কুন্তী মুক্তি পেলেন, কিন্তু

নিরপরাধ এক নিষাধ পরিবারের ছাটি মানুষ কুন্তীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে প্রাণ হারাল। দ্বিতীয় অগ্নিকাণ্ড খাণ্ডবদহনে; সেখানেও কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উদ্যোগে বহু নিরপরাধ অরণ্যবাসী প্রাণী প্রাণ হারায়; বেঁচে থাকে তক্ষক, প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে। তৃতীয় অগ্নিদাহ আশ্রমবাসিক পর্বে; সেখানে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের মৃত্যু ঘটে দাবানলে। কিন্তু এ সবের অন্তরালে আর একটি বৃহত্তর অগ্নিকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে, যেটির প্রতীক বাকি সব অগ্নিকাণ্ডগুলি। কুরুক্ষেত্রে কৌরবকুল ও পাণ্ডবকুল ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, মাৎসর্য ও দম্ভের অগ্নিতে আঠারো দিন ধরে জ্বলে নিঃশেষ-প্রায়। সেই দাবদাহের অন্যতম মুখ্য কর্তা ধৃতরাষ্ট্র, আশ্রমে দাবানলে তাঁর মৃত্যু হল। নিরপরাধ গান্ধারী ও সঞ্জয়ও দগ্ধ হলেন কারণ জীবন তো এমনই, সে কৃপা করে না কৃপাপাত্রকে। আর কুন্তী? নিজের সন্তানদের বাঁচাতে তিনি জতুগৃহে বলি দিয়েছিলেন নিষাদী ও তার সন্তানদের; অগ্নিদাহে মৃত্যু তো তাঁর পাওনাই ছিল জীবনের কাছে। সমস্ত যুদ্ধ বর্ণনার প্রধানত উপমান হল অগ্নি–তার তেজ, দাহিকাশক্তি, শিখা, স্ফুলিঙ্গ, ধুম, দীপ্তি ও প্রলয়ঙ্কর রূপ। এ সব কি শুধু অস্ত্রের ও বীরত্বের উপমান? মনে হয়। না; বরং মনে হয়, একটা আগুন সারা মহাকাব্য জুড়েই জ্বলেছে, কখনও প্রতীকে প্রচ্ছন্ন ভাবে তুষাগ্নির মতো, কখনও প্রকাশ্যে দাবাগ্নির মতো। এবং পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংঘাতে লোভের, ক্রোধের ইন্ধনে জ্বলে-ওঠা এই আগুনের দুঃসহ জ্বালার ভেতরে জ্বলে জ্বলে জীবনের শ্যামিকা বা খাদ পুড়ে সৃষ্টি করেছে এই অনুপম স্বর্ণসমুজ্জ্বল জীবনবোধের। বিরুদ্ধে আগেবের যুগপৎ সমাবেশ ও অন্তর্নিহিত আততিই (tension) সৃষ্টি করে মহৎ কাব্যকে। আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাত, চরিত্র ও ভাগ্যের সংঘর্ষ, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান, যোগ্যতা ও সার্থকতার পার্থক্য–এই সবের মধ্যে নিহিত সেই আততি যা সৃষ্টি করেছে: এ মহাকাব্যের অন্তর্গূঢ় চাপ ও তাপ, যার থেকে উৎসারিত এর মহত্ব ও ভাবতত্ব।

স্ত্রীপর্বে একটি রূপক পাই। যুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির যখন অন্তরে বাহিরে সর্বস্বান্ত বোধ করছেন ও বেঁচে থাকার কোনও সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন:

‘এক গভীর অরণ্যে একটি কূপ আছে, এক ব্রাহ্মণ সেই তৃণাচ্ছন্ন কূপটি না দেখতে পেয়ে তার মধ্যে পড়ে গেল। পড়বার সময়ে কুয়োপাড়ের একটি লতাকে ধরে লম্বিল হয়ে রইল, পা ঊর্ধ্বে, মাথা নীচে। কুয়োর পাড়ে একটি প্রকাণ্ড মহাগজ ধীরে ধীরে সে দিকে এগোচ্ছে। এ দিকে যে লতাটিকে অবলম্বন করে লোকটি ঝুলে আছে ইঁদুরে তার গোড়া কাটছে, অর্থাৎ যে-কোনও মুহূর্তে লতাটি উন্মূলিত হবে এবং তখনই লোকটির অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, কারণ কুয়োর নীচে এক মহাসর্প।...ওপরে লতার পুষ্পিত শাখায় মৌচাক, মৌমাছির ঝাঁক আনাগোনা করছে। এই বিপৎসঙ্কুল অবস্থায় লোকটি নিরুপায় ভাবে লম্বিত আছে. শুধু মধ্যে মধ্যে ওপরের মৌচাক থেকে বিন্দু বিন্দু মধু তার মুখে ঝরে পড়ছে। তাতে তার তৃষ্ণা মিটছে না, বরং বেড়েই চলেছে।’

বিদুর উপসংহারে বললেন, এই হল জীবন, মহারাজ।

মনে রাখতে হবে মূল মহাভারতের আদি সংস্করণ স্ত্রীপর্বেই শেষ হয়েছিল। জীবনে বিতৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উপলক্ষ্য করে জীবন সম্বন্ধে চিরন্তন তাৎপর্যপূর্ণ এই প্রলম্বিত রূপকটি তাই মূল মহাভারতের অন্তভাগেই স্থান পেয়েছে। রোগব্যাধি, জরা, নানা রিপুর আনাগোনা, নিরন্তর প্রাণসংশয়, আসন্ন অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, এ সবের মধ্যে জীবন মানুষকে কী দিয়ে মুগ্ধ করে রাখে? ওই মধু। প্রত্যেক জীবনেই কোনও না কোনও উৎস থেকে বিন্দু বিন্দু মধু এসে পড়ছে, তাই এই সর্বতো ভাবে বিপন্ন ও অনিশ্চিত জীবনেও এত আসক্তি মানুষের।

যে দেশ জীবনকে মায়া বলেছে। এ তো তার বাণী নয়; ওই মধুটুক তো সম্পূর্ণ সত্যই। তা না হলে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের কালো পর্দটার সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের এই জয়গান আসে কোথা থেকে? — মহাভারত-এ মানুষ যে বলছে: 'জীবন আমাকে কিছু দেবে বলে নয়, আমার শ্রেষ্ঠ সত্তা থেকে আমি জীবনকে কিছু দেওয়ার স্পর্ধ রাখি, এ স্পর্ধা আমার সমস্ত মানুষের হয়ে।' একমাত্র মানুষই সমস্ত মানুষের ঊর্ধ্বের্ব উঠে। জীবনকে মহিমান্বিত করতে পারে। গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কের মতো বাইরে তার অবধারিত পরাজয় থাকলেও চরম বিজয়ের উৎস তার অন্তরাত্মার মধ্যেই নিহিত; সেখানে সে নিত্যবিজয়ী।

সব মহাকাব্যেই জীবনজিজ্ঞাসা কোনও না কোনও রূপে প্রতিফলিত, যদিও সব মহাকাব্যে তার ব্যাপ্তি বা গভীরতার পরিমাণ এক নয়। আদি মহাকাব্য গিলগামেশা থেকেই দেখি এই জীবন জিজ্ঞাসাঁই মহাকবির মুখ্য প্রেরণা। কিন্তু মহাভারত-এ যে জিজ্ঞাসা, জীবনের মূল্যবোধের অন্বেষণা এবং চরিত্র, ঘটনা ও উপলব্ধির মধ্যে সে বোধের যে পুনর্মূল্যায়ন, তার প্রসার ও গভীরতা অন্য কোনও মহাকাব্যেই নেই। বোধহয় এ কথা বললেও খুব অত্যুক্তি হবে না যে, বাকি সবকটি মহাকাব্য মিলে মানবিক মূল্যবোধের যে মাননির্ণয়ের চেষ্টা, এক মহাভারত-তেই তা পূর্ণ ভাবে বিকশিত। সুপ্রচুর অবাস্তর প্রসঙ্গ থাকা সত্বেও যেখানে মূল মহাকাব্যের জীবনজিজ্ঞাসা প্রতিবিম্বিত, সেখানে তা জীবনবিমুখ নয়, জীবনমুখীন। মহাভারত-এ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দার্শনিকতা, বৈরাগ্য, ত্যাগের, অনাসক্তির প্রচুর উপদেশ, বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের জীবন সম্বন্ধে অনীহার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ সব ছাপিয়ে তো একটি অপরিস্নান ছবি থেকে যায়: চতুর্দিকে বিপৎসঙ্কুল কুপের মধ্যে আলম্বিত ওই মানুষটি, যার মুখে বিন্দু বিন্দু মধু ঝরে পড়ছে বলেই যে জীবনের সব বঞ্চনা, সব দুঃসহ দুঃখ-বিপদ-গ্লানি সইতে পারছে।

মহাভারত বলেছে, 'গুহ্যং ব্রহ্ম যদিদং তে ব্রবীমি ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরম হি কিঞ্চিৎ–গোপন একটি তত্ব তোমাকে বলি: মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নেই।' (১২:২৮৮:২০) মহাভারত-এর বিরাট অংশ জুড়ে মায়াবাদ ও বৈরাগ্যের এত যে রাশি রাশি শুকনো পাতা সবই উড়ে গেল উপলব্ধির এক প্রবল ঝড়ে। রয়ে গেল শাশ্বত মানুষ–তার দৈন্য, কুশীতা, অপূর্ণতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আদর্শ তার সাধ-স্বপ্ন-বেদনার মর্মস্তিক টানাপোড়েন নিয়ে। তাহলে দেবতা? রবীন্দ্রনাথের বোধে নিদারুণ দুঃখরাতে/মৃত্যুঘাতে/মানুষ চুর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা/তখনও দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?' নিদারুণ দুঃখ সংশয়ের সংঘাতের মধ্যে, নিষ্ঠুর বঞ্চনা ও ব্যর্থতার মধ্যে আপন আন্তর তেজে এসব কিছুকেই জয় করে মানুষ তার মর্ত্যসীমা লঙ্ঘন করে দেবতা হয়ে উঠেছে। বহু চরিত্রে, বহুতর ঘটনার বিন্যাসে এ সত্য প্রতিপাদন করেছে মহাভারত, তাই মহাকাব্যের বিচারে এর স্থান পৃথিবীর সমস্ত মহাকাব্যের শীর্ষস্থানে। প্রথম অধ্যায়েই এ মহাকাব্যের পরিচয়: 'ভারতস্য বপুর্য্যেতৎ সত্যঞ্চামৃতমেব চ–মহাভারত হল ভারতের কলেবর, সত্য ও অমৃত।' (১:১:২০১১)

নারীর স্থান: রামায়ণ ও মহাভারত-এ

রামায়ণ

রচনাকালের দিক থেকে দেখলে রামায়ণ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় থেকে খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের মধ্যে রচিত; মহাভারত রচনা সম্ভবত শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতক থেকে এবং শেষ হয় খ্রিস্টিয় চতুর্থ বা

পঞ্চম শতকে। অর্থাৎ বুদ্ধের পরের আট বা নশ’ বছরের মধ্যে এ দুটি মহাকাব্য রচিত হয়; এদের মধ্যে মহাভারত আগে শুরু হয়ে পরে শেষ হয়; রামায়ণ পরে শুরু হয়ে আগে শেষ হয়; আগে পূর্ণকলেবর মহাকাব্যের রূপ পায় বলেই সম্ভবত এর নাম আদিকাব্য। মনে রাখতে হবে, রামায়ণ শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে; কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, শ্রীমদ্ভগবদগীতা এবং মনুসংহিতা, এই ক্রান্তিকালের রচনা। এর কিছু পরেই শুরু হয়ে যায় পুরাণগুলির রচনা। রামায়ণ ও মহাভারত-এ। পরবর্তী সংযোজিত অংশগুলি অভিপৌরাণিক, অর্থাৎ পুরাণে প্রতিফলিত যে সামাজিক মূল্যবোধ ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সমাবেশে ভারতীয় ধর্মচিন্তা তার বিবর্তিত রূপে ক্রমে ‘হিন্দুধর্ম’ বলে অভিহিত হল, এই অভিপৌরাণিক অংশেই আমরা সেগুলির সাক্ষাৎ পাই। এ দিকে রামায়ণ ও মহাভারত-এর মূল কাহিনি দুটি সম্ভবত অনেক প্রাচীনকাল থেকেই গাথায় ও আখ্যানে জনমানসে সঞ্চারণ করছিল; ফলে মহাকাব্য দুটিতে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের দুটি চিত্র পাই: একটি মূল কাহিনির আর একটি সংযোজিত বা প্রক্ষিপ্ত অভিপৌরাণিক অংশের।

প্রথমে রামায়ণ-এর কথাই ধরা যাক। যেহেতু এর রচনা শুরু হয়। পরে, সে জন্যে এর মূল অংশের মধ্যেই ওই অভিপৌরাণিক অংশের কিছুঅনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তবু দেখিকৈকেয়ীর সাহস হয় রাজাকে পূর্ব প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করতে; লক্ষ্মণ বনগমন করলেও উর্মিলা তাঁর সঙ্গে না গিয়ে প্রাসাদেই থেকে গেলেন; দশরথের মৃত্যুর পরে রানিরা ‘সতী’ হননি, বিধবা অবস্থায় বেঁচেই রইলেন। মন্দোদরী বিলাপ করবার সময়ে স্বামীকে নিন্দা করে বলছেন:

> ন কুলেন ন রূপেণ ন দক্ষিণ্যেন মৈথিলী।
> ময়াধিকা বা তুল্যা বা তত্ত্ব মোহান্ন বুধ্যাসে।

সীতা বংশগৌরবে, রূপে বা দক্ষিণ্যে (কিছুতেই)। আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, এমনকী আমার তুল্যও নয়, তুমি মোহবশে সে কথা বুঝলে না। (৬:১১১:২৮)

স্বামীগর্বে অনেক প্রশংসা করলেন রাবণের রূপ, গুণ, শৌর্য ও চরিত্রের। কিন্তু দোষও দিলেন:

ত্বয়া কৃতমিদং সর্বমন্নাথং রাক্ষসংকুলম।

সুহৃদাং হিতকামানাং ন শুতং বচনং ত্বয়া।

তুমি এই সমগ্র রাক্ষসকুলকে অনাথ করেছ; হিতৈষী বন্ধুদের কথা তুমি শুনলে না। (৬.১১১.৭৬)

শুধু যে রাক্ষসনারী বলে মন্দোদরীই নিন্দা করেছেন স্বামীর তা নয়, রামচন্দ্র প্রত্যাখ্যান করার পরে সীতাও বলেছিলেন:

মদধীনং তু যত্তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে।

পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী।

আমার নিজের আয়ত্তে আমার যে মন তা তো তোমাতেই আছে, আমার যে শরীরটা পরাধীন সেটার সম্বন্ধে অক্ষম আমি কি করব। (৬:১১৬:৯)

আগেও রামচন্দ্রকে বলেছিলেন: স্বেন চরিত্রেণ তে শপে–আমার চরিত্রের শপথ করে বলছি। (৬:১১৬:৬) আরও বললেন:

সহ সংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেণ চ মানদ।

যদি তেহহং ন বিজ্ঞাত হতা তেনাস্মি শাশ্বতম।

তুমি আমি একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি সেই (এতদিনের) সংসর্গেও যদি তুমি

আমাকে না জেনে থাক তবে তো চিরদিনের জন্যেই আমি হতভাগিনী। (৬:১১৬:১০)

এই সীতা, রামায়ণে যিনি শুধুই মুখ্য নয়, বলতে গেলে একমাত্র নারীচরিত্র, তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলেই রামায়ণে নারীর স্থান সম্বন্ধে একটা ধারণা হবে। রাক্ষস অকম্পন সীতার বর্ণনা করেছিল:

নৈব দেবী ন গন্ধবী নাপ্সারা ন চ পন্নগী।
তুল্যা সীমস্তিনী তস্যা মানুষী তু কুতো ভবেৎ।
দেবী, গন্ধবী, অপ্সরা, নাগিনী কোনও নারীই সীতার সমকক্ষ নয়, মানুষী বা কেমন করে তাঁর তুল্য হবে? (৩:৩১:৩০)

এই অনন্যা নারী স্বামীর বনগমনের সংবাদ পেয়েই তৎক্ষণাৎ মনস্থির করলেন তিনিও বনে যাবেন। মূল কাহিনিতে সম্ভবত সীতা স্বামীর বিরহের আশঙ্কাতেই বনে যেতে চেয়েছিলেন, পরে যে-সব সংযোজন হল তার মধ্যে সেই অভিপ্রায়টিকে চিনে নেওয়া যায়; যেমন সীতা বলছেন:

ত্বয়া বিনা নরব্যাঘ্র নাহং তদপি-রোচিয়ে।
বা, তুদ্বিয়োগেন মে রাম ত্যক্তব্যমিহ জীবিতম।
অথবা, উঝ্ঝিতায়াস্তুয়া নাথ তদৈব মরণং বরম।
ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্তমপি নোৎসহে
হে নরব্যাঘ্র তোমাকে বাদ দিয়ে আমার স্বর্গোও রুচি নেই। (২:২৭:২১) তোমার বিরহে রাম, আমাকে প্রাণ ত্যাগ করতে হবে। (২:২৮:৫) তুমি পরিত্যাগ করলে আমার মৃত্যুই ভাল। (২:৩০:২০) এ-শোক আমি এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারব না। (২:৩০:২১)

এ সব কথা প্রেমের; যে প্রেম আদর্শন বিচ্ছেদ সহ্য করার সম্ভাবনার চেয়ে মৃত্যুকেও বরণীয় জ্ঞান করে। এ সীতা প্রাচীনতর উপাখ্যানের নায়িকা, যিনি পতিব্রতা বলে নয়, রামকে ভালবাসতেন বলেই স্বেচ্ছায় সানন্দে তার সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন, কর্তব্য বা পতিব্রতাধর্ম পালন করছেন বলে নয়। কিন্তু, এরই সঙ্গে প্রায় ওতপ্রোত ভাবে মিশে রয়েছে। পরবর্তীকালের পতিব্রতাধর্ম, যা ম্লান করে দিয়েছে তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের মহিমাকে। এইখানেই শুনি, 'শ্রুতির্হি শ্রুয়তে পুণ্যা ব্রাহ্মনাণাং যশস্বিনাম–যশস্বী ব্রাহ্মণদের পুণ্য উক্তি শোনা যায়।' কী সেই উক্তি? না, ভর্তা হি পরমদৈবতম–স্বামীই পরম দেবতা।' (২:২৯:১৬) কিংবা:

ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকে গতিঃ সদা

অথবা, প্রাসাদগ্রে বিমানৈর্বা বৈহাহসগতেন বা।

সর্বাবস্থাগত ভর্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে।

ইহজগতে ও পরলোকে সর্বদাই পতিই হল নারীর একমাত্র গতি। (২:২৭:৬) সে প্রাসাদের ওপরে, বিমানে, আকাশে যেখানেই হোক স্বামীর পদচ্ছায়ার বিশিষ্ট স্থান। (২:২৭:৯) বিদায়কালে সীতা কৌশল্যাকে বলছেন:

নাতন্ত্রী বাদ্যতে বীণা নাচক্রেগ বিদ্যতে রথঃ।

নাপতিঃ সুখমেধতে যা সাদপি শতত্বজা।

তন্ত্রীহীন বীণা বাজে না, চক্রহীন রথ হয় না। পতিহীনা নারী শতপুত্রের জননী হলেও সুখ পায় না। (২.৩৯.২৯)

অথবা রামকে বলছেন:

গতিরেক পতিনায় দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজংশ্চতুর্থী নৈব বিদ্যতে।
নারীর একটি গতি স্বামী, দ্বিতীয় পুত্র, তৃতীয় আত্মীয়রা, চতুর্থ কোনও গতি তার নেই। (২.৬১.২৪)

রাবণ যখন সীতাকে হরণ করতে এলেন তখন সীতা তাকে যে ভাষায় প্রত্যাখ্যান ও তিরস্কার করছেন তার অনেকটাই প্রেমে ও স্বামিগর্বে বলা, শুধু পতিব্রতাধর্ম থেকে নয়। বলছেন, নৃসিংহং, সিংহসংকাশমহং রামমনুব্রতা/– আমি সিংহসদৃশ সেই নরসিংহ রামের অনব্রতা।' (৩:৭৪:৩৩) প্রচণ্ড ধিক্কার দিচ্ছেন রাবণকে তার ধ্রুবপদ যেটি বারেবারে উচ্চারণ করছেন তা হল, রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যাং যত্বমিচ্ছসি রাক্ষস।–তুমি রামের প্রিয় বধূকে চাইছ, রাক্ষস।'

আশীবিষ্যস্য বদনাদংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি।
কালকূটং বিষং পীড়া স্বস্তিমান গন্তুমিচ্ছসি।...
সূর্যচন্দ্রমসৌ চৌভৌ পাণিভ্যাং হতুমিচ্ছসি।....
অগ্নিং প্রজলিতং দৃষ্ট্রা বস্ত্রেণহতুমিচ্ছসি।
সাপের মুখ থেকে দাঁত নিতে চাইছ; কালকূট বিষ পান করে স্বস্তিতে চলে যেতে চাইছ; সূর্য ও চন্দ্রকে হাত দিয়ে হরণ করতে চাইছ, জ্বলন্ত আগুনকে বস্ত্র দিয়ে নিয়ে যেতে চাইছ? (৩:৪৭:৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩) শুধু পতিব্রতের কথা এ নয়, এর মধ্যে আছে সীতার গভীর প্রেমের প্রকাশ। আর রামচন্দ্রকে নিয়ে গর্ব, যে গর্বে তিনি রাবণকে বলেন, 'তোমার সঙ্গে রামচন্দ্রের পার্থক্য হল: বনে সিংহ এবং শৃগালের যে পার্থক্য, সোনার সঙ্গে সীসা-লোহার যে পার্থক্য, গরুড়ের সঙ্গে কাকের যে পার্থক্য তাই:

যদন্তরং সিংহ শৃগালয়োর্বনে...
যদন্তরিং কাঞ্চনসীসলোহয়োঃ...
যদন্তরাং বায়সবৈনতেয়ায়োঃ... (৩:৪৭:৪৫, ৪৬, ৪৭)
তাই ইন্দ্রের ভার্যা শচীকে অপহরণ করেও বাঁচা সম্ভব কিন্তু রামের ভার্যা আমাকে নিয়ে গিয়ে তুমি স্বস্তি পাবে না।

অপহৃত শচীং ভার্যাং শক্যামিন্দ্রস্য জীবিতুম।
ন হিরামস্য ভার্যাং মামানীয় স্বস্তিমান ভবেৎ। (৩:৪৮.২৩)
এ কথা অহংকারের, যে অহংকার তার রামকে নিয়ে, রামের শৌর্য ও পত্নী প্রেমে বিশ্বাস থেকে যে অহংকার জন্মায়।

এই সহজ অনুভূতির মহিমাকে বারে বারে ক্ষুন্ন করেছে ধর্মীয় ও সামাজিক বিধান, যা যত্রতত্র প্রক্ষিপ্তরূপে মিশে আছে। এই মহাকাব্যে। আগে মনে করা হত রামায়ণ-এর প্রক্ষেপ শুধু বাল ও উত্তরকাণ্ডে; এখন গবেষণায় যা জানা যায় তা হল ও দুটি কাণ্ড প্রায় সম্পূর্ণই প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু অন্যান্য কাণ্ডেও প্রচুর পরিমাণে প্রক্ষেপ আছে। জে. এল বুকিংটন-এর প্রামাণ্য বই দ্য রাইটিয়াস রাম (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪)-তে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন একটি ক্ষত্রিয় বীরের কাহিনি কী ভাবে ধীরে ধীরে ধর্মগ্রন্থে পরিণত হল এবং ক্ষত্রিয়বীর কী ভাবে অবতারে পরিণত হল। এই বিবর্তনে অভিপৌরাণিক প্রক্ষেপগুলির ভূমিকা খুবই স্পষ্ট। রাবণ যখন ছল করে রামের মৃত্যু ঘোষণা করলেন তখন সীতা ভাবলেন:

নূনং মামৈব শোকেন স বীরো লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
দেবলোকমিতো যাতস্তত্ব দেহং মুহীতলে।

নিশ্চয়ই আমারই শোকে বীর রামচন্দ্র দেহত্যাগ করে দেবলোকে চলে গেছেন। (৫:২৬:৩৮)

হনুমানের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর দীর্ঘ এক প্রশ্নমালায় রামের কুশলসংবাদ জেনে নিলেন। প্রশ্ন করলেন, 'কচিৎস্মাং বষযনাদশাস্মোক্ষয়িষ্যতি রাঘবঃ– রামচন্দ্র আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন তো?' (৫:৩৬:২০)

এই সীতাকে দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর রামচন্দ্র যখন প্রথম দেখলেন তখন কী বললেন?—'যুদ্ধ করে যে জয়লাভ করেছি সে তোমার জন্যে নয়–ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ '(৬:১১৫:১৫) তাহলে কেন করলেন? 'প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গঞ্চ পরিমার্জতা–নিজের বিখ্যাত বংশের কলঙ্ক মোচনের জন্য করেছি!' (৬:১১৫:১৬)

প্রাপ্তঃ চারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্তিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকুলাসি মে দৃঢ়া।।
তদ গচ্ছ ত্বানুজানেহদ্য যথেষ্টং জনকাত্মজে।
এতা দিশ দিশো ভদ্রে কার্যমস্তি ন মে ত্বয়া।।
কঃ পুমাংস্তু কুলে জাতঃ স্ক্রিয়ং পরগৃহোঁহিষতাম।
তেজস্বী পুনরাদন্দ্যাৎ সুহৃল্লোভেন চেতসা।।
রাবণাঙ্কপরিক্রিষ্টাং দুষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা।
কথং ত্বাং পুনরাদন্দ্যাং কুলং ব্যাপদিশন্মমহৎ।।
যদর্থং নির্জিতা মে ত্বং সোয়মাসাদি ময়া
নাস্তি মে ত্বষ্যভিষ্বঙ্গো যথেষ্ট্রং গম্যতামিতি।।
তোমার চরিত্রে (আমার) সন্দেহ, আমার সামনে তুমি আছ এতে আমি (তোমার প্রতি) প্রতিকুল বোধ করছি যেমন চোখের রোগীর সামনে দীপ

থাকলে (তার কষ্ট) হয়। অতএব এই দশদিকের যেখানে ইচ্ছা তুমি যাও, তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তোমাতে আর আমার কোনও প্রয়োজন নেই। সদ্বংশজাত কোন তেজস্বী পুরুষ, পরগৃহে বাস করেছে এমন নারীকে বন্ধুত্বের লোভে পুনর্বার গ্রহণ করবে? রাবণের অঙ্কলঙ্কিতা, তার দুষ্ট দৃষ্টিতে দূষিতা যে তুমি, সেই তোমাকে কেমন করে আমি পুনর্বার গ্রহণ করব আমার মহৎ বংশকে দূষিত করে? যে কারণে তোমাকে উদ্ধার করেছি সে উদ্দেশ্য আমার সিদ্ধ হয়েছে; তোমাতে আমার আর কোনও আসক্তি নেই! যেখানে ইচ্ছে চলে যাও। (৬:১১৫:১৭-২১)

এতেও যথেষ্ট হল না, সীতার ভবিষ্যতের পথও-দেখিয়ে দিচ্ছেন রাম:

তদস্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিনা।
লক্ষ্মণে বাথ ভারতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম।
আজ সুবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে তোমাকে বলে দিলাম, হে ভদ্রে, লক্ষ্মণ অথবা ভরত যাতে তোমার সুখ হয় তাকেই বরণ কোরো। (৬:১১৫:২২)

মনে রাখতে হবে, বনগমনের পূর্বে লক্ষ্মণ যখন সুমিত্রাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন তখন সুমিত্রা তাকে বলেছিলেন:

ক্ষরামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম। অযোধ্যামটকীংবিদ্ধি গচ্ছ তাঁত যথাসুখম। রামকে দশরথ বলে মনে কোরো, সীতাকে মনে কোরো আমি, অরণ্যকে অযোধ্যা জ্ঞান কোরো, যথাসুখে চলে যাও বৎস।

এই নির্দেশের জন্যে লক্ষ্মণ সীতার পায়ের অলংকার ছাড়া আর কিছু চিনতে পারেননি, কারণ প্রণাম করার সময়ে শুধু পা-ই দেখতে পেতেন। আজ সেই লক্ষ্মণকেও অপমান করলেন রামচন্দ্র; সীতাকে তো চূড়ান্ত ভাবেই করলেন। কয়েকটি রামায়ণ-এর সংস্করণে প্রত্যাখ্যানের সময়ে আরও কিছু কথা রামের

মুখে দেওয়া আছে; আর মহাভারত-এর বনপর্বেরামোপাখ্যানে তো সংশোধিত সংস্করণেও তা রক্ষিত আছে। সেখানে রাম বলছেন:

গচ্ছ বৈদেহি মুক্তা ত্বং যৎ কার্যাং তন্ময়া কৃতম।।
মামাসাদ্য পতিং ভদ্রে ন ত্বং রাক্ষসবোশ্মনি।
জরাং ব্রজে থা ইতি মে নিহতো য়ং নিশাচরঃ।।
কথং হাস্মদ্বিধো জাতু জানন ধর্মবিনিশ্চয়ম।
পরহস্তগতাং নারীং মুহূর্তমপি ধারয়েৎ ।।
সুবৃতত্তামসুবৃত্তাং বাপ্যহং ত্বামদ্য মৈথিলি।।
নোৎসাহে পরিভোগায় শ্বাবলীঢ়ং হবির্যথা।।
যাও, বৈদেহি, তুমি মুক্ত। যা করণীয় ছিল তা আমি করেছি। আমাকে স্বামিরূপে পেয়ে, ভদ্রে, তুমি রাক্ষসের গৃহে জরাগ্রস্ত যাতে না হও তাই আমি রাক্ষসকে বধ করেছি। আমার মতো লোক যে ধর্মাধর্ম-বিনিশ্চয় জানে সে পরহস্তগতা নারীকে কেমন করে এক মুহূর্তের জন্যেও ধারণ করবে? তুমি সচ্চরিত্রই হও বা দুশ্চরিত্রই হও, মৈথিলি, তোমাকে আমি আজ ভোগ করতে পারি না, তুমি (এখন) সেই ঘিয়ের মতো যা কুকুরে লেহন করেছে।
(মহাভারত ৩.২৭৫.১০-১৩)

এখানে কয়েকটি বিষয় বিশ্লেষণ করলেই তৎকালীন সমাজে নারীর স্থান, বিশেষত ওই অধিপৌরাণিক অংশ সংযোজিত হওয়ার পর, তার স্থান কী ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, তুমি মুক্ত’–কী থেকে মুক্ত? বিবাহবন্ধন থেকে? এত সহজ তা? ধর্মসূত্রে আছে ধর্ষিতা নারীকেও পরের মাস থেকে স্বামী শুচি জ্ঞান করবেন। এবং রামায়ণ রচনা বেশ কয়েকটি ধর্মসূত্রের সমসাময়িক, আর কয়েকটির পরবর্তীর্ণ। কাজেই এ শাস্ত্র রামের অজানা থাকার কথা নয়। তবু সীতা পরিত্যাগে রামের কোনও দ্বিধা নেই। তারপর রাম ব্যাখ্যা করে

রূঢ় সত্যটি বলছেন, যুদ্ধটা তিনি কেন করলেন: ঈস্ফাকুবংশের মর্যাদা রক্ষার জন্যে এবং নিজের বীরখ্যাতি অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে। রামের স্ত্রী হয়ে সীতা রাবণের প্রাসাদে জরাপ্রাপ্ত হলে সেটা রামের শৌর্যের হানি ঘটায়, তাই যুদ্ধ করেছেন। সে যুদ্ধ সীতার জন্যে নয়। রামের মতো সূক্ষ্ম ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি পরহস্তগত নারীকে মুহূর্তের জন্যেও বা কি করে ধারণ করবেন? অতএব সীতা সচ্চরিত্রই হোন বা দুশ্চরিত্র, রামের পক্ষে তাকে 'ভোগ' করা সম্ভব নয়। প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান ওই পরিভোগায়' শব্দে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেন ভোগে লাগবেন না সীতা? কুকুরে-চাটা ঘি যেমন যজ্ঞে ব্যবহার করা যায় না, তেমনই পরহস্তগত নারীও তার স্বামীর ভোগে লাগে না। মনে রাখতে হবে, এতটা অপরাধ সীতার প্রতি স্বয়ং রাবণও করেনি। রাবণ সীতাকে ধর্ষণ করেছে। কিনা জেনে নেওয়ারও প্রয়োজন নেই এবং সীতার কোনও অধিকার নেই তার অদর্শনের কালে রাম কী করেছেন সে প্রশ্ন করবার। প্রাচীন ভারত নারীর 'সতীত্ব' খুব ভাল বুঝাতে, 'সতী' শব্দের ওই অর্থে কোনও পুংলিঙ্গ শব্দও সৃষ্টি করেনি। অর্থাৎ স্বামীর একনিষ্ঠতার অভাব সমাজের চোখে গর্হিত ছিল না, স্ত্রীকে শুধু সন্দেহের বশেই ত্যাগ করা চলত। এত বড় অন্যায় অপমানের পরে সীতা লক্ষ্মণকে চিতা নির্মাণ করতে বললেন।

অস্ত্রীতেন গুণৈর্ভেত্রা ত্যক্তায়া জনসংসদি।

যা ক্ষমা মে গতির্গন্তুং প্রবেক্ষ্যে হব্যবাহনম।
স্ত্রীর গুণে যে শ্রীত নয় এমন স্বামী যখন জনসভায় স্ত্রীকে ত্যাগ করে তখন সেই স্ত্রীর যে পথে যাওয়া সম্ভব তাই করব; অগ্নিপ্রবেশ করব। (৬:১১৬:১৯)

জনসভায় সকলের প্রত্যাশা রাম লক্ষ্মণকে সীতার চিন্তা রচনায় বাধা দেবেন, কিন্তু;

ন হিরামং তদা, কশ্চিৎ কালান্তক যমোপমম।

অনুনেতুমিথো বক্তুং দ্রষ্টুং বাপ্যশকৎ সুহৃৎ।
রামকে তখন কাল অন্তক ও যমের মতো দেখাচ্ছিল, তাকে অনুনয় করা, তাকে কিছু বলা বা (এমনকী) তার দিকে চেয়ে দেখার সাধ্যও কোনও বন্ধুর ছিল না। (৬:১১৬:২২)

রামের এই নৈতিক আত্মতুষ্টি ও দুষ্কৃতকারীর শাস্তিবিধানের ভূমিকাটি এসেছিল তৎকালীন সমাজের স্ত্রী-পুরুষের আপেক্ষিক মূল্যবোধ থেকে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরপরাধ স্ত্রীকে সন্দেহের বশে ত্যাগ করা যে কোনও রকম অন্যায়ই নয়। এই দৃঢ় ধারণা।

এর পরে সীতা বললেন:

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসাপতি রাঘবাৎ।

তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ।।

কর্মণা মনসা বাচা যতা নাতিচরাম্যহম।

রাঘবং সর্বধর্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ।।

আদিতো ভগবান বায়ুর্দিশশ্চন্দ্রস্তথৈব চ।

অহশচাপি তথা সন্ধ্যে রাত্রিশচ পৃথিবী তথা।।

যথান্যেপি বিজানন্তি তথা চারিত্রসংযুতাম।।
যেহেতু আমার হৃদয় রামচন্দ্র থেকে কখনও সরে যায়নি, অতএব লোকসাক্ষী অগ্নি আমাকে সর্বদিকে রক্ষা করুন। কাজে, মনে, কথায় যেহেতু সর্বধর্মজ্ঞ রামকে কখনও লঙ্ঘন করিনি, সেহেতু অগ্নি আমাকে রক্ষা করুন। ভগবান, আদিত্য, বায়ু, দিকগুলি, এবং চন্দ্র, দিন, সন্ধ্যা, রাত্রি ও পৃথিবী এবং

অন্যেরাও যেহেতু জানেন আমি এই রকম চরিত্রাবতী। (৬:১১৬:২৫, RA, Rbr)

এই শপথ করে অগ্নিপ্রবেশ করার দুটি দিক আছে একটির নাম ‘সত্যক্রিয়া’। কোনও ব্যক্তির প্রতি অন্য কেউ সন্দেহ করলে সে নিজের নির্দোষিতা প্রতিপাদন করবার জন্যে প্রকৃতির নিত্যস্থায়ী শক্তিগুলিকে সাক্ষী মানে। অন্য দিকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ রকম অবস্থায় চার রকমের বিচার আছে: বিষ, অগ্নি, জল ও তুলা অর্থাৎ নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি নিরপরাধ হয় তাহলে বিষভক্ষণ করলে শরীরে বিষক্রিয়া হয় না, অগ্নিপ্রবেশ করলে দগ্ধ হয় না, জলে ডুবলে মৃত্যু হয় না এবং তুলাদণ্ডে তার ওজনের তুলনায় সে লঘুভার হয়ে যায়। সীতা এই শপথ করে অগ্নিপ্রবেশ করে যখন দগ্ধা হলেন না তখন ধর্ম এবং রাষ্ট্রের বিচারের দৃষ্টিতে তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণ হল। বলা বাহুল্য, তৎকালীন বিশ্বাসের পটভূমিকায় এ শপথ করতে পারত একমাত্র সম্পূর্ণ নিরপরাধ ব্যক্তিই–মনে, কথায় ও কাজে যে শুচি।

অযোধ্যায় ফিরে স্বল্পকাল সুখভোগের পর লোকেরা রামের বিষয়ে বলতে লাগল:

কীদৃশং হৃদয়ে তব সীতাসম্ভোগজং সুখম।
অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলার্দ্ধতম।
রাবণ যাকে অঙ্কে আরোপণ করে সবলে হরণ করেছিল, সেই সীতার সম্ভোগে তোমার হৃদয়ে কেমন সুখ হয়? (৭:৪৩:১৭)

লক্ষণীয়, সীতার অগ্নিপরীক্ষার সাক্ষী অন্তত দুজন ছিলেন, রাম এবং লক্ষ্মণ। দেবতারা, বিশেষত ব্রহ্মা এসে সীতার শুচিতা ঘোষণা করেছিলেন–এ সব

কিছুই উল্লেখ করা হল না। প্রজাদের শ্লেষযুক্ত বাক্য শুনে রাম বিচলিত হলেন, কারণ প্রজারা বলল:

অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্তন্তে।
(এমন হলে) আমাদের স্ত্রীদেরও (এই অপরাধ) সহ্য করতে হবে! রাজা যেমন করে প্রজা তারই অনুবর্তন করে। (৭:৪৩:১৯)

রাম বললেন, এই পৌরাপবাদ তার মর্ম ছেদন করছে। লক্ষ্মণকে বললেন সীতা তার শুচিতার প্রমাণ দিয়েছেন (৭:৪৪:৬-১০), তবু, অকীর্তিনিন্দ্যিতে দেবৈঃ কীর্তিলোকেষু পূজ্যতে— দেবতারা অকীর্তির নিন্দা করে, পৃথিবীতে কীর্তি পূজিত হয়। (৭:৪৪:১৩)

অতএব সীতা পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। পরিত্যক্তা সীতা লক্ষ্মণের মুখে রামকে বলে পাঠালেন:

যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদসমুত্থিত।
ময়া চ পরিহর্তব্যং ত্বং হি মে পরম গতি।।
এই অপবাদ থেকে তোমার যে নিন্দা রটেছে সেটা পরিহার করাই আমার কর্তব্য, কারণ তুমি আমার পরম গতি। (৭:৪৮:১৩, ১৪)

সমাজে নারীর তখন এই স্থান, নারীর পরম গতি হন স্বামী। স্ত্রীর প্রতি অন্যায় অভিযোগ, মিথ্যা সন্দেহ খণ্ডন করার দায় নেই স্বামীর, কিন্তু স্বামীর নিন্দ সর্বতে ভাবে পরিহার করাই স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য।

রাজসভায় দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে সীতাকে নিজের শুচিতা আবার প্রতিপাদন করবার আদেশ দিলেন রাম। সভায় সীতা কিছু বলার আগেই বাল্মীকি বললেন,

বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্য ময়া কৃতা।

নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী।।

মনসা কর্মনা বাচা ভূতপূর্বাং ন কিল্বিষম।।

তস্যাহং ফলমশ্রামি অপপা যদি মৈথিলী।

ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপী পতিদেবতা।

বহু সহস্র বৎসর আমি তপস্যা করেছি, সীতা যদি দুশ্চরিত্র হন তবে সেই তপস্যার ফল আমি ভোগ করব না। মনে, কাজে, কথায় কখনও অন্যায় করিনি, সীতা যদি নিষ্পাপ হন তবে আমি তার ফল ভোগ করব। এই (সীতা) শুদ্ধচরিত্রা, নিম্পাপ, পতিই এর দেবতা। (৭:৯৬:২০, ২১, ২৩)

বাল্মীকির এত বড় শপথই রাম এবং প্রজাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ হওয়ার কথা। নিষ্পাপ। যে ঋষি বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করেছেন তাঁর পক্ষে চূড়ান্ড যা শপথ হতে পারে, তাই তিনি বারে বারে প্রকাশ্যে রাজসভায় ঘোষণা করলেন। সমাজে নারীর স্থান কোথায় নেমে গেলে এর পরেও প্রজাদের সন্দেহ ঘোচাবার জন্যে সীতার আবার অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে? শেষ পর্যন্ত বাল্মীকিও বললেন সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে। সীতা বললেন:

যথাহং রাঘবদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।

মনসা কর্মণা বাচা যথা রামমভ্যর্চয়ে।

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।

যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেগ্নি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি। ।
রাঘব ছাড়া অন্য কাউকে যদি মনেও না চিন্তা করে থাকি, তবে মাধবী দেবী (পৃথিবী) আমাকে বিবরে (আশ্রয়) দিন। মনে, কাজে কথায় যদি রামকেই অর্চনা করে থাকি, তবে মাধবী দেবী বিবর দিন। রাম ছাড়া আর কাউকেই জানি না। এ কথা যদি সত্য বলে থাকি তবে মাধবী দেবী বিবর দিন।
(৭:৯৮:৭, ৮, ৯)

এ সীতার শেষ সত্যক্রিয়া। এখানে যেটা লক্ষণীয় তা হল সীতা নিজের শুচিতার প্রমাণের বিনিময়ে কি চাইছেন। একবারও বলছেন না, যে আমি রামের প্রতি বিশ্বাসিনী হয়ে থাকলে যেন তিনি এবং প্রজারা আমার প্রতি সন্দেহ ত্যাগ করেন; আমি আবার রামের প্রিয়বন্ধু হয়ে তাঁর সান্নিধ্যে থাকি; সিংহাসনে তাঁর পাশে স্থান পাই। সে সব সাধ তীব্র সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে; বেশ বুঝতে পারছেন, প্রজারা আবার সন্দেহ করতে পারে এবং রাম কোনও দিনই তাঁর পক্ষ সমর্থন করবেন না, বারে বারেই তাকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। যে সমাজে নারীর এই স্থান, তাকে সন্দেহ করতে গেলে যুক্তি তথ্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না, বিশ্বাস করতে গেলে সমাজ ক্ষুব্ধ হয়— সেখানে নারী রাজসুখ পেলেও সম্মান ও মানুষের মর্যাদা কোনও দিনই পাবে না। সেই জন্যে, আত্মমর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে একটি চরম সত্যক্রিয়ার শপথ গ্রহণ করে নিজের শুচিতা প্রমাণ করলেন; কিন্তু রামের কাছে, সমাজের, জীবনের কাছে আর কোনও প্রার্থনা বা প্রত্যাশা তার নেই। সারাজীবন ধরে অনন্যচিত্তে যে রামকেই তিনি চিন্তা করেছেন, ভালবেসেছেন, অনুগমন করেছেন রাম তাঁর কী মূল্য দিলেন? পৃথিবী সীতাকে নিয়ে যাওয়ার পরে রাম ‘ক্রোধশোকসমাবিষ্ট’ হয়ে পৃথিবীকে বললেন: আনয় ত্বং হি তাং সীতাং মত্তে

হং মৈথিলীকৃতে—সেই সীতাকে তুমি নিয়ে এস, মৈথিলীর জন্যে আমি উন্মাদ।।' (৭:৯৮:৯)

বিরহে তাঁর কষ্ট হয়ে থাকতেই পারে, আর বিবাহও তিনি করেননি। কিন্তু তার তো একটা কারণ পৃথিবী সীতাকে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই সীতার সম্পূর্ণ নির্দোষিতা প্রমাণিত হয়েছিল, ফলে সর্ব্বজনসমক্ষে রাম তো এক রকম অপরাধী প্রতিপন্ন হয়েইছিলেন। অন্তত কতকটা অপ্রতিভ তো হওয়ার কথাই। বিশেষত, বাল্মীকির অতি গুরুতর শপথবাক্যের পরে তো তিনি অগ্নিপরীক্ষার আজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে পারতেন। করেননি বলেই বাল্মীকি সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বললেন। করেননি, এই ক্ষোভেই সীতা জীবনে এমনকী রাম সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ হয়ে পৃথিবীতে আশ্রয় চাইলেন। এর পরে রামের বিরহকে খুব গুরুত্ব দেওয়া যায় না। সীতাহরণের পরে রাম। এত উন্মাদের মতো আচরণ করেছিলেন যে ছোট ভাই লক্ষ্মণ তাকে বারে বারে আতিশয্য প্রকাশ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। অথচ যাঁর অন্ত বিরহোম্মাদ তিনি দীর্ঘ অদর্শনের পর প্রথম দেখেই সীতাকে বললেন, 'তোমার জন্যে যুদ্ধ করিনি, নিজের সম্মানের জন্যেই করেছি। যাও তুমি, তুমি সচ্চরিত্রই হও অসচ্চরিত্রই হও, তোমাকে 'ভোগ' করতে পারিনে, তুমি কুকুরে চাটা ঘি। লক্ষ্মণ ভরত যাকে হয় গ্রহণ করি।' মনে রাখতে হবে সেদিন লঙ্কায় সীতার চরিত্রে রাম ছাড়া আর কেউই সন্দেহ করেনি। রাম ছাড়া। অর্থাৎ লোকপবাদের কথা ওঠবার আগেই রাম নিজে সর্বপ্রথমে সীতাকে অপবাদ দিলেন। অসহায় নারীকে পরপুরুষ স্পর্শ করেছে, এই হল আমাজনীয় অপরাধ। সীতা বললেন, ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি, তুমি কি চোননি আমাকে? বললেন, আমার মতে তো তুমিই একমাত্র; যে দেহটার ওপরে আমার কর্তৃত্ব ছিল না সেটাই কি এত বড় হয়ে উঠল? মনের শুচিতা ও দেহের শুচিতাকে সমাজ সেদিনও পৃথক করে বিবেচনা করেনি, আজও করে না। তাই অশোকবনে থাকার সময়ে ইন্দ্র এসে সীতাকে দিব্য ক্ষীরা খাইয়ে

গেলেন, যাতে রাবণের অন্ন তাঁকে না গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ভবভূতির ভাষায় যথা স্ত্রণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনা জনঃ–সংসারে লোকে বাক্য ও নারীর শুচিতা মানতে চায় না।’ ওই যে পতি দেবতা, পতি নারীর একমাত্র গতি, পতির স্ত্রীকে সন্দেহ করবার অবাধ অধিকার এবং সে সন্দেহবশে স্ত্রীকে ত্যাগ করবার অধিকার, জনসাধারণের নারীর চরিত্রে সন্দেহ করবার এবং সে সন্দেহবশে নিরপরাধী নারীকে দণ্ড দেওয়ার অধিকার–এ সবই এসেছে অভিপৌরাণিক যুগের সামাজিক মূল্যবোধ এবং নারীর স্থান নিরূপণের একতরফা অধিকার থেকে। লক্ষণীয় যে, লঙ্কায় সীতাকে আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলতে দেওয়া হয়নি। প্রশ্নও করা হয়নি তার আচরণ সম্বন্ধে। তার একমাত্র অপরাধ রাবণ হরণ করবার সময়ে তাঁকে স্পর্শ করেছিল। পরপুরুষের স্পর্শ তখন এতবড় অপরাধ হয় যখন নারী একান্ত ভাবে অন্তঃপুরচারিণী হয়ে ওঠে। একটিমাত্র পুরুষ–স্বামী–ছাড়া অন্য কারও সঙ্গ তার পক্ষে তখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তার বিচারের পদ্ধতি হল: নির্দোষিত প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত ধরে নেওয়া হবে সে যে দোষী। সমাজের অনুরূপ কোনও একনিষ্ঠতার দাবি পুরুষের কাছে নেই। এবং নারী একনিষ্ঠতা, শুচিতা দিয়েও সমাজে সসম্মানের আসন অর্জন করতে পারে না। আমরণ পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

নারীর অবস্থার এই অবনমন রামায়ণ-এ অত্যন্ত স্পষ্ট। কাহিনির মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে আছে পূর্বতন যুগে নারীর কতকটা স্বাধীন আচরণ যেমন শবরী একাকিনী আশ্রমে বাস করেন। কিন্তু তার পাশাপাশি দেখি গৌতম অহল্যাকে মর্মান্তিক শাপ দেন। অর্থাৎ নারীর সামান্যতম স্খলন সমাজ ক্ষমা করে না। যদিও পুরুষের স্বলন সম্বন্ধে সে অনেক সহিষ্ণু।

মহাভারত-এ এ-চিত্র আরও প্রত্যক্ষ, ব্যাপক এবং নিঃসন্দিগ্ধ। যেহেতু মহাভারত-এর কলেবর রামায়ণ-এর চতুর্গুণ (রামায়ণ-এ শ্লোকসংখ্যা চব্বিশ হাজার, মহাভারত-এ এক লক্ষের কিছু কম এবং যেহেতু মহাভারত-এর রচনাকালের ব্যাপ্তি রামায়ণ-এর অন্তত দ্বিগুণ, সে জন্যে এখানে সমাজের যে চিত্রটি পাই তার পরিসর ব্যাপকতর। অতএব এর মধ্যে প্রাচীনতর কালের সমাজচিত্রও যেমন আছে, রামায়ণ-এর বহু পরবর্তীকালের চিত্রও তেমনই আছে। ফলে মহাকাব্যের কাহিনির সৃষ্টির আদিমতম যুগের–হয়তো বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরবর্তীর্ণ যুগের–যে চিত্র পাই, স্বভাবতই, তা রামায়ণ-এর চেয়ে অনেক প্রাচীন। এবং যেহেতু এর শেষতম সংযোজনটি রামায়ণ-এর শেষাংশের চেয়ে অন্তত দু্শ’(তিনশও হতে পারে) বৎসর পরের, সেহেতু এতে অভিপৌরাণিক সংযোজনগুলি আরও প্রত্যক্ষ ভাবে পুরাণধমী।

মহাভারত-এর আদিমতম অংশ থেকে শেষতম অংশের ব্যবধান অন্তত আটশত বৎসর; এই দীর্ঘকালের মধ্যে সমাজ তো একই অবস্থায় থাকেনি। ফলে বিবর্তনের চিত্রও মহাভারত-এ স্পষ্টতর। আদি ক্ষত্রিয়কাহিনি রচনার পরে কিছু নৈতিক কাহিনির সংযোজন হয়, যেগুলি সার্ব্বজনীন; দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে বিরাজিত। শেষতম অর্থাৎ দ্বিতীয় সংযোজনের কর্তী ভৃগুবংশীয় ঋষিরা, এটি ব্রাহ্মণ্য সংযোজন বলে খ্যাত। নারী ও শূদ্রের অবনমনের স্পষ্টতম চিত্র পাই এই অংশে।

আদি ক্ষত্রিয় কাহিনি যখন গাথারূপে রচিত হয় সেই প্রাচীন যুগে নারীর কতকটা স্বাধীন সঞ্চরণের ও আচরণের কিছু চিহ্ন মহাভারত-এ রয়ে গেছে। গান্ধারী বারে বারে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুযোগ করছেন, ধিকার দিচ্ছেন, বলছেন দুর্যোধনকে শাসন করতে, শাসন না মানলে ত্যাগ করতে; ধৃতরাষ্ট্র নিজে যে

পন্থাকে ন্যায় বলে বিবেচনা করেন তার অনুসরণ করছেন না–কাপুরুষতা ও অন্ধ পুত্রস্নেহের কারণে। (২:৭৫:৮-১০; ৫:১২২:৯)। প্রকাশ্য রাজসভায় স্বামীকে ভর্ৎসনা করে সমস্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্যে তাকে দায়ী করছেন। এখানে প্রচলিত অর্থে তিনি পতিব্রতা স্ত্রী নন। নারী হয়ে কৃষ্ণকে প্রকাশ্যে অভিশাপ দিচ্ছেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তিনি নিবারণ করতে পারতেন। অথচ করেননি বলে সবংশে নিধনের শাপ দিলেন তাকে। (১১:২৫:৪২) কুন্তী প্রচলিত অর্থে স্নেহময়ী জননী, কিন্তু, যখন তাঁর মনে হল পুত্রেরা ক্ষত্রিয়োচিত আচরণ করছে না, তখন তিনি বিদুলার উপাখ্যানটি কৃষ্ণের মুখে বলে পাঠালেন, যে উপাখ্যানে বিদুলা তার পুত্র রাজা সঞ্জয়কে ক্লীবোচিত নিষ্ক্রিয়তার জন্যে ধিক্কার দিচ্ছেন। (৫:১৩২-১৩৫) দ্রৌপদী তাঁর স্বামী স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে জীবনের নৈতিক, রাষ্ট্রিক ও দার্শনিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে প্রচণ্ড তর্ক করেছিলেন। (৩:৩৭, ৩০, ৩২, ৩৭) প্রচলিত অর্থে এবং পরবর্তী অনুশাসনের দৃষ্টিতে পতিব্রতার উপযুক্ত আচরণ এটা নয়। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে কুন্তী যখন অরণ্যবাসের বাসনা জ্ঞাপন করলেন তখন পুত্রদের কোনও যুক্তি ও অনুরোধ তিনি মানেননি। (১৫:১৬-১৭)। যদিও শাস্ত্র বলে, 'রক্ষান্তি স্থবিরে পুত্রাঃ,–বার্ধক্যে নারীর রক্ষা করবে পুত্ররাই।' দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে আশ্রমে রেখে চলে গেলেন। কয়েক বৎসর পরে শকুন্তলা বালকপুত্রটিকে নিয়ে রাজসভায় এসে প্রচুর কটুবাক্য বলে রাজাকে ভর্ৎসনা করলেন। (১:৬৯:১-২৭)। নারীর মুখে পুরুষের প্রতি এত কঠিন ধিক্কারবচন ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে অকল্পনীয়।

মহাভারতে নারী সোমপান করেন; (১৫:১৭:১৭) প্রকাশ্যে চলাফেরা করেন এবং নিজেদের সম্বন্ধে বহু সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেন। পিতৃমতী কন্যা পিতার অনুমতি ব্যতীত পুরুষের সঙ্গে মিলিত হন (শকুন্তলা, সত্যবতী এবং আরও অনেকেই); প্রয়োজন হলে নিজের ঈপ্সিত পুরুষটিকে পাওয়ার জন্যে প্রকাশ্য

রাজসভায় পিতা রাজার সঙ্গে তর্ক করে নিজের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন, যেমন সাবিত্রী। ভীষ্ম যখন অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকাকে হরণ করে আনেন তখন অম্বা তাকে জানান যে তিনি শাম্বরাজকে কামনা করেন। শুনে ভীষ্ম তাঁকে শাম্বের কাছে পাঠান। পরবর্তীকালের নারী সাহসই পেত না নিজের গোপন প্রেমের কথা পরপুরুষকে জানাতে; এবং সে পুরুষও তার প্রেমের মর্যাদা দিত না। পাণ্ডু কুন্তীকে বলেন ঋতুকালে নারী যে কোনও পুরুষের সঙ্গে সহবাস করতে পারে, তাতে কোনও দোষ নেই। (১:১১৩:২৫-২৬); এবং কুন্তী পর্যায়ক্রমে তিনজনের সঙ্গে মিলিত হন। দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে নল যখন চলে যান এবং দীর্ঘকাল যখন তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন, বয়ঃপ্রাপ্ত দুটি সন্তানের জননী দময়ন্তী অসংকোচে মা-কে বলেন নলের বিরহে তাঁর পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব নয় (৩:৫৩-৭৮), অতএব পুনর্বারা যেন দময়ন্তীর স্বয়ম্বর আহ্বান করা হয়।

পরের যুগে এমন একটা ব্যাপার কল্পনাও করা যায় না। কচ যখন দেবযানীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেন তখন দেবযানী তাকে শাপ দেন। সে শাপ ফলে যায়, এর দ্বারা মহাভারত-কার যেন বলছেন এ শাপ দেওয়ার অধিকার দেবযানীর ছিল। পরে শর্মিষ্ঠার বিবাহের যৌতুকরূপে সে যযাতির গৃহে আসে এবং সেখানে নিজের অনুরোধক্রমে, যযাতির গোপন প্রেমিক ও তাঁর সন্তানের জননী হয়। (১:৫৯) পরে শমিষ্ঠা যখন সব জানতে পারে তখন দেবযানী যযাতিকে মিথ্যাবাদী ও মুর্খ বলে তিরস্কার করে। রুরুর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে প্রমদ্বারা তাকে বিবাহ করেন। হিড়িম্বা ভীমসেনকে সম্মত করান। তার প্রেম গ্রহণ করতে ও তাকে বিবাহ করতে। তেমনই উলুপী ও চিত্রাঙ্গদাও উপযাচিক হয়ে অর্জুনকে প্রেম নিবেদন করেন, এদের বিবাহ করেন অর্জুন কিন্তু উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করেন। নারী স্বয়ং প্রেমপ্রাথিনী হয়ে পুরুষকে যুক্তি ও মিনতির দ্বারা সম্মত করাচ্ছে–এ চিত্র পরে বিরল হয়ে আসে। প্রথম যুগের রচনায় পুরুষ যখন নারীর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে প্রার্থনা জানায় তখন নারী

নিজের শক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শর্ত স্থাপন করে এবং পুরুষ তা স্বীকার করে; সত্যবতী, গঙ্গা, শকুন্তলা এর দৃষ্টান্ত। কৌরবদের মধ্যে নারীর বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এমন কথাও শুনি দ্রৌপদীর বিবাহের সময়ে বাদপ্রতিবাদে। (১:১২২: ৭) জটিলা এবং বাক্ষীও বহুপতিক ছিল এমন উল্লেখ আছে। (১:১৯৬:১৪-১৫) নারী নিজের অভিরুচিমত কুমারী থেকে পস্যা করতে পারত। তার দৃষ্টান্তও আছে। সিদ্ধা, শিবা (৫:১০৯:১৯) এবং শাণ্ডিলের তাপসী কন্যার (৯:৫৪:৬-৮) উল্লেখই তার প্রমাণ। পরে নারীর এ অধিকার সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হয়। ঋষি অত্রির স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে তপস্যা করতে যান। তার তপস্যায় প্রীত শিব তাকে সন্তানের বর দেন এবং তিনি সেখানেই শুধুমাত্র দৈব-বরেই সন্তানবতী হন। (১৩:১৪)

ব্রাহ্মণ সংযোজনে যেখানে নারী সর্বতো ভাবে গৌণ এবং পুরুষের অধীন, পূর্বতন অংশে পড়ি, যে প্রলুব্ধ করতে আসে সতী স্ত্রীর অশ্রু অগ্নি হয়ে তাকে দগ্ধ করে। (১:১৮২:৬)। এতে সতীত্বের মাহাত্ম্য ঘোষণার সঙ্গেই আছে, যে কোনও নারীকে নির্বিচারে ভোগ-অধিকারের অস্বীকৃতি, যা পরে তেমন ভাবে আর থাকেনি। তবুও, পূর্ববতী অংশে তার অশ্রুর অগ্নিতে পরিণত হওয়ার অপেক্ষা নেই, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রেমেরই সে শক্তি আছে; যে ব্যাধ দময়ন্তীকে কামনা করেছিল। সে দময়ন্তীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হওয়ামাত্রই ভস্মে পরিণত হল। এ নারী শক্তিমতী, এ অশ্রুপাত করে না, অন্যায়ের সামনে ক্রোধে জ্বলে ওঠে। সৈরিষ্ট্রীরূপিণী দ্রৌপদী কামুক কীচককে পদাঘাত করে, অপবাধীর দণ্ডের জন্যে অতি প্রাকৃতের প্রতীক্ষা করে না, অশ্রুপাতও করে না। (৪:১৬:১৯-২০) নারীর চরিত্র ও আচরণ নিয়ে শাস্ত্র যেখানে বহু নির্দেশ দিয়েছে সেই অংশে দৈবশক্তিতে দেবতার মধ্যস্থতায় অপরাধী দণ্ডিত হয়েছে; তার আগে অসংযত কামুকের প্রলোভন প্রতিহত করেছে নারী নিজেই উদ্যত

ক্রোধ ও ঘৃণা দিয়ে তর্ক করেছে, যুদ্ধ করেছে, অভিশাপ দিয়েছে, ভর্ৎসনা করেছে, পদাঘাত করেছে আত্মরক্ষার জন্যে।

মহাভারত-এ কামনায় প্রণোদিত হয়ে নারীপুরুষের মিলনের বিরুদ্ধে বিস্তর নিষেধ রয়েছে। বিবাহ ক্রমে ক্রমে প্রেমের একমাত্র আশ্রয়ভূমি হয়ে উঠল; কন্যা আর বেদের অনুশাসনে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজের রুচিমত সঙ্গী বেছে নেয় না–'স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনেচিৎ নির্দেশ মেনে'; বরং কন্যাকে এখন পিতা দান করেন তার রুচিমত পাত্রে। ব্যাপারটা ব্যক্তিগত থেকে কুলগত হয়ে উঠছে; ধর্মশাস্ত্রও বলেছে, কুলেই প্রদান করা হয় কন্যাকে। অথচ পূর্বতন অংশে বারবার দেখছি প্রেমে নারীর স্বাতন্ত্র্য ছিল, আপনি জীবনসঙ্গীকে সে নির্বাচন করতে পারত, পুরুষের মতোই প্রেমে, প্রেমানিবেদনে এবং প্রেমাস্পদকে নিজের অনুকূল করার চেষ্টা করার অধিকার তার ছিল, এর জন্যে সে নিন্দিত হত না। স্বয়ং ভীষ্মও অম্বার প্রেমের কথা শুনে তাকে ধিক্কার দেননি।

ব্যভিচারের অপরাধে নারী পুরুষের সমান দণ্ডের কথা দু-একটি স্থলে দেখা যায়; (১২:১৬৫৬৩) এমনকী ব্যভিচারে নারী নির্দোষ, কারণ পুরুষ বলাৎকার করলে নারী অসহায় এমন কথাও আছে। (১২:২৬৫:৪০) মহাভারত-এর প্রথম অংশে এমন বহু ব্যভিচারের কাহিনি আছে যার সম্বন্ধে বিচার বা দোষারোপ নেই, যেন তথ্যই পরিবেশিত হচ্ছে শুধু। এমনই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নরনারীর মিলনের ফলে মহাভারত-এর বহু মুখ্য নায়কেরই জন্মবেদব্যাস, ভীষ্ম, কর্ণ, পঞ্চপাণ্ডব এবং বহু উপনায়কের এ ভাবেই জন্ম। এত অসংকোচ এ ঘটনাগুলির বিবরণ এবং সে বিবরণে ওই মিলনের ধর্মীয়তা প্রতিপাদনের কোনও চেষ্টামাত্রই নেই। মনে হয় এমন বহু ঘটনা

লোকমুখে চলিত ছিল এবং সমাজে যে এমন ঘটনা ঘটে। থাকে সে সম্বন্ধে সমাজ অবহিত ছিল। তার সমর্থন বা নিন্দা কোনওটাই প্রকট ছিল না।

এই নিন্দ যখন উগ্র হয়ে উঠল তার আগে নারীর স্থান সমাজে অনেক মেনে গেছে; সে তখন কোনও পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি— হয়। পিতার, নয় স্বামীর। কন্যা বা পত্নী ছাড়াও সমাজে নারী আছে–সেই নারীসাধারণ সম্বন্ধে স্পষ্ট, উচ্চারিত বোধটি হল: নারী নরকের দ্বার। মোহিনীরূপে দেখা দেয় সে, পুরুষের কামনার উদ্রেক করে, অতএব পুরুষ প্রলুব্ধ হলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নারীরই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে ওঠার পরই তো না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করা'-র প্রশ্ন ওঠে। ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের বহু পূর্ব হতেই এ সময়ের সূচনা, যদিও এই সময়কার মনোভাব স্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ হয় ব্রাহ্মাণ্য সংযোজনেই। এই অংশে দেখি নারী অশুভ, সমস্ত অমঙ্গলের হেতু, কন্যা দুঃখের। (১:১৫৯:১১) শান্তিপর্বে মুমূর্ষুভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, ‘নারীর চেয়ে অশুভতর আর কিছুই নেই, বৎস, নারীর প্রতি পুরুষের কোনও স্নেহমমতা থাকা উচিত নয়। (১২:৪০:১; ১৩:৪৩:২৫) পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে এ-জন্মে নারী হয়ে আসতে হয়। (৬:৩৩:৩২) বা, নারী সপোর মতো, পুরুষের তাকে কখনওই বিশ্বাস করা উচিত নয়। (৫:৩৭:২৯) ত্রিভুবনে এমন কোনও নারীই নেই যে স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য। (১২:১০:২০) এতেও বোধ হয় যথেষ্ট হল না, তাই দেবতার দোহাই পাড়া হল: প্রজাপতির ইচ্ছা যে নারী স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য নয়। (১২:২০:১৪) যে ছটি বস্তু এক মুহুর্তের অসতর্কতায় নষ্ট হয় তা হল: গাভী, সৈন্য, কৃষি, স্ত্রী, বিদ্যা এবং শূদ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ। (৫:৩৩:৯০) নারী এক ধর্মাচরণে অধিকারিণী, শুধুমাত্র স্বামীর সঙ্গেই সে ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে। (৮:৪:১৩) এইটি অবশ্য বৈদিক যুগের শেষ পর্যায় থেকেই আছে, সম্ভবত যখন থেকে উপনয়নে তার অধিকার প্রত্যাহৃত হল তখন থেকেই। এবং তাও হল আর্যরা যেহেতু প্রাগার্য নারী বিবাহ করতে

থাকেন। অতএব আর্যবর্ণ ছাড়া অন্য কাউকে উপনয়ন দেওয়া কার্যত বন্ধ হয়ে গেল, দু-চারটি ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও।

বহু স্থানে সতী ও কর্তব্যপরায়ণা নারীর প্রশংসা আছে, (১:১১০ এবং অন্যত্র) তার চূড়ান্ত চরিতার্থতা হল ভক্তিতে স্বামীকে প্রসন্ন করা এবং তাঁর সন্তান ধারণ করা। কর্মনিষ্ঠ পতিব্রতা নারী হল তপস্বিনী, (১৩:১৪৬:৪৮-৫১) গৃহিণীর ভূমিকায় সার্থকতায় পুণ্য আছে এবং এ পুণ্যের প্রশংসায় মহাভারতের ব্রাহ্মাণ্য অংশ মুখর। প্রাচীনতর অংশে বহু বিধবা আছে। সত্যবতী, কুন্তী এবং বহু মৃত বীরের ও কৃষ্ণের স্ত্রীদের উল্লেখ আছে, এরা কেউই সহমৃতা হননি; শুধু মাদ্রী একই সহমৃতা হন এবং সেও সমাজের নির্দেশে নয়, ব্যক্তিগত অপরাধবোধে। এরা কেউই পুনর্বার বিবাহ করেননি, কিন্তু অম্বিক, অম্বালিকা নিয়োগপ্রথার দ্বারা সন্তান ধারণ করেছিলেন। প্রোষিতভর্ত্তকার জন্যে কঠোর নির্দেশ আছে, যাতে তার আচরণে শুধু চাপল্য নয় কোনও রকম সজীবতাও না প্রকাশ পায়। (১২:১২৩:১৬, ১৭) স্বামী কাছে থাকলে যথাসম্ভব মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে স্ত্রী তার সেবা করবে। যে স্ত্রী মধুরভাষিণী তার প্রশংসাও যেমন আছে, (৫:৩৩:৮৬) যে পরুিষভাষিণী তার নিন্দাও তেমনি আছে। (৫:৩৩:৮৪)। যে বধুর শাশুড়িকে গৃহকর্মকরতে হয় অথবা যে শাশুড়ির কোনও রকম নিন্দ করে তার পাপ হয়। (১৩:৯৩:১৩১) পতিব্রতা সতীর এমনই মাহাত্ম্য যে ধর্মব্যাধের উপাখ্যানে তপস্বীকে আসতে হল পতিব্রতার কাছে ধর্মে শিক্ষা নিতে। (৩:২০৫)

পরবর্তীকালে বিবাহিতা নারী শিবিকায় আরোহণ করে যাতায়াত করতেন (১:৭৩:২১, ৮০:২১; ৩:৬৯:২৩; ১৫:২৩:১২)। লঙ্কাকাণ্ডে যুদ্ধের শেষে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে সীতাও আসছিলেন শিবিকায়। তাঁরা পুরুষ সহযাত্রীর তত্ত্বাবধানে যাতায়াত করতেন। এবং অন্তঃপুরেও বসনে আবৃত, অবগুণ্ঠিত হয়ে বাস করতেন। (৫:৮৬:১৬; ১৫:১৫:১৩) সভায় যখন

আসতেন তাদের বসবার জন্যে স্বতন্ত্র একটি অংশ থাকত। (১:১৩৪:১২) বিবাহিতা নারী দীর্ঘদিন পিত্রালয়ে বাস করলেও সেটা নিন্দনীয় বলে গণ্য হত না, এতে নাকি তার যশ, চরিত্র ও গুণ নষ্ট হয়ে যায়। (১:৭৪:১২) অর্থাৎ ক্রমেই বিবাহিতা নারীর একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল শ্বশুরালয়। পিত্রালয়ে, দীর্ঘকাল বাস করলে নারী কলঙ্কিনী হয়। (৫:৩৯:৮০) কারণটা সহজেই অনুমান বরা যায়, তেমন নারীকে স্বামী-পরিত্যক্তা বা স্বামী ও শ্বশুরকুলের অপ্রীতিভাজন বলে মনে করা হত এবং তার চেয়ে বড় কলঙ্ক কমই ছিল। স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নারীর নিন্দা করে বলেছেন নারী হল সমস্ত অমঙ্গলের মূল; (১২:৬) ভীষ্ম বলেছেন নারীর দ্বারা বংশ কলঙ্কিত হয়; (১২:৪-৮); কৃষ্ণ বলেছেন নারী কলঙ্কিত হলে বর্ণসংকর হয় এবং তার থেকে চূড়ান্ত সর্বনাশ হয়। (৬:২৩:৪১)

ক্রমে ক্রমে কৈশোরের পরে নারীর বিবাহ বাধ্যতামূলক বলে গণিত হল, কুমারী নারীর কথা বড় একটা আর শোনা যায় না। কুণিগর্গের কন্যা বহুদিন তপস্যা করার পরে যখন স্বর্গে উত্তম স্থান লাভ করার জন্য দেহত্যাগ করতে উদ্যত হলেন তখন নারদ এসে তাকে বললেন কুমারী কন্যার জন্যে স্বর্গে কোনও সম্মানের আসন নেই, কারণ, সে অশুচি। অগত্যা ওই বর্ষীয়সী তাপসীকে বিবাহ করে তার পরে প্রাণত্যাগ করতে হল। (৯:৫২:১)। ওই অধ্যায়েই আর একটি অনূঢ়া নারীর কাহিনি আছে। যৌবনে তিনি বিবাহের অনেক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ কোনওটিই তার মনের মতো ছিল না। বহুদিন তপস্যা করার পরও তাকেও শুনতে হল অবিবাহিতা নারী অশুচি, অতএব একরাত্রির জন্য তাকে গালিবের স্ত্রী হতে হল যাতে তিনি স্বর্গেস্থান পান। তপস্বিনীসুলভা যখন রাজা জনকের সভায়দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনার জন্য আসেন তখন জনক নানা বিক্রপাত্মক কঠোর বাক্যে তাঁকে আলোচনা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। নিতান্তই জ্ঞানাথেষণায় এসে এত রূঢ় কথা শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি পরদিনই সভা ত্যাগ করে চলে যান।

(১২:৩২০) মনে পড়ে, গার্গীর প্রশ্নে কোণঠাসা হয়ে যাজ্ঞবল্ক্যও তাকে নিবৃত্ত করার প্রয়াসে বলেন,অতিরিক্ত প্রশ্ন কোরোনা, গার্গী, তোমার মাথা খসে পড়বে। এমন কথা কোনও পুরুষ বিদ্যার্থীকে তো জনক বা যজ্ঞবল্ক্য বলেননি কখনও। এ-কাহিনিগুলি থেকে বোঝা যায়, প্রথমত, অবিবাহিতা নারীকে নিয়ে সমাজ স্বস্তি পেত না, বিবাহ তার পক্ষে তাই বাধ্যতামূলক হয়ে উঠল। জরৎকারু ঋষির ক্ষেত্রভিন্ন, সেখানে তিনিবিবাহ করে পুত্রসন্তান উৎপাদন না করলে পূর্বপুরুষদের পিণ্ড-তর্পণের ব্যবস্থা হয় না, তাই তার বিবাহের প্রয়োজন; তাঁর নিজের স্বর্গপ্রাপ্তির বাধা হত না তপস্যায়। বস্তুত শাস্ত্রে, সাহিত্যে আমরা বহু অকৃতদার তপস্বীর কথা পাই যাঁদের কৌমার্যের জন্যে স্বর্গলাভে কোনও ব্যাঘাত হয়নি। দ্বিতীয়ত, শিক্ষিতা নারী সংখ্যায় নিতান্তই মুষ্টিমেয় ছিল বলে সহসা কোনও বিদুষী ও বুদ্ধিমতী নারীর সামনে এলে পুরুষ কিছু বিচলিত বোধ করতেন। ব্রহ্মজ্ঞানের ফল যে সমদর্শিতা সেটা তো নারী ও শূদ্রে এসে বরাবরই ঠেকে গেছে, শিক্ষিতা নারী তাই প্রতিপক্ষ পুরুষের উষ্মাই জাগাত, শিক্ষাথিনী হয়ে এলেও পুরুষ হয়তো নিরাপদ বোধ করত না।

নারীর কাছে সমাজের প্রত্যাশা হল সে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ও গৃহকর্মনিপুণ হবে স্বামী ও শ্বশুরকুলের জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করবে, সন্তান, মুখ্যত পুত্রসন্তানের জন্ম দেবে। তাদের লালন এবং স্বামী ও তার আত্মীয়দের সেবা করবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তার মন, চিন্তা, ব্যক্তিত্ব থাকবে না। সে ছায়ানুগামিনী হবে তার স্বামীর। যদিও তেমন স্ত্রীর ভাগ্যেও সন্দেহ ও লাঞ্ছনা। জুটবে, এ আমরা সীতার ভাগ্য থেকেই জানি। নারীর, বিশেষত স্ত্রীর প্রতিশব্দগুলি, লক্ষ্য করলেও খানিকটা বোঝা যায় সমাজে তার স্থান কী ছিল। রামায়ণ মহাভারত-এই বর্ণনা ও সম্বোধনে প্রথম এ শব্দগুলির দেখা মেলে; পরবর্তী সাহিত্যে এই জাতীয় বিশেষণাত্মক শব্দ চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে থাকে। কয়েকটি

দেখলেই বোঝা যাবে কোন সংজ্ঞায় নারী সমাজে ও সাহিত্যে আবির্ভূত—ভার্যা, যাকে ভরণ করা হয়, ভৃত্যের সঙ্গে এর পার্থক্য শুধু প্রত্যয়টিতে। এইখানেই পুরুষের জোর স্পষ্টত, নারীকে সে অন্ন জোগায়, নারীকে কারণ নিজের ভরণপোষণ অর্জন করার মতো বিদ্যা তাকে দেওয়া হত না। বৃত্তিতে বা সম্পত্তিতে তাকে অধিকারও দেওয়া হত না; তাই সে একান্তই নির্ভরশীল ছিল স্বামীর ওপরে। কামিনী, রমণী, কান্তাশেষের দুটি শব্দ পুংলিঙ্গে ‘প্রিয়া’ বোঝায়, অর্থাৎ একটি নারীর পক্ষে যে পুরুষ প্রিয় সে তারই রমণ ও কান্ত; কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিনিরপেক্ষ এই সংজ্ঞা, যেন তার ধর্মই পুরুষের তৃপ্তিবিধান করা। আর একটি প্রতিশব্দ, জায়া, যাতে পুরুষ সন্তানরূপে জাত হয়। এছাড়াও বর্ণনাত্মক সম্বোধনগুলির অধিকাংশই দেহের অনুষঙ্গ বহন করে–যেমন রম্ভোরু, সুশ্রোণী, পীনস্তনী, ইত্যাদি (আরও নিচে, কতকটা অপমানসূচক অথচ বহুলব্যবহৃত শব্দ বরারোহা, ইত্যাদিও আছে।) মুখ্যত যৌনসম্ভোগের বস্তুরূপেই নারীর পরিচয়।

নারীকে সমাজে স্থান দেওয়ার প্রশ্নই যাতে না ওঠে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা ছিল। যেমন দুই একটি ব্যতিক্রম বাদে সাধারণ ভাবে শিক্ষায় নারীর অধিকার ছিল না। এই সময়কারই রচনা মনুসংহিতা। পুত্রের শিক্ষাব্যবস্থার বিধান দেওয়ার পর বলেছে, কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ, কন্যাকেও এই রকম শিক্ষা দিতে হবে এবং অতি যত্নে পালন করতে হবে। কিন্তু ঠিক তার পরেই বলা আছে, নারীর পক্ষে বিবাহ হল উপনয়ন, পতিগৃহে বাস হল গুরুগৃহে বাস এবং পতিসেবা হল বেদধ্যয়ন। (মনুসংহিতা ২:৬৭) অর্থাৎ বিবাহ করে পতিগৃহে থেকে পতিসেবা করাই তার বেদপাঠের বিকল্প, তাতে একই ফল লাভ করবে। ফল যাই লাভ করুক না কেন বিদ্যা তো সে লাভ করল না। এটা ঠিক যে,

পুরাকল্পে তু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।

অধ্যাপনঞ্চ বেদনাং সাবিত্রীবচনং তথা।।
পুরাকল্পে কিন্তু নারীদের উপবীত ধারণ, বেদ অধ্যাপনা এবং সাবিত্রী পাঠ (প্রবর্তিত) ছিল। (স্মৃতি চন্দ্রিকা, সংস্কারকাণ্ড, মহীশূর সংস্করণ, ৬২ পৃষ্ঠা)

কিংবা হারীতধর্মশাস্ত্র-তে পড়ি, দ্বিবিধা স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃসিদ্যোবধাবশাচ— নারী দু-প্রকারের, ব্রহ্মবাদিনী ও সদোবধূ। তৎসত্ত্বেও সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের ব্রহ্মবাদিনীদের আঙুলে গোণা যায়। বাকি সবই তো বন্ধু, যাদের পতিসেবাই হল বেদাভ্যাস। শিক্ষা ছাড়াও সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ছিল না। এর ফলেও সমাজে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে স্থান পাওয়াও তার পক্ষে কঠিন ছিল, কারণ ভরণপোষণের জন্য তাকে পরমুখাপেক্ষী হতেই হত, তা সে পিতাই হোক বা স্বামীই হোক। তৃতীয়ত, কোনও অর্থকরী বৃত্তির শিক্ষা বা ব্যবহার তার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; হয়তো সমাজের একেবারে নিচের স্তরের মেয়েরা কুটিরশিল্প, ইত্যাদি বৃত্তিকরী বিদ্যার চর্চা করে সংসারে সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্য করতে পারত। কিন্তু, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত স্তরে নারীর কোনও বৃত্তির কথা রামায়ণ বা মহাভারত-এ (বা অন্যত্র কোথাও বড় একটা) পাওয়া যায় না। ফলে সে পুরুষের ওপরে আর্থিক ভাবে নির্ভরশীল হতে বাধ্য হত। চতুর্থত, সমসাময়িক শাস্ত্রে ও সাহিত্যে দেখি, নারীর নিজের দেহের ওপরেও কোনও অধিকার ছিলনা। একমাত্র ব্যতিক্রম গণিকা, যার শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করত। তার দেহের ওপরে বেশ খানিকটা স্বাধীনতা তার ছিল এবং সে অন্নবস্ত্রের জন্যে কোনও পুরুষের দয়ার ওপরে নির্ভর করত না। যত গর্হিতই হোক তার বৃত্তি–এবং নিঃসংশয়ে তা অত্যন্ত গর্হিত ছিল–তার দ্বারা সে স্বাধীন ভাবে উপার্জন করতে পারত।

গণিকাই হোক কুলবধূই হোক, পুরুষের মনোরঞ্জনের দ্বারাই নারীর ভরনপোষনের সংস্থান হত। মর্তের গণিকা স্বর্গের অপ্সরারূপে চিত্রিত–তাদের

বিবরণ যা পাই তা থেকে সমাজে রূপোপজীবিনীর আচরণ, ভূমিকা ও স্থান জানা যায়। রামায়ণ মহাভারত-এ সর্বত্রই অপ্সরা আসে ঋষির ধ্যানভঙ্গ করতে বা অন্য ভাবে ইষ্টসিদ্ধি করতে–যেমন ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানে। এরা রূপসী তরুণী, কিন্তু এদের ভূমিকা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়; ইন্দ্র বা অন্য দেবতারা কোনও ঋষির তাপে বা যজ্ঞে অসহিষ্ণু ও বিচলিত বোধ করলে অবসরা পাঠিয়ে তাদের ধ্যানভঙ্গ ঘটাতেন। ইষ্টসিদ্ধি হলে পর এরা স্বর্গে ফিরে আসত। এই যে চিত্তবৃত্তিবর্জিত দেহসর্বস্ব তরুণীর কল্পনা, মোটের ওপর এই ছিল নারীর কাছে পুরুষের প্রত্যাশা। সে যেন শুধুই ভোগ্যবস্তু; তা না হলে রাম উষ্চারণ করে সীতাকে বলতে পারতেন না, 'নোৎসাহে পরিভোগায়– (তোমাকে) ভোগ করতে পারি না।'

নারীর এই ভোগ্যবস্তু ভূমিকা রামায়ণ মহাভারত-এ নানা ভাবে চিত্রিত আছে। প্রথমত উপাখ্যানে। অসংখ্য উপাখ্যানে নারী এই ভূমিকায় অবতীর্ণ। একটি কাহিনি উল্লেখ করা যেতে পারে:

'ঋষিকুমার গালব যযাতির কাছে এলেন। গুরুদক্ষিণা দেওয়ার সংগতি নেই। তাই রাজা যদি তাকে অর্থসাহায্য করেন। ঠিক সেই সময়ে যযাতির অর্থসংকট ছিল, তাই গালিবকে বললেন, তুমি আমার এই সুন্দরী তরুণী কন্যা মাধবীকে নিয়ে যাও। কোনও রাজার কাছে এক বৎসরের জন্যে একে দিলে রাজা এর কাছ থেকে যে পুত্রসন্তান লাভ করবেন তার বিনিময়ে তোমাকে অর্থ দেবেন। গালিব মাধবীকে নিয়ে পরপর তিনজন রাজাকে এক এক বছরের জন্যে ভাড়া দিলেন। বিনিময়ে যে অর্থ পেলেন তা দিয়ে অবশেষে তাঁর গুরুদক্ষিণার উপযুক্ত অর্থ সঞ্চিত হল। তখন তিনি মাধবীকে পিতা যযাতির কাছে এনে ফিরিয়ে দিলেন।' (মহাভারত ৫.১১৮-২২)

এ কাহিনিতে নারীর স্থান মর্মান্তিক রূপে স্পষ্ট। প্রথমত পিতা নিজে অর্থদান করতে না। পেরে কুমারী কন্যাকে প্রায় গণিকাবৃত্তিতে ঠেলে দিচ্ছেন, নিজে ব্রাহ্মণকুমারকে গুরুদক্ষিণার অর্থ দেওয়ার পুণ্যটি লাভ করবার জন্যে। দ্বিতীয়ত সমাজে এমন অন্তত তিন জন রাজা পাওয়া গেল। যারা সুন্দরী তরুণী কুমারীটির দেহ এক বৎসরের জন্য ভাড়া করতে দ্বিধা করেন না; পুত্রসন্তান লাভ করার কি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন উপায়। তৃতীয়ত ব্রাহ্মণ ঋষিকুমার অনায়াসে এ-কদর্য উপায়ে লব্ধ অর্থ নিলেন এবং নিজের উদ্যমে তিন জন রাজার কাছে মাধবীকে বাঁধা দিয়ে সে অর্থসংগ্রহ করলেন। চতুর্থত, এই ভাবে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে গুরুদক্ষিণা দিতে তার বাধল না। কাহিনিটির কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এই ভাবে যে মেয়েটির লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ হল যযাতি তাকে বিবাহ করতে বললেন, সে সম্মত হল না, তপস্যা করতে গেল। যযাতি স্বর্গে যাওয়ার সময়ে দেখা গেল তাঁর সঞ্চিত পুণ্যে কিছু কম পড়ছে, তখন মাধবীর পুণ্য থেকে সেটুকু পুরণ করে তিনি স্বর্গে গেলেন। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ঐহিক পারমার্থিক সর্বপ্রকার বঞ্চনাই মাধবীর ভাগ্যে জুটল। এসবের পশ্চাতে সমাজমানসে যে বোধটি সক্রিয় ছিল তা হল: নারী ব্যক্তি নয়, বস্তু এবং ভোগ্যবস্তু।

এই বোধ বারে বারে প্রমাণিত হয় যখন দেখি হস্তী, হিরণ্য, রথ, অশ্ব, ভূমি, ইত্যাদির সঙ্গে নারীও যুক্ত হচ্ছে দানের তালিকায়। (১:১৯৮:১৬, ৮১; ৮১:৩৭; ২২১:৪৯; ৪:৩৪:৫; ১৫:১৪:৪ এবং অন্যত্র বহু স্থানে) এ দান বিবাহে, শ্রাদ্ধে, বিজয়োৎসবে, অতিথি আপ্যায়নে যজ্ঞে এবং সামাজিক নানা অনুষ্ঠানে। অর্থাৎ নারীর দেহ ও শ্রম পুরুষের ভোগ্যবস্তু, এ নিয়ে শাস্ত্রকারদের কিছুমাত্র কুণ্ঠা নেই। এবং এ প্রথা চলে আসছিল বৈদিক কাল থেকেই। মহাভারত-এ একাধিক কাহিনি আছে যেখানে অতিথিকে আপ্যায়ন করতে গৃহস্বামী আপনি স্ত্রীকে পাঠাচ্ছেন তার শয়নকক্ষে। কখনও বা অতিথির স্বরূপ পরে ধ্যানযোগে জানা যাচ্ছে যে তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম; কিন্তু প্রশ্ন

থেকে যায়; স্ত্রীকে পাঠাবার সময়ে (বা গুরুর অবর্তমানে শিষ্য। যখন গুরুপত্নীকে অতিথির কাছে পাঠায়)। তখন তো জানা ছিল না যে, অতিথি সাক্ষাৎ ধর্ম, তখন মানুষ জেনেই তো পাঠানো হয়েছিল।

নারী যে প্রলোভন সে কথা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার জন্য এক নারী অপ্সরা পঞ্চচূড়াকে দিয়েই বলানো হয়েছে নারীর কামবৃত্তি স্বভাবতই পুরুষের থেকে অধিক। (১৩:৩৮) অপ্সরা হল গণিকার স্বর্গের প্রতিরূপ; তাহলেও এ আখ্যান উদ্দেশ্যমূলক তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন, আদিকালে পুরুষ এতই ধর্মপরায়ণ ছিল যে দেবতাদের ঈর্ষা হল। তাঁরা তখন নারীর সৃষ্টি করলেন পুরুষকে প্রলুব্ধ করে ধর্মত্যুত করবার জন্য। (১৩:৪২) বাইবেল-এ ঈভের ভূমিকা স্মরণীয়। তবু ঈভ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আদমকে প্রলুব্ধ করেনি, স্বয়ং শয়তান তাকে প্রেরণা দিয়েছিল। মহাভারত-এ নারীর স্বভাবই হল পুরুষের অধঃপতন ঘটানো। স্বয়ং দেবতারা তাকে এ কাজের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম যুগের রচিত অংশে নারী পুরুষের সমকক্ষ না হলেও অনেক অংশে তার আচরণের স্বাধীনতা ছিল; তার চিন্তা করার ক্ষমতা এবং স্বতন্ত্র মানসিকতা স্বীকৃত হয়েছিল। অর্থাৎ তখন সে ব্যক্তি ছিল, বস্তুতে পরিণত হয়নি, যদিও তার চেতনার গভীরে ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল পুরুষের তুলনায় সে হীনতর জীব এবং তার ওপরে পুরুষের যেন এক বিধিনির্দিষ্ট অধিকার আছে। একটি উপাখ্যান অনুধাবন করলে এটি স্পষ্ট হয়। দ্যুতসভায় যুধিষ্ঠির যখন জুয়াতে একে একে সব সম্পত্তি, ভাইদের এবং নিজেকেও বাজি রেখে হারলেন, আর কিছুই যখন অবশিষ্ট রইল না। তখন কৌরবদের প্ররোচনায় দ্রৌপদীকে বাজি রেখে খেললেন, এবং হারলেন। কৌরবদ্যুত যখন অন্তঃপুরে দ্রৌপদীকে এ সংবাদ দিল, মনস্বিনী নারী তাকে প্রশ্ন করলেন, যুধিষ্ঠির কি আগে নিজেকে বাজিত হেরেছেন, না। আগে আমাকে বাজি রেখে হারিয়ে পরে

নিজেকে হেরেছেন?’ অর্থাৎ আগে নিজেকে হারলে তো দ্রৌপদী তখন আর তাঁর সম্পত্তি নন। এ প্রশ্নের মধ্যে দ্রৌপদীর স্বাধীন চিন্তার পরিচয় আছে। কিন্তু ওই তেজস্বিনী নারীও অবহিত ছিলেন না যে, আগে হোক পরে হোক তাঁকে বাজি রাখার অধিকারই যুধিষ্ঠিরের ছিল না। এই ধরনের ছোটখাট উক্তি ও ঘটনার মধ্যেই ধরা পড়ে সমাজে নারীর স্থান তখনই এতটাই অবনমিত যে চেতনায় নারী অধীন হয়ে রয়েছে।

সাবিত্রীর উপাখ্যানে নারীর পূর্বতন কিছু স্বাধীনতা দেখতে পাই। রাজা অশ্বপতি পুত্রের জন্য বর চেয়ে পেলেন তেজস্বিনী কন্যা, সাবিত্রী। সাবিত্রী যৌবনে উপনীতা হলে অশ্বপতি সেই জ্বলন্তীমিব তেজসা’ কন্যাকে বললেন:

ইদং মে বচনং শ্রাত্বা ভর্তৃরন্বেষণে ত্বর।

দেবতানাং যথা বাচ্যে না ভবেয়ং তথা কুরু।।

আমার এই কথা শুনে স্বামীর সন্ধানে ত্বরান্বিত হও, যাতে আমি দেবতাদের কাছে নিন্দিত না হই। (৩.২৭৭.২৬)

তখন সাবিত্রী বৃদ্ধ সচিবদের সঙ্গে নিয়ে রথে চড়ে রাজর্ষিদের তপোবনে অন্বেষণ করতে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন সভায় নারদ অশ্বপতিকে অনুরোধ করছেন কন্যার বিবাহের জন্যে। অশ্বাপতি সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন দুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে তিনি নির্বাচন করেছেন। নারদ সত্যবানের নানা গুণের প্রশংসা করে বললেন তাঁর একমাত্র দোষ হল, তার পরমায়ু মাত্র এক বৎসর। শুনেই অশ্বপতি সাবিত্রীকে বললেন, তুমি অন্য কাউকে বরণ কর, সাবিত্রী। সাবিত্রী বললেন:

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।

সকৃন্দাহ দদানীতি স্ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ।।

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নিগুণোপি বা।
সকৃদ্ধৃতো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম।।
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ।।
(অংশবিভাগের সময়ে) ভাগ একবারই পড়ে; কন্যাকে একবারই সম্প্রদান করা হয়; 'দান করলাম' এ কথা একবারই বলা হয়–এ তিনটি একবার একবারই হয়। দীর্ঘায়ু অথবা অল্পায়ু হোন, গুণবান অথবা নিগুণ হোন, একবার স্বামীকে বরণ করেছি, দ্বিতীয় কাউকে বরণ করব না। লোক মনে নিশ্চয় করে, কথায় উচ্চারণ করে বলে, পরে (সেট) কাজে করে; এ ব্যাপারে আমার মনই প্রমাণ। (৩:২৭৮:২৫-২৭)

এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে, পিতা অশ্বপতি এবং দেবর্ষি নারদ দুই মান্যজনের নির্দেশ পরামর্শ উপেক্ষা করে, প্রকাশ্য রাজসভায়, সাবিত্রী যাঁকে ভালবেসেছেন। তাঁকেই বিয়ে করবেন। এই মর্মে তর্ক করলেন এবং তার মত উপেক্ষিত হল না। তিনি যাঁকে চেয়েছিলেন তাকেই বরণ করতে পারলেন। সমাজের এই স্থিতিস্থাপকতা, যা গান্ধর্ববিবাহেও স্বীকৃত, তা ক্রমেই লুপ্ত হয়ে গেল। এই সব নারীরা–সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী–এরা গভীর প্রেমের বশে স্বামীর জন্যে যে ত্যাগাস্বীকার করেছেন, পরবর্তী যুগে সেইটে পতিব্রতা ধর্মের অনুশাসনে পরিণত হল কিন্তু যে শক্তিতে তারা তা করতে পেরেছেন সেই মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের সার্বভৌমতা, তার কোনও স্বতঃস্ফূর্তি স্বীকার করবার শক্তি সমাজে আর রইল না।

ফলে পতিব্রতাধর্ম কতকগুলি যান্ত্রিক নির্দেশের সমাহারে পরিণত হল; এর খুব ভাল একটি দৃষ্টান্ত বনপর্বে যেখানে সত্যভামা দ্রৌপদীকে প্রশ্ন করছেন, পাঁচটি স্বামীকে তুমি কী উপায়ে তুষ্ট এবং বশীভুত রেখেছ?

তব বশ্যা হি সততং পাণ্ডবাঃ প্রিয়দর্শনে।
মুখাপেক্ষাশ্চ তে সর্বে তত্ত্বমেতদব্রবীহি মে।।
অয়ি প্রিয়দর্শনে, পাণ্ডবরা যে সর্বদাই তোমার বশে আছে, তোমার মুখাপেক্ষী হয়ে আছে তার রহস্যটি আমাকে বল। (৩:২২২:৫)

সত্যভামা জানতে চাইলেন কোনও রাসায়নিক চুর্ণ বা মন্ত্র দ্রৌপদী ব্যবহার করেন কিনা। দ্রৌপদী বললেন:

ন জাতু বশগো ভর্তা শ্রিয়াঃ সান্মন্ত্রকারণাৎ (৩:২২২:১২)
ওইসব যারা ব্যবহার করে,
পাপানুগাস্তু পাপাস্তাঃ পতীনুপসৃজন্তুত।
ন জাতু বিপ্রিয়ং ভর্তুঃ স্ক্রিয়াঃ কার্য্যং কথঞ্চন।
তারা পাপিষ্ঠ, পাপের অনুসরণ করে স্বামীদের ক্ষতি করে। স্বামীর অপ্রিয় কিছু করা স্ত্রীর কখনও উচিত নয়। (১৬)

পরে দ্রৌপদী বললেন কি করে তিনি পাঁচটি স্বামীকে তুষ্ট রাখেন:
দুর্ব্যাহৃতচ্ছকিমানা দুঃখিতাদ্দুরবেক্ষিতাৎ।
দুরসিতাদুর্ব্বজিতাদিঙ্গিতাধ্যসিতাদপি।।
না ভুক্তব্বতি নামাতে নাসংবিদেষ্ট চ ভর্তরি।
ন সংবিশামি নামামি সদা কর্মকারেন্থাপি।।
নিরত্যাহং সদা সত্যে! ভর্তৃণামুপসেবনে।
পত্যাশ্রয়ো হি মে ধর্মে মতঃ স্ত্রীণাং সনাতনঃ।
সব দেবঃ সি গতিনান্য তস্য কা বিপ্রিয়ং চরেৎ।।
মন্দ কথা বলতে আমার শঙ্কা হয়, দুঃখিত হয়ে অপ্রিয় ভাবে দৃষ্টিপাত

করতেও, অপ্রিয় ভাবে থাকতে, চলতে, ইঙ্গিত করতে, আসন গ্রহণ করতেও শঙ্কা হয়। (২০) স্বামীর এবং ভৃত্যদের ভোজন সাঙ্গ না হলে আমি আহার করি না, স্নান সমাপ্ত না হলে স্নান করি না, তিনি না উপবেশন করলে বসি না। (২৩) সত্যভামা, আমি অহরহ স্বামীদের সেবায় নিরত। আমার মতে স্ত্রীদের সনাতন ধর্মপতিকে অবলম্বন করেই। (২৮) স্বামীই দেবতা, স্বামীই গতি, এমন যে স্বামী কে তার অপ্রিয় আচরণ করবো? (৩৫) নিজের আচরণ সম্বন্ধে দ্রৌপদী আরও বলছেন:

অহং পতীয়াতিশয়ে নাত্যশ্নে নাতিভুষয়ে।
নাপি পরিবদে শ্বশ্রূং সর্বদা পরিযান্ত্রিতা।

আমি স্বামীদের চেয়ে বেশি শয়ন, ভোজন ও অলংকরণ করি না। শাশুড়ির সঙ্গে তর্ক করি না, সর্বদা বশবর্তিনী হয়ে থাকি। (৩৬)

এই দ্রৌপদী প্রাথমিক ক্ষত্রিয়কাহিনির দ্রৌপদী নন, আর কিছু না হোক স্বামীদের বিশেষত জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ স্বামী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তিনি শুধু তর্ক করেননি, প্রচুর ধিক্কার এবং অনুযোগ করেছেন। দ্রৌপদীর এত বশংবদ রূপ মূল কাহিনিতে পাওয়া যায় না; ব্রাহ্মণ্য অংশের রচয়িতা যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য এক দ্রৌপদী সৃষ্টি করলেন। এর শক্তির আর একটি উৎস ওইখানেই দেওয়া আছে:

সর্বংরাজ্ঞঃ সমুদয়।মায়ং চ ব্যয়মেব চ।

একাহং বেগ্নি কল্যাণি! পাণ্ডবানাং যশস্বিনাম।

একাহং বেগ্নি কোশং বৈ পতীনাং ধর্মচারিণাম।

কল্যাণি! রাজার ও যশস্বী পাণ্ডবদের সমস্ত আয় এবং ব্যয় একা আমিই

জানি। (৫১) ধর্মচারী স্বামীদের ধনভাণ্ডারের বিষয়ে একা আমিই জানি। (৫৪)

এ দ্রৌপদী মূল কাহিনির, যার ব্যক্তিত্বকে নানা ভাবে সম্মান দেখিয়েছেন কবি। পরবর্তীর্ণ

ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের কালে শেষদিকের ধর্মসূত্রগুলির চাপে সম্পত্তিতে নারীর কোনও অধিকার ছিল না। অবশ্য এখানেও দ্রৌপদী আয়ব্যয়ের অধিকারিণী, সে কথা বলা নেই। বলা আছে, তিনি শুধু সব কিছুর খবর এবং হিসাব রাখেন। তবু ধর্মসূত্রে যেখানে স্বামীর ধন স্বামীর প্রবাসে থাকাকালে স্ত্রী শুধু প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারেন, দান করতে পারেন না, সে যুগের পরে স্বামীরা আয়ব্যয়ের সমস্ত ব্যাপার স্ত্রীর গোচর করে রাখতেন এমন মনে করবার কোনও হেতু নেই। মনু এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রকাররা এ ব্যাপারে রূঢ় ভাবেই স্পষ্টভাষী। দ্রৌপদী ক্ষত্রিয়কাহিনির নায়িকা, তিনি কিছু কিছু অধিকারে স্বামীদের কাছে সমতা ভোগ করতেন–এ সেই প্রথম যুগের নারীর বর্ণনা। তাঁর সঙ্গে তুলনা কুন্তীর, গান্ধারীর, যাঁরা প্রয়োজন মতো স্বামীর সঙ্গে তর্ক করেছেন, স্বামীকে দোষারোপ করেছেন, গঞ্জনা দিয়েছেন। অর্থাৎ এ সেই যুগের চিত্র যখনও নারীকে সর্বতো ভাবে পুরুষের বশ্যতাস্বীকার করতে হয়নি। মানুষ হিসেবে, সমাজে ব্যক্তি হিসেবে কিছু মর্যাদা তার অবশিষ্ট ছিল।

ব্রাহ্মণ্য সংযোজন

যাকে এখন আমরা হিন্দু ধর্ম বলি ধর্মসূত্র ততটা তার ধর্মগ্রন্থ নয়, যতটা দুটি মহাকাব্য, কুড়িটি ধর্মশাস্ত্র, আঠারোটি মহাপুরাণ এবং বেশ কয়েকখানা উপপুরাণ। এর মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতই আদিমতম পর্বের গ্রন্থ এবং

প্রথমেই দেখেছি দুটিরই অন্তত দুটি স্পষ্ট ভাগ–মূল ক্ষত্রিয়কাহিনি ও ব্রাহ্মণ্য সংযোজন। মূল অংশ মনে হয় রচনার বেশ কয়েকশো বছর পূর্ব হতেই গাথা ও কাহিনিরূপে জনমানসে বিদ্যমান ছিল; ভাটচারণদের গানে আবৃত্তিতে লোকমুখে সঞ্চরমাণ ছিল। ফলে পরবর্তী সংযোজকরা এ অংশে বিশেষ হস্তক্ষেপ করতে পারেননি। ইচ্ছার অভাবে নয়, শুধু কাহিনির যে-রূপটি দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে কাব্যগুণে অমর হয়ে ছিল তার পরিবর্তন সাধারণ শ্রোতা মেনে নেবে না বলে। সে জন্যে যখন মূল মহাকাব্য দুটি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তখন এই পর্যায়ের সংযোজকরা এ দুটিকে পর পর হাতে নিলেন তাদের বক্তব্য, বিধিনিষেধ, অনুশাসন এই জনপ্রিয় আধারে ভরে দেওয়ার জন্যে। এতে তাদের শ্রোতা হন। সমগ্র সমাজ। রামায়ণ-মহাভারত-এর কাব্যরসে যাঁরা মুগ্ধ তাঁরা এখন বাধ্য হয়েই মহাকাব্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এই সব প্রক্ষিপ্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিপৌরাণিক তত্ত্ব শুনতে লাগলেন। এগুলি অভিপৌরাণিক, কারণ পুরাণে যে সামাজিক তথা ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রচারিত তার প্রথমতম রূপ এই প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতে পাই। এগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কারণ এগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের তদানীন্তন নবতম যে বিবর্তন পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম আখ্যা পেল তার নিজস্ব যে মূল্যবোধ তার প্রকাশ এখানে; এ মূল্যবোধের দুটি প্রধান দিক প্রথমত শূদ্রের দ্বিতীয়ত নারীর অবমূল্যায়ন। তৃতীয়ত ব্রাহ্মাণের মহিমাকীর্তন, চতুর্থত সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রবর্তন যথা শৈব, বৈষ্ণব, ইত্যাদি। এগুলি যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা এদের বক্তব্যেই স্পষ্ট এবং এগুলির অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক পুরোহিতের রচনা যারা সকলে শিক্ষিত ছিল না। ফলে এ অংশগুলি কাব্যমূল্যে নিকৃষ্ট।

নারীর অবমূল্যায়ন সমাজ নানা কারণে প্রয়োজনীয় মনে করেছিল। এখন যুক্তি উপস্থাপিত করা হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত বহু বহিঃশত্রুর আক্রমণে তখন উত্তর ভারত বিপর্যস্ত, তাদের মধ্যে অনেকেই দাসুয়, যাদের আক্রমণ থেকে নারীকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য ছিল

তাই অবরোধ প্রথা বিস্তৃতি ও কঠোরতা লাভ করে। এ যুক্তি তুর্কি আক্রমণ সম্পর্কেও দেওয়া হয়। নারী শিক্ষিত, স্বাবলম্বী হলে যতটা অসহায় হয়। অশিক্ষিত পরমুখাপেক্ষী হলে অবশ্যই অনেক বেশি হয়; কাজেই এই সব কুযুক্তি নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যেই সৃষ্ট। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজে যখন বাড়তে লাগল তখন বিশেষ সুবিধাভোগী একটি শ্রেণি সৃষ্ট হল, যে শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্যেই নারী তার পূর্বেকার অধিকার থেকে উত্তরোত্তর বঞ্চিত হতে লাগল। এই স্বার্থ হল সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্যে। পরিবারের পুরুষ কর্তা একাগ্র ভাবে কামনা করতে লাগল। যাতে একমাত্র ঔরস পুত্রের জন্যেই সে তার সব সঞ্চয় রেখে যেতে পারে। এখন কি করে নিশ্চিত হওয়া যাবে পুত্রটি সত্যিই তাঁরই ঔরস পুত্র কিনা? যদি স্ত্রীকে অন্য সমস্ত পুরুষের সাহচর্য থেকে পুরোপুরি সরিয়ে রাখার নিশ্চিত ব্যবস্থা করা যায় একমাত্র তখনই গৃহকর্তা আশ্বস্ত হতে পারে পুত্রটি তারই। এই স্বার্থপ্রণোদিত কামনা যে কতটা উদগ্র এবং উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তার একটি প্রমাণ মহাভারতের একটি শ্লোকে আছে:

ন চন্দ্রসুযো ন তরুং পুন্নামো যা নিরীক্ষতে।

ভর্তৃবর্জং বরারোহা সা ভবেদ্ধর্মচারিণী।

যে নারী স্বামী ব্যতীত কোনও পুংলিঙ্গান্ত (নামের বস্তু), চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষও দর্শন করে না সেই ধর্মচারিণী। (১২:১৪৬:৮৮)

এ অবরোধ ব্যবস্থা পর্দাপ্রথার এক চূড়ান্ত ও উন্মত্ত সংস্করণ। পুরুষের সান্নিধ্য থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখতে পারলে গৃহস্বামী আশ্বাস পায় যে পুত্রটি তার, অতএব তার সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পত্তি ভোগে সে অধিকারী। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশের অনুপাতে নারী তার স্বাধীনতা হারায়। বলা বাহুল্য, এ অপচেষ্টা সর্বত্র সার্থক হয়নি–হয় না বলেই। অলংকারশাস্ত্রের অধিকাংশ উদাহরণ শ্লোকে অবৈধ প্রণয়েরই দৃষ্টান্ত। ‘জার’ ও ‘জারিণী’ ঋগ্বেদ থেকেই অসংখ্যবার ব্যবহৃত। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বাৎস্যায়ন কামসূত্র রচনা

করলেন, তাতে অসংকোচে পর্যন্ত্রী ও অনুঢ়া কুমারীকে কী ভাবে প্রলুব্ধ করে অনুকূল করে এনে ভোগ করা যায় তার অনুপুঙ্খ সবই দিলেন। কাজেই এ কথা অনুমান করলে ভুল হবে না যে কুলস্ত্রী মাত্রেই অবরোধের মধ্যে থাকলেই সতীসাধবী থাকত। এর ফলে সন্দেহ বান্তিকগ্রস্ত পুরুষ স্ত্রীর জীবন বিষাক্ত করে তুলত এবং যখন আশ্বস্ত থাকত তখন নিশ্চয়ই কখনও কখনও তার যত্নে-উপাজিত সম্পত্তি গিয়ে পড়ত স্ত্রীর উপপতি বা প্রেমিকের জারজ সন্তানের হাতে। এর ফলে, বিশেষত সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর জীবন বিষময় হয়ে উঠল। সমাজ মানসে রামচন্দ্র যে সন্দেহের বিষ ঢেলে দিলেন, যে অন্যায় অবিচারের প্রবর্তন করলেন তার ফল এখনও অব্যাহত আছে। এখনও সন্দেহে পরিত্যক্ত অসংখ্য নারী দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে। সন্দেহে পরিত্যাগ ছাড়াও সত্যকার পদস্খলনে পরিত্যক্ত ছিল— আরও সহজে হতে পারত এটা। তা ছাড়াও ছিল পুত্রসন্তানকামনায় পরপর বিবাহ করা–অম্বিক, অম্বালিকা ও দাসীর গর্ভে ব্যাসের সন্তান উৎপাদন। কুন্তীর স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষদের (কাহিনিতে তারা দেবতা হয়ে উঠেছে অবশ্য) দ্বারা ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্ম দেওয়ার মধ্যে রয়েছে ওই পুরুষ বংশধরের জন্য অদম্য আকুতির ফল।

নারীর মনুষ্যত্বের অবমাননার বহুপ্রকার ব্যবস্থা এই সময়ে শুরু হয়। যজ্ঞে দক্ষিণার তালিকায় সে আগে থেকেই ছিল; রামায়ণ-মহাভারত-এ আরও কয়েকটি কারণে নারী দান করা হত: প্রথমত, অতিথি আপ্যায়নে, যে কোনও বৃহৎ ক্রিয়াকর্মে–শ্রাদ্ধে, উৎসবে, যুদ্ধযাত্রায়, যুদ্ধজয়ে, যৌতুকে–নারী দান ও ভোগ্যসামগ্রীর তালিকায় স্থান পেল। দ্বিতীয়ত অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে সুন্দরী তরুণী নারী দান করতে পারা দাতার সামাজিক প্রতিপত্তির পরিচায়ক হয়ে উঠল; অর্থাৎ ধনী আত্মপ্রচারের জন্যে নিরপরাধ বহু নারীকে অসম্মান করতে দ্বিধা করত না। রাজঅন্তঃপুরের দাসীও রাজপরিবারের পুরুষের ভোগ্যবস্তু ছিল, এমন কাহিনিও পাই, অর্থাৎ এই দরিদ্র নারীদের শ্রমের সঙ্গে দেহও দান করতে হত। বহুপত্নীত্বেও নারীর অসম্মান ছিল এবং এ অসম্মান

অনুষ্ঠিত হত পরিবারের মধ্যে, যেখানে সন্তানরা দেখত তাদের জননীর অসম্মান, এবং যেখানে বন্ধ্যা, বিগতযৌবনা, এবং শ্রীহীনা বধূ জানতই যে তরুণীতরা এবং সুন্দরতরা নারীকে এনে গৃহস্বামী পূর্বপরিণীতার সম্মান ধূলিতে লুটিয়ে দেবেন–পরিবারের বৃহৎ পরিসরে তাবৎ আত্মীয়পরিজনের সামনেই।

পুরাণে নারীর যে চূড়ান্ত অবমাননা নির্লজ্জ অসংকোচে অসংখ্যবার উচ্চারিত হয়েছে রামায়ণ-মহাভারত-এ তার সূচনা মহাকাব্য দুটির ব্রাহ্মণ্য প্রক্ষেপে। ক্ষত্রিয়কাহিনির নারীর যে চিত্র আগে থেকে ছিল তা যথাসম্ভব তেমনই রাখা আছে; রসোত্তীর্ণ যে সাহিত্য সমাজের স্মৃতিতে ভাস্কর, তাকে ক্ষুন্ন করার চেষ্টা তাই ব্যর্থ হত। কিন্তু ওই রসোত্তীর্ণ সাহিত্যকেই জনশিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করল সমাজের ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধের প্রবক্তারা, জনগণকে যে নানাবিধ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল ক্রমে ক্রমে তার মধ্যে মুখ্য একটি শিক্ষা: নাস্ত্রী স্বাতন্ত্র্যামর্হতিস্বাধীনতায় নারীর কোনও অধিকার নেই।

কালিদাস-কাব্যে কয়েকটি আদিকল্প

কাব্য রচনাকালে কবির মানসপটে যে চিত্রকল্প (ইমেজ)-গুলি আনাগোনা করে–শুধু বাক্যগত নয়, সমগ্র আলেখ্যকে ব্যাপ্ত করেও–তাদেরই আদি-উৎসকে বলছি আদিকল্প (আর্কিটাইপ)। সাহিত্যের মাধ্যমে কবি তাঁর উপলব্ধি শ্রোতার মানসে সঞ্চার করতে চান। কিন্তু রচনার পূর্বে তাঁর উপলব্ধির জন্যে তাঁকে কয়েকটি বস্তুকে মনে-মনে আশ্রয় করতে হয়–কখনও সচেতন ভাবে, কখনও-বা অবচেতনার অনুপ্রেরণায়। এগুলিই সাহিত্যের উপাদান। উপাদানের মধ্যে যেমন ভাষা, ছন্দ আর অলংকারের বহু বিচিত্র

উপকরণ আছে, তেমনই আছে কথাবস্তু। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কালিদাস-সাহিত্যে কয়েকটি আদিকাল্পর সন্ধান।

প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় সাহিত্যে কয়েকটি আদিকল্প পরবর্তীকালের মানুষের মগ্নচৈতন্যে সংরক্ষিত ছিল; সেগুলি নবরূপ ধারণ করেছে কালিদাস-সাহিত্যে। যেমন, ভারতীয় সাহিত্যে বিক্রমোর্বশীয় কাহিনির সংলাপ-রূপ রয়েছে। ঋগ্বেদ-এর একটি সংবাদ-সূক্তে; (১০:৯৫) শতপথব্রাহ্মণ-এ (১১:৫:১)। এটি পূর্ণতর রূপ পেয়েছে। কিন্তু নিশ্চয়ই এটি অনেক প্রাচীন কাহিনি, তাই এটি অন্যান্য ইন্দো-ইয়োরোপীয় দেশের সাহিত্যশিল্পে নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সোয়ান লোকু নামে রুশ ব্যালেতে তাই এর দেখা পাই। ম্যাথু আরনলডের দ্য ফরুসেকশন মারম্যান এবং অন্যত্র বহু সাহিত্যে তাই এ কাহিনি ফিরে-ফিরে এসেছে। ঋগ্বেদ-এ উর্বশীর হংসীরদপপরিগ্রহ আছে: তা আতয়ো ন তন্বঃ শুস্তুস্ত স্বাঃ–তাদের শরীর হংসীর মতো শোভা পাচ্ছিল। (১০:৯৫৯)। শতপথব্রাহ্মণ-এ দেখি: তদ্ধ তা অপ্সরস আতয়ো ভূত্বা পরিপাপ্তুবিরে–সেখানে সেই অপ্সর্যারা হংসীরূপে জলে ভাসছিল। (১১:৫:১:৪) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় কাহিনিতেও উর্বশীর হংসীরূপে হ্রদে বিহার করার কথা ছিল বলে মনে করার হেতু রয়েছে। নাটকে বাস্তবানুগ হতে গিয়ে কালিদাস এ অংশটি পরিহার করেছেন, কিন্তু এটি যে তার অবচেতনে আনাগোনা করছিল তার ইঙ্গিত রয়ে গেছে বিক্রমোর্বিশীয় নাটকের কয়েকটি চিত্রকল্পে। মনে রাখতে হবে, মূল কাহিনিতে নায়ক যখন বিরহার্ত, তখনই নায়িকা হংসীরূপে দেখা দিচ্ছে। বিক্রমোর্বশীয়-র প্রথম তিনটি অঙ্কে হংসের চিত্রকল্প সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে, অর্থাৎ বিরহের রূপায়ণের প্রবেশক থেকেই হংসীর চিত্রকল্প নানা ভাবে আসছে:

সহচরীদুঃখালীঢ়ং সরোবরে সিন্ধম।
বাষ্পাববল্পিতনয়নং তাম্যাতি হংসীযুগলকম।

সহচরীর দুঃখে কাতর অবস্থায় সরোবরে স্নিগ্ধ বাষ্পসজলনেত্রে হংসীযুগল ক্লিষ্ট হচ্ছে।

এর কিছু পরেই:
চিন্তাদুনমানসিক সহচরীদর্শনলালসিকা।
বিকসতি কমলমনোহরে বিহরতি হংসী সরোবরে।
চিন্তাক্লিষ্ট মানসে সহচরীকে দেখবার জন্যে উৎসুক হংসী পদ্মসরোবরে বিহার করছে।

নাটকের অন্তিম শ্লোকেও শুনি::

প্রাপ্তসহচরীসঙ্গমঃ পুলকপ্রসাধিতাঙ্গোঃ।
স্বেচ্ছাপ্রাপ্তবিমানো বিহরতি হংসযুবা।
সহচরীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পুলকিতদেহ হংসযুবা স্বেচ্ছায় আকাশে উড়ে যাচ্ছে।

কাজেই দেখছি, ইন্দো-ইয়োরোপীয় কাহিনির এই অংশটিকে কবি নাটকের কাহিনির মধ্যে স্থান না দিলেও চিত্রকল্পে সেটিকে উপস্থাপিত করেছেন। এটি যে প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় কাহিনি, তার প্রমাণ–অন্য ইরোরোপীয় সাহিত্যেও এর সাক্ষাৎ মেলে। আয়ারল্যান্ডের প্রাচীন লোককথায় বারেবারেই হংসীরূপ নারীতে আরোপিত হয়েছে, এবং এর অনুষঙ্গ হল ইহলোক-

পরলোকের মধ্যে আনাগোনা করার ক্ষমতা, যেমন হংস। জলস্থলে আর আকাশের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিহার করতে পারে।

'The form of a Swan-perhaps because it is that of a creature of land, waterand land, a creature whose milleu has no boundaries-is appropriate for communication between two worlds (Alwyn Rees and Brinley Rces: Celtic Heritage. Thames and Hudson, London, 1961, P-236.) (হংসের এই কারণে যে, এই প্রাণী স্থলের, জলের ও স্থলের এবং যার বিচরণক্ষেত্রের কোনও সীমারেখা নেই; দুই পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগে যথোপযুক্ত।) ওয়েলশ কাহিনিতে দেখি, লীনই ফান নামে জলচারিণী দেবী প্রেমিকের উপহার প্রত্যাখ্যান করতে থাকে, শেষে একদল রাজহংসী তাদের হংসবেশ ত্যাগ করে হ্রদের জলে নামলে প্রেমিকটি তাদের মধ্যে সুন্দরীতিমার বেশ হরণ করে, আর তাকে মেয়েটির পিতার কাছে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। আয়ারল্যান্ডে এওখেইড আর এতেইনের কাহিনি, এবং সুপ্রসিদ্ধ কুখুলেইন্ন আর তার রাজংসীরূপিণী প্রেমিকার কাহিনিতেও এই একই কল্পচিত্র। ইয়োরোপের অন্যান্য লোককথাতেও এ কাহিনির নানা প্রতিরূপ পাওয়া যায়; কাজেই মনে হয়, এটির একটি প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় আদিকল্প ছিল। কালিদাস এটি পেয়েছেন ঋগ্বেদ আর শতপথব্রাহ্মণ-এর কাহিনি থেকে।

এই কাহিনির একটি দিক হচ্ছে মানব আর অপ্সরার প্রেম। শতপথব্রাহ্মণ-এ এ প্রেমের একটি সম্ভাব্য সংকটের সমাধান দেওয়া হয়েছে: পুরুদারবা মর্ত্য মানব, উর্বশী নভশ্চারিণী অপ্সরা; একদিন পুরস্কারবার মৃত্যু ঘটবে, উর্বশী। কিন্তু চিরজীবিনী। শতপথব্রাহ্মণ-এ পুরূদরবা একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গন্ধর্ব হয়ে উর্বশীর সঙ্গে দীর্ঘকাল মিলিত হতে পারলেন। কালিদাসের নাটকের শেষ অঙ্কে দেবতার অনুগ্রহে ঊর্বশীকে তাঁর প্রিয়তমের বিচ্ছেদ সহ্য

করতে হল না, তারা দুজনেই আমরণ মর্ত্যে মিলিত জীবনযাপন করবার অধিকার পেলেন। এই সমস্যা খুব স্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হয়েছে প্রাচীন গ্রিক দেবকাহিনিতে। দেবী এয়স (উষস, বা লাতিন অরোরা) প্রেমে পড়লেন মর্ত্য তরুণ টিথনসের সঙ্গে। টিথনসের মিনতিতে দেবী এয়সতীকে বর দিলেন অমরতার। কিন্তু দুজনেই ভুলে গেলেন যে অমরতা বার্ধক্য নিবারণ করবে না। টিথনস স্থবির, পঙ্গু, জরাগ্রস্ত হয়ে গুহায় শুয়ে থাকেন অমরতার অভিশাপ নিয়ে; আর প্রতি প্রত্যুষে চিরতরুণী এয়সতাঁকে দেখে যান। এই সমস্যার সমাধানে শতপথব্রাহ্মণ-এ একটি যজ্ঞ আছে, যার দ্বারা পুরুদারবা গন্ধর্বত্ব আর অমরত্ব লাভ করেন; পুরাণে শুনি এঁরা একষট্টি হাজার বছর মিলিত জীবনযাপন করেন!! কালিদাস এ সমস্যার অন্য সমাধান দিয়েছেন: পঞ্চম অঙ্কে নারদ স্বর্গ থেকে দেবতাদের নির্দেশ জানান, ইয়ঞ্চ ঊর্বশী যাবদায়ুঃ তব সহধর্মচারিণী ভবত্বিতি–এই উর্বশী পূর্ণ আয়ুষ্কাল ধরে তোমার সহধর্মচারিণী হোক।'

দ্বিতীয় যে আদিকল্পের কথা মনে আসে সেটির উৎস ইন্দো-ইয়োরোপীয় যুগের থেকেও প্রাচীনতরকাল থেকে সভ্যমানুষেরচিত্তের গহনে প্রোথিত। কালিদাসে এর প্রকাশরতিবিলাপে। সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরূপ একটি বিলাপ পাই মৈত্রায়ণী-সংহিতা-য় যমীর বিলাপে। (১:৫:১২) যম-যমী ভাইবোন, আবার প্রণয়ী-প্রণয়িনী। যমের মৃত্যুতে যমীর শোক কোনও প্রবোধ মানে না; সান্ত্বনা দিতে গেলে যমী কেবলই বলেন, 'এইমাত্র তো যম মারা গেল।' যম তখনও মর্ত্য (যো মমার প্রথমে মর্ত্যানাম; অথর্ববেদ ১৮:৩:১৩)। কাজেই তাঁর মৃত্যু আছে, কিন্তু যমী তা মানতে পারছেন না। তাই দেবতারা পরামর্শ করে রাত্রির সৃষ্টি করলেন; পরদিন যমী কিছুটা শান্ত হয়ে বললেন, 'যম কাল মারা গেছে।' এ কাহিনির লাতিন প্রতিরূপ পাই খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকের কবি আপুলেইয়ুসের গ্রন্থ দ্য গোলডেন অ্যাস-এর সপ্তম থেকে নবম অধ্যায়ে।

অনবদ্য কবিত্বের সঙ্গে সেখানে একটি কাহিনির উপস্থাপনা ঘটেছে যা প্রত্যক্ষ ভাবে মূল কাহিনির সঙ্গে অন্বিত নয়। সুন্দরীতিমা দেবী ভেনাসের পুত্রকিউপিড় (= মদন) প্রেমে পড়েছেন সাইকির সঙ্গে, যে সাইকি রূপে ভেনাসের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। মর্তে ভেনাসের পূজা অবহেলিত, কিউপিড় মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছেন এবং সাইকি কিউপিন্ডের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছেন। তাই ভেনাসের শাপে অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ দেখা দিল। সাইকি কেঁদো-কেঁদে বিরহযাপন করে। অনেক দুঃখের পথ পেরিয়ে তাদের পুনর্মিলন ঘটল।

বাইবেল-এর 'সঙস অব সলোমন'-এও ভাইবোন প্রণয়-প্রণয়িনী। সেখানেও প্রণয়িণীর বিরহ রূপ পেয়েছে অমর শোকগাথাতে:

By night in my bed sought him whom my soul loveth. I sought him but

found him nought. will rise now and go about the city in the streets and in the broadways. I will seek him whom my soul loveth. I sought him but I found him not. ('Song of Solomon' Ch. 3, Verses 1-3) (নিশীথশয্যায় আমি তাকেই খুঁজি আমার হৃদয় যাকে ভালবাসে। তাকে খুঁজি কিন্তু পাই না। এখন আমি শয্যা ছেড়ে বেরোবো– শহরের পথে রাজপথে তাকে খুঁজতে আমার হৃদয় যাকে ভালবাসে, তাকে চাই, কিন্তু পাই না।) সম্ভবত এ কাহিনির প্রাচীনতর সংস্করণ সুমেরীয় দেব কল্পনায়।ইনান্না-দেবী (যাঁর আসিরীয় নাম ইশতার)-র প্রেমিক ছিলেন দুমুজি (আসিরীয় তন্মুজ)। দুমুজির মৃত্যুর পরে ইনান্না কেঁদে-কেঁদে তাঁর সন্ধান করে বেড়ালেন, দুমুজির সন্ধানে পরলোকে দেবমণ্ডলীতে উপস্থিত হয়ে তাঁর জীবন ভিক্ষা করলেন–দুমুজি পুনরুজ্জীবিত হলেন। (সম্ভবত এরই একটি প্রতিরূপ পাই মনসামঙ্গলের বেহুলা-উপাখ্যানো।)। কিন্তু এরও পশ্চাতের অতীতে

হয়তো এ কাহিনির সূত্রপাত মিশরীয় দেবকথার অসিরিস-আইসিস-উপাখ্যানে। এরাও ভাইবোন এবং প্রেমিক-প্রেমিকা। লোভী ভাই সেথ-এর চক্রান্তে অসিরিসের মৃত্যু ঘটল। আইসিস কেঁদে ফেরেন দেশে-দেশান্তরে। পনেরো শ'খ্রিস্টপূর্বাব্দের আমেনমোসের গাথায় আছে–দুপুরের চিলনির মতো কেঁদে সে বেড়িয়েছে সারা মিশর, মৃত অসিরিসের পুনরুজ্জীবনের আশায়। লক্ষণীয়, মিশরে এ কাহিনির সঙ্গে অনুষ্ঠান ছিল, প্যালেস্টাইনেও ছিল, এবং উভয়ত্রই সে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য–শস্যক্ষেত্রে এবং প্রাণিজগতে উর্বরতা এবং বীর্যবত্তার বৃদ্ধিসাধন। কালিদাসও রতিবিলাপকে ব্যবহার করেছেন এবং রতিকে বিরাহিণী রেখেছেন। হরপার্বতীর মিলন পর্যন্ত। তারপরে দেবতাদের অনুনয়ে মহাদেব মদনকে সঞ্জীবিত করেন; তস্যানুমেনে ভগবান বিমনুযব্যাপারমাত্মন্যপি সায়কানাম–বিগতক্রোধ ভগবান আপনার প্রতি তার শর সন্ধান ব্যাপার অনুমোদন করলেন। (কুমারসম্ভব, ৭:৯৩)

অতিপ্রাচীন আর-একটি আদিকল্প পাই রঘুবংশ-এ, যার পুর্বরূপ আছে রামায়ণ-এ রামচন্দ্র যুদ্ধশেষে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করবার পরে দশরথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে, যেমন ঘটেছিল। রামায়ণ। গ্রিক ইলিয়াদ আর লাতিন ঈনীড-এও মৃত পিতার সঙ্গে উত্তরপুরুষের সাক্ষাৎকারের কাহিনি আছে।

অন্য-এক ধরনের আদিকল্প কালিদাস পান লোকসাহিত্য থেকে, এবং নানা বিচিত্র রূপে এগুলি তিনি ব্যবহার করেছেন। লোকসাহিত্যের দুটি বৈশিষ্ট্য: অতিশয়োক্তি এবং অতিলৌকিকতার আশ্রয়গ্রহণ। কালিদাস সত্যকার শিল্পী, তাই অতিশয়োক্তি তিনি পরিহার করেছেন, কিন্তু অতিলৌকিক উপাদান গ্রহণ করে কাব্যানুগরূপে ব্যবহার করতে তিনি বিমুখ নন। অতিলৌকিক উপাদান কালিদাস-সাহিত্যে বহুরূপে অনুপ্রবিষ্ট। প্রথমত, ধরা যাক অতিলৌকিক বস্তু: যেমন বিক্রমোর্বশীয় সংগমনীয় মণি, স্পর্শমণিরই অন্য-এক সংস্করণযার সাহায্যে পুরুদরবার আলিঙ্গনে লতারূপিণী উর্বশী নারীদেহ ফিরে পেলেন।

কিংবা অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ রক্ষাকরণ্ডক–যা অবাঞ্ছিত ব্যক্তির স্পর্শে সাপ হয়ে যায়, তারই মাধ্যমে দুষ্যন্ত পুত্র সর্বদমনকে পেলেন। অথবা রঘুবংশ-এর সেই মালাটি, যার স্পর্শেইন্দুমতীর প্রাণনাশ ঘটল। রঘুবংশ-এ শুনি, প্রার্থী কৌৎসের জন্যে রাজা অজ যেই কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত, ওমনি, হিরন্ময়ীং কোষগৃহস্য মধ্যে বৃষ্টিঃ শশংসুঃ পতিতাং নভস্তঃ:–রাজকোষের মধ্যে আকাশ থেকে স্বর্ণময় বৃষ্টিপাতের খবর পাওয়া গেল।'(৫:২৯) অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ চতুর্থ অঙ্কে পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে শকুন্তলার বাসনালংকারপ্রাপ্তিও তেমনই একটি অতিপ্রাকৃত উপাদান। রূপান্তরে অতিলৌকিকের দ্বিতীয় একটি পরিচয় আছে। যেমন, রঘুবংশ-এ মতঙ্গে শাপে প্রিয়ংবোদর গজরদপপ্রাপ্তি; (৫:৫৩) স্বরূপ ফিরে পাওয়ার পর ইনি অজকে একটি সম্মোহন-অস্ত্র দেন যার সাহায্যে ইন্দুমতীর স্বয়ংবারের পরে অজ সমবেত যুদ্ধোদ্যত রাজমণ্ডলীকে পরাস্ত করেন। বিক্রমোর্বিশীয়-তে উর্বশীর কুমারবনে লতায় পরিণত হওয়াও একটি লোকসাহিত্যের উপাদান। রঘুবংশ-এ রাজা দিলীপ দেবধেনু নন্দিনীর সেবা এবং প্রাণের বিনিময়েও নন্দিনীকে রক্ষা করার চেষ্টা যখন তাকে তুষ্ট করেন, তখন পুত্রহীনতার শাপ থেকে তাঁর মুক্তি ঘটে–সেও একটি অলৌকিক ঘটনার সাহায্যে। নন্দিনী বলেন, 'দুগ্ধ। পয়ঃ পত্রপুট মদীয়ং পুত্রোপড়ুঙ্ক্ষেতি তমাদিদেশ–পুত্র, আমার দুগ্ধ পত্রপুটে দোহন করে পান করো!' (২:৬৫) আমরা জানি, বহু রূপকথায় এই রকমই মন্ত্রপূত ফল বা শেকড় যথাবিধি সেবন করে অপুত্রক পুত্র লাভ করে। দশরথের মহিষীদের চারুভক্ষণের কাহিনি তো রামায়ণ-এ ছিলই।

রঘুবংশ-এর সূচনাতেই লোকসাহিত্যের একটি পরিচিত কথা পাই–রাজা দিলীপের সবই আছে: একতিপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশচ— পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য, তরুণ বয়স, সুন্দর দেহ। নেই কেবল পুত্রসন্তান, রাজসিংহাসনে বা রাজবংশে উত্তরাধিকারী। ঠিক যেমন শুনি

রূপকথায়; রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াাশালে ঘোড়া, সুন্দরী রানি–কিন্তু রাজার ছেলে হয় না। এবং রঘুবংশ-তে এর সমাধানও এল রূপকথারই রূপ ধরে; সেবায় প্রীত নন্দিনীর দুগ্ধপান। অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ রাজার সবই আছে, নেই কেবল পুত্রসন্তান। বিক্রমোর্বিশীয়-তে কাহিনির অস্ত্যপর্বে অপুত্রক রাজা পুত্রবান হন। এখানেও ঠিক এমনই আর-একটি রূপকথার সূত্র পাই: জটিল সমস্যার চূড়ান্ত মুহূর্তে সমাধান আসে অলৌকিকের পথ ধরে। যেমন, আজ যখন কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত তখন স্বর্ণবৃষ্টি হয়ে সমাধান হল, অথবা শাপের অবসানে যখন উর্বশীর স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের দুর্লগ্ন উপস্থিত তখন নারদের মুখে ইন্দ্রের নির্দেশে আসন্ন বিপদ নিকারিত হল। ৰূপকথাতেও ঠিক এমনই ঘটে: ডাকাতরা যখন বন্দিকে দেবীর সামনে বলি দিতে খাড়া তোলে, তখনই দৈবনিয়ন্ত্রণে ঘটনার গতি আমূল পরিবর্তিত হয়।

দৈববাণী লোকসাহিত্যের আর-একটি উপাদান। অত্যন্ত সংকটময় কয়েকটি মুহূর্তে কালিদাস দৈববাণীর আশ্রয় নেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ কথা অগ্নিগৃহে দৈববাণী শোনেন যে শকুন্তলা দুষ্যন্তের পরিণীতা বধূ, এবং তারই সন্তানের জননী হতে চলেছেন। মানুষের মুখে এ কথা শুনলে সম্পূর্ণ সংশয়চ্ছেদ হত না এবং ঋষি শকুন্তলাকে ওই ভাবে অভিনন্দিত করতেন না। নাটকের পক্ষে অত্যাবশ্যক এই দৈববাণী। কুমারসম্ভব-এর পার্বতী যে হরবধু হবেন সে সম্বন্ধে নারদের ভবিষ্যদ্বাণী শুনি; (১:৫০) কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণদৈববাণী শুনি চতুর্থ সর্গে যখন রতি সহমৃতা হওয়ার জন্য চিন্তারোহণে উদ্যত। দৈববাণীই তখন জানিয়ে দেয় যে মদন পুনরুদ্ধজীবিত হবেন–হরপার্বতীর মিলনের পরে। (৪:৪৮)

পৃথিবীর সব লোকসাহিত্যেই এক কল্পলোকের চিত্র আছে যেখানে নিত্যসুখজরা-মৃত্যু-বেদনা, মর্তজীবনের অপূর্ণতা যেখানে অনুপস্থিত। ভারতীয় সাহিত্যের আদিপর্বে শুনি:

যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রঞ্জস্য বিষ্ট্রপম।
স্বধা যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামৃতং কৃধি।
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যাত্রাপ্তাঃ কামাস্তাত্র মামমৃতং কৃদ্ধি।
যেখানে কামনার তৃপ্তি, যেখানে স্বধা ও তৃপ্তি সেখানে আমাকে অমর করো। যেখানে আনন্দ, আমোদ, হর্ষ ও প্রকৃষ্ট হর্ষ আছে, কামনার যেখানে চরিতার্থতা, সেখানে আমাকে অমর করো। (ঋগ্বেদ ৯:১১৪:১০-১১)

মহাভারত-এ উত্তরকুরুর বর্ণনা, সত্যযুগের বর্ণনা–আকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী পুটকে পুটকে মধু হলকর্ষণে পৃথিবীতে শস্য উৎপাদন করতে হয় না, প্রতি পত্রপুটে যেখানে মধু পাওয়া যায়। এরও পশ্চাতে আমরা অন্যান্য প্রাচীনতর সাহিত্যে এমনই স্বপ্নস্বগের চিত্র পাই। এ স্বর্গ দূরে— হয় স্থানে, নয় কালে, কিংবা উভয়তই। বোধহয় পৃথিবীর প্রাচীনতম স্বপ্নস্বর্গের বর্ণনা পাই মধ্যপ্রাচ্যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম ভাগের নিপুরের এক শিলালেখে দিলমুনের বর্ণনায়:

Where the croak of the raven was not heard, the bird of death did not utter the cry of death, the wolf did not rend the lamb, the dovc did not mourn. there was no widow, no sickness, no old age, no lamenation. (সেখানে কাকের কর্কশধ্বনি ছিল না; মৃত্যুপক্ষী যেখানে ডাকত না মরণের ডাক; ভেড়াকে ছিঁড়ে খেত না। নেকড়ে বাঘ, পারাবত গাইত না দুঃখগীতি; যেখানে বিধবা ছিল না; অসুখ ও বার্ধক্য ছিল না, ছিল না কোনও দুঃখ।)

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য গিলগামেশ-এর কাহিনিতেও অনুরূপ একটি কল্পচিত্র পাই। গিলগামেশা যাচ্ছে উতনপিশতিমের কাছে:

There was the garden of the Gods, all round him stood bushes bearing gems... there was fruit of carnelian with vine hanging from it beautiful to look at: lapis lazuil leaves hung thick with fruit, sweet to see. For thorns there were haematite and rare stone, agates and pears out of the sea. (The Epic of Gilagamesh, Penguin, Ch. Hv) (সেখানে ছিল ঈশ্বরের বাগান, তার চাদ্দিকে ঘিরে ছিল রত্নের ঝাড়... সুন্দর দেখতে লতা থেকে ঝুলে থাকা ফল; লাপিস লাজুহল পাতার ফাঁকে ঝুলে থাকা ফল। কাঁটার বদলে ছিল গৈরিক লৌহ আকর এবং দুস্তপ্রাপ্য পাথর–সমুদ্র থেকে উঠে আসা চুনি পান্না।)

বাইবেল-এ এ স্বর্গ আছে সৃষ্টির আদিতে আর প্রলয়ের অন্তে। সৃষ্টির আদিতে গার্ডন অব ঈড়ন-এ অভাব, জরা, মৃত্যু, অতৃপ্তি নেই। আবার বুক অব রেহ্ুলেশন-এ পড়ি:

And I saw a new heaven and a new earth... and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. (Ch, XXI: 1, 4) (আমি এক নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী দেখলাম... এবং ঈশ্বর তাদের চোখ থেকে সব অশ্রু মুছে দেবেন; এবং সেখানে কোনও মৃত্যু থাকবে না, দুঃখ ও কান্না থাকবে না? আর এগুলো যেহেতু থাকবে না। তাই কোনও যন্ত্রণাও থাকবে না।)

কালিদাসের সাহিত্যে এই কল্পচিত্রটি নানা রূপে ফিরে-ফিরে দেখা দিয়েছে। কুমারসম্ভব এর প্রথম সর্গের হিমালয়বর্ণনায় একটি দুঃখবিনিমুক্ত দেবস্থান আনন্দভূমিরূপে বর্ণিত। অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ মারীচের আশ্রমও প্রায় তাই: সৎকল্পবৃক্ষ বন, কাঞ্চনপদ্মরেণুকাপিশ জল, রত্নশিলাগৃহ, ইত্যাদির বর্ণনা শেষ করছেন কবি–যৎকাঙ্ক্ষতি তপোভিঃ:–মানুষ তপস্যার ফলরূপে যা চায়।' (৭:১২) কুমারসম্ভব-এ ওষধিপ্রস্থের সুদীর্ঘ বর্ণনাও এই পর্যায়ের। সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত ভোগ্যবস্তুর সমাহারে মানুষের ভোগবাসনা এখানে কল্পনায় চরিতার্থ হয়: 'যৌবনান্তং বয়ো যস্মিন্নান্তকঃ কুসুমায়ুধাৎ— বয়স যেখানে যৌবন ছাড়ায় না, যেখানে মদন (প্রেমে) ছাড়া অন্য মৃত্যু নেই।।' (৬:৪৪) এত সুখ যে 'স্বর্গাভিসন্ধিসুকৃতং বঞ্চনামিব মেনিরে:–স্বর্গসুখের পুণ্যকে তাঁরা বঞ্চনার মতো মনে করেন।' (৬:৪৭)

কিন্তু কালিদাস-কাব্যে সার্থকতম স্বপ্নস্বর্গবোধহয় মেঘদূত-এর উত্তরমেঘের অলকাবর্ণনায়। এখানেও পৃথিবীর বঞ্চিত ব্যর্থকাম মানুষের, ব্যাধিবেদনা-জরা–মৃত্যু-জর্জরিত মানুষের স্বপ্নের অভিপ্রসারণ একটি পরমাভোগ্য নিত্যসুখের কল্পলোকে। ঐশ্বর্য সৌন্দর্য সম্ভোগ বৈচিত্র এবং অনায়াসলব্ধ অবিচ্ছিন্ন সুখের একটি স্বল্পধাম কবি উত্তরমেঘের প্রথম এগারোটি শ্লোকে নির্মাণ করেছেন। এর মধ্যে একটিতে প্রেমের চিত্রায়ণে সিদ্ধহস্ত কবি মানুষের প্রেমিক সত্তার জন্যে চিরন্তন কাম্যস্বর্গ সৃষ্টি করেছেন:

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈনিমিত্তৈর্নান্যস্তাপঃ

কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।

নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তির্বিত্তেশানাং ন

চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি।

যেখানে অশ্রু শুধু আনন্দেরই, অন্য কোনও কারণের নয়, প্রেমের তাপ ছাড়া অন্য তাপ যেখানে নেই এবং সে তাপও প্রিয়মিলনে নির্বাপিত হয়; প্রণয়-কলহ

ছাড়া যেখানে বিরহ নেই, এবং যক্ষদের যেখানে যৌবন ছাড়া অন্য বয়সই নেই।

এর মধ্যে কুমারসম্ভাব-এর ওষধিপ্রস্থের বর্ণনার ‘যৌবনান্ডং বয়ো যস্মিন্নাস্তকঃ কুসুমায়ুধাৎ’-এর প্রতিধ্বনি আছে। লক্ষণীয়, উত্তরমেঘের এই শ্লোকের সমস্ত বোকাটা পড়ে বিপ্রয়োগোপপত্তি’ শব্দটির ওপরে। বিরহভীরু প্রেমিকের স্বগের কল্পনা তো এমনই এক নিত্যমিলনের ধামের মধ্যেই চরিতার্থ। তাই রঘুবংশ-এ রামচন্দ্র পরিত্যাগ করলে পর সীতা পরজন্মের জন্যে একটিমাত্র কামনা উচ্চারণ করেন, ‘ভুয়ো যথা মে জননাস্তরেহপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ–পরজন্মে আবার যেন তোমাকেই স্বামী পাই, আর যেন বিচ্ছেদ না। হয়।’ (১৪:৬৬) তাই যক্ষ মেঘকে আশীর্বাদ জানায়, মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ–(তোমার বধূ) বিদ্যুতের সঙ্গে যেন তোমার এক মুহুর্তের বিচ্ছেদও না হয়।’

কালিদাস-সাহিত্যে প্রেমের যে চিত্র তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেকেই বলেছেন যে, কবি দেহনিষ্ঠ প্রেমকে তপস্যার দ্বারা শোধন করে স্থায়ী মিলনে উত্তীর্ণ করেছেন। কিন্তু মনে হয়, কবির চিত্তের গহনে যে চিত্রকল্পটি সক্রিয় ছিল তা তপস্যা নয়, যজ্ঞ। উদাহরণে বলা যায়, কুমারসম্ভব-এ মদনের মৃত্যুর হেতুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে,

অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বসূতামাকারোৎ প্রজাপতিঃ।
অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তঃ ফলমেতদন্বভুৎ ।

প্রজাপতিকে নিজের দুহিতার প্রতি অভিলাষী করে (মদন)...সেই কারণে অভিশাপে তাকে এর ফল ভোগ করতে হয়। (৪:৪১)

মেঘদূত-এ স্বাধিকারপ্রমত্ত যক্ষ তার বিচ্যুতির পূর্ণ মূল্য শোধ করেছে তীব্র বিরহের মমর্যন্ত্রণায়। মালবিকাগ্নিমিত্র-তে বিরহ নেই বললেই হয়; মালবিকা আর অগ্নিমিত্রের পরস্পরের আদর্শনে যে ব্যাকুলতা তা অনেকটা লঘু স্তরেই চিত্রিত হয়েছে। অগ্নিমিত্র মধ্য যৌবনে উত্তীর্ণ তাঁর পিতা আর পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত, তিনি অন্তঃপুরে একটি সুন্দরী তরুণীকে দেখেই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। এ মনোভাবকে প্রেম বললেও এ প্রেম অগভীর, এবং নাটকের শেষ পর্যন্ত তা কোনও গভীরতায় পৌঁছয়নি। এ প্রেমের বাধাও যেমন অকিঞ্চিৎকর, তার নির্যাকরণও তেমনই লঘু স্তরের। বিক্রমোর্বিশীয়-এ কিন্তু চিত্রটি অন্য রকম– এখানে নায়ক-নায়িকার বিরহ দুবার; প্রথম বার দ্বিতীয় অঙ্কে ইষ্টজনকে লাভ করবার ব্যাকুলতা, প্রথম প্রেমের উন্মাদনায় চঞ্চল। দ্বিতীয় বার চতুর্থ অঙ্কে, যেখানে পুরুদারবার বিরহ মর্মস্পশী। পুরুদরবা প্রমোদবনে এসেছেন, রাজকার্যসচিবদের হাতে অর্পণ করে; উর্বশী এসেছেন একমাত্র পুত্রকে পিতামাতার কাছ থেকে নির্বাসন দিয়ে, দুজনেই এসেছেন নিরঙ্কুশ সম্ভোগের আশায়। এই উদ্বেল কামনার ধ্বংসবীজ। তার নিজের মধ্যেই নিহিত ছিল, তাই অহেতুক ঈর্ষায় উদভ্রান্ত হয়ে ঊর্বশী অসতর্কে কুমারবনে প্রবেশ করে লতায় পরিণত হলেন এবং পুরুরবা কেঁদে-কেঁদে উন্মত্তপ্রায় হয়ে তাঁকে খুঁজে ফিরলেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এও বিরহ দুটি পর্যায়ে–প্রথম বার দ্বিতীয় আর তৃতীয় অঙ্কে আদর্শনের ক্ষোভে আর হতাশায়, এবং দ্বিতীয় বার ষষ্ঠ অঙ্কে দুষ্যন্তের নিরন্ত মমর্যন্ত্রণায়। নেপথ্যে শকুন্তলারও, যার পরিচয় সপ্তমে পাই, ‘বসনে পরিধূসারে বসানা নিয়মক্ষমমুখী ধৃতৈকবোণিঃ –ধূলিধূসর দুখানি বস্ত্র পরণে, ব্রতশীর্ণ মুখ, (বিরহদিনের) একটি বেণী ধারণ করে আছেন।’

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অভিশাপ প্রকট বা প্রচ্ছন্ন এবং তা এসেছে কর্তব্যে বিচ্যুতির অপরাধেই। নায়ক বা নায়িকার মর্মন্তুদ যন্ত্রণার মধ্যে প্রতিকার বা পুনর্মিলন ঘটেছে।

এই যন্ত্রণাভোগ প্রায়শ্চিত্ত যাগ আর কাম্যেষ্টির মিলিত প্রতীক। মনে রাখতে হবে, কালিদাসের কাল ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগ, যজ্ঞ তখন মহাসমারোহে বারংবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গুপ্তরাজারা নতুন করে যজ্ঞ করছেন, এমন কথা শিলালেখেও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, যাঁর রাজত্বকালেই সম্ভবত কালিদাসের আবির্ভাব, তিনি মথুরা শিলালেখে বলছেন, ‘চিরোৎসন্নাশ্বমেধাহর্তৃর্মহারাজশ্রীগুপ্তপৌত্রস্য... দীর্ঘকাল যা অনুষ্ঠিত হয়নি সেই অশ্বমেধের সম্পাদক মহারাজ শ্রীগুপ্তের পৌত্র’... ইত্যাদি।

গুপ্তযুগ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাদুর্ভাবকাল; সমগ্র কালিদাস-সাহিত্যে যজ্ঞের কথা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। রঘুবংশ-এর শুরুতেই রঘুবংশীয় আদর্শ বর্ণনা হচ্ছে, যথাবিধিহুতাগ্নীনাম–যাঁরা যথানিয়মে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়ে থাকেন। (১:৬) রাজা রঘুর বিষয়ে, ‘দুদোেহ গাং স যজ্ঞায়, শস্যায়, মঘবা দিবম— যিনি পৃথিবীকে দোহন করেন যজ্ঞের জন্য,ইন্দ্র আকাশকে দোহন করেন শস্যের জন্য।’ (১:২৬) দিলীপের পত্নী সুদর্শনার বর্ণনা, ‘অধিবরস্যেব দক্ষিণা–তিনি যেন যজ্ঞের দক্ষিণা।’ (১:৩৯) বশিষ্ঠকে দিলীপ বলছেন:

হবিরাবর্জিতং হোতস্ত্বয়া বিধিবদগ্নিষু।

বৃষ্টির্ভবতি শস্যানামবিগ্রহবিশোষিণম।

হে হোতা, তুমি যথানিয়মে হাব্য এনেছ অগ্নির উদ্দেশ্যে, (তাই)। অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক শস্য বৃষ্টি পায়। (১:৬২)

রঘুবংশীয়দের পরিচয়, এঁরা ‘ইজ্যাবিশুদ্ধাত্মা–যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন।’ (২:৭৫) দিলীপের পুত্র রঘু বিশ্বজিৎযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দশরথের বর্ণনায় শুনি, ‘ঋষিদেবগণাস্বধাভুজাং শ্রুতযাগপ্রসবৈঃ স পার্থিবঃ–স্বধাভোজী ঋষি ও

দেবগণের জন্যে বহু বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এই রাজা।' (৮:৩০) ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে অনুপরাজের বর্ণনা, অষ্টাদশদ্বীপনিখাতযুপাঃ–আঠারোটি দ্বীপে তাঁর (যজ্ঞে পশুবলির) যুপ প্রোথিত।' রাজা কুশের পুত্র অতিথির বর্ণনা: তিনি অনুষ্ঠান করেন, 'প্রচুরদক্ষিণাযুক্ত বহু যজ্ঞেরযজ্ঞঃ পর্যাপ্তদক্ষিণাঃ।।' (৭:১৭)। মালবিকাগ্নিমিত্র-এর বিষ্কম্ভকে নাটকের বর্ণনা: 'দেবনামিদমামনন্তি মুনয়ঃ শান্ত ক্রতুং চক্ষুষম— মুনিরা বলেন, নাটক দেবতাদের শান্ত চক্ষুগ্রাহ্য যজ্ঞ।' (১:৪)। এই নাটকের অন্তে এক অশ্বমেধযজ্ঞের উল্লেখ আছে (চতুর্থ অঙ্কে)। অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এর সূচনাতেই, যা স্রষ্টুঃ সৃষ্টিরাদ্যা বহতি বিধিহুতাং যাহবির্ষা চ হোত্রীযিনি স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি, যিনি যথানিয়মে (অগ্নিতে) প্রদত্ত হব্য বহন করেন, যিনি হবিঃ, যিনি হোতা।' (১:১)। দুষ্যন্তের বর্ণনা করছে সারথি, মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনমযেন মৃগরূপধারী যজ্ঞের অনুসরণকারী শিবকেই সাক্ষাৎ দেখছি।' দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষিদের ইষ্টিবিয়ের কথা আছে। যজ্ঞ সমাধা হলে পর দুষ্যন্ত চলে গেছেন– অদ্য স রাজর্ষিরিষ্টিং পরিসমাপ্য ঋষিভিবিসজিতঃ–আজি যজ্ঞ শেষ হওয়ার পরে ঋষিরা সেই রাজাকে বিদায় দিয়েছেন।' চতুর্থ অঙ্কে কথা শকুন্তলাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, 'দিষ্ট্যা ধূমাকুলিতদৃষ্টেরপি যজমানস্য পাবক এবাহুতিঃ পতিতাঃ–সৌভাগ্যক্রমে ধুমে আকুলিতদৃষ্টি যজমানের আহুতি ঠিক অগ্নিতেই পড়েছে।' ষষ্ঠ অঙ্কে সানুমতী বলছেন, 'শ্রুতং ময়া শকুন্তলাং সমাশ্বাসয়ন্ত্যা মহেন্দ্রজনন্যা মুখাদ্য যজ্ঞভাগোৎসুকী/দেবাস্তথা করিষ্যস্তি যথাচিরেণ ধর্মপত্নীং ভর্তা অভিনন্দিষ্যতি।-ইন্দ্রের জননী যখন শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন তখন তার মুখে শুনেছি যে যজ্ঞভাগের জন্যে উৎসুক দেবতারা এমন (ব্যবস্থা) করবেন যাতে অচিরেই ধর্মপত্নীকে তাঁর স্বামী অভিনন্দিত করবেন।' নাটকের শেষে তাই মারীচ দুষ্যন্তকে আশীর্বাদ করছেন, ত্বমপি বিততযজ্ঞং বজ্রিণং গ্রীতিয়ালম–তুমিও যজ্ঞবিস্তার করে বজ্রধারী ইন্দ্রকে

প্রীত করো।' স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়া উপমানেও ফিরে-ফিরে এসেছে যজ্ঞ। শকুন্তলা, সর্বদমন আর দুষ্যন্ত যেন শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি–শ্রদ্ধা, ধন ও (যজ্ঞের) বিধান।।' এ রকম অনেক উদাহরণ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কালিদাসের চিত্তে তৎকালীন সমাজে যজ্ঞের পুনরানুষ্ঠান, বহুদিনের আচলিত যজ্ঞের পুনঃপ্রবর্তন বিশেষ একটি তাৎপর্য বহন করত।

যজ্ঞ দ্বারা মানুষ তার অভীষ্ট লাভ করে এবং কৃত দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে। তপস্যার মতো যজ্ঞেও যজমান কৃচ্ছ্সাধন করেন, শুদ্ধাচারী থেকে উপবাস আর নিয়ম পালন করেন এবং ভোগ্যবস্তুর ভোগ থেকে বিরত থাকেন। এখানে যজ্ঞের সঙ্গে তপস্যার মিল; কিন্তু যজ্ঞে অগ্নিক্রিয়া প্রত্যক্ষ, অভিধাগত— তপস্যায় ব্যঞ্জনগত। বিরহের যন্ত্রণা এই দাহের, অগ্নিক্রিয়ার রূপকল্প। কাতায়ন শ্রেণীতসূত্র-র ভাষ্যে আছে: উদ্দিশ্য দেবতাং দ্রব্যত্যাগো যাগঃ'–দেবতার উদ্দেশে দ্রবত্যাগই যজ্ঞ।' তপস্যায় ত্যক্ত দ্রব্যের পুনর্ভোগ নেই, যজ্ঞে আছে। যজ্ঞের আগে আর পরে যজমানের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, তপস্যায়। সাধারণত তা নয়। ব্রত কাম্যেষ্টির মতোই, কিন্তু এতে অগ্নিক্রিয়া নেই এবং এর দ্বারা ভোগ্যবস্তুর শুদ্ধিসম্পাদন হয় না। এইখানেই কালিদাস-সাহিত্যে যজ্ঞের রূপকল্পের সার্থকতা। যজমান হব্যের একাংশ দেবতাকে দেন, যজ্ঞের আগুনে সে-অংশ ভস্মসাৎ হয়, এবং কেবলমাত্র তখনই হব্যের বাকি অংশ হুিতশেষ বা প্রশিত্র হয়, তা যজমান গ্রহণ করেন।

কালিদাস-সাহিত্যে প্রথম প্রেমের উন্মাদনায় বিহুল নায়ক-নায়িকার কর্তব্যে ত্রুটি ঘটে। প্রেম এমনই একান্ত হয়ে ওঠে যে তা সম্ভোগসর্বস্ব রূপে প্রতীয়মান হয়। কিছুকালর জন্যে নায়ক বা নায়িকা বঞ্চিত হয় প্রিয়মিলন থেকে। এই বিরহের যন্ত্রণা তার প্রায়শ্চিত্তআত্মবিস্মৃতির, কর্তব্যে বিচূতির। এই বঞ্চিত হওয়ার দ্বারা তার বাকি জীবনে সেই প্রেম হতশেষরূপে দেখা দেয়।

বিক্রমোর্বশীয় চতুর্থ অঙ্কে বিরহ এবং মিলনের পরেই উর্বশী পুরূরবাকে বলছেন:

মহান খলু কালস্তব প্রতিষ্ঠানান্নির্গতস্য।
কদাচিন্দসূয়িষ্যন্তি মহং প্রকৃতয়ঃ তাদেহি নির্বতোবহে।

বহুদিন হল তুমি প্রতিষ্ঠান-নগর থেকে বেরিয়ে এসেছ, হয়তো প্রজারা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবে, তাই চলো ফিরি।

এ নাটকের শেষ অঙ্কে তাদের পুনর্মিলিত জীবনের বর্ণনা:

প্রবিশ্য নগরমিদানীং সসৎকারোপচারৈঃ
প্রকৃতিভিরনুরজ্যমানো রাজ্যং করোতি।
নগরে প্রবেশ করে এখন প্রজাদের দ্বারা বহু উপচারের সম্মান আর অনুরাগ পেয়ে তিনি রাজত্ব করছেন।

এবারে সেই উদ্দাম প্রেম আপন সীমার মধ্যে সুষমা লাভ করেছে, আর তা কর্তব্যে বিচ্যুতি ঘটায় না, বরং কর্তব্যে প্রেরণা জোগায়। এবারে সে প্রেম হয়েছে হুতশেষ, তার আতিশয্য দগ্ধ হয়ে বাকিটুকু পরিণত হয়েছে প্রাশিত্রে, যার মধ্যে ভোগ আর ত্যাগ একটি সামঞ্জস্যের মধ্যেই বিধৃত।

এর ব্যতিক্রম উনমানবের ক্ষেত্রে, যেমন তাড়কার কামনাসর্বস্ব আবেগ। তার মধ্যে ত্যাগ নেই বলে কোনও শুভকে তা বহন করে না। মানুষের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম অগ্নিবর্ণে, যার কামনার আলেখ্য বিভীষিকাময় : রাজদর্শনে আগ্রহী প্রজাদের জন্যে যিনি দুটি পদতল প্রসারিত করে রাখেন, কারণ অবিচ্ছিন্ন সম্ভোগ থেকে এক মুহূর্তও তিনি বিরত হতে প্রস্তুত নন। এর

পরিণাম ক্ষয়, অকালমৃত্যু; এ ভোগসর্বস্ব কামনা অভিশপ্ত। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে যখন প্রেম আসে না তখন তার রূপ উগ্র, কামনাসর্বস্ব। (রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা নাটকে এ প্রেম অভিচার আর উচাটনকে আশ্রয় করে সার্থকতা খুঁজেছে।)

কালিদাস মুখ্যত পুরুষেরই বিরহ বর্ণনা করেছেন–রামচন্দ্র, দুষ্যন্ত, পুরুদারবা, যক্ষ, অজ। এঁদেরই বিলাপ তাঁর কাব্যনাট্যতে নানাসুরে অনুরাণিত। সীতা, শকুন্তলা, উর্বশী, যক্ষবন্ধুএঁরা নেপথ্যে বিরহ যাপন করেছেন। দেবতার বেলাতেই শুধু ব্যতিক্রম; উমার বিরহের মর্মস্পশী চিত্র এঁকেছেন কবি, রতিবিলাপ কুমারসম্ভবের কেন্দ্রস্থলে। মদন-রতির উপাখ্যান কালিদাসেরই উদ্ভাবন। পরবর্তী পুরাণগুলি খুব সম্ভব মহাকবির কাব্য থেকেই এ কাহিনি পেয়েছে। কাহিনিটি অসামান্য তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, প্রেম সম্বন্ধে কালিদাসের যে উপলব্ধি আর বোধ, তা এই প্রতীকী কাহিনিতেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রেমের অধিদেবতা মদন তাঁর উচ্ছৃঙ্খল শরসন্ধানের বিলাসে প্রজাপতিকে গর্হিত কামনায় অনুপ্রেরিত করেছিলেন। পরে, দ্বিতীয় বারে, উদাসীন শিবকে লক্ষ্য করে যখন কামুকে জ্যা আরোপণ করলেন তখন, শিক্ষুরুল্কুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষোঃ কৃশানুঃ কিল নিস্পপাত-সহসা তাঁর তৃতীয় নেত্র থেকে স্ফুলিঙ্গ-জুলা অগ্নি নির্গত হল।' (৩:৭১) সে অগ্নিতে মদন ভস্মসাৎ হলেন, রতির আর্ত বিলাপে আকাশ বাতাস শিহরিত হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রতির আত্মহত্যা নিবারিত হল। পুনর্মিলনের আশ্বাসে, দৈববাণীতে। এর অব্যবহিত পরের সর্গেই আর-এক দেবীর বিরহের বর্ণনা–পার্বতীর সুকঠোর তপস্যা।

মদন-রতির উপাখ্যানে কালিদাস প্রেম সম্পর্কে তার শিল্পীর উপলব্ধিকে একটি প্রতীকী রূপ দিয়েছেন। মদনের ভস্ম হয়ে যাওয়া যজ্ঞে হব্যবস্তুর দগ্ধ হওয়ারই প্রতীক। কিন্তু দগ্ধ হলেও মদন দেহবিনিমুক্ত অমুর্তভাবে বিদ্যমান

ছিলেন, তাই হরপার্বতীর মিলন সম্ভব হল–কিন্তু তা হল সম্পূর্ণ অন্য এক স্তরে। বিবাহে এ মিলন যখন অন্য স্তরে উন্নীত হতে চলেছে, তখন মদন ভস্মদেহ থেকে পুনর্বার স্বমূর্তি পরিগ্রহ করলেন এবং তখনই পার্বতী হুতশেষরূপে ফিরে পেলেন তার প্রেমকে, তার প্রিয়তম শিবকে। কালিদাসের ইষ্টদেবতা শিব। তাই হরপার্বতীর প্রেমের আর মিলনের প্রসঙ্গেই প্রেম সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধিটিকে মূর্ত করে, প্রত্যক্ষ করে তুললেন মদন-রতির উপাখ্যানে। কালিদাস-সাহিত্যে প্রেমের রূপায়ণে তাই এই উপাখ্যানটিই কেন্দ্রবিন্দুরূপে অবস্থিত। তাঁর উপলব্ধি এখানে প্রতীকী হলেও সম্পূর্ণ ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রতি যেখানে প্রেমের আর্তিতে বিহুল, প্রায় উন্মাদ, পার্বতী সেখানে কঠোর নিষ্ঠাভরে আহুতি দিচ্ছেন তার রূপযৌবন আর সম্ভোগকামনাকে, একাগ্রচিত্তে চাইছেন তার শিবকে, জীবনের সঙ্গী-রূপে। আহুতি সমাপ্ত হলে তাপসরদপী শিব এলেন তার তপস্যার দ্বারদেশে, হতশেষ হয়ে উঠল। প্রেম। মদন যখন ভস্মীভূত তখনই এ প্রেম পরস্পরের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পেল। এর সূচনায় মদন ছিল উন্মাদনারূপে, মাঝে সেই প্রেমদেবতার পূর্ণতর সত্তার উদ্দেশে পার্বতী নিবেদন করলেন তার মনোহারিণী শক্তিকে, মদনের স্বেচ্ছাচারকে। তারপর তারা যখন মিলিত হলেন তখন দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব মদনকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। কালিদাস জানেন, যত মহৎই হোক প্রেম, তার মধ্যে কামনা থাকবেই, আসঙ্গলিপ্সাকে সে কখনওই পরিহার করবে না। যে কোনও বনস্পতিই অদৃশ্য মূলের সাহায্যে মাটির নিচে রসসন্ধান করে, রসশোষণ করে, এই মূলকে বাদ দিয়ে সে বাঁচে না। কিন্তু শিকড় থাকবে যথাস্থানে, মাটির নিচে; অগোচরে তার আহৃত রস সঞ্চারিত হবে সমস্ত তরুণদেহে; তবেই ফুল ফুটবে উপরের শাখায়; ফলভারে আনত হয়ে আসবে শাখা; সার্থক হবে তার তরুজন্ম। তাই সংযত মিলনের প্রহরেই পুনরুজজীবিত হয় মদন। তাই যক্ষ নির্মল শরৎকালে পরিণতচন্দ্রিক রাত্রিতে

মিলিত হবে যক্ষবন্ধুর সঙ্গে; পুরুদরবা নতুন করে পাবেন হুতশেষরূপে তাঁর প্রেমকে; অপুত্রক রাজা নিজেকে ফলবান দেখবেন আয়ুর মধ্যে–বধূ আর সন্তান নিয়ে কর্তব্যে অবিচল থেকেই প্রেমের ঐশ্বর্য অনুভব করবেন। দুষ্যন্ত দীর্ঘবিরহানলে হব্যের মতো প্রেমের দাহ্য অংশটুকু আহুতি দিয়ে প্রাশিত্ররূপে ফিরে পাবেন যা তাঁর ভোগ্য সেই প্রেমকে; অপুত্রক দুষ্যন্ত পাবেন সর্বদমনকে আর কল্যাণী বধূকে। এই আহুতি যে দিতে পারল না তার প্রেম দুরন্ত কাম হয়ে জ্বলে মরল অতৃপ্ত জ্বালায়। সে কাম অগ্নিবর্ণের ক্ষয়রোগ আনে, চিন্তানলে অকালে পুড়িয়ে দেয় তার সমস্ত জীবনকে। আহুতি নেই, তাই হুতশেষও রইল না।

গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বোধহয় পরিমিতিবোধ। এ যুগের বিষ্ণুমূর্তি সূর্যমূর্তি দেখলে শিল্পীর সুষমাসৃষ্টির ক্ষমতায় চিত্ত শ্রদ্ধাপ্লুত হয়। মূর্তিগুলি একটি অস্ফুট স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল; এ হাস্যটি রেখামাত্রসার; একটু কম হলে মূর্তি হত গভীর, একটু বেশি হলে হত। উচ্ছল। এই পরিমিতিবোধই কালিদাসেরও সবচেয়ে বিস্ময়কর কৃতিত্ব। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে এ আর দ্বিতীয় বার দেখা দেয়নি; পরবর্তী সাহিত্য আতিশয্যদুষ্ট, এক কালিদাসই প্রায় সম্পূর্ণভাবে একে জয় করতে পেরেছেন। সৌষম্যবোধ তাঁর শিল্পকে নতুন করে একটি মাত্রা দিয়েছে। তার কাব্যনাটকে এর একটি পরিচয় মেলে প্রেমের রুদ্যপায়ণে। তার সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রেমের তরুটির মূল ভূমির গভীরে প্রোথিত, কাণ্ডশাখাপল্লবে তার বিস্তার দৃষ্টিগোচর; বসন্তের অজস্র সমারোহে তার পুষ্পসম্ভার ঊর্ধ্বের্ব প্রসারিত; ফলের ঋতুতে ফলোদগমে তার পূর্ণ পরিণতি। প্রেমের আত্মত্যাগ যজ্ঞক্রিয়ার মতো নিষ্পাদিত হলে পর নতুন পর্বে প্রেমের যে বিকাশ তাতে ঐশ্বর্য আছে, আতিশয্য নেই; ভোগ আছে কিন্তু তা একান্ত হয়ে ওঠেনি; কর্তব্যের সঙ্গে তার আর সংঘাত নেই।

এই বিশেষ বোধটি নানা বিচিত্র রূপকল্পে চিত্রিত হয়েছে, এবং এটি কবির নিজস্ব উপলব্ধি থেকে সঞ্জাত। মিশর-ব্যাবিলন-গ্রিসের বিরাহিণীর বিলাপগাথা বাণিজ্যপথে ভারতে অনুপ্রবেশ করে থাকলেও কালিদাস-সাহিত্যে মদন আর রীতির প্রেমকাহিনি যে তাৎপর্য বহন করে তার কোনও আদিকল্প অন্যত্র নেই। এ উপলব্ধির পশ্চাতে আছে গুপ্তযুগের শিল্প আর বিজ্ঞানের যুগপৎ প্রসার এবং উন্নতি, বহির্বাণিজ্য আর আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা থেকে যে নিরাপত্তার বোধ আর আত্মপ্রত্যয় আসে তা-ও আছে, এবং সর্বোপরি আছে একটি দৃঢ় প্রত্যয়: প্রেম বিদেহ নয়, কিন্তু দেহসর্বস্বও নয়; এবং পূর্ণতম বিকাশের স্তরে কল্যাণের সঙ্গে তাঁর আত্যন্তিক বিরোধ নেই। দেহের মধ্যে থেকেই একটি উর্ধশিখ প্রদীপ হয়ে তা জ্বলতে পারে। এই প্রত্যয়টি কালিদাসের কাব্যে একটি কেন্দ্রীয় আদিকল্প, এবং এর স্রষ্টা তিনি স্বয়ং।

মৃচ্ছকটিক

নাটকের প্রকারভেদ অনুসারে মৃচ্ছকটিক প্রকরণ। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্র-তে বলেছেন, কবি নিজের শক্তিতে যখন উদ্ভাবিত কাহিনি ও নায়ক সৃষ্টি করে নাটক রচনা করেন তখন সেটি প্রকরণ হয়। প্রকরণ দুই প্রকারের: শুদ্ধ ও সংকীর্ণ। নায়িকা কুলস্ত্রী হলে প্রকরণটি শুদ্ধ, গণিকা থাকলে সংকীর্ণ। (যত্র কবিরাত্মবুদ্ধ্যা বস্তু শরীরঞ্চ নায়কমেব চ/ঔৎপত্তিকং প্রকুরুতে প্রকরণমিতি তদবুধের্জ্ঞেয়ম। নাট্যশাস্ত্র ২০:৪৮) প্রায় দেড় হাজার বছর পরে খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকে বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যাদর্পণগ্রন্থে বলেছেন, প্রকরণের ঘটনা হবে লৌকিক, কবিকল্পিত; মূল রস-শৃঙ্গার; নায়ক-বিপ্র, অমাত্য অথবা বণিক

যিনি ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের চর্চায় নিরত এবং ধীরপ্রশান্ত। নায়িকা কখনও কুলনারী, কখনও বেশ্যা কখনও বা দুজনেই থাকবে। (ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতম/শৃঙ্গারোইসী নায়কস্তু বিপ্রোমাত্যেথবা বণিকঃ /সাপায়ধর্মকামার্থপরো ধীরপ্রশান্তকঃ/নায়িকা কুলজা কপি বেশ্যা কপি দ্বয়ং কৃচিৎ। ৬:২৫৩-৫৪) দেখা যাচ্ছে ভরত ও বিশ্বনাথের মধ্যে যে কালের ব্যবধান তার মধ্যে কিছু কিছু প্রকরণ রচনা হয়েছে এবং প্রকরণের সংজ্ঞা আরও স্পষ্ট অনুপুঙ্খতা অর্জন করেছে; ফলে নায়কের সামাজিক পরিচয় ও চরিত্র, একই নাটকে কুলনারী ও বেশ্যার যুগপৎ উপস্থিতি এবং মূল রসের প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্টতর নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ভরত ও বিশ্বনাথ দুজনেই বলেছেন কাহিনি কবিকল্পিত হবে; বিশ্বনাথ যোগ করলেন ‘লৌকিক, তাই নায়ক এখানে রাজা নয়, অমাত্য বা বণিক এবং বিপ্র (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য), উন্নতচরিত্র ও ধর্মপরায়ণ।

মৃচ্ছকটিক-এর কাহিনি বা বস্তু সম্পূর্ণই লোকায়ত। বৃহৎকথা-য় এ কাহিনির সংক্ষিপ্ত বীজ আছে, কথাসরিৎসাগর-এও তার বিভিন্ন অংশের সূত্র আছে। কথাসরিৎসাগর-এ গণিকা কুমুদ্দিকার প্রতি আসক্ত উজ্জয়িনীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। (৫৮:২) ওই গ্রন্থেরই অন্যত্র পাই রূপণিকা নামে গণিকা এক ব্রাহ্মাণের প্রতি আসক্ত। (১২:৪) গণিকা মন্দনিকার প্রাসাদের সঙ্গে বসন্তসেনার প্রাসাদের বর্ণনা মেলে; (৩৮:২০-২৭) যেমন এর অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখি জুয়াড়িরা মন্দিরে ঢুকে পড়ছে। মৃচ্ছকটিক-এর নয় অঙ্কের রাজা পালক ও দশম অঙ্কের নতুন রাজা গোপালপুত্র আর্যক; কথাসরিৎসাগর-এ প্রদ্যোত ও অঙ্গরাবতীর দুই পুত্রের নাম গোপাল ও পালক। ভাসের বিখ্যাত নাটক চারুদা‍ি‍ক্তচার অঙ্কে সমাপ্ত, সেখানকার কাহিনি মৃচ্ছকটিক-এর পঞ্চম অঙ্কের কাহিনি পর্যন্ত। মনে হয়, নাট্যরচনায় এই নাটকটিই শূদ্রককে প্রণোদিত করে। কাব্যালংকার্যসূত্র-এর রচয়িতা বামন তাঁর গ্রন্থের উদাহরণে যে শ্লোক

ও উক্তিগুলি উদ্ধৃত করেছেন তার মধ্যে দুটি চারুদত্ত ও মৃচ্ছকটিকে আছে। প্রথম, ‘যাসাং বলি সপদি মদগৃহদেহলীনাম; দ্বিতীয়, ‘দ্যুতং হি নাম পুরুষস্যসিংহাসনং রাজ্যম; তৃতীয় একটি, ‘ব্যসনং হি নাম সোচ্ছ্বাসং মরণম— ভাসে আছে এবং এর প্রতিধ্বনি পাই মৃচ্ছকটিকে।

সুক্তিমুক্তাবলী-তে একটি শ্লোক আছে, শূদ্রককথাকার ছিলেন র্যামিল ও সোমিল। এঁদের কাব্য ছিল অর্ধনারীশ্বরের মতো। (তৌ শূদ্রককথাকারৌ রম্যৌ রামিলসোমিলীে/কাব্যং যয়োদ্ধয়োরিাসী দর্ধনারীনরোপমৌ।) এর এক অর্থ হতে পারে এদের একজনের কাব্য অপরের কাব্যের পরিপূরক ছিল, অথবা অন্য অর্থ হতে পারে। এঁরা দুজনে যৌথ ভাবে একখানি শূদ্রককথা রচনা করেছিলেন। এ কাব্য পাওয়া যায় না। তবে একটি শূদ্রককথা-র অস্তিত্ব ওই শ্লোক থেকে জানা যায়।

শূদ্রকের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে আজও বিতর্কের অবসান ঘটেনি। প্রথম বা দ্বিতীয় শিবমার রাজা (সপ্তম থেকে অষ্টম শতকের), আভীর রাজা শিমুক (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের), শিশুক, শিংশুক, ইত্যাদি নানা নামে, নানা স্থানে ও নানা যুগে নাট্যকারকে স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণে আমরা শিমুক, শিশুক, সিন্ধুক ও শিপ্রক, ইত্যাদির নামের রাজাদের কথা পাই। কিন্তু শূদ্রক যদি সাতবাহন বংশীয় হন তবে ওই বংশের রাজারা ব্রাহ্মণ্যাগর্কিত ছিলেন। বাণভট্ট কাদম্বরী-তে এক শূদ্রক রাজার উল্লেখ করেছেন যিনি জন্মান্তরে চন্দ্রপীড় ও চন্দ্র ছিলেন (দণ্ডী তাঁর দশকুমারচরিত-এ শূদ্রকের বহু জন্মের কথা উল্লেখ করেছেন)। তার থেকে মনে হয় খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীতেই — বাণভট্টের যুগে— এই শূদ্রক এক ইতিহাস-বিখ্যাত রাজা ছিলেন। দক্ষিণাত্যের এক রাজা দ্বিতীয় শিবামার কল্পনার তু নামে একটি হস্তিশিক্ষার গ্রন্থ রচনা করেন, এর পৌত্র শিবমর সম্বন্ধে। ৭২৬ খ্রিস্টাব্দের বারদুর শিলালেখে পাই যে

ইনি শতায় ছিলেন (স্মৃত্যাবিরোধেন বর্ষশতপূর্ণায়ুঃ)। বেতাল পঞ্চবিংশতি-র বীরবরোপাখ্যানে শূদ্রক এক বিজয়ী রাজ; তার কর্মচারী বীর্যবর রাজার মৃত্যু আসন্ন জেনে নিজের পুত্রকে বলি দিয়ে শূদ্রকের জন্য শতবর্ষ পরমায়ুবর দেন। মৃচ্ছকটিক-এও রাজা শূদ্রকের শতবর্ষ পরমায়ুর উল্লেখ আছে, তিনি হস্তিশিক্ষাবিৎ এমন কথাও আছে। এ সব থেকে মনে হয় নাটকে শূদ্রাক-পরিচিতির শ্লোকগুলিতে বহু প্রখ্যাত রাজার গুণাবলী একত্র করে নাট্যকার শূদ্রকে আরোপিত হয়েছে। এ শূদ্রক সম্ভবত কাদম্বী-তে উল্লিখিত রাজা শূদ্রক, যাঁর কথা অষ্টম শতকের আলংকারিক বামন তাঁর কাব্যালংকার্যসূত্রবৃক্তি-তে শ্লেষগুণের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, এবং একাদশ শতকে কলহণ তাঁর রাজতরঙ্গিণী-তে র্যাকে বলেছেন বিক্রমাদিত্যের তুল্য। রায়মুকুট-এ শূদ্রক বধ' নামে এক পরিকথা, পঞ্চশিখরচিত শূদ্রাকচারিত এবং বিক্রমাস্তশ্বন্দ্রক নামে এক নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তামিলনাড়ুতে প্রাপ্ত দন্তীর অবন্তীসুন্দরীকথা-র এক পাণ্ডুলিপিতে একটি শ্লোক পাওয়া যায় যার অর্থ হল: শূদ্রক স্বচ্ছ অসিধারে বারবার পৃথিবী জয় করে তারপরে আত্মচরিতার্থক রচনায় পৃথিবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। (শূদ্রকেশাসকৃজ্জিত্বা স্বচ্ছয়া খড়গধারয়া/জগদভুয়োহভ্যবষ্টৰ্ং বাচা স্বচরিতীর্থয়া।) এখানে সম্ভবত শূদ্রাক-বিরচিত কোনও অধুনালুপ্ত আত্মচারিত অথবা শূন্দ্রক রচিত নামক লুপ্ত রচনাটিরই উল্লেখ পাচ্ছি। বামন তাঁর কাব্যালংকার্যসূত্রবৃক্তি-তে শূদ্রক বিরচিতেষু প্রবন্ধেযু (৩:২:৪) লিখেছেন; বহুবচন থেকে মনে হয় শূদ্রক মৃচ্ছকটিক ছাড়া অন্য গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

শূদ্রক নামটিতেও বৈশিষ্ট্য আছে; শুনেই বোঝা যায় এ নাম পৈত্রিক নয় (অশূদ্র পিতামাতা সন্তানের এ নামকরণ করবেন না, শূদ্র পিতামাতাও করবেন না)। হয়তো এটি উপাধিরূপেই ব্যবহৃত। মনে হয় কোনও শূদ্রজাতীয় রাজা বা/এবং নাট্যকার যশস্বী হওয়ার পরে তাঁর শূদ্র-পরিচয় স্বার্থিক 'ক'-

প্রত্যয়যোগে বিশেষণরূপে ব্যবহার করেন। একাদশ শতকের ভাগবতপুরাণ-এ পড়ি দক্ষিণাত্যের অন্ধ্রভৃত্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শিমুক ছিলেন বৃষল অর্থাৎ শূদ্র। ইনি নাট্যকার না-ও হতে পারেন। তবে নাটকটি দক্ষিণাত্যের, এমন অনুমানের কিছু কিছু ভিত্তিও আছে; নানা আচার সংস্কার ও দক্ষিণাত্যের কিছু কিছু শব্দ এতে আছে (যথা কর্ণাটকলহ, দেবী সহ্যবাসিনী, খুন্টমোড়ক, বরগুলাম্বুক, ইত্যাদি শব্দ বা বীরকের উক্তি 'বয়ং দক্ষিণাত্যাঃ', ইত্যাদি)।

নাটকের নাট্যকারের কাল নিয়ে যেমন বিসংবাদ স্থান নিয়েও তেমনই। ভাষায় সামাজিক পটভূমিকার কিছু অংশে দক্ষিণাত্যের প্রভাব স্পষ্ট, অথচ মুখ্যত এ নাটকে ঘটনা ঘটছে উজয়িনীতে, নাটকে উজ্জয়িনী সম্বন্ধে বহু গর্কিত উক্তিও আছে। এমন হতে পারে যে, উজ্জয়িনীর ঘটনা হিসেবেই নাট্যবস্তু পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল, তাই দক্ষিণী নাট্যকার উজ্জয়িনীতেই এর স্থাপনা করেন, তবু দাক্ষিণাত্যের কিছু কিছু চিহ্ন এতে থেকে যায়। অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত সম্ভাবনাও খণ্ডন করা কঠিন। ভাষা থেকে নিঃসংশয়ে কিছু বোঝা যায় না। চারুদত্ত, শর্বিলক, আর্যক, অধিকরণিক, দর্দুরক এবং পঞ্চমাঙ্কে একবার বসন্তসেনাও সংস্কৃত বলছেন। শৌরসেনী, যা মুখ্য নাটকীয় প্রাকৃত তাতে কথা বলছেন বসন্তসেনা, সূত্রধার, বীরক, চন্দনক, শ্রেষ্ঠীকায়স্থ, মদানিক, ধুতা ও বসন্তসেনার মা। মৈত্রেয় বলছেন প্রাচ্যা; সংবাহিক, কর্ণপুরক, বর্ধমানক, স্থাবরক, রদনিক এরা বলছে মাগধী এবং সংস্থানক বলছে নিকৃষ্টতম প্রাকৃত, শাকারী।

দশম অঙ্কে রাজনৈতিক পটভূমিকা পরিবর্তনের ফলে যে-আর্যক রাজা হলেন নাটকে তিনি গোপালদারক। এ শব্দের একটি অর্থ গোয়ালার ছেলে; কিন্তু এ-অর্থ সংগত মনে হয় না, কারণ, প্রথমত, সংস্কৃত নাটকে গোয়ালার ছেলে

সংস্কৃত বলে না, প্রাকৃত বলে। দ্বিতীয়ত, গোয়ালার ছেলের নাম আর্যক হওয়া, খুব আপেক্ষিত নয়। তৃতীয়ত, দশম অঙ্কের ৫০ সংখ্যক শ্লোকে পড়ি আর্যকতাঁর বংশমর্যাদা রক্ষা করেছেন, এ কথা গোয়ালার ছেলে সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে প্রযুক্ত হত না। কাজেই এখানে গোপালদারক মানে আর্যকের পিতার নাম গোপাল। নাটকটির নামকরণেও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রকরণের নাম হবে নায়ক-নায়িকার নামে, যেমন মালতীমাধবা। সে হিসেবে এ নাটকের নাম হওয়ার কথা চারুদত্তবসন্তসেনা, কিন্তু হল মৃচ্ছকটিকা এ নামের সূত্র ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথমে একটি আপাতগৌণ ঘটনায় নিহিত। পূর্বরাত্রে প্রিয়সঙ্গমের পরে সকালে বসন্তসেনা যাবেন উদ্যানে চারুদত্তের কাছে; চারুদত্ত আগেই সেখানে গেছেন। সকালে বাড়িতে চারুদত্তের পুত্র রোহসেনের কান্না শুনে দাসীকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে বসন্তসেনা জানতে পারলেন, রোহসেন প্রতিবেশীর ছেলের সোনার খেলনাগাড়ি নিয়ে তার সঙ্গে খেলছিল। সে ছেলেটি তার গাড়ি নিয়ে বাড়ি গেছে, তাই কান্না। তাকে ভোলাতে দাসী একটি মাটির গাড়ি নিয়ে আসে, তাতে রোহসেনের মন ওঠে না, কান্নাও থামে না। শুনে বসন্তসেনার চোখে জল এল। দেখে রোহসেন বলল, ‘তুমি কে?’ বসন্তসেনা বললেন, ‘আমি তোমার মা হই।’ ছেলে বললে, ‘না, আমার মা এত গয়না পারেন না।’ তখন বসন্তসেনা সাশ্রুনেত্রে একে একে নিজের অঙ্গ থেকে অলংকারগুলি খুলে রোহসেনের মাটির গাড়িতে দিয়ে বললেন, ‘যাও, বাবা, এগুলো দিয়ে সোনার খেলনাগাড়ি গড়িয়ে নিও।’

এই খেলার মাটির গাড়িই সংস্কৃতে মৃৎ-শকটিক, তার থেকেই নাটকের নাম। এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার কারণ হল, নামকরণে শূদ্রক প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে এই ঘটনাটি দিয়েই যখন নামকরণ করেছেন তখন নিশ্চয়ই এর কোনও গূঢ় নিহিতার্থই তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল।

এক অর্থে এই নিহিতার্থই নাটকের মূল বিবক্ষিতের রূপক-চুম্বক। এ নাটকের প্রথম পাঁচ অঙ্কের ঘটনা ভাসের চারুদত্ত নাটকের চার অঙ্ক থেকে নেওয়া। নায়িকা নায়কের অভিসারে যাচ্ছেন, এখানে তাদের আসন্ন মিলনের সংকেতের মধ্যে ভাসের নাটকের পরিসমাপ্তি। কিন্তু মৃচ্ছকটিক-এ নাট্যবস্তুর যা কিছু গৌরব তা নিহিত আছে ষষ্ঠ থেকে দশম অঙ্কে। নাটকের অন্তর্নিহিত সমস্যা দেখা দেয় ষষ্ঠে, জটিল হয়ে ওঠে সপ্তম থেকে নবমে, দশমে তার চূড়ান্ত পরিণতি। কাজেই মৃচ্ছকটিক যেখানে নাটকীয় তাৎপর্যের গভীরতা অর্জন করছে তার সবটুকু কৃতিত্ব শূদ্রকেরই। এবং ষষ্ঠ অঙ্ক থেকেই সে অংশের সূচনা। এই ষষ্ঠ অঙ্কের শুরুতেই এই ঘটনা, এবং এরই মধ্যে নামকরণের উৎস।

নাট্যকার এখানে মঞ্চে একটি দৃশ্য দেখালেন, সালংকারা বসন্তসেনা অলংকার খুলে মাটির গাড়িতে ভরে দিয়ে নিরাভরণা হলেন, কারণ, অলংকৃত অবস্থায় রোহসেন তাঁকে মা যাচ্ছিল। এখানে দুটি ঘটনা ঘটল। যার রূপক তাৎপর্য আছে: একটি, বসন্তসেনার অলংকার মোচন; দ্বিতীয়টি, মাটির গাড়ি সোনায় ভরে ওঠা।

সমাজে ভালমন্দের যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আছে তা যেন একটি সাংকেতিক রূপকল্প হয়ে এখানে দেখা দিল: রাজা পালক ও তার শ্যালক শকার ধনী, তারা দুজনেই শক্তিমান ও দুর্জন। চারুদত্ত, শবিলক, সংবাহক, দদুরক, স্থাবরক, বর্ধমানক, মন্দনিকগ, রদনিক, গোহ, আহীিন্ত এরা সকলেই সৎ ও দরিদ্র। ব্যতিক্রম একজনই ছিলেন, বসন্তসেনা। ইনি ধনী। কিন্তু সৎ। ষষ্ঠ অঙ্কে যখন তিনি নিরলংকর হলেন তখনই যেন তিনি দরিদ্র চারুদত্তের পাশে এসে দাঁড়াতে পারলেন। আর, মঞ্চের ওপরে যখন একটা মাটির গাড়িতে সোনার গহনা ভরে দেওয়া হল তখন সেই গাড়িটাই নাটকের সৎ চরিত্রগুলির প্রতীক হয়ে উঠল, বাইরে যাদের দৈন্য ও ভঙ্গুরতা (যেমন, বসন্তেসেনার

গণিককুলে জন্ম, চারুদত্ত ও অন্যান্য সৎ চরিত্রগুলির দারিদ্র) অথচ অন্তরের চরিত্রবল যাদের খাঁটি সোনা, তাদের প্রতীক হয়ে উঠল। ওই মৃৎ-শকটিকা। এই একটি রূপকের মধ্যে নাটকের মূল কথাটুকু বিধৃত হয়ে রইল এবং এর দ্বারাই নাটকের নামকরণের যথার্থতা প্রতিপন্ন হল।

যদিও অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকে রাজাই নায়ক, মৃচ্ছকটিক-এ কিন্তু রাজা নেপথ্যেই থাকে। এ নাটকের অন্য চরিত্রগুলি সমাজের সব স্তর থেকে সংকলিত হয়েছে এবং বহু সামাজিক অবস্থা ও বৃত্তি চরিত্রগুলিতে প্রতিফলিত। নেপথ্যে রাজা, প্রকাশ্যে একদা-ধনী চারুদত্ত, ধন্যবতী। বসন্তসেনা, কুলপুত্র শর্বিলক ও সংবাহক, সহসা-ধনী সংস্থানক, অধুনাদরিদ্র দর্দুরক, দরিদ্র চারুদত্তের বান্ধব মৈত্রেয়, গণিকা মন্দনিকা, ভৃত্য স্থাবরক, বর্ধমানক, দাসী রদনিকা ও দরিদ্র চণ্ডাল। বৃত্তির দিক থেকে গণিকা, বণিক, বিট, চেট, অধিকরণিক, শ্রেষ্ঠীকায়স্থ, দাস-দাসী, চোর, সংবাহক, শ্রমণ, হাতির মাহুত, প্রবহণক, জুয়াড়ি, চণ্ডাল–সবাই আছে। বর্ণের দিকে আছে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ ও চণ্ডাল। মধ্যে মধ্যে একই বৃত্তিধারী ব্যক্তিদের মধ্যে ভিন্ন চরিত্রের মানুষ বৈচিত্র্য এনেছে; যেমন, দুই বিট, বীরক-চন্দনক, গোহি-আহীন্ত।

নায়ক হিসেবে যেমন চারুদত্তের চরিত্রে, নায়িকা হিসেবে তেমনই বসন্তসেনার চরিত্রে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আছে। চারুদত্ত বিবাহিত পুত্রবান এবং স্ত্রী ধূতার প্রতি উদাসীন নন; কিন্তু তাঁর জীবনে একটি নতুন ও প্রবল প্রেম দেখা দিয়েছে সামাজিক নিয়মে যার চরিতার্থতার পথ রুদ্ধ, কারণ গণিকাকে ধন দিয়েই পাওয়া যায় এবং তিনি বর্তমানে নির্ধন। বসন্তসেনা গণিকা; চারুদত্তের প্রতি তাঁর প্রেম অন্ধগলিতে মাথা কুটে মরে কারণ তাঁর কাছে আসবার মতো অর্থসম্বল চারুদত্তের নেই। কিন্তু এ প্রেমে বসন্তসেনার জন্মান্তর ঘটে গেছে,

তাই কায়মনোবাক্যে তিনি গণিকাবৃত্তি পরিহার করেছেন। যে-অলংকার কাটি নাটকের নামকরণে এত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে প্রথম অঙ্কে বসন্তসেনা কৌশলে সেগুলি চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রাখেন যাতে আবার তাদের দেখা হয়। সে গহনাচুরি করেও দৈবক্রমে চোর শর্বিলক মদনিকার নিষ্ক্রয়মূল্য হিসেবে অলংকারগুলি বসন্তসেনাকেই এনে দেয় এবং চুরির অপবাদ ঘোচাতে বিদুষক ধূতার বহুমূল্য মুক্তামাােলা এনে দিলেন বসন্তসেনাকে। বসন্তসেনা বলে পাঠালেন সেই সন্ধ্যাতেই চারুদত্তের কাছে যাবেন।

নানা প্রাসঙ্গিক বস্তুর (sub-plot) মাধ্যমে চারুদত্ত ও বসন্তসেনা যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকা নন, সেখানে তাঁদের মনুষ্যত্বের ও মহত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং এই একটি নাটকে অন্তত চারুদত্ত ও বসন্তসেনা শুধু পরস্পরের রূপমুগ্ধ নন, গুণে অভিভূত। পঞ্চম অঙ্কে এদের ক্ষণিক মিলন। ষষ্ঠ থেকে দশমে বিরহ ও বহু প্রতিকুল অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে দুজনে দুঃখের মূল্য দিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে প্রেমকে জীবনের গভীরে অর্জন করলেন।

যদিও এ নাটকে বহু পার্শ্বচরিত্রের তাৎপর্য আছে (যেমন আর্যক, স্থাবরক, শবিলক, সংবাহক, চন্দনক ও বসন্তসেনা-মাতা) তথাপি সংক্ষেপে অন্তত দুটি গৌণ চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন মৈত্রেয়, বিদূষক। সংস্কৃত নাটকে বিদুষকের একটি সুপরিচিত ভূমিকা আছে–সে ভাঁড় ও ঔদরিক। মৈত্রেয় কোনওটিই পুরোপুরি নন, অথচ দুটি লক্ষণই তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান, তিনি ভোজনরসিক ও পরিহাসপ্রিয়। প্রথম পরিচয়েই দেখি মৈত্রেয় তাঁর অপেক্ষিত ভূমিকাকে লঙ্ঘন করে গেলেন; যে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলে বন্ধু চারুদত্তের দারিদ্র্য প্রকাশ্যে অবমানিত হয় তা তিনি অনায়াসে ও সগর্বে প্রত্যাখ্যান করলেন। নাটকে তার প্রধান পরিচয়, তিনি অনায়াসে ও সগর্বে প্রত্যাখ্যান করলেন। নাটকে তার প্রধান পরিচয়, তিনি চারুদত্তের বন্ধু— যে বন্ধু দুদিনে রাষ্ট্রবিপ্লবে ও শ্মশানে পাশে থাকে, যে বন্ধু বন্ধুর মৃত্যুর পরে

প্রাণধারণ করার কথা ভাবতেই পারে না, যে বন্ধু চারুদত্তের সম্মান রক্ষার জন্যে নিত্য উদ্যত, চারুদত্তের স্বার্থের কাছে যার আর সবই গৌণ হয়ে যায়।

সংস্থানকের যে বিট তার চরিত্রেও বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্থানকের বৃত্তিভোগী সহচর তিনি। দারিদ্র্যের চাপে একটি অমানুষের পার্শ্বচর হওয়ার যে গ্লানি সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে অবহিত। সংস্থানক শুধুমুর্খনয়, সে ধূর্ত, নিষ্ঠুর, কামুক, স্বার্থপর ও অত্যাচারী। তবু দুর্দৈবক্রমে তারই স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সচেষ্ট থাকার চরাচরিত ভূমিকাতেই বিট অভ্যস্ত ছিলেন এবং মনিব সংস্থানকের স্বার্থে বারবার নিষ্ঠুর ভাবে বসন্তসেনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ধনী সংস্থানকের ইচ্ছাপূরণে আপত্তি করা একান্ত অসংগত। গণিকার উচিত প্রিয়-অপ্রিয় সঙ্গপ্রার্থীর সঙ্গে সমান ভাবে আচরণ করা, কারণ সে পথের পাশের লতা, যে-কেউ তার ফুল ছিঁড়ে নিতে পারে। কিন্তু এই বিট যে, মুহূর্তে শুনলেন বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রতি অনুরক্তা তৎক্ষণাৎ তার মনোভাবে গভীর পরিক তঁন এল, বসন্তসেনার প্রেম তার কাছে সম্ভ্রমের বস্তু হয়ে উঠল এবং বসন্তসেনা-চারুদত্তের মিলনের জন্যে সর্বতো ভাবে আনুকুল্য করা ও মনিব সংস্থানকের কামুকতার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করাই তার কাছে একান্ত কর্তব্য হয়ে উঠল। শকার যখন বসন্তসেনার গলা টিপে ফেলে রেখে গেল তখন তাকে মৃত জেনে সাশ্রনেত্রে বিটের সেই আশীর্বাদ: সুন্দরি, এর পরজন্মে নির্মল কোনও বংশে জন্মিও, তোমার গণিকজন্মের যন্ত্রণার যেন এখানেই অবসান ঘটে। আমাদের মনে হয়, বৌদ্ধভিক্ষুর পরিচর্যায় যখন বসন্তসেনা পুনরুজজীবিত হন তখন যেন বিটের আশীর্বাদ সফল হল: সত্যই যেন বসন্তসেনার এক নবজন্ম ঘটল। আগেই তিনি ঐশ্বর্যের সমস্ত চিহ্ন মোচন করে এসেছেন, এবার এই নবজন্মে। সেই নিরাভরণা বসন্তসেনা, নাটকে যাঁকে বারবার বলা হয়েছে বসন্তশোভার মতো সুন্দরী, তিনি যেন প্রেমের মহিমায় অন্য এক সর্বশুচিলোকে উদিত হলেন। আসন্ন মৃত্যুর সামনেও যিনি অকুন্ঠ ভাবে প্রেমের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছেন, তিনি এবার সত্যই সহধর্মিণী

হলেন চারুদত্তের, যিনি নিজেও প্রেমের জন্যে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এ নাটকে ঘটনা দ্রুত ঘটেছে, বহু বিচিত্র উপকাহিনি অঙ্গাঙ্গী ভাবে মূল ঘটনার সঙ্গে সুগ্রথিত হয়ে সংহত একটি নাট্যবস্তু সৃষ্টি করেছে। দু-একবার ছাড়া সংলাপ বা বর্ণনার দ্বারা ঘটনার গতি কখনওই প্রতিহত হয়নি (বসন্তসেনার গৃহবর্ণনায়; হয়তো এটি পরবর্তীকালের সংযোজন। এছাড়া দারিদ্র্য বা বর্ষার বর্ণনায় বহু শ্লোকের সমাবেশেও ঘটনার গতি ব্যাহত হয়, কিন্তু স্পষ্টতই এগুলি সব শূদ্রকের রচনা নয়, বহু কবির রচনা প্রক্ষিপ্ত হয়েড় নাট্যগতিকে মন্থর করে তুলেছে)। প্রথম অঙ্কের ঘটনা প্রথম দিন সন্ধ্যা থেকে রাত্রি, দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় দিন দিনের, তৃতীয়ে দ্বিতীয় রাত্রির, চতুর্থে তৃতীয় দিন দিনের, পঞ্চমে তৃতীয় দিন রাত্রির, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টমে চতুর্থ দিন দিনের ঘটনা ও দশমে পঞ্চম দিন দিনের। অর্থাৎ দশ অঙ্ক মিলে মাত্র চার দিনের ঘটনা, এতেই বোঝা যায় ঘটনার গতি কত দ্রুত ও অপ্রতিহত।

মৃচ্ছকটিক নাটকটি পাশ্চাত্য জগতে খুবই সমাদর লাভ করেছে। তার কিছু কিছু কারণ এতক্ষণ দেখা গেল–যেমন নামকরণ, অতিলৌকিকের অনুপস্থিতি, বৃহৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিসর, সমাজের বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের সমাহার, কয়েকটি ভাবকল্প ও রূপক অনুষঙ্গের উপস্থিতি, ঘটনার দ্রুত গতি ও চরিত্রচিত্রণে বৈশিষ্ট্য।

মৃচ্ছকটিক-এ মূল কাহিনি ছাড়াও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বস্তু আছে, যেমন জুয়া খেলা, চুরি, বেয়াড়া হাতির কাহিনি, ইত্যাদি। এইগুলি নানা ভাবে মূল নাট্যবস্তুকেই পুষ্ট করে। কিন্তু মূল বা আধিকারিক (main plot) এবং প্রাসঙ্গিক বস্তু সব কটির মধ্যেই কতকগুলি রূপকের অনুষঙ্গ ফিরে ফিরে

এসেছে, তার মধ্যে একটি হল তাড়া করা। প্রথম অঙ্কেই দেখি সংস্থানক বসন্তসেনাকে তাড়া করছে, তারপরে সংবাহককে তাড়া করছে জুয়াড়ি ও সাভিক, খুঁটভাঙা হাতি তাড়া করছে সন্ন্যাসীকে, সপ্তম অঙ্কে আর্যককে তাড়া করছে রাজপ্রহরীরা।

আর একটি হল আশ্রয় প্রার্থনা: প্রথম অঙ্কে বসন্তসেনা চারুদত্তের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আশ্রয় পাচ্ছেন, দ্বিতীয়ে, সংবাহক আশ্রয় পায় বসন্তসেনার কাছে এবং সপ্তমে আর্যক আশ্রয় পেলেন চারুদত্তের কাছে। অন্য একটি রূপক-অনুষঙ্গ হল বিপর্যাস–প্রবহণ বিপর্যাস বা গাড়িবদলের ফলে বসন্তসেনা এসে পড়লেন শকারের মুঠোর মধ্যে এবং এরই পরিপূরক বিপর্যাসটির ফলে আর্যক রক্ষা পেলেন রাজরোষ থেকে, চারু দত্তের আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়ে; এবং এ দুটিই নাটককে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে দেয়। তাড়া করার ব্যাপারে লক্ষ্য করি ভালকে মন্দ তাড়া করছে, আশ্রয়দানে ভালকে ভাল আশ্রয় দিচ্ছে আর বিপর্যাসের ক্ষেত্রে দৈব সক্রিয়। অর্থাৎ নাটকটি যে ভাবরূপের জগতে চলাফেরা করছে সেখানে মুখ্যত মানুষই ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করছে, দৈবের ভূমিকা যেটুকু সেখানেও মানুষের প্রতিরোধ উদ্যমে সংকট কেটে যাচ্ছে। সংস্কৃত নাট্যজগতে এ ঘটনা অত্যন্ত বিরল।

সংস্কৃতে অন্য যে বিখ্যাত প্রকরণটি আছে, ভবভূতির মালতীমাধব সেখানে দৈব নাটকের গতি ও পরিণতির পক্ষে অপরিহার্য (সৌদামিনীর যোগসিদ্ধির দ্বারা আকাশপথে ভ্রমণ)। তন্ত্রচারের জন্যে সেখানে কাপালিক অঘোরাঘন্ট ও তার শিষ্যা কপালকুণ্ডলার দ্বারা মালতীর অপহরণ, হতাশ মাধবের নিজের দেহমাংস দিয়ে দেবীকে প্রসন্ন করার উদ্যোগ–এ সব নাটকটিকে সম্পূর্ণ লৌকিক স্তর থেকে কতকটা সরিয়ে নিয়ে যায়, অথচ এগুলি মূল কাহিনির অপরিহার্য অংশ। অর্থাৎ এখানে নায়ক-নায়িকার মিলনের বাধাও যেমন

কতকটা অতিলৌকিক জগৎ থেকে আসছে, তার নিরসনও তেমনই ঘটছে অলৌকিক শক্তির দ্বারা। এ ছাড়া দৈব ও অলৌকিকের প্রভাব দেখি অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ ঋষিশাপ, অগ্নিগৃহে দৈববাণী, আশ্রমবৃক্ষ থেকে বধূসজ্জা লাভ, মাতলির অলৌকিক শক্তিতে বিদূষকের অদৃশ্য হওয়া, পুষ্পক রথে দুষ্যন্তের স্বর্গে যাওয়া, সর্বদমনের অলৌকিক রক্ষাকরণক, ইত্যাদি। তেমনই বিক্রমোর্বশীয়-এ উর্বশীর তিরস্করিণী বিদ্যার শক্তিতে অদৃশ্য হওয়া, কুমারবনে প্রবেশমাত্র লতায় পরিণত হওয়া, সংগমনীয় মণি'-র সাহায্যে স্বরূপ ফিরে পাওয়া ইত্যাদি; এবং এ সবই নাটকের পরিণতির পক্ষে অপরিহার্য। অন্যান্য নানা নাটকে দৈবশক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বহু উদাহরণ আছে। সে দিক থেকে মৃচ্ছকটিক-এর সংঘাত সমস্যা ও তার নিরসন, সবই ঘটছে সম্পূর্ণ মানবিক জগতে। এ নাটকে অন্যায়ের, অমঙ্গলের দায়িত্বও যেমন মানুষের, তার প্রতিকারের দায়িত্বও তেমনই মানুষই নিয়েছে– কখনও একক ভাবে, কখনও বা যৌথ ভাবে। সামাজিক স্তরে একক ভাবে অন্যায় করেছে শকার, প্রতিকার করেছেন মুখ্যত চারুদত্ত, নেপথ্যে বসন্তসেনা, মৈত্রেয়, বিট ও অন্য কয়েকজন। রাষ্ট্রিক স্তরে দুষ্কৃতকারী রাজা পালক ও তার সহচরবৃন্দ, তার প্রতিকার করেছেন আর্যক, শর্বিলক, দর্দুরক, রেভিল, সংস্থানকের বিটরাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা। নেপথ্যে সাহায্য করেছেন চারুদত্ত, মৈত্রেয়, চন্দনক, এঁরা। এ রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে কতকগুলি সামাজিক অন্যায়েরও প্রতিকার হল: যেমন, বসন্তসোনার বধুত্বলাভ, সামাজিক ও আর্থিক ভাবে চারুদত্তের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, শবিলকের যশ ও অর্থলাভি, চন্দনকের পদোন্নতি, সংবাহকের শ্রমণ-প্রধানের পদপ্রাপ্তি ও শকারের প্রকাশ্য লাঞ্ছনা। অর্থাৎ সমাজের অন্যায়মোচনের দায়িত্ব এ নাটকে মানুষ একই নিয়েছে। বিচারক যেখানে যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে সুবিচার করতে অক্ষম, প্রজারা যেখানে অন্যায়কারী রাজার দুঃশাসনে পীড়িত, অপদার্থ অত্যাচারী শকারের অপ্রতিহত প্রতাপে যেখানে সৎ দরিদ্র বণিক, বৌদ্ধভিক্ষু ও সুন্দরী গণিকা

থেকে অধিকরণিক পর্যন্ত সকলেই সন্ত্রস্ত, সেখানে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই, সমবেত উদ্যোগে রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা এ অন্যায় রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাজাকে হত্যা করে সৎ ও বীর এক রাষ্ট্রনায়ককে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে।

মৃচ্ছকটিক-এর কবিত্বেও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যদিও পরবর্তীকালের বহু প্রক্ষেপ নাটকের প্রচুর ক্ষতি করেছে। তবু কবিত্বের বিচারে মূল ও প্রক্ষেপকে পৃথক করে নেওয়া দুরূহ নয়। স্বভাবোক্তির সাহায্যে অনলংকৃত ব্যঞ্জনা-ঋদ্ধ কাব্য নির্মাণ করা শ্রেষ্ঠ কবিরই সাধ্য; মৃচ্ছকটিক-এ মধ্যে মধ্যে এ ধরনের কবিতার দেখা মেলে। পঞ্চম অঙ্কে যখন বসন্তসেনা বর্ষাভিসারে এসেছেন। চারুদত্তের বাড়িতে তখন বিট সে-খবরটা বাড়ির মধ্যে পাঠাচ্ছেন:

'চারুদত্তকে গিয়ে বলো, বনে বনে যখন কদম বকুল ফুটে উঠেছে তেমন এক দিনে ইনি প্রেমের আনন্দে প্রেমাস্পদের বাড়িতে এসেছেন। এর কেশভার সিক্ত, পথে আসতে বিদ্যুৎ-স্ফুরণে ও মেঘগর্জনে ইনি চমকে চমকে উঠেছেন, তবুচারুদত্ত, আপনাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষায় ইনি এসেছেন; এখন দ্বারদেশে দুটি পায়ের নূপুরের কাদা ধুয়ে নিচ্ছেন।'

একটু আগে আমরা লাল শাড়ি ও বর্ষার শাদাফুলের অলংকরপরা সুন্দরীতিমা বসন্তসেনাকে অভিসারিকাবেশে ঘনান্ধকার পথে দেখেছি। এখন দেখছি চারুদত্তের গৃহের দ্বারদেশে, প্রফুল্লমুখে নিচু হয়ে নুপুরের কাদা ধুয়ে নিচ্ছেন। পরনে রক্তবসন ও বর্ষার শ্বেতপুষ্পের আভরণ; সিক্ত তাঁর কেশ বেশ এবং এই নিচু হয়ে নুপুর ধোওয়ার ভঙ্গিটি–সব মিলে একটি ছবি হয়ে উঠেছে। অথচ নানা ব্যঞ্জনার অনুরণন এ শ্লোকে নিহিত। প্রথম অঙ্কের শেষ শ্লোকে কাদা ছিল তাঁর সামাজিক মালিন্যের প্রতীক, আজ মিলনের পূর্বমুহূর্তে এই ধুয়ে ফেলা যেন সে কথারই রেশ বহন করে। তাছাড়া মিলন-মুহূর্তে নূপুরের নিকশটুকুও না বাদ যায়। চতুর্থ অঙ্কের শেষ থেকে অকাল দুর্দিনের ব্যঞ্জনা

ছিল তাদের প্রেমের পথে সামাজিক অন্তরায়। এখন প্রবল মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ ও বর্ষণের মধ্যে অভিসারে আসবার বর্ণনায় শুধু যে চারুদত্তকে দেখবার জন্যে তাঁর গভীর আকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে ও হৃষ্টা' শব্দে প্রেমের আনন্দ ফুটে উঠেছে তা-ই নয়, প্রেমের অপরাজেয় শক্তিতে আর সব বাধাকে পরাস্ত করার ইঙ্গিতও সূচিত হচ্ছে।

এ নাটকের মূল অংশে অলংকার প্রয়োগের আতিশয্য নেই, তবু তার মধ্যে কবিত্বের কয়েকটি নিদর্শন বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম অঙ্কে রাত্রের অন্ধকারে ত্রস্ত বসন্তসেনা ছুটে চলেছেন, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, তাঁর লাল আঁচলের ঝিলিক দেখে মন হচ্ছে যেন মনঃশিলার গুহায় টাঙির ঘায়ে মনঃশিলা চুর্ণ উড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন অন্ধকারে কেউ মুঠো মুঠো রক্তপদ্মের কুঁড়ি ছড়িয়ে দিচ্ছে।' কিংবা সদ্বংশজাত বুদ্ধিমান দুর্জন যেন সার-দেওয়া খেতের কঁটিগাছ। অথবা, প্রখর গ্রীষ্মের পর গাঢ় অন্ধকার বর্ষাদিনে যখন সকল থেকে বাদল এসে বেলা ফুরিয়ে যায় তেমনই একটি দিনের বর্ণনা: 'প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপে তপ্ত পৃথিবী যেন মেঘভবনে মেঘের ছত্রের নিচে এক ধারাগৃহে জলধারার নিচে বসে শীতল স্নিগ্ধ আরামে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়েছে।' পরিচিত জগৎ থেকে উপমান সংগ্রহ মাঝে মাঝে বেশ সার্থক, যেমন শকারের মুখে, 'গাছের ডালে বাঁদর ঝুলছে যেন ফলন্ত কঁঠাল।' কিংবা, 'প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরে তপ্ত মাটি যেন শতপুত্রের মৃত্যুতে সন্তপ্ত গান্ধারী।'

অন্য এক ধরনের গভীরতর, সমৃদ্ধতর কবিত্ব মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ নাটকটির উপরে নূতন আলোকপাত করে, তার একটি হল মাটির গাড়িতে সোনা– আমরা আগেই দেখেছি। অন্য এক জায়গায়, সপ্তম অঙ্কে, দেখি আর্যক চারুদত্তের প্রবহণে নিরাপদে চলে যাওয়ার ঠিক আগে চারুদত্ত-আর্যকের মুখে খণ্ডিত শ্লোকের সেই সংলাপটি, যার পরস্পরের পরিপূরক বাক্যাংশে সমস্ত

নাটকটি একটি উজ্জ্বল মহিমা লাভ করে। এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ চারুদত্ত ও আর্যকের মুখে চারটি অর্ধচরণে পরিণত হয়েছে।

'চারুদত্ত আর্যককে বলছেন: পথে চলিবার সময়ে দেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন;
আর্যক: আপনিই তো আমাকে রক্ষা করলেন;
চারুদত্ত: নিজের ভাগ্যই তোমাকে বাঁচিয়েছে;
আর্যক: সেখানেও আপনিই তো হেতু।'

লক্ষ্য করা যায়, দেবতার স্থানে মানুষ এখানে অভিষিক্ত; ভাগ্য বা দৈবকেও নাট্যকার মানুষের কাছে গৌণ করেছেন যেন মানুষই একান্ত হয়ে ওঠে। যেন মানুষই সংসারে মঙ্গলের বিধায়ক দেবতা নয়।

অষ্টম অঙ্কে শকার যখন বিটকে বলছে, 'এই নির্জন বাগানে বসন্তসেনাকে মেরে ফেললে কে দেখতে পাবে?' উত্তরে বিট বলছেন, 'সূর্য-চন্দ্র আকাশ-বাতাস দশ দিক আমার অন্তরাত্মা ও পাপপুণ্যের সাক্ষী এই পৃথিবী— এরা সবাই দেখবে।' এর অন্তর্নিহিত অর্থটি হল, মানুষ সত্য আচরণের জন্যে সমস্ত চরাচরের কাছেই দায়বদ্ধ এবং শেষ জবাবদিহিটি বাকি থাকে নিজের অন্তরাত্মার কাছে, সেখানে মিথ্যাচরণ হল আত্মপ্রবঞ্চনা।

সাহিত্যের চূড়ান্ত বিচার জীবনের পুনর্মূল্যায়নে; সেই মানদণ্ডে মৃচ্ছকটিক-এর স্থান অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকের ঊর্ধ্বে, তার কারণ এখানে জীবনবোধের গভীর মূল্যায়নের চিহ্ন রয়েছে। চারুদত্তের জীবনে এক দিকে দাম্পত্য সম্পর্ক, দারিদ্র্য অন্য দিকে গণিকার প্রতি প্রেম; গণিকা বসন্তসেনার চারুদত্তের প্রতি প্রেম, অন্যদিকে গণিকাবৃত্তি ও শকারের প্রলোভন; মৈত্রেয়ের প্রচলিত বিদূষকের ভূমিকা ও আপনি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে চারুদত্তের প্রতি গভীর

অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি; নিরুপায় শবিলকের অভ্যস্ত নৈতিক মূল্যবোধে চৌর্যে অনিচ্ছা ও মন্দনিকার প্রতি গভীর প্রেমে চৌর্যে প্রবৃত্ত হওয়া; মন্দনিকার প্রেম ও বসন্তসেনার প্রতি আনুগত্যে ও আপনি সততায় অন্যায়ের মূল্যে নিষ্ক্রয় অর্জনে আপত্তি; শকারের বিটের প্রচলিত বিটসুলভ কর্তব্য ও মানবিক দায়িত্ব; চন্দনকের রাজকার্যও বিবেকা; চারুদত্তের রাজদ্রোহিতার শঙ্কা ও নিরপরাধ শরণাগতকে আশ্রয়দান; বসন্তসেনার মায়ের কন্যার প্রতি স্নেহ ও নিরপরাধ চারুদত্তকে রক্ষা করার দায়িত্ব; এমনকী দুই চণ্ডালের মধ্যেও রাজনিয়োগ ও বিবেকবোধের সংঘাত— এই ভাবে বহু পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধের সংঘাতের মধ্যে নাটকটির প্রাণবস্তু নিহিত আছে। সংস্কৃত নাটকে সাধারণত চরিত্রগুলি আগাগোড়া একটি নির্দিষ্ট ছকে গঠিত হয়, (যেমন নায়কের ছক হল ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত, ইত্যাদি)। তাই চরিত্রের মধ্যে বিবর্তন বা পরিবর্তনের বিশেষ অবকাশ থাকে না। কিন্তু শকারের বিট, সংবাহক, চন্দনক, বসন্তসেনা-মাতা এরা সকলেই নৈতিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়ে নিজেরা প্রচলিত মূল্যবোধকে যাচাই করে পরিবর্তিত রূপে তাকে অর্জন করতে পেরেছেন; এইখানে চরিত্রগুলি জীবন্ত ও বিশ্বসনীয় হয়ে উঠেছে।

এ নাটকে বহু বিচিত্র সুর লেগেছে। বিভিন্ন ধরনের মানুষ–রাজা থেকে চণ্ডাল, শিশু থেকে বৃদ্ধ, ধনী থেকে নির্ধন, সজ্জন থেকে দুর্জন–নানা ধরনের ভাষা, নানা ধরনের কবিত্ব, নানা ধরনের হাস্যরস–ভঁড়ামি, শ্লেষ সামাজিক ব্যঙ্গ ও ব্যক্তিগত বিদ্রূপ— বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ বহু স্বার্থের সংঘাত নানা রসের আনাগোনা, সব মিলে নাটকটি যে শুধু সমাজের ও মানব-জীবনের একটি সুবৃহৎ বৃত্তাংশকে সার্থক ভাবে প্রতিফলিত করেছে তা নয়, জীবনের নানা আবেগসঞ্জাত উপলব্ধি ও নীতিগত মূল্যবোধের অবতারণা, বিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়নও করতে পেরেছে। এবং সমস্তটাই করেছে লোকায়ত স্তরে,

অবিশ্বাস্য অতিলৌকিককে পরিহার করে, যা সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। এইখানেই মৃচ্ছকটিক অনন্য।

শতক কাব্য

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রগুলিতে শ্রব্য কাব্য বলতে প্রধানত মহাকাব্য ও চম্পূর কথাই আছে; স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে খণ্ডকাব্যকে ধরা হয়নি; অথচ নানা শ্রেণির খণ্ডকাব্য সাহিত্যে আছে। কালিদাসের মেঘদূত-ই সম্ভবত প্রথম খণ্ডকাব্য, তার পরে আছে বেশ কিছু শতক কাব্য। মেঘদূতের অনুকরণে দীর্ঘকাল ধরে রচিত আরও অনেক দূতকাব্য এগুলির মধ্যে বিখ্যাত ধোয়ীর পবনদূত; এ ছাড়াও পিকদূত, কাকদূত, তুলসীদূত, চন্দ্রদূত, নেমিদূত, হংসদূত, মনোদূত, ভৃঙ্গদূত, প্রভৃতি) এবং নানা স্তোত্র সংকলন, যেগুলি একটি বিষয়ের দ্বারা গ্রথিত কিছু শ্লোকের সমাহার। এছাড়াও ষোলটি, দশটি, সাতটি এমন ছোট ছোট শ্লোক সংকলন (যেমন ঘটকর্পব। কাব্য, দরিদ্রসপ্তক, কিছু কিছু অষ্টক ইত্যাদি) পাওয়া যায় এবং একেবারে অন্তিম পর্যায়ে পাই একক শ্লোকের সংকলন গ্রন্থগুলি, যেমন সুভাবিতাবলী, শাঙ্গাধরপদ্ধতি সুভাফিতরত্নকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত, ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে মহাকাব্যের পর ওই দৈর্ঘ্যের কাব্য ক্রমে আচলিত হয়ে আসতে থাকে–যদিও শতক ইত্যাদি রচনা কালেও এবং এই সেদিন পর্যন্ত কবিদের মহাকাব্য রচনার আগ্রহ কমেনি কবিদের। নৈষধচরিত-এর পরে রচিত কোনও মহাকাব্যই আর খ্যাতিলাভ করেনি, এর থেকে বোঝা যায় শক্তিমান কবিরা তখন আর মহাকাব্য রচনার জন্য লেখনী ধারণ করেননি, বরং খণ্ডকাব্য রচনার দিকেই তখন তাঁদের আগ্রহ বেশি। এই খণ্ডকাব্যগুলির মধ্যেও মেঘদূত ও পবনদূতাবাদ দিলে আর কোনও কাব্য তত বিখ্যাত হয়নি। যেমন হয়েছিল। কয়েকটি শতককাব্য।

প্রায়ই দেখা যায় কোনও একটি সাহিত্যিক ভঙ্গি বা প্রকারভেদ তার চরম উৎকর্ষ লাভ করার পর অন্তত কিছুকালের জন্য তা পরিত্যক্ত হয়, তখন বিকল্প কোনও প্রকারভেদ দেখা দেয় সাহিত্যে। এই নিয়মেই মহাকাব্যের পরে এল খণ্ডকাব্য। খণ্ডকাব্যের মধ্যে দূতকাব্য ও বিচ্ছিন্ন শ্লোকের সংকলন বাদ দিলে যেটি প্রধানত উল্লেখযোগ্য তা হল শতককাব্য। বলা বাহুল্য, মহাকাব্য রচনার শেষ পর্যায়েই কবিদের প্রেরণা ক্ষীণ ও উদ্ভাবনী শক্তি দীন হয়ে আসছিল যার ফলে কাব্যগুলি ভঙ্গীসর্বস্ব হয়ে উঠছিল। দীর্ঘ কবিতায় এ দোষ যত প্রকট হয়। খণ্ড খণ্ড শ্লোকে বা শ্লোকগুচ্ছে ততটা নয়। সম্ভবত সে-ও একটা কারণ যার জন্য শতককাব্য জনপ্রিয় হয়েছিল। এর পরিসর ছোট বলেই শ্রোতা বা পাঠকের প্রত্যাশাও এর কাছে কম, ছোট ছোট শ্লোক বা শ্লোকগুচ্ছে কোনও একটি ভাবের বিন্যাসই প্রত্যাশিত। চরিত্র, ঘটনা, দীর্ঘায়িত বর্ণনা, অঙ্গী ও অঙ্গরসের সঞ্চারের দ্বারা পরস্পরের পরিপূরণ ও সর্বোপরি কোনও প্রকার জীবনবোধ এখন আর কবিরা দিতে পারেন না, ফলে পাঠকও চায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই খণ্ডকাব্য ও তার অন্তর্গত শতককাব্যের বিচার হতে পারে। খণ্ডকাব্য লিরিক বা গীতিকাব্যধমী, শতককাব্যও তাই। ছোট কাব্যখণ্ডে কোনও রসের বা চিন্তার বর্ণনা বা বিস্তার, এই হল শতককাব্যের উপজীব্য। অলংকারশাস্ত্রে যে খণ্ডকাব্য বা শতককাব্যের আলোচনা নেই তার প্রধান কারণ মনে হয় এ কাব্যগুলি পাঠকচিত্তকে তেমন ভাবে নাড়া দিতে পারেনি, যেমনটা মহাকাব্য পেরেছিল। নইলে প্রখ্যাত অলংকারশাস্ত্রগুলি রচনার শেষ পর্যায়ে বেশ কিছুদিন ধরেই খণ্ডকাব্য রচনা চলছিল। মেঘদূত-এরও কোনও স্বতন্ত্র আলোচনা কোনও অলংকার গ্রন্থে নেই। মহাকাব্যই যে শুধু আলংকারিকদের আলোচনার কেন্দ্রস্থলে তারও একটি কারণ হয়তো মহাকাব্যের আলোচনাও নাটককে মনে রেখেই করা এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্র-এর আলোচনাই অলংকার সাহিত্যে মহাকাব্য সম্বন্ধে আলোচনার গতি ও লক্ষ্য স্থির করে দেয়। তাই পরবর্তীকালে যখন মেঘদূত-এর মতো উৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য রচনা হল তখন ওই মহাকাব্যের ছাঁচের মধ্যে

তাকে ধরানো গেল না বলে কোনও স্বতন্ত্র আলোচনায় তা স্থান পেল না। অথচ চম্পূর মতো মোটামুটি দো-আঁশলা রচনারও আলোচনা হল, কারণ গদ্য, পদ্য ও গদাপদামিশ্র এই ভঙ্গীগত জাতিভেদের মধ্যে চম্পূর একটা স্থান হয়। যাই হোক, খণ্ডকাব্য যে কাব্যখণ্ড নয় তা এর যে কোনও ধরনের রচনাই প্রমাণ করে, প্রথম প্রখ্যাত খণ্ডকাব্য মেঘদূত-এই তার স্বতন্ত্র ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

কালিদাসের পরে মহাকাব্যের ইতিহাস অবক্ষয়ের ইতিহাস, কারণ, পরবর্তীরা তার মতো শক্তিমান শিল্পী ছিলেন না, তাঁদের প্রেরণাও ছিল দুর্বল। ধীরে ধীরে মহাকাব্য নিস্তপ্রাণ ও ভঙ্গ সর্বস্ব হয়ে উঠল। তখন স্বাভাবিক নিয়মেই কবিরা অন্য পথে রচনায় প্রবৃত্ত হলেন; শতককাব্য সেই অন্য পথগুলির অন্যতম। প্রথম উল্লেখযোগ্য শতককাব্য বাণভট্টের চণ্ডীশতক। উপজীব্য এসেছে মহাভারত ও পুরাণ থেকে, ভঙ্গী হল অতিরঞ্জিত বর্ণনার। বিষয়: চণ্ডীর মহিষাসুরবধ–বাম চরণের ও শূলের একটিমাত্র আঘাতে দুর্জয় মহিষাসুরের জীবনাবসান। এ শতকের প্রত্যেকটি শ্লোকই আশীর্ব্বাদ বহন করে: দেবী চণ্ডী তোমাদের মঙ্গল করুন। সরাসরি এই ভাবেই না হলেও বিজয়ের এক একটি প্রতীককে উল্লেখ করে বলা আছে সেটি তোমাদের মঙ্গল করুক। কখনও সেটি দেবীর বাম চরণ, কখনও ভূভঙ্গ, কখনও অস্ত্র, কখনও নূপুর, ইত্যাদি। মঙ্গলকামনাটির সঙ্গে যুক্ত অসুরবিনাশে দেবীর একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী। কবির দৃষ্টির কেন্দ্রে কখনও দেবী স্বয়ং, কখনও তাঁর পুত্র, কখনও স্বামী কখনও-বা বন্ধুদেবতারা যাঁরা ছুটে এসেছেন এই দৃশ্য দেখতে। কখনও কবি দেবীর অসুরনিধন সরাসরি বর্ণনা না করে তির্যক ভঙ্গীতে করেছেন। যথা, চণ্ডীর পূর্বেই অন্যান্য দেবতারা একের পর এক মহিষাসুরকে বধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। তাঁদের ব্যর্থতা বর্ণনার মধ্যে দেবীর সার্থকতা রূপ পেয়েছে তির্যক অথচ সার্থক বর্ণনারীতিতে। কখনও-বা কবি বধ্য অসুরটিকেই স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণনা করে দেখিয়েছেন সে কত ভয়াবহ ও

শক্তিশালী; এ যেন প্রতিনায়কের প্রবলতার বর্ণনার দ্বারা নায়কের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। অবশ্য গৌণ এক স্তরে প্রবল ও প্রতিষ্ঠিত পুরুষ দেবতাদের অসুরবিজয়ে অক্ষমতার বর্ণনাও এই উদ্দেশ্যেই।

প্রথম তিনটি শ্লোকে অসুরবধের সময়ে দেবীর যে পদাঘাত তারই বর্ণনা। প্রসঙ্গক্রমে যে বাম চরণের আঘাতে অসুর নিহত সেই চরণটিরও বর্ণনা: মহিষের পৃষ্ঠকে দেবীর ভ্রম হল তাঁর বাসভূমি বিন্ধ্যপর্বত বলে, মহিষের যে গর্জন সমুদ্রের তরঙ্গনিনাদকেও পরাস্ত করে তা সহসা ডুবে গেল মহিষের পৃষ্ঠে দেবীর পদাঘাতের সময়ে উত্থিত নুপুর-নিক্কণে। মহিষের পৃষ্ঠ হতে নির্গত রক্তধারা দেখে দেবীর ভ্রম হল এ বুঝি তাঁরই চরণের অলক্তরেখা। এমনই ভাবে সম্পূর্ণ অবহিত না হয়েই দেবী (অনায়াসে) অসুরকে বধ করেন; তার সেই চরণ তোমাদের রক্ষা করুক। (চণ্ডীশতক ২) দেবীর চরণের অসম শক্তির বর্ণনাকেও আচ্ছন্ন করেছে দেবীর সম্পূর্ণ অনবধান; যে অসুরকে প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত শক্তিমান বৈদিক দেবতারাও হত্যা করতে পারলেন না, দেবী সম্পূর্ণ হেলায় তা করলেন।

বহু শ্লোকে দেবতাদের অক্ষমতা, পরাভব ও বিমর্ষতার বর্ণনা পাই যেগুলির মধ্যে তাদের প্রতি অনুচ্চারিত একটা শ্লেষের পরিচয় আছে:

‘দেবী যিনি শত্রুকে বিনাশ করেছেন তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। এর পর চণ্ডীর সঙ্গী জয়া হেসে দেবতাদের বললেন, ‘হরি ভয় পেলেন নাকি? অবশ্য ঘোড়ারা (হরির রথের বাহন) বরাবরই মহিষকে ভয় পায়। চন্দ্রে কি অতিরিক্ত একটা কলঙ্ক লাগিল নাকি? সমুদ্র (ক্ষীণি) শশিকলা দেখেই ধৈর্য হারিয়েছে! বায়ু, তোমার নয়। অন্য কারও শিহরিত হওয়ার কথা (বায়ুই সকলকে কম্পিত করে)। যম, তুমি তোমার বাহন মহিষটিকে এবারে সরিয়ে নাও (মহিষাসুরের মৃত্যুতে সে চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে) ’ (১৫)

এই সুরে বেশ কয়েকটি শ্লোক আছে (১, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪২, ৮০, ৯০ ও ৯৮) যে গুলির উদ্দেশ্য হল মুখ্য দেবতাদের অপ্রতিভ হওয়ার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে চণ্ডীর মাহাত্ম্যকীর্তন। চণ্ডীর স্বামী স্বয়ং মহাদেব ও পুত্র দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ও বাদ যাননি। এই সব পুরুষ দেবতারা প্রায় প্রত্যেকেই অসুরবিনাশের জন্যই যশস্বী, প্রত্যেকেই মহাবলী, অসমসাহসী ও অস্ত্রনিপুণ। এদের প্রতি শ্লেষের মধ্যে বাণভট্টের সমাজের একটা নতুন দিক প্রকাশিত হয়েছে, তা হল প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের পাশাপাশি, কতকটা বা তাদেরই স্থানে মাতৃকার আবির্ভাব। নব্যব্রাহ্মণ্যধর্ম যা গুপ্তযুগে প্রথম লক্ষ্যগোচর হয় এবং পুরাণগুলিকে অবলম্বন করে যা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে বর্তমানে 'হিন্দুধর্ম' নামে পরিচিত, এ তার একটি প্রধান লক্ষণ। বাণ এ-ধর্মের প্রথম যুগের এক পুরোধা ও উদগীতা: যে প্রবল উল্লাসে তিনি পুরুষদেবতাদের পরাভব ও চণ্ডীর বিজয় বর্ণনা করছেন তাও এ যুগের, এ ধর্মের একটি লক্ষণ।

অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও এই প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে–দেবপত্নীরাও চণ্ডীর সামনে নিষ্প্রভ:

'তুমি কি পালিয়ে গেলে, ইন্দ্রাণী? কুবেরবধূ, তোমার সখী পার্বতীর বীরকীর্তি দেখ। শান্ত হও, স্বাহা, তোমার স্বামী (অগ্নি) এখনও অমৃত পান করেন। বৃথাই রোদন করছেন রোহিণী (চন্দ্রের পত্নী); লক্ষ্মী, তুমি তোমার স্বামীর শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষে আবার হেলান দেবে।' এই কথাগুলি বলে জয়া দেবীদের সান্ত্বনা দিলেন। চণ্ডী, যিনি এই কার্যে আলজ্জিতা, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। (৩৩)

দেবতারা মহিষাসুরবধে উদ্যোগী হয়ে, অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করেন, কিন্তু অসুরের গায়ে আঁচড়ও লাগে না।

'যে দেবী স্থির ছিলেন, যখন অসুরের দেহে শূল এসে পড়ল, যখন তীর এসে লাগল। তখনও যার চোখে পলক পড়েনি, কন্টকিত শার নিক্ষিপ্ত হতে যিনি হাস্য করেন, বজ্র নিক্ষিপ্ত হলেও যিনি বিচলিত হননি, বর্শা নিক্ষিপ্ত হলেও যাঁর চাঞ্চল্য ছিল না, চক্র নিক্ষেপের সময়ে তিনি অনবনতই ছিলেন, গদাক্ষেপের সময়েও স্থির ছিলেন, যিনি বাম চরণের স্পর্শে মহিষাসুর বধ করেন। সেই দেবী তোমাদের শুচি করুন।' (৫২)

মহিষাসুর যখন প্রখ্যাত দেবতার বাহুবল ও শস্ত্রবলের দ্বারা পরাভূত হল না। তখন তাঁরা বিচলিত হলেন:

'মহিষাসুর বলল, 'প্রথমে বিষ্ণুর চক্র পুনরাবর্তিত হল, তারপর দেবসেনা পশ্চাৎপদ হল, ইন্দ্র ও শিবের ধনুর জ্যা শিথিল হয়ে চ্যুত হল, এই শিশু কীর্তিকেয়ের শক্তি অস্ত্র আমাকে কী করে আঘাত করবো?' যে পার্বতী এই শত্রুকে বধ করে সমস্ত দেবমণ্ডলীর শক্তিকে পরিহাস করেছেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন।' (৬৫)

দেবতাদের পরাভব ও অবমাননা নানা ভাবেই বর্ণিত হয়েছে: মহিষীকে বধ করতে এসে তাঁরা সরাসরি পরাহত হয়েছেন এ বর্ণনায়, আবার তাদের প্রতি তাদের অস্ত্রের প্রতি ও তাদের পরাজয়কে উদ্দেশ করে দেবী বা তাঁর সঙ্গীর বিদ্রুপের মাধ্যমেও তাদের অবমাননা।

'এই মহৎ শৌর্যের কথা শুনে মহাদেব দূর থেকে এলেন, দুবাহু প্রসারিত করে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, যাঁর গাঢ় প্রশ্বাসে নক্ষত্ররা শিহরিত হচ্ছিল। দেবতারা ভিড় করে এলেন, লজ্জনতা দেবী করসঞ্চালনে নিষেধ করলেন তীদের। এই যে দেবী যিনি পৃথিবীর আনন্দের অপহারক দৈত্যটিকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন।' (৮৭)

এই ভাবেই কবিতাটি অগ্রসর হয় দেবীর কীর্তি, শক্তি, অস্ত্র, শৌর্য ও মহিমার স্তবের মধ্যে দিয়ে, এরই মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ দেবতাদের পরাজয়ের গ্লানি। এই দেবীর মধ্যে বৈদিক, বেদোত্তর, মহাকাব্যিক ও পৌরাণিক দেবীর, শুভ ও অশুভ শক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক মহিমাময়ী দেবীর অভ্যুত্থান। তাঁর পূর্ববর্তী সকল দেবতার গুণ ও কীর্তি তার মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে; এ কীর্তিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল দানব-দলন। সেইটিকে তাই এত অতিরঞ্জন ও আড়ম্বরের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এই যুগ তন্ত্রশাস্ত্র রচনার যুগ; তন্ত্রে বর্ণিত দেবীর পূর্বগামিনী এই পৌরাণিক দেবী, বাণ তাঁর সূক্তকার। চণ্ডীশতক-এ তন্ত্রের ‘মহাশক্তি’ শাস্ত্রে নয়, অবতীর্ণ হলেন সাহিত্যে। বিদগ্ধ ভাষা, অপরিচিত প্রতিশব্দ, দূরান্বয়, অলংকারাবাহুল্য জটিল শব্দবিন্যাস, অস্বচ্ছ ভাব, কষ্টকল্পনা, যমক ও অনুপ্রাসের ছড়াছড়িএ সবই বাণভট্টের শৈলীর চিহ্ন। কালিদাসের পরবর্তী আলংকারিকরা সাহিত্যে কৃত্রিমতার সমর্থন জুগিয়েছেন, পাঠকশ্রোতাও তখন কাব্যে বৈদগ্ধ্য ও ভঙ্গীভণিতিরই প্রত্যাশা করেন; এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যশস্কাম কবিরাও তাদের এই বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করে চলেন। কাব্য-স্বচ্ছন্দ্য যেখানে প্রসাদগুণ ও প্রেরণার দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হল, সেখানে সে ক্ষতিপূরণ করতে চাইল এক গুরুভার অলংকৃত সমাসবহুল কৃত্রিম শৈলীতে। এই কৃত্রিমতার যুগে সম্ভবত বাণভট্টই একমাত্র কবি যার মধ্যে সত্যকার কবিত্বের প্রেরণা ও শক্তি ছিল; তাঁর গদ্যকাব্যে মাঝেমাঝেই স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বের ঔজ্জ্বল্য পাঠককে চমকিত করে তোলে। কিন্তু ছন্দকাব্যে তাঁর দক্ষতা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; সমালোচকরা বলেছেন: ‘যাদৃগ গদ্যবিধৌ বাণঃ পদবন্ধে ন তাদৃশঃ– গদ্যরচনায় তাঁর যত কুশলতা পদ্যরচনায় তত নয়।’ নিজের শক্তির সীমা তিনি জানতেন বলেই প্রধান দুটি রচনা তিনি গদ্যেই করেন। যে ধরনের রচনায় যথার্থ কবিত্বের কোনও অবকাশ নেই, সেই জন্যে পাঠকের দাবি প্রেরণা ও স্বতঃস্ফূর্ততার কন্ঠরোধ করল। ঠিক তেমনই যমকে, অনুপ্রাসে,

সমাসে-দূরান্বয়ে, অলংকারে ও দুরুহ শব্দ প্রয়োগে কবিত্বের অভাবটা ঢাকা পড়ল না, শুধু রচনারীতি কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হয়ে উঠল।

তাছাড়া, এই চণ্ডীশতক-এ যেখানে উপজীব্য হল চণ্ডীর মহিষাসুরবধ, সেখানে স্বতঃ স্মূর্তি কবিত্বের অবকাশ অল্পই, যেটুকু আছে বাণ তা নিঃশেষে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই বিষয়বস্তুই তাকে প্রায় বাধ্য করেছে অতিশয়োক্তির দ্বারা তুচ্ছ অনুপুঙ্খগুলিকে অতিরঞ্জিত করতে এবং পূর্বের দেবতা ও দেবপত্নীদের লাঞ্ছনার দ্বারা চণ্ডীকে মহিমান্বিত করতে। এ তুচ্ছ কাজ একশোটি শ্লোকে করতে হলে স্বভাবতই পুনরুক্তি ও অত্যুক্তির আশ্রয় নিতে হয়, বাণও তা নিয়েছেন। ফল যা পাওয়া গেল তা যেমন কৃত্রিম তেমনই পুনরুক্তিবহুল। তাই পুরুষ দেবতাদের তুলনায় চণ্ডীর শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করতে বাণকে উনিশটি শ্লোক রচনা করতে হয়েছে। (১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৯, ৩৩, ৩৬, ৩৮, ৪২, ৫৭, ৬০, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৭৩, ৮০, ৯০, ৯২, ৯৮) এর দ্বারা সমস্ত উদ্যমটির আত্যন্তিক নিরর্থকতা এবং ভাবের সর্বস্বান্ততাই সূচিত হয়।

শ্লেষ ও দ্ব্যর্থবোধক রচনা সম্বন্ধে বাণের পক্ষপাতিত্ব মধ্যে মধ্যে কুরুচিপূর্ণ রচনায় পর্যবসিত হয়। ৭.৫, ৭৬ ও ৭৭ সংখ্যক শ্লোকে এই শ্লেষ নিহত মহিষাসুর ও মহাদেব উভয়ের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হয়; এর দ্বারা হয়তো চণ্ডীর মহিমাবৃদ্ধি হয়, কিন্তু শ্লেষের মধ্যে মহাদেব ও মহিষাসুরের ব্যঞ্জনগত সাদৃশ্যে সাহিত্যিক রুচির অতি নিম্নমান সূচিত হয়। তেমনই সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যে মাতৃকামূর্তির বর্ণনায় যথেষ্ট সংযম থাকার কথা। বাণভট্ট চণ্ডীর দেহ বর্ণনা এমন ভাবে করেছেন যে, তাতে তিনি তাঁকে সাধারণ কাব্যের নায়িকায় পরিণত হয়েছেন: নায়িকার দেহের বর্ণনায় যা সঙ্গত, কিন্তু জননীরূপে কল্পিত দেবীর বর্ণনায় অচল তেমন বহু উল্লেখ চণ্ডীশতক-এ পাওয়া যায় (লক্ষণীয় ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৭, ৮১ ও ৮৫ সংখ্যক শ্লোক)। এর ফলে শুধু যে অশালীনতা প্রশ্রয় পেয়েছে তাই নয়, আরও গভীর স্তরে রুচিগত

অপরাধ ঘটেছে, কারণ, রসের মধ্যে অনুচিত মিশ্রণ ঘটেছে: বর্ণনার ব্যঞ্জনায় শৃঙ্গাররসের আভাস আছে, অথচ কাব্যের উদ্দিষ্ট মূলসুর ভক্তির। সম্ভবত তৎকালীন মন্দির গাত্রের ভাস্কর্যে মাতৃকামূর্তির অবয়ব-সন্নিবেশের যে শাস্ত্রীয় নির্দেশ কার্যকরী ছিল তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বাণভট্ট চণ্ডীর দেহবর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর ফলে সাহিত্যে যে বাঙময়ী প্রতিমা নির্মিত হল তাতে রসবিরোধ ও রসসংকর ঘটল এবং পাঠকের চিত্তেবিভ্রান্তির উদয় হল; সেটা রচনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। চণ্ডীশতক-এর চণ্ডীর বর্ণনা বাণের গদ্যকাব্যের নায়িকার বর্ণনার মতোই; ফলে বাণের অভিষ্ট রসের হানি ঘটেছে এখানে।

বাণের শব্দপ্রয়োগ, তাঁর গদ্যকাব্যে সুবন্ধুর তুলনায় সরল হলেও কালিদাস বা ভারবির তুলনায় দুরুহ ও অপ্রচলিত। তার বাক্যবিন্যাস বা বন্ধ রীতি গদ্যে গৌড়ীয় অর্থাৎ সমাসবহুল। প্রথম যুগের আলংকারিক দণ্ডী সমাজবহুলতাকে ওজোগুণের বৈশিষ্ট্য বলেছেন এবং ওজোগুণবিশিষ্ট গৌড়ীয় রীতিকে গদ্যেরই প্রাণ বলেছেন–'ওজঃ সমাসভূয়স্তমেতদ গদ্যস্য জীবিতম।' (কাব্যাদর্শ-১:৮০) কাজেই কাদম্বরী ও হর্ষচরিত-এ গৌড়ী রীতি ঠিকই ছিল। মুশকিল হল চণ্ডীশতক-এ। এ তো কাব্য, এখানে ওই সমাসবহুল রীতি অস্থান-প্রযুক্ত, শুতিকটু ও রসহানিকর। তার উপরে আছে দুরুহ বাগভঙ্গী: ভ্রমরের একটি প্রতিশব্দ ষটুপদ; বাণভট্ট চণ্ডীশতক-এ বললেন–'দ্বাদশার্ধাঙঘ্রি (৯৫)। শ্রুতিকটুত্ব বাদ দিলেও এ প্রয়োগে কবিতায় মাধুর্যের গুরুতর অভাব ঘটে, প্রসাদগুণেরও। তাছাড়া এর হাস্যকর দিকও একটা আছেওই শ্রুতিকটু এবং তির্যক ভঙ্গি দিয়ে যা প্রকাশিত হল তা তো সাধারণ ভ্রমর ছাড়া কিছুই নয়। তেমনই ৯২ সংখ্যক শ্লোকে দু-তিনটি শ্লেষযুক্ত শব্দের ব্যবহারে আপাত যে দুরুহতা এসেছে তা শুধুমাত্র দ্ব্যর্থবোধক শব্দের থেকেই, ভাবে বা উপলব্ধিতে

নয়; ফলে রসবিচারে এগুলি অপাঙক্তেয়, সুস্থ রুচি ও রসবোধকে অকারণ আঘাত করে মাত্র।

বাণের যুগেই শুরু হল সাহিত্যে সেই বিষক্রিয়া, যার ফলে কবিরা প্রেরণার স্থলে অভিষিক্ত করলেন ভঙ্গিকে। চণ্ডীশতকের পশ্চাতে কোনও আন্তর উপলব্ধি নেই, নতুন কোনও মননও নেই, এর বিষয়বস্তু যৎপরোনাস্তি অকিঞ্চিৎকর। তাকে অবলম্বন করে ছোট একটি স্তোত্র রচনা হতে পারত, একশোটি শ্লোকে রচনা করবার মতো মূলধন তার ছিল না। অনিবার্য ভাবেই শতকের মধ্যে বাণভট্ট তাঁর পাণ্ডিত্য, আঙ্গিকসর্বস্ব, রচনাকুশলতা, দুরুহ শব্দ প্রয়োগের ক্ষমতা, অলংকার বহুলতা, বিশেষত রূপক ও শ্লেষের ব্যবহারে দক্ষতা এবং তির্যক বাগভঙ্গিতে রচনার শক্তির প্রকাশ করেছেন। মহিষাসুরবধের মতো একটি ক্ষীণ বক্তব্যের ওপরে এত ওজন সয় না, ফলে রুচিমান পাঠকের কাছে অসহিষ্ণু লাগে আঙ্গিকের এই গুরুভার, এই কষ্টকল্পনার প্রাচুর্য। বৈদগ্ধ্য নিয়ে এর প্রহেলিকাগুলির সমাধান করলেও এমন কিছু পাওয়া যায় না, যা রসের বা বোধের দ্বারা ক্ষতিপূরণ করতে পারে। সত্যকার জটিলতা, যা কবির উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত তার দ্বারা সৎকাব্য সৃষ্ট হতে পারে, তা-ও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। ইংরেজিতে ডান বা তৎকালীন কবিদের রচনায় যে অন্তর্নিহিত উপলব্ধিগত দুরুহতা আঙ্গিকে কতকটা জটিলতার সৃষ্টি করেছে তার কথা মনে পড়ে এবং ক্ষোভ হয়। শুধু যদি ভঙ্গির ফুলঝুরির মোহ ত্যাগ করে উপলব্ধির গভীরে প্রবেশ করতে পারতেন। তবে হয়তো স্থায়ী সম্পদ পেতাম তাঁর কাছে, যেমন পেয়েছি, খুব হলেও মাঝে মাঝে, তাঁর গদ্যকাব্য দুখানিতে। কিন্তু তার জন্যে বিষয়গৌরবও প্রয়োজন। চণ্ডীর মহিষাসুরবধ তেমন বিষয় নয়।

হয়তো বাণভট্ট যে যুগে জন্মেছিলেন তখন পাঠকের রুচি এমন ছিল যে গভীরতা, উপলব্ধির ঐশ্বর্য বা জীবনবোধ কবিতার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত

ছিল। কলাকৌশলের জাদুতেই মুগ্ধ ছিল পাঠক; গভীরতর কিছু সৃষ্টি করতে গেলে বাণভট্টকেও হয়তো ভবভূতির মতোই নিরবধি কাল ও বিপুল পৃথ্বীর দিকে চেয়ে আমরণ প্রতীক্ষা করতে হত, জীবৎকালে হয়তো স্বীকৃতিই মিলত না। তাই কি পাঠকের রুচিকে গড়ে তোলবার অপেক্ষাকৃত আয়াসীসাধ্য ব্রত ত্যাগ করে আপাত যশের নগদবিদায়ের প্রত্যাশী হলেন কবি? না কি গদ্যে তার যে অধিকার পদ্যে তা ছিল না, তাই এই রচনা? অথবা চণ্ডীশতক-এর বিষয়টির তুচ্ছতাই তার সাধনা ও সিদ্ধি উভয়কেই সীমায়িত করেছে? কারণ যা-ই হোক, চাওঁীশতক কবিতা হিসেবে সার্থক নয়, রসোত্তীর্ণ নয়। এর কতকটা ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্য ছিল, কিন্তু যেখানে এর অন্তিম বিচার সেই শিল্পবিচারে এর মূল্য নগণ্য কারণ আঙ্গিকের প্রচুর আড়ম্বর সত্ত্বেও কাব্যটি রসে পৌঁছয়নি।

ময়ূরভট্ট বাণভট্টের সমকালীন কবি, জনশ্রুতি, তাঁর কুটুম্বী। ইনি রচনা করেছিলেন। সূর্যশতিকা কিংবদন্তী হল, ময়ূরভট্ট কোনও একটি অশালীন কবিতা রচনার ফলে অভিশপ্ত হয়ে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন, সূর্যের স্তবরচনা করার ফলে তাঁর রোগমুক্তি ঘটে, কারণ সূর্য আরোগ্যদাতা। (প্রচলিত শ্লোকে আছে, ‘আরোগ্যং ভাস্কর্যাদিচ্ছেৎ—সূর্যের কাছে আরোগ্য চাইবে।’) গল্পটি সম্ভবত সূর্যের আরোগ্যদাতারূপে প্রসিদ্ধি থেকেই তৈরি। সূর্যশতক-এ একশো একটি শ্লোক, সূর্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে সেগুলি বিভক্ত। প্রথম স্তবকে তেতাল্লিশটি শ্লোকে সূর্যের দীপ্তির বর্ণনা, দ্বিতীয় স্তবকে ছটি শ্লোকে সূর্যের অশ্ব, তৃতীয় সূর্যসারথি অরুণ এগারোটি শ্লোকে, চতুর্থের এগারোটিতে সূর্যের রথ, পঞ্চমে আটটিতে সূর্যগোলক এবং শেষ কুড়িটিতে সাধারণ ভাবে সূর্যের বর্ণনা ও স্তব। শেষ শ্লোকটি কবির নিজের কথা এবং কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি।

বাণের গদ্যে এবং কাব্যে সপ্তম যে পল্লবিত রচনার ভঙ্গি দেখি, ময়ুরের কাব্যেও ঠিক তেমনই বহু বিচিত্র অনুপুঙ্খের সমাবেশ। মূল বর্ণনীয় বস্তু হল সূর্য, যে সূর্য বেদের যুগ থেকেই দেবতা, সপ্ত-অশ্ব-বাহিত রথে সমারূঢ়, যাঁর সারথি ক্ষীণকায় অরুণ! এই সূর্যময়ূরের বহুপূর্ব হতে জনমানসে বহু কাহিনি ও বর্ণনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আরোগ্যদাতারূপে। ময়ুরের মুখ্য বিবক্ষিত বস্তু সূর্যের ঔজ্জ্বল্য। ময়ূরের বর্ণনায় অলংকার ও অতিশয়োক্তি প্রচুর থাকলেও কাব্যের নিজস্ব জটিলতা বিশেষ কিছু নেই; সমাস অলংকার বুঝলে আর কোনও দুর্বোধ্যতা নেই। অর্থাৎ উপলব্ধি নিতান্ত সরল। দুরূহতা এসেছে শ্লেষ থেকে, যার উপর ময়ূরের বিশেষ পক্ষপাত। (শ্লেষের ছড়াছড়ি দেখি ৩, ৪, ৯, ১৮, ২১, ২৫, ৩১, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৬, ৬৪, ৯২ ও ৯৩ সংখ্যক শ্লোকে) শ্লেষ ছাড়াও ময়ূরের দুর্বলতা অনুপ্রাস সম্বন্ধে; প্রতি শ্লোকে অনুপ্রাসের প্রাদুর্ভাব, এদিকে তাঁর এত পক্ষপাত যে, প্রসাদগুণ তাঁর কাব্য থেকে অন্তর্হিত; দুরূহ প্রতিশব্দ ও বাক্যবিন্যাস এসেছে অনুপ্রাসের খাতিরে। অতি সহজ ভাবের কাব্য দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগে এবং ওই শব্দগুলি এসেছে অনুপ্রাসের প্রয়োজনে। দু-একটা উদাহরণে স্পষ্ট হবে:

ভূত্বা জন্তুস্য ভেত্বঃ ককুভি পরিভাবারম্ভভূঃ শুভ্রভানো–
বিভ্রাণা বক্তৃভাবং প্রসভমভিনবা স্তোজজৃম্ভাপ্রগলভাঃ।।
ভূষা ভূয়িষ্ঠশোভা ত্রিভুবনভবনস্যাস্য বৈভকরী প্রাগ-
বিভ্রান্তি ভ্রাজমানা বিভবতু বিভবোদ্ভূতয়ে সা বিভা বঃ।। (৩৩)

যমকও মাঝে মাঝে দেখা দেয়, যেমন

সানৌ সা নৌদয়ে নারুণিতদলপুনর্যৌবনানাং বনানা–
মালীমালীঢ়পূর্ব পরিহৃতকুহরোপান্তনিমা তিনিম্না।

ভা বোভাদৌপশান্তিং দিশতু দিনপতের্ভাসমান সমানা
রাজী রাজীবরেণোঃ সমসময়মুদৌতীব যস্যা বয়স্যা। (৩৮)

এ-ধরনের রচনা কবিতা না ধাঁধা তা নিয়ে সংশয় জাগে। এতে বাহাদুরি বিস্তর আছে কিন্তু কবিত্ব? তার কোনও অবকাশও নেই। আরও লক্ষণীয়, এত অনুপ্রাস ও যমক অর্থাৎ শব্দালংকারের এত আড়ম্বর সত্ত্বেও ওই বাহাদুরির লোভে মাধুর্য নেই। ময়ূরের রচনায়। ওই বাহাদুরির লোভে শব্দালংকার তার প্রাথমিক দায়িত্বই পালন করেনি, যা বাণভট্টে প্রচুর পরিমাণে আছে। সূর্যশতক-এর রচনা গুরুভার অস্পষ্ট ও কৃত্রিম। ভাবে বা প্রকাশভঙ্গিতে যথার্থ কোনও গাম্ভীর্য নেই। এ কাব্যে, যদিও তার বিষয়বস্তুর মধ্যেই নিহিত ছিল গাভীর্যের উপাদান। খুব মধ্যে মধ্যে একটুখানি ব্যতিক্রম আছে, যেমন ১৭ সংখ্যক শ্লোকে। বাংলায় এর অর্থ হল: সূর্যকিরণ অবিলম্বে অন্ধকার ধ্বংস করে অসীম আকাশকে ও দশদিককে প্রকাশ করুক। সমুদ্রের অশান্ত তরঙ্গরা তটে এসে সবেগে লাগছে। বহু পর্বত, নগর, বৃক্ষ দৃশ্যমান হওয়াতে পৃথিবীকে বিপুলায়তন দেখাচ্ছে। এই সূর্যকিরণে পদ্ম প্রস্ফুটিত হচ্ছে; এই কিরণ দ্রুত তোমাদের সব অমঙ্গল দূর করুক।' ৫৮ নং শ্লোকে সূর্যসারথি অরুণের বর্ণনা ঠিক বাণভট্টের ভঙ্গিতে; অর্থাৎ চঞ্জীশতক-এ যেমন মহিষাসুরকে অন্য কোনুও দেবতা বধ করতে না পারায় চণ্ডীর সামনে সকলে নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন, এই বর্ণনার মাধ্যমে চণ্ডীর মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনই এখানেও অগ্নি, যম, বরুণ, পবন, কুণ্যের, মহাদেব, ইত্যাদি সকলকে নিষ্প্রভ। বর্ণনা করে সূর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। (এই কথাই প্রতিপাদিত হয়েছে ১৬, ৫৮, ৭১, ৭৬, ৮৮ ও ৯৯ নং শ্লোকে।) আরও ছটি শ্লোকেরই বক্তব্য এই কথা, ফলে কিছুক্লান্তিকর হয়ে পড়ে একই কথার পুনরুক্তি, বৈশিষ্ট্য শুধু ভঙ্গিবৈচিত্র্যে।

বাণভট্টে যেমন মাতৃকা চণ্ডীর অভ্যুত্থা‌েনই চণ্ডীশতক-এর প্রেরণার উৎস, ময়ূরের সুর্যশতক-এর প্রেরণাও তেমনই সপ্তম শতকে নবপর্যায়ে সূর্যোপাসনার প্রবর্তনায়। হর্ষবর্ধন যে ধর্মসভা আহ্বান করেন সেখানে তিনটি দেবতা সর্বাধিক গৌরবের পদ পান–বুদ্ধ আদিত্য ও শিব। বর্ধন-রাজবংশের শিলালিপিগুলি থেকে বোঝা যায়। এ তিনটি দেবতাই ওই রাজবংশের উপাস্য; বুদ্ধ শুধু হর্ষবর্ধনের বৌদ্ধধর্মগ্রহণের পরে আসেন এই দেবমণ্ডলীতে, বাকি দুজন পূর্ব হতেই ছিলেন। (স্মরণীয়, হর্ষবর্ধন যে নাম দেন– শীলাদিত্য– তাতেও সূর্যেরই স্বীকৃতি।) কিছুকালের জন্যে হর্ষের রাজত্বকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমান মর্যাদা লাভ করে এবং যেহেতু তন্ত্রের মাধ্যমে শিব বী‌েদ্ধের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং বুদ্ধ ধীরে ধীরে দশাবতারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিলেন (এই যুগেই প্রথম তন্ত্রশাস্ত্রগুলি রচিত হয়); তাই দুটি সম্প্রদোয়ই এমন তিনটি দেবতাকে পেলেন যাঁরা তাদের উভয়েরই আরাধ্য। (মিশরে টুটানখামেন এবং বহু পরবর্তীকালে ভারতে আকবর যখন সর্বজনগ্রাহ্য ধর্ম প্রবর্তনে উদ্যোগী হন তখন দুজনেই হর্ষবর্ধনের মতো সূর্যকে কেন্দ্রীয় উপাস্যরূপে উপস্থাপিত করেন, যাতে বহু ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসক সম্প্রদায়গুলি এক দেবতার ছত্রতলে মিলিত হতে পারেন।) হর্ষবর্ধনের এ-উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কিন্তু সূর্য-উপাসনার জন্যে একটি স্তব প্রয়োজন ছিল; ময়ূরের সূর্যশতক সেই অভাব মেটায়। কিন্তু এ শুধু বিদ্বৎসমাজেই গ্রাহ্য স্তব, সম্ভবত রাজসভাতেই কবি সমাদৃত হন সুর্যশতক-এর কবি রূপে এবং হয়তো তা-ই তাঁর অভীষ্ট ছিল। নতুবা এই দীর্ঘসমাসবদ্ধ, বহু-অলংকৃত, যমকে-অনুপ্রাসে খচিত এ কাব্য যে কখনওই জনপ্রিয় হতে পারেনি সে বিষয়ে কোনও সংশয়ই নেই।

সূর্যময়ূরকে কাব্য রচনার প্রেরণা দেয়। কিন্তু কবিত্বশক্তি দিতে পারেনি, ফলে ময়ুর এমন কোনও কল্পকাহিনি সৃষ্টি করতে পারেননি যার দ্বারা সূর্যশিতক পাঠককে মুগ্ধ করতে পারে। বাণভট্টের রচনায় আতিশয্য, কৃত্রিমতা,

অলংকারবাহুল্য থাকা সত্ত্বেও চণ্ডীর একটা কাহিনি ছিল–মহিষাসুরবধ উপাখ্যানে, যাকে অবলম্বন করে বাণের কবিত্ব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বেদেও সূর্য সম্বন্ধে তেমন কোনও কাহিনি গড়ে ওঠেনি আর মহাকাব্য দুটিতে তো সূর্য গৌণ দেবতা। অনেক পরের সাম্বপুরাণ-এর আগে সূর্য আর প্রাধান্য পায়নি। অসুরবধ বা শাপ অথবা বর দেওয়ার কোনও কাহিনির সঙ্গে সূর্য সম্পৃক্ত নন। তাই কল্পকাহিনির একটা বড় ফাক রয়ে গেছে, যা ভরে দেওয়ার মতো কবিত্বশক্তি ময়ূরের ছিল না। শুধু আরোগ্যদাতা সূর্যের বিষয়ে মহৎ কোনও সৃষ্টি করার সাধ্য তাঁর ছিল না। ফলে ময়ুরের সমস্ত ঝোকটা পড়েছে সূর্যের তেজ ও দীপ্তির উপর। কল্পকাহিনির ফাক ভরাতে ময়ূর এনেছেন। সূর্যের রথ, সারথি, ঘোড়া, তার অবয়ব এবং সূর্যগোলকটির তেজ–বহু অলংকারে, আড়ম্বরে, সবিস্তারে, পুনরুক্তি দিয়ে এই সবই ময়ুর বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাব্যবিন্যাস জটিল, অনুপ্রাসে ও যমকে বৈদগ্ধ্য যত আছে মাধুর্য তত নেই; অলংকারপ্রয়োগে আড়ম্বর যত, রুচির প্রমাণ তত নেই। কৃত্রিম অলংকারে কাব্যের ভার বেড়েছে, সৌন্দর্য আসেনি।

ময়ূরের একটাই সুবিধে ছিল: সূর্য স্বয়ং। মহাবিশ্বের অনন্ত বিস্তারের মধ্যে সূর্যের উজ্জ্বল প্রতাপ আপনিই মনে সম্রাম জাগায়। এই উপাদান মহৎ কবির হাতে যা হয়ে উঠে পারত ময়ূরের হাতে তা অবশ্যই হয়নি; কিন্তু সপ্তম শতকের পাঠক কবির কাছে যা প্রত্যাশা করতপাণ্ডিত্য–তা ময়ূরের যথেষ্টই ছিল। কখনো সখনো মাত্র দু-একবার ময়ুর যথার্থ কাব্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। ৬৯ সংখ্যক শ্লোকে শুনি:

‘আকাশে সূর্যের রথ যখন ধাবমান, তখন দেবতারা সারি বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছেন তাকে নমস্কার করতে। সারথি অসতর্ক নিষ্ঠুরতায় অগণ্য নক্ষত্রকে রথচক্রতলে পিষ্ট করে উজ্জ্বল চূর্ণে পরিণত করছেন। রথের

অশ্বগুলির হ্রেষাধবনি, চক্রনেমির গুরুদ্ধবনি দুরের গুহায় গভীর প্রতিধ্বনি জাগাচ্ছে। সূর্যের যে রথ এই ভাবে ছুটে চলেছে তা আমাদের রক্ষা করুক।'

মনে হয় এই শ্লোকটির তির্যক প্রভাব পড়েছে 'শেষের কবিতা'র শেষ কবিতাটির একটি পঙক্তিতে—'চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দনে।'

খাঁটি স্তোত্রকাব্যের সুর লেগেছে ৭৩ সংখ্যক শ্লোকে: 'যে (সূর্য) দিনের মহান বীজ, ক্লান্ত নেত্রের পক্ষে স্নিগ্ধ কজল, মুক্তির তোরণ, সর্বজ্যোতির একক আধার, বর্ষাব্যারির উৎসস্থল, সমস্ত পৃথিবীর রসসুধার একমাত্র পানপত্র,–সেই সূর্য্যমণ্ডল আমাদের মঙ্গল বিধান করুক।' ভঙ্গির প্রতি এই অত্যধিক মনোযোগের ফলে বৈদগ্ধ্য ও জটিলতার জাল ভেদ করে পাঠক কতকটা প্রবঞ্চিত বোধ করেন, কারণ প্রায় কখনওই কাব্যটি রসে উত্তীর্ণ হয় না। আবেগ ও ব্যঞ্জনার একান্ত অভাব এতে, এমনকী মননের দিকেও নতুন কিছু মেলে না। ময়ুরের কণ্ঠে স্বতঃস্ফুর্ত আবেগের সুর লাগে খুবই কদাচিৎ, সুর্যশতক তাই সর্বপ্রকার কৃত্রিমতার উদাহরণস্বরূপ। দুরুহ প্রতিশব্দের ছড়াছড়ি, যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ, ইত্যাদি কৃত্রিম অলংকারের বহুল প্রয়োগ, দূরান্বয়, দীর্ঘসমাস, তিযর্ব বাগভঙ্গি, ইত্যাদির মধ্যে কাব্যটি যেন বহু-অলংকৃত একটি প্রতিমা, যাতে শেষ পর্যন্ত প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি।

সংস্কৃত শতককাব্যের ইতিহাসে ভর্তৃহরির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তার তিনটি শতক— নীতি, বৈরাগ্য ও শৃঙ্গার, বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ-তিনটি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিংবদন্তীতে ভর্তৃহরি এক বিস্ময়কর মানুষ, থেকে থেকেই তাঁর মত ও পথ আমূল পালটে গেছে, ধর্ম ও দর্শনে তিনি শৈব, বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ মত অবলম্বন করেছেন জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে; গৃহী ও সন্ন্যাসী জীবনে একাধিকবার আনাগোনা করেছিলেন এমন কথাও শোনা

যায়। ভোগের ও ত্যাগের অভিজ্ঞতা যে ছিল তা অনুমান করা যায়। তার কাব্য থেকে, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের চিহ্ন আছে এবং তার অনেকগুলিতেই খাঁটি সুর লেগেছে।

নীতিশতক-এর বিষয়বস্তু নামেই প্রকাশ, এ কাব্যে কবিত্বের অবকাশ সবচেয়ে অল্প। তবু মাঝে মাঝে কবির আন্তরিকতা ও গভীরতা বিস্মিত করে পাঠককে। বিষয়বস্তু অনুসারে কাব্যটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি শ্লোকেই কবির বিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে। নানা অলংকারের প্রয়োগে কবি দেখিয়েছেন। সহজাত অজ্ঞতা কত দূরপনেয়: কুমীরের দাঁত থেকে কেউ যদিও বা রত্ন উদ্ধার করতে পারে, বিষধর সাপকে ফুলের মতো মস্তকে ধারণ করতে পারে। তবু মুখকে কেউ কখনও সন্তুষ্ট করতে পারে না।' (৪ নং) তেমনই বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে পূর্ণ আনন্দ লাভ করার একমাত্র উপাদানই হল বুদ্ধি: ক্রুর নিয়তি হংসকে পদ্মবনে সঞ্চরণের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে পারে। কিন্তু, দুধ ও জলের মধ্যে পার্থক্য বোঝবার (সহজাত) শক্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।' (১৫ নং) যোগ্য ব্যক্তির গর্ব। ছোট একটি শ্লোকে খুব স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত: 'প্রকৃত যোগ্য ও আত্মসম্মানবিশিষ্ট মানুষের স্থান পুষ্পেরই মতো যথার্থ ভাবে দুটি স্থানেই মাত্র হতে পারে–হয় তারা অন্য মানুষের মস্তকে শোভা পাবেন, নতুবা অরণ্যে অনাদৃত হয়ে থাকবেন।' (২৬ নং) মানুষের ভোগ্য সম্পদ পূর্ব হতেই ভাগ্য নির্ধারণ করে রাখে: 'কূপে মগ্ন কলসের দিকে চেয়ে দেখ, তার যতটুকু সাধ্য মাত্র ততটুকু জলই সে ধারণ করতে পারে।' (৪১ নং) 'পণ্ডিত হলেও দুর্বত্তকে পরিহার করা উচিত। মস্তকে মণি ধারণ করলেও সর্প কি বিষধর থাকে না?' 'সজনের চিত্ত সম্পদের দিনে পদ্মের মত কোমল, কিন্তু বিপদের দিনে প্রস্তরের মত কঠিন।' ধৈর্যের গুণ সম্বন্ধে ভর্তৃহরির সুন্দর উক্তি ধীর ব্যক্তি নির্যাতিত হলেও ধৈর্য হারান না, অগ্নিকে নিচু করে ধরলেও তার শিখা কখনও নিম্নগামী হয় না।' (৭৭ নং)

দৈব যদিও সর্বশক্তিমান তবু মানুষের প্রধান গৌরব তার কর্তব্যপালনে; দেবতারাও আপনি আপন কর্তব্যে অবিচল: ‘ব্রহ্মাও কুম্ভকারের মতো সৃষ্টিতে, নানা নির্মাণকার্যে ব্যাপৃত, বিষ্ণু দশটি অবতারের দুর্বিপাকে বদ্ধ, নরকপাল হাতে নিয়ে শিব ভিক্ষণ করে বেড়ান। কর্মই এ সব নিয়ন্ত্রণ করে, কর্মকে নমস্কার।’ (৯৩ নং)। এ সব কাব্যে আছে জীবন সম্বন্ধে ভর্তৃহরির অভিজ্ঞতার ফল, এ শুধু তত্ত্বাবাগীশের উপদেশ নয়, বুদ্ধিমান ও সহৃদয় ব্যক্তির প্রণিধান করে জীবনকে দেখা।

বৈরাগ্যশতক-এর সঙ্গে নীতিশতক-এর বেশ কিছু মিল আছে, কারণ মোটের ওপর একই ধরনের জীবনবোধ থেকে এ-দুটির উদ্ভব। কিন্তু নীতিশতক-এর উক্তিগুলি সামাজিক মানুষের অভিজ্ঞতার প্রকাশ, বৈরাগ্য শতক-এর উদ্দিষ্ট মানুষ সংসারত্যাগী বা সংসারত্যাগে উদ্যত। হয়তো নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে কবির যখন জীবনে বিতৃষ্ণা জেগেছে, শান্তি পাওয়ার জন্যে যখন তিনি উৎসুক হয়ে উঠেছেন, তখনই বৈরাগ্যশতক-এর কবিতাগুলির সৃষ্টি। জীবনের ঘূর্ণবর্তের বাইরে এসে তিনি শান্তির সন্ধান করেছেন, সেই সন্ধানেই এ কবিতগুলি জন্ম নিয়েছে। ‘আমি বহু দুর্গম প্রদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, বিনিময়ে কিছুই পাইনি। পরিবার ও বংশের যথার্থ গৌরব বর্জন করে (অযোগ্য) প্রভুর সেবা করেছি; বৃথাই কাকের মতো ভয়ে ভয়ে পরগৃহের অন্নে প্রাণধারণ করেছি। অয়ি তৃষ্ণা, মানুষকে নীচ ও হীন কর্মে প্রবৃত্তি দিয়ে থাক তুমি, এতেও কি তোমার তৃপ্তি হয়নি?’ (২ নং শ্লোক) দিনে একবার মাত্র ভিক্ষার অন্ন আহার করি, ভূমি আমার শয্যা, নিজের দেহই আমার একমাত্র আত্মীয়, বসন হল জীর্ণ চীর; হায়, তবু তো তৃষ্ণা আমাকে ত্যাগ করে না।’ (১৫ নং) এই বিতৃষ্ণার মনোভাবের কবিতাতেও মাঝে মাঝে খাটি সুরটি লাগে, সে সুর ঐকান্তিক বৈরাগ্যেরই: সুখভোগ হল মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ক্ষণিক চমকের মতো; বায়ুতে আন্দোলিত পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতোই তার

পরমায়ু, এই কথা উপলব্ধি করে মানুষের সংযম অভ্যাস করা উচিত।' (৩৫ নং)। কিন্তু তবু তো মানুষ এ কথা উপলব্ধি করে না, বরং মাতালের মতো আচরণ করে: 'পরমায়ু প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে আসছে, নানাশ্বকর্তব্য ও দায়িত্বের চাপে কালের গতি লক্ষিত হয় না। জন্ম, জরা, বিপদ ও মৃত্যু দেখেও মানুষের ভয় নেই। সংসার মদিরায় সে মত্ত, নেশার ঘোরে যেন উত্তাল।।' (৪৩ নং) 'স্বল্পস্থায়ী শৈশবের পরে মানুষ পূর্ণ যৌবন লাভ করে–স্বল্পকালের জন্যেই। স্বল্পকালই সে দরিদ্র, ধনীও হয়। স্বল্পকালের জন্যই। অবশেষে বলিচিহ্নিত জরায় জীর্ণ দেহ নিয়ে টলতে টলতে সে মৃত্যুর রাজ্যে প্রবেশ করে।' (৫০ নং) মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশী অতৃপ্তির পরিচয় একটি সুন্দর শ্লোকে; যদি সব ঈপ্সিত বস্তু লাভ করে থাকে, যদি শত্রুদের মস্তকে চরণ স্থাপন করতে পেরে থাকে, যদি বিত্তের বিনিময়ে মিত্র অর্জন করতে পেরে থাকে, যদি দীর্ঘ যুগ ধরে জীবিত থাকতে পেরে থাকে, তাতেই বা কী, তাতেই বা কী?' (৬৭ নং) এ শ্লোকের প্রতি চরণের শেষে আছে 'ততঃ কিম'–এই পুনরাবৃত্তির দ্বারা এ সব লাভেরই আত্যন্তিক অসারতা প্রতিপন্ন হয় কবিত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনার দ্বারা। যে উন্নত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষ তৃষ্ণাকে প্রশ্ন করতে পারে, প্রতিটি সার্থকতাকে ওজন করে লঘুভার বলে প্রতিপন্ন করতে পারে, জগতের সমস্ত লাভ ও লব্ধব্যের প্রতি এই উদ্ধত ঔদাসীন্য এ-মনোভাবের এত সার্থক প্রকাশ কমই হয়েছে। চন্দ্রকিরণ সুন্দর, বনভূমি রমণীয়, সজ্জনের সঙ্গ উপভোগ্য, সৎকাব্য চিত্তগ্রাহী, ক্রুদ্ধ প্রিয়ার অশ্রুপূর্ণ নেত্র সুন্দর–এ সবই সুন্দর ততক্ষণই যতক্ষণ না মানুষ উপলব্ধি করে যে জীবনই ভঙ্গুর।' (৭৯ নং) নির্বেদিও উপভোগ্য কবিতার উপজীব্য হয়ে উঠেছে: 'পৃথিবী তার প্রসারিত শয্যা, বাহু দুটি তার আয়ত উপাধান, আকাশ তার চন্দ্রাতপ, স্নিগ্ধ বায়ু তাকে বীজন করে, শরতের চন্দ্র তার প্রদীপ, বন্ধু বিতৃষ্ণার সঙ্গসুখে মুনি যেন অক্ষুন্নবিভব সম্রাটের মতোই সানন্দে শয়ন

করে।' (৯৪ নং) যে শান্তরসের রসত্বই বিসংবাদিত তাকে অবলম্বন করেও ভর্তৃহরি মোটের ওপরে সার্থক কিছু শ্লোক রচনা করেছেন।

নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতকমূলত কতকটা যেন একই মনোভাবের দুটি স্তরকে প্রতিফলিত করে। নীতিশতক-এ সংসারে থেকেই সংসারকে নিস্পৃহ ও নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখে যথাযথ আচরণ করবার নির্দেশ আর বৈরাগ্যশতক-এ কবির নিস্পৃহতা আরও উচ্চগ্রামে পৌঁছে তাঁকে সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ করে তুলেছে। দুটিতেই সংসারে আসক্ত মানুষের থেকে অনেকটা দূরত্বে কবির অবস্থান। নীতিশতক-এর আবেদন বুদ্ধির ও যুক্তির কাছে, উৎস ভুয়োদর্শিতা। বৈরাগ্যশতক-এর আবেদন আবেগের ভারসাম্যে স্থিত শান্তরসের উপলব্ধিতে, উৎস নির্বেদ। দুটি শতকেই প্রত্যেকটি শ্লোকেই স্বতন্ত্র একটি ভাব বা আবেগের রূপায়ণ–বিষয়ের সামাই এদের শতকরূপে গ্রথিত করেছে।

শৃঙ্গারশতক-এ কিন্তু শ্লোকের বিন্যাস অন্য রকম। এখানে শ্লোকগুলিতে শৃঙ্গার সম্পর্কে বিভিন্ন মনোভাবের অভিব্যক্তি; সাতটি গুচ্ছে শ্লোকগুলি বিভক্ত: স্ত্রীপ্রশংসা, সম্ভোগবর্ণন, পক্ষদ্বয়ানিরূপণ (নারীসঙ্গ ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে দোলায়মান মনোভাব), কামিনীগহণ (নারীনিন্দা), সুবিরক্তপদ্ধতি (নারী সম্বন্ধে নিরাসক্তির উপায়), দুবিরক্তপদ্ধতি (নারী সম্বন্ধে নিরাসক্তির অসম্ভাব্যতা) ও ঋতুবর্ণন। বিষয়গুলির তালিকা থেকেই বোঝা যায় ভর্তৃহরির চিত্ত কত সংবেদনশীল ও অস্থির ছিল, কত বিভিন্ন ভাবে তার চিত্তে সাড়া জগত এবং নিরন্তর একটি আন্ততির মধ্যে থাকার ফলে তাঁর চিত্তবৃত্তি কখনওই স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে পারেনি। হয়তো চায়ওনি। নারী ও প্রেম সম্বন্ধে তার মন কোনও একটি বিন্দুতে পৌঁছে বিরাম লাভ করেনি, সর্বদাই দোলাচল অবস্থায় পরস্পরবিরোধী দুটি কোটির মধ্যে আনাগোনা করেছে। 'সূর্য, অগ্নি, নক্ষত্র ও চন্দ্র থাকা সত্ত্বেও সেই মৃগনয়ন দুটি না থাকলে আমার

পৃথিবী অন্ধকারে।' (১৪ নং) আবার নিরাসক্তির মেজাজে বলছেন, 'এই মোহময়ীরা স্বভাবতই (সৌন্দর্য দিয়ে) মুগ্ধ করে; কেবলমাত্র মুখরাই তাদের হাবভাবে প্রভাবিত হয়। পদ্ম রক্তবর্ণ (নিজের গুণে নয়), প্রকৃতি তাকে রক্তবর্ণ করেছে বলেই, তবুও ভ্রমর তারই কাছে ঘোরাফেরা করে।' (৪৭ নং) মদন নারীকে ব্যবহার করেন। পুরুষকে আকর্ষণ করবার জন্যে। জীবনের সমুদ্রে ধীবরের মতো মদন নারীকে বড়শির মতো নামিয়ে দিয়েছে, মৎস্যের মতোই পুরুষ তার ওষ্ঠ্যাধরের টোপে আকৃষ্ট হয়ে উঠে এসে কামের অনলে দগ্ধ হয়।' (৫২ নং) শ্লোকের পর শ্লোকে পুরুষকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে সুন্দরীর আকর্ষণ ও ক্ষণিক প্রেমে সে দিগভ্রান্ত না হয়। কবিতার বিচারে এগুলি উন্নত মানের নয়, কারণ এক হিসেবে এগুলিও নীতিশতক-এর শ্লোকের মতো উপদেশমূলক ও বেশ নীরস। এদের পিছনে অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, কিন্তু হয় সে অভিজ্ঞতা। কবির আবেগকে গভীরে স্পর্শ করেনি, নয়তো বিরুদ্ধ আবেগের উপলব্ধির সামনে এগুলি তাঁর নিজের কাছেই অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ ও দুর্বল ঠেকেছে। যে কারণেই হোক এ কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি।

কবির সংবেদনশীল মনের সবলতর, দৃঢ়তর অভিজ্ঞতার প্রকাশ অন্য ধরনের কবিতাগুলিতে। এগুলিতে কবি বলছেন, নারীই জীবনকে বহনীয়, সহনীয় করে তোলে। ঈষৎ তির্যক ভঙ্গিতে কবি স্বীকার করেছেন প্রেমের অভিজ্ঞতায় একমাত্র বেদনাই হল বিরহ: 'নারীর বাইরে অমৃতও নেই, হলাহলও নেই; মিলনে সে-ই অমৃত, বিরূপ হলে সে-ই বিশুদ্ধ হলাহল।' (৪৪ নং) কিংবা, 'দৃষ্টিপথে থাকলে সে সুধা, দৃষ্টির বহির্ভূত হলে বিষের চেয়েও বিষম।।' (৪৩ নং)। কখনও বা সুতীব্র তিক্ততা নিয়ে কবি নারীকে প্রলোভনের নাগপাশ ও নরকের দ্বার বলে অভিহিত করেছেন। (২৯, ৭৭ নং)। কিন্তু এগুলিতে শৃঙ্গারশতক-এর কবির যথার্থ পরিচয় নেই, আছে সেই সব শ্লোকে যা নারীর নিন্দা বা প্রশংসার ঊর্ধ্বে; স্থায়ী কাব্যসুষমায় মণ্ডিত সেইসব ছোট ছোট

শ্লোকগুলি যাতে প্রেমের দুর্জয় ও দুরধিগম্য আকর্ষণ ভাষা পেয়েছে। নারীনিন্দার শ্লোকগুলি অপেক্ষাকৃত অগভীর এবং অনান্তরিক, দেশের বাতাসে সঞ্চরণ করে যেসব গতানুগতিক নারীনিন্দা, পুরুষশাসিত সমাজের সাহিত্যে যা এক সনাতন উপজীব্য, নানা ভঙ্গিতে তারই উচ্চারণ। তেমনই নারীপ্রশংসার শ্লোকগুলিও অতিশয়োক্তিতে বিবর্ণ ও সাহিত্যবিচারে বেসুর ও ব্যর্থ। কিন্তু যে কটি শ্লোকে প্রেমের অপরাজেয় শক্তি স্নিগ্ধতা মাধুর্য ও সুধা রূপ পেয়েছে সে কটি সত্যিই অবিস্মরণীয়। জীবন, তোমার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে পরিক্রমা সত্যিই অসাধ্য হত, যদি না এই নারীরা না থাকত যাদের নয়নে ভরা মদিরা।' (৩৩ নং) দুর্গম বিপৎসংকুল পথপরিক্রমার ক্লান্তি অপনোদন করতে যাত্রায় শ্রান্ত পথিক যেমন সুরাপানে শক্তি সঞ্চার করে নিজের দেহে, তেমনই নারীনয়নের মদিরায় জীবনপথিকেরও প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয়। সপ্তলোকের একটিমাত্র সত্য উচ্চারণা করি: নারীর মতো এমন মনোহারী আর কিছুই, এমন দুঃখহেতুও আর কিছু নেই।।' (৩৫ নং) সবচেয়ে মর্মস্পশী শ্লোকটি বোধহয়: 'এই অসার সংসারে জীবিকার জন্য কুৰুনৃপতির ভবনদ্বারে সেবা করার কলঙ্ক ও গ্লানি আত্মসম্মানবিশিষ্ট মানুষ কেমন করে ধৈর্য ও স্থৈর্য অক্ষুন্ন রেখে সহ্য করতে পারত যদি না স্তনভরে আনন্তকটি বিকশিত মেখলা এই পদ্মনয়নারা চন্দ্রকিরণের দ্যুতি ধারণ করত?'

ভর্তৃহরির কাব্যে লক্ষ্য করি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ। ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে এটাই রীতি, উত্তমপুরুষে রচনা প্রায়ই থাকে না। যদি না প্রসঙ্গটি উত্তমপুরুষের হয়, যেমন চৌরসুরতপঞ্চাশিকায়। তবু ভর্তৃহরির নৈর্ব্যক্তিকতার আড়ালটি খুবই সূক্ষ্ম, অন্তরালে কবিকে দেখা যায়। মুগ্ধ কবির নারীস্তুতি, প্রেমের উপলব্ধির গভীরে তাঁর নিমজ্জন, পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস, বিরহের মর্মবিদারী দীর্ঘশ্বাস যেন স্পষ্ট শোনা যায়। কখনও বা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নারীর প্রতি তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা, যে নারী জীবনের বহু দুঃখশোকে বন্ধুর মরুযাত্রাকে সহনীয় করে তোলে। এই শেষের কবিতাই নতুন সুর

এনেছে সংস্কৃত কাব্যে। প্রকৃত বিচারে ভর্তৃহরি খুব উচ্চমানের কবি নন, মেঘদূত বাদে কোনও খণ্ডকাব্যই সেই অর্থে তেমন রসোত্তীর্ণ নয়। সার্বজনীন ও চিরন্তন সত্য বলার নেশায় পেয়ে বসেছিল। কবিদের, এতে তত্ত্ব থাকে প্রচুর, কাব্য হয়ে ওঠে খুব কম শ্লোক।

অমরু সম্পূর্ণ ভিন্ন কোটির কবি। তাঁর রচিত শ্লোকসংকলনটি অমরুশতক নামে বিখ্যাত। এতে প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে। কতকটা যেন অলংকরশাস্ত্রের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমরু প্রেমের অবস্থাগুলি অবলম্বন করে শ্লোক রচনা করেছেন; তার মধ্যে পুর্বরাগ, উৎকণ্ঠা, মিলন, বিরহ, কোপ, ক্ষোভ, অভিমান সবই আছে। ডঃ সুশীলকুমার দে তার সংশোধিত পাঠের সংস্করণে অমরুশতক-এর প্রচলিত একশো সাতাশটি শ্লোকের মধ্যে মাত্র বাহাত্তরটিকেই প্রামাণ্য বলে ধরেছেন, বাকিগুলি প্রক্ষিপ্ত। এই বাহাত্তরটির মধ্যেই প্রেমের নানা অবস্থাই প্রতিফলিত। তরুণীকে তার প্রেমিক বলছেন, ‘তোমার প্রেমপূর্ণ অর্ধমুকুলিত নেত্রের অলস দৃষ্টিপাত কখনও সরাসরি, কখনও বা তির্যক ভাবে প্রসারিতযেন তোমার চিত্তে বিভিন্ন ভাবের আনাগোনা সূচিত করছে; বলত, প্রেয়সি, ওই দৃষ্টি তুমি কার উপরে নিক্ষেপ করছ?’ (৪ নং) অভিমানিনীর সখী, অপরাধী নায়ককে বলছে, ‘সখীকে তুমি একদা প্রেম দিয়েছিলে, দীর্ঘদিন তাকে আদর করেছ, সেই তুমিই আজ তাকে আঘাত করেছ, এই তার দুর্ভাগ্য। তার এই আঘাত ও অলপমান শুধু তোমার মুখের কথায় যাওয়ার নয়। নিষ্ঠুর, দাও ওকে করুণ ভাবে, সরবে। কঁদতে দাও।’ (৬ নং) যে প্রেমিকা বধুটি কল্পনা করতে পারে না যে, স্বামী তাকে ছেড়ে বেশি দিন বাইরে থাকতে পারেন। আর জানে না যে স্বামীর। এবারের যাত্রা কয়েক মাসের জন্যে, সে যাত্রার পূর্বে স্বামীকে বলছে, ‘তুমি ফিরবে: কখন, এক প্রহর পরে? দ্বিপ্রহরে না। আরও পরে? একেবারে কি

দিনের শেষে?’ সাশ্রুঞ্চ নেত্রে বাধুটি যখন এই প্রশ্ন করে তখন সে জানে না যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতেই স্বামীর একশো দিনের বেশি লাগবে।’ (১২ নং)

দম্পতির জীবনের কতকগুলি চিত্র পাই অমরুর হাতে: তার মধ্যে অভিমান, ধীরে ধীরে পরস্পরের কাছ থেকে সরে যাওয়া, প্রেমের বিলোপ, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, পরীক্ষা ভাষায় আলাপ ও ভর্ৎসনা আবার কখনও-বা সহসা আবেগভরে পুনর্মিলন। মানিনী বধুটি স্বামীর আচরণে গভীর ভাবে ক্ষুব্ধ কিন্তু মুখে প্রকাশ করবে না। সে কথা। স্বামী তাকে বলছে: দূর থেকে স্মিত হেসে তুমি আমাকে অভ্যর্থনা কর, যখন তোমাকে কিছু করতে বলি, নতশিরে শোনা তা, সম্ভোগের চূড়ান্ত মুহুর্তেও কিন্তু তোমার দৃষ্টি আর আচ্ছন্ন হয়ে আসে। না; কঠিন হৃদয়ে, একটিই জিনিস আমাকে নিষ্ঠুরতম আঘাত হানে, এই সযত্নে তোমার কোপ গোপন করা।’ (১৩ নং)

সরলা বালিকাবধূর প্রথম বেদনার সুন্দর প্রকাশ: স্বামীর প্রথম অপরাধে বালিকাবধুটি জানে না কেমন করে শয্যায় পার্শ্বপরিবর্তন করতে হয় অথবা নিষ্ঠুরভাষায় ভর্ৎসনা করতে হয়, কেউ তাকে এ সব শেখায়নি। তাই পদ্মনেত্র হতে স্থূল স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দুঝরে পড়ে তার চুর্ণকুন্তল সিক্ত করে তোলে। মেয়েটি (নীরবে) শুধু কেঁদেই চলে।’ (২৮ নং) সব সংকাব্যের মতো এ কবিতারও অনুবাদে অনেকটা সৌন্দর্যহানি ঘটেছে। দীর্ঘ স্বরবর্ণ ও তরল ব্যঞ্জনবর্ণগুলির বিন্যাসে আকর্ম্মপ্রএর ধ্বনিতে, আর ওই অশ্রুসিক্তকুন্তলা নতনয়নার অবিরল নীরব ক্রন্দনের চিত্রটিতেই তীব্র বেদনার ব্যঞ্জনা রয়ে গেছে। বিপ্রলব্ধা নায়িকাকে স্বামী বলছে: ‘সুন্দরি তোমার মৌন ভঙ্গ করে তোমার পদানত এই আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ। তোমার কোপ তো আগে এমন ছিল না। স্বামী এই কথা বলতে বলতেই বধুর দুনিয়ন হতে অশ্রুর স্রোত নেমে এল।’(৩৬ নং) মানিনী স্বামীকে বলছে: ‘তবে তাই হোক, বৃথা বাক্য থাক। তুমি যাও, প্রিয়তম, তোমার বিন্দুমাত্র দোষ নেই। ভাগ্য আমার প্রতি বিরুপ।

তোমার সেই গভীর প্রেমেরই যদি আজ এই পরিণতি, তবে এই ভঙ্গুর জীবন আমাকে ত্যাগ করলে তা নিয়ে আর কি নালিশ থাকবে?’ (২৯ নং) অন্য একটিতে যাত্রায় উদ্যত স্বামীর সম্বন্ধে নায়িকা ‘তার বসনপ্রান্তও আকর্ষণ করল না, দুহাত দ্বারের দুপ্রান্তে রেখে তার যাত্রা রুদ্ধ করতেও প্রয়াসী হল না। আকাশে মেঘের ঘনঘটা কিন্তু নায়কের যাত্রায় বাধা পড়ল সেই তরুণীটির দুচোখ থেকে নেমে আসা অশ্রু নদীর ধারায়।’(৫৫ নং) সুন্দর একটি শ্লোকে দেখি, ‘প্রেমিক ভাল করেই জানে তার প্রেয়সীর মধ্যে বহু জনপদ, কতশত নদী, পর্বত ও অরণ্যের ব্যবধান; সে জানে যে, নায়িকা (তার) দৃষ্টিপথের অগোচরে, তবু পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে সে চোখরগড়ে প্রিয়ার অভিমুখে বারে বারে তাকিয়ে দেখছে।’ (৭২ নং) মেঘদূতের যক্ষের কথা মনে পড়ে: যার আনন্দস্পর্শের লোভে অতি সহজ কথাও কনেকগনে বলতাম আজ সে চোখের আড়ালে, শ্রবণের ওপারে।’ (উত্তরমেঘ ৪০) শুধু নায়কের কটি ভঙ্গি বর্ণনা করে বর্ণিত হয়েছে সেই বিরহের তীব্রতা যা বুদ্ধির প্রবোধ মানে না।

ক্রোধ, অভিমান, ক্ষোভ ইত্যাদি নানা ক্ষণিক মনোভাবের অন্তরালে গভীর স্থায়ী প্রেমের ব্যঞ্জনা অমরুর কাব্যে। ভ্রূকুটি করলেও নায়িকা সংগ্রহে নায়কের দিকে চেয়ে আছে, ক্রোধে বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না, তবু সহসা স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হচ্ছে মুখমণ্ডল, হৃদয় কঠিন হয়ে উঠেছে তবু রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে তনুলতা, প্রেমিকের ওপরে তার যে ক্রোধ তা কেমন করে চরমে উঠবে যতক্ষণ সে নায়ককে চেয়ে দেখছে?’ (২৭ নং) আহতা নায়িকার মান যেতে চায় না, সে বলে: ‘চিত্ত দীর্ণ হোক, মদন শীর্ণ করে দিক এ দেহকে, ঐ চঞ্চলচিত্ত মানুষটির সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই থাকবে না। আমার, সখি।’ মনের খেদে নায়িকা। এ কথা বলল বটে। কিন্তু উচ্চারণ শেষ না হতেই প্রিয়তমের পথের দিকে একদৃষ্টি চেয়ে রইল। (৬১ নং)

প্রচণ্ড ভুল বোঝার সময়েও, যখন গভীর ভাবে আহত নায়ক নায়িকা দুজনেই, তখনও প্রেম যে কি বিচিত্র অচিন্ত্যপূর্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করে তা সত্যি বিস্ময়কর।

'একই শয্যায় শুয়ে তারা দুজন পরস্পরের কথায় উত্তর দেয় না। আর। মনে মনে যদিও দুজনেই অনুতপ্ত এবং পরস্পরের কথাই ভাবছে। তবু মান ত্যাগ করছে না। ধীরে ধীরে পরস্পরের তির্যক দৃষ্টি এসে মিলল, দোষারোপের হিমানী গলল, একটি স্মিতহাসি দেখা দিল এবং সবটারই অবসান ঘটল একটি আলিঙ্গনে।' (২২ নং)

স্বামী ভাবছে বিধুটির প্রতিক্রিয়া কী হবে:

'আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। সে আমার দিকে ফেরে। কিনা। সে-ও আহত হয়ে ভাবছে তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছি। আমি এতই নিষ্ঠুর। এমনই এক মুহূর্তে, যখন দুজনেই চোবাচাহনিতে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে তখন আমার স্মিতহাস্য দেখেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ল, তাতে আমারও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।' (২৩ নং)

দীর্ঘ বিরহের পর প্রেমিক প্রেমিকার মিলন; শাস্ত্রে যেমন লেখে তেমনটা কিন্তু ঘটল না, তখন তাদের নিজস্ব প্রতিক্রিয়াই দেখা দিল সে মুহূর্তে: দীর্ঘ বিরহ ও সতৃষ্ণ প্রতীক্ষার অবসানে প্রেমিকপ্রেমিকার দেহ শিথিল হয়ে আসে। দীর্ঘদিন পরে তারা যখন পরস্পরকে অভিবাদন করে তখন পৃথিবীটাই তাদের চোখে নতুন হয়ে দেখা দেয়। (মিলনের প্রথম) দীর্ঘ দিনটি কোনও মতে কাটে, রাত্রেও কামনা ততটা উদ্রিক্ত হয় না। যতটা হয় অবিশ্রান্ত কথা বলে যাওয়ার বাসনা। (৪০ নং) স্লান শীর্ণ নায়িকা নায়কের কাছে স্বীকার করবে না যে আদর্শনেই তার এই অবস্থা: 'কোন তোমার এই শীর্ণতা এই বেপথু, কপোলে ও

আননে এই স্লানিম?' প্রেমিক এই প্রশ্ন করলে তন্বী নায়িকা জানায় এ সবই স্বাভাবিক আর মুখ ফিরিয়ে পক্ষ্মতলে সঞ্চিত অশ্রু ঝরিয়ে দেয়।' (৪৬ নং)

আবার কখনও বা সত্যই প্রেমের মৃত্যু ঘটে, তখন বাকি থাকে নিষ্প্রতিকার বেদনা। অমরুর সংবেদনশীল লেখনীতে এ অবস্থার সার্থক প্রকাশ ঘটে:

'যেখানে ভ্রূকুটিরচনাই ছিল কোপ, মৌন যেখানে ছিল নিগ্রহ, পরস্পরের অভিমুখে স্মিতহাস্য যেখানে ছিল অনুনয়, দৃষ্টিপা েতই ছিল প্রসাদ, সেই প্রেমের কেমন মৃত্যু ঘটেছে দেখ, তুমি পদপ্রান্তে লুন্ঠিত, তবু, খাল আমি, আমার ক্রোধ তো এখনও যায় না। (৩৫ নং) 'প্রথমে আমাদের দেহ দুটি মিলিত হয়েছিল, তখন তুমি ছিলে প্রেমিক আর এই হতভাগিনী আমি তোমার প্রণয়িনী। এখন তুমি বর আমি বন্ধু, তবু আমি বজের চেয়ে কঠিন এই জীবন বহন করে চলেছি, (অর্থাৎ তোমার প্রেমে বঞ্চিত হয়েও আমার মৃত্যু ঘটে না)।' (৪৮ নং)

ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতকে প্রেমের উপলব্ধি নির্বৈশিষ্ট্য, সাধারণীকৃত, আমরুর কাব্য কিন্তু যেন সত্যকার প্রেমিক প্রেমিককে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও মনোভাবে চোখে দেখা যায়, তারা যেন স্বতন্ত্র ও বাস্তব ব্যক্তি। এ কথা সত্যি যে অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশ এ ধরনের বর্ণনার পশ্চাতে সক্রিয়, তবু শ্লোকগুলিতে খাঁটি সুরটি বেজেছে। ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতক-এরও অধিকাংশ শ্লোকেরই আবেদন বুদ্ধিবৃত্তির কাছে, অর্থাৎ তারা যেন দীপ্তিকাব্য', সেখানে অমরুর মুখ্য আবেদন হৃদয়বৃত্তির কাছে, তাই তার কাব্য দ্রুতিকাব্য', চিত্তকে দ্রব করে আনে। তাছাড়া স্থূল দেহবর্ণনায় অমরুর অরুচি, সম্ভোগ-শৃঙ্গার-এর বর্ণনায় বা নারীদেহের অনুপুঙ্খের বর্ণনা যা কালিদাসোত্তর কাব্যের মূলধন, তাতে আমরুর স্পষ্ট অনীহা। দেহ আছে, নারীদেহও আছে তার যৌবনের সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে, তবু অমরুতে সর্বদাই দেহের মন্দিরের বিগ্রহের

মতো প্রতিষ্ঠিত একটি চিত্ত, যা নানা আবেগে নিয়তকাম্প্র ও শিহরিত। তীব্র আবেগের রূপায়ণও যেমন সার্থক তাঁর লেখনীতে, তেমনই সার্থক সূক্ষ্ম সুকুমার আবেগগুলি। অমরুতে নরনারী উভয়েই প্রেমের জন্যে উন্মুখ, নারী অন্যত্র যেমন নিস্ক্রিয় ভাবে চিত্রিত, অমরুতে তেমন নয়। অমরু প্রেম সম্বন্ধে কোনও তথ্য উপস্থাপিত করেননি। যেমন করেছেন ভর্তৃহরি; প্রেমের কোনও মূল্যায়নও তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তার কাব্য প্রেমকে তার নানা তীব্র ও সূক্ষ্ম আবেগের অনুষঙ্গে সার্থক ভাবে চিত্রিত করেছে। সহজ একটি প্রেমের অবস্থাও অমরুর উপস্থাপনায় জটিল ভাবে রূপায়িত হয়েছে, কারণ নানা অঙ্গরস, ওই স্বল্প পরিসরের মধ্যেই কখনও অন্তঃস্রোতে কখনও-বা দৃষ্টিগোচর ভাবেই আনাগোনা করেছে। নানা সূক্ষ্ম আভাস দেখা যায়— দ্বিধা, উভয়াবেশ, দুটি তিনটি ভাবের মধ্যে দোলাচলতা, প্রেমের মধ্যেই যেন অবচেতনে সন্নিহিত আছে, বিদ্বেষ, ক্রোধ, করুণা, মমতা ও ক্রুরতা। এ সবই যেন প্রেমের পটে দ্রুত দেখা দিয়ে সরে সরে যায়, যেমনটি ঘটে জীবনে। একটি মূল আবেগের সঙ্গেই এই পরিক্রিয়মাণ বৃত্তিগুলি যেন গৌণ ভাবে সম্পৃক্ত। এ ভাবে চিত্রণ অনেক বেশি বাস্তবানুগ, সরলরেখায় একটি মুখ্য রসকে চিত্রিত করার চেয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকাংশ প্রেমের কাব্য যেখানে স্থূলরেখায় একটিমাত্র পরিচিত রসকে আঁকে সেখানে অমরুর কাব্যে আবেগের মুখ্য ও গৌণ অনুষঙ্গের জটিল মিশ্রণে কাব্য অনেক সমৃদ্ধতির হয়েছে।

অমরু পর্যন্ত শতককাব্যকাররাই এই কাব্যের ক্ষেত্রে প্রধান কবি। এর পরেও বেশ কয়েকজন অপেক্ষাকৃত অক্ষম কবি শতককাব্য রচনা করেছেন–নানা বিচিত্র বিষয়ে। রাজপুত টাকা’ রাজবংশের রাজত্বকালে ধারা রাজ্যের এক নাগরাজ রচনা করলেন নিতান্ত নগণ্য এক ভাবশতক; এতে পাঠভেদে পচানব্বই থেকে একশো দুটি পর্যন্ত শ্লোক পাওয়া যায়। নারীর দিক থেকে প্রেমের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাই এর বিষয়বস্তু। মোটামুটি নৈপুণ্য থাকলেও শতকটি সম্পূর্ণই প্রেরণাহীন। প্রেরণার অভাব তিনি পূরণ করতে চেয়েছেন

প্রচণ্ড অতিশয়োক্তি, ভাবালুতা এবং কামশাস্ত্রের নির্দেশগুলির প্রতি অন্ধ আনুগত্য রেখে শ্লোক রচনা করে। শ্লোকগুলি বেশ কতকটা দুর্বোধ্য এবং ভাষ্যের শরণ না নিলে অস্পষ্ট থেকেই যায়; ভাষ্যকার সম্ভবত স্বয়ং কবিই; তিনি শ্লোকে যা প্রকাশ করতে পারেননি ভাষ্যের মাধ্যমে সেটি সম্পূরণ করেছেন। বসন্তে কোনো পদ্মনয়না নায়িকা পুষ্পতরু'র কাছে গিয়েও প্রশ্বাস রোধ করে। থাকেন, মোচন করেন না।' (৪ নং) টীকাকার জুড়ে দিচ্ছেন 'পাছে মধুকররা তার শ্বাসকে পুষ্পগন্ধ মনে করে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ে!' এ-ধরনের রচনার অন্তর্নিহিত অসারতা আরও স্পষ্ট হয় যখন পড়ি: সূর্য দূর সমুদ্রে তার তাপ নিমজ্জি করে' তাঁটের এক প্রাণীতে তা সঞ্চারিত করেন।' ধাঁধার মতো এই শ্লোকটির উপসংহার ভাষ্যকারের কথায়; চক্রবাক রাত্রে চক্রবাকী থেকে বিযুক্ত তারই বক্ষে সেই তাপ! এ জাতীয় উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। অক্ষম কবি তার কাব্যগত দেউলে অবস্থা গোপন করবার জন্যে এই ধরনের কলাকৌশলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। নবম শতকের কোনও এক ভল্লট একটি শতককাব্য রচনা করেন, সেটি ভল্লটশতকবলেই পরিচিত। অলংকারশান্ত্রগুলিতে মাঝে মাঝে এর থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। এতে ১০৮টি শ্লোক পাওয়া যায়, জীবনের নানা দিক এর বিষয়বস্তু। মনে হয়। ভল্লটের রচিত বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির সংকলনেই এর সৃষ্টি, বিষয়গত কোনও সংহতি এগুলিতে নেই। শ্লোকগুলি গুণগত দিক থেকেও সমান নয়। অধিকাংশ শ্লোকই জীবন সম্বন্ধে বহুপ্রচলিত সদুক্তি, নিতান্তই বৈশিষ্ট্যহীন। শুধু ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি অনাবশ্যক ভাবে জটিল। বিষ, কে তোমার স্থান নিরূপণ করেছিল? প্রত্যেকটি স্থানেই পূর্বটির থেকে গৌরবের: প্রথমে সমুদ্রের মধ্যে, তারপর মহাদেবের কণ্ঠে এবং তারপরে খালের বচনে?' (৪ নং) 'স্বর্ণকার, তোমাকে নমস্কার! সূক্ষ্ম ওজন নিরূপণ করার জন্যে একা তুমিই সুবর্ণের সঙ্গেই তুলায় শিলাখণ্ড চাপিয়ে দাও।' (৭০ নং) 'কপোল বেয়ে যে গন্ধগজের মদ্যশ্রাব হচ্ছে সে যদি তার কাছে আসা মৌমাছিদের তাড়িয়ে

দেয়। তবে ক্ষতি হাতিরই, কারণ তারই অলংকার চলে গেল। (মৌমাছির গুঞ্জন হাতির মদস্রাবের বিজ্ঞাপন), কারণ মৌমাছিরা গিয়ে প্রস্ফুটিত পদ্মের চারিদিকে ঘুরবে।' (১০৫ নং) ভল্লটের ভাবগুলি নেহাৎই সাধারণ, বৈশিষ্ট্যবর্জিত। একমাত্র বৈশিষ্ট্য হল পাণ্ডিত্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত বা উল্লেখ্য, এই দিয়েই ভাল্লট তাঁর প্রেরণার অভাব ঢাকতে চেষ্টা করেছেন। তার শতকটিও যে রক্ষা পেয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়। সাধারণ পাঠক আর সংস্কৃত পড়েন না, যাঁরা পড়েন তারা পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেলেই তারা খুশি, কাব্যের কাছে তারা আর কবিত্ব আশা করেন না।

কালানুক্রমে মুখ্য শতককাব্যের ধারায় ওরইমধ্যে বিখ্যাত শেষতম রচয়িতা নীলকন্ঠ দীক্ষিত, যাঁর সভারঞ্জনশীতকটি সপ্তদশ শতকের রচনা, এতে ১০৫টি শ্লোক আছে; সব কটিই অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। বিষয় অবশ্য বহুপ্রকার–কাব্য প্রশংসা, কবিকে দান করার প্রশংসা, শক্তি, দৈব, ধৈর্য, বিত্ত, সতী স্ত্রী ও সৎ রাজা। এ সব বিষয়ে নীলকন্ঠ বিভিন্ন সময়ে যা কিছু রচনা করেছেন সব কটি সংকলন করে এ শতকটি নির্মিত। বিষয়গুলি মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা, সেইটিই এর বৈচিত্র্য। শত সূর্য, শত চন্দ্র উদিত হোক, মহিষীর বচন ব্যতিরেকে মনের তমিস্রা ঘোচে না।' (৩ নং) স্ত্রীর কাছে প্রেমিক স্বামী সুন্দর, গণিকার কাছে বিত্তবান সুন্দর।' (৪৯ নং) শ্রীতি ও স্মৃতি ধনের নিন্দা করে কেন, যখন ধন ছাড়া তারা এক পা-ও এগোতে পারে না?' (৫৯ নং) 'দাম্পত্য প্রেম অক্ষুন্ন থাকলে কোনও কিছুরই সত্যিকার ক্ষতি হয় না।' (৯৩ নং) এই শ্লোকগুলির বৈশিষ্ট্য দুটি; প্রথমত এরা কোনও অসামান্যতার দাবি করে না। সবচেয়ে সাধারণ ও বহুব্যবহৃত অনুষ্টুপ ছন্দে, অনাবশ্যক অলংকার, আড়ম্বর ও দুরুহতা বর্জন করে এরা সহজ ভাবে স্বচ্ছন্দ সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছে। না আছে অপ্রচলিত প্রতিশব্দের ব্যবহার, না কৃত্রিম অলংকারের, না। দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার। ফলে এগুলি সুখপাঠ্য ও

প্রসাদগুণে সহজবোধ্য। ভাবগুলি প্রায়ই অতি সাধারণ, যদিও মধ্যে মধ্যে যথার্থ ভুয়োদর্শিতার নিদর্শনও আছে। সহজ ভাষা আঙ্গিকে ব্যক্ত বলে এগুলি ভাল্লট বা নাগরাজের রচনার মতো বিরক্তি উৎপাদন করে না।

আরও কয়েক শতাব্দী পূর্বে ভল্লটের সমকালেই আনন্দবর্ধন রচনা করেন তাঁর দেবীশতক এতে একশোটি শ্লোকে দেবীর স্তুতি। এটি বিষয়ের দিকে স্তোত্রকাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা, কিন্তু বিচ্ছিন্ন একশোটি শ্লোক থাকায় শতক বলেও বিবেচনা করা যায়। রচনার দিক থেকে দেবীশতক-এর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। ভারতবর্ষে স্তোত্র সাহিত্য এত সমৃদ্ধ বলেই স্বভাবত অন্যান্য স্তোত্র শতকের (চণ্ডী বা চণ্ডীশতক-এর) সঙ্গে পাঠক মনে মনে তুলনা করেন ও লক্ষ্য করেন। দেবীশতক স্থানে স্থানে দুরূহ। কিন্তু কাব্যের ভাবও জটিল নয় এবং দীপ্তিকাব্য বা দ্রুতিকাব্য হিসেবে কোনও গোত্রেই এর আবেগে বা মননে কোনও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নেই। স্রগ্ধরা ছন্দে শংকরাচার্যের রচনা বলে পরিচিত শতশ্লোক নামের একটি শতক, এতে মোট একশো একটি শ্লোক। শংকরাচার্যের নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার একটিই কারণ, এর বৈদান্তিক বিষয়বস্তু। নিজগুণে এটিরও সহৃদয় পাঠকের চিত্তবৃত্তি বা বুদ্ধির কাছে কোনও দাবি নেই। আরও অনেক শতককাব্য গতানুগতিক বিষয়ে ও ভঙ্গিতে মধ্যে মধ্যেই রচিত হয়েছে। বিষয়ে, প্রেরণায় ও রসে তারা এমনই দীন ও অকিঞ্চিৎকর যে সাহিত্যের ইতিহাসে তারা উল্লেখের দাবি করতে পারে না। এগুলির মধ্যে পরবর্তী কালের রচনাই বেশি, যেমন পদ্মানন্দের বৈরাগ্যশতক, স্পষ্টই বোঝা যায় ভর্তৃহরিই এ-শতকের মূল, কিন্তু রচনা নিতান্তই দীন। তেমনই নরহরির শৃঙ্গারশতক) এরও মূল ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতক; জনার্দন ভট্টের শৃঙ্গারশতকও আমনই একটি অনুকৃতিবিশেষ। অজ্ঞাত কবির খড়্গশতক, বীরেশ্বরের অন্যোক্তিশতক রচনায় অত্যন্ত নিকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণবল্লাভের কাব্যভূষণশতক যমক ও অনুপ্রাসে উদাহরণ দেওয়ার জন্যই যেন রচিত। জৈনশতকও কয়েকটি আছে; জম্বুগুরুর জিনশতক একটি;

ভূপালের জিনচতুর্বিংশতিকা-র একমাত্র সদগুণ হল এটিতে মোটে চব্বিশটি শ্লোক আছে। নাম ও পরিচয়েই বোঝা যায় ধীরে ধীরে এই নিতান্ত সাধারণ রচনাগোত্রটি কী ভাবে উত্তরোত্তর অবক্ষয়ের পথে নেমে যাচ্ছে।

ঠিক একশোটি না হলেও এমন কিছু সংকলন আছে যা এই জাতেরই, যেমন গোবর্ধনাচার্যের আর্যাসপ্তশতী আর্য ছন্দে সাতশোটি শ্লোকের সংকলন। এ শ্লোকগুলি শৃঙ্গাররসের। গোবর্ধনের উদ্দেশ্য ছিল শৃঙ্গাররসের নামে যে কুরুচিপূর্ণ রচনার প্রাদুর্ভাব ছিল তার যুগে, তার থেকে সংস্কৃত সাহিত্যকে মুক্ত করা। অর্থাৎ এর রুচিগর্হিত দিকটিকে বর্জন করে শৃঙ্গাররসাঙ্খিত কাব্য রচনা করা। গোবর্ধনাচার্যের কবিতা শক্তি রচনার মান এমন ছিল না যে, তিনি তার কাব্য দিয়ে তার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন; কিন্তু তৎকালীন কুরুচিকে তিনি নিজের কাব্যে স্থান দেননি। এ কথা সত্য। তার প্রভাবে কবি বিহারীলাল হিন্দিতে সৎসঙ্গ (সপ্তশতী) রচনা করেন; এ কাব্যের ওপরে হয়তো প্রাকৃত ভাষায় রচিত সাতবাহন রাজা হালের গাহসিক্তসঙ্গীরাও (গাথা-সপ্তশতী) প্রভাব ছিল। বিহারীলালের প্রভাব পড়ে পরবর্তী কবি প্রেমানন্দের শৃঙ্গারসপ্তশতিকা-য় দেখা যাচ্ছে শৃঙ্গাররসকে আশ্রয় করে সাতশোটি শ্লোক রচনা জনপ্রিয় হয়েছিল, হয়তো হালের প্রাকৃত গাহসিক্তসঙ্গ এর প্রবর্তক। কিন্তু হালের রচনার মতো কোনওটিই খ্যাতি পায়নি, কারণ উন্নতমানের কবিত্ব না থাকলে একই বিষয়বস্তুর একই রসের সাতশোটি সার্থক শ্লোক রচনা করা সম্ভব নয়; সেই কারণে অন্য সপ্তশতীগুলিকে মানুষ বিস্মৃত হয়েছে। সপ্ত একটি পবিত্র সংখ্যা, সেই জন্য সপ্তশতীর এত প্রাদুর্ভাব।

একশোর কম, অর্ধেক, শ্লোকে বিলহণের রচিত চৌরসুরতপঞ্চশিকা (স্বতন্ত্র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এ-ও শৃঙ্গাররসের। এছাড়াও আছে সাম্ব পঞ্চাশিকা (নামান্তরে, পরমাদিত্যস্তোত্র বা ব্রহ্মাদিত্যস্তোত্র)। এর রচয়িতা নাকি শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্ববতীর

পুত্র সাম্ব। সূর্যশতকের মতো সাম্বপঞ্চাশিকা-রও উপজীব্য সূর্যের মাহাত্ম্য। এর দ্বারা স্বল্পস্থায়ী এক সূর্য উপাসনার স্বতন্ত্র রীতি ও ধারা যে প্রবর্তিত হয়েছিল তা-ই প্রমাণিত হয়; সাম্বপুরাণ এই সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ। পঞ্চশিকা যে শতকের ধারাতেই রচিত তা সহজেই বোঝা যায়; সম্ভবত চৌরসুরতপঞ্চশিকা-য় বিলহণ যে-খ্যাতি লাভ করেন তার দ্বারাই পরবর্তী পঞ্চাশিকা রচয়িতারা উদ্বুদ্ধ হন। সংখ্যার হিসেব খুব বড় কথা নয়, শতকের শত' শব্দ কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা ততটা সূচনা করে না। যতটা করে সংখ্যা পূর্ণতাকে। মনে হয় যজুর্বেদ-এর শতরুদ্রীয়-ই এ দিকে পথিকৃৎ; সেখানেও সংখ্যা হিসেবে শত' নিরর্থক, পূর্ণ একটি স্তোত্রের পরিচয় বহন করে মাত্র। বৌদ্ধসাহিত্যেও দেখি একটি বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে পরস্পর অসংলগ্ন কয়েকটি গাথা গ্রথিত হয়ে স্তোত্রের আকার নিয়েছে, সুত্তািনপাত, থেরগাথা, থোরীগাথা ও ধম্মপদ-এ। রামায়ণ মহাভারত-এও এ রকম মূল আখ্যান থেকে কতকটা বিচ্ছিন্ন স্তোত্র অনেক আছে, পুরাণেও প্রচুর পরিমাণে আছে। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। উদাহরণ শ্রীমদ্ভগবদগীতার বিশ্বরূপদর্শন ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এ দেবীমাহাত্ম্য অংশে যা 'চণ্ডী' নামে প্রখ্যাত এবং যার প্রভাবে চণ্ডীশতক রচিত। ক্রমে ক্রমে অষ্টোত্তরশত নামে দেবতার আহ্বান ও স্তবের প্রচলন হয় এবং স্তোত্রসাহিত্যে বহু স্তব এই ধারাতেই রচিত।

শতককাব্য খণ্ডকাব্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম সার্থক খণ্ডকাব্য মেঘদূত-এর সঙ্গে এগুলির অনেক পার্থক্য; মেঘদূত-এ শ্লোকগুলির পারম্পর্য আছে যার প্রভাব বেশ কিছু দূতকাব্যে কিছুদিন পর্যন্ত পড়েছিল। কিন্তু শতককাব্যে বহু বিচ্ছিন্ন শ্লোক বিষয়গত শিথিল এক সংহতিকে অবলম্বন করে একত্র গ্রথিত। শতককাব্যের অধিকাংশেই শ্লোকগুলি নানা ছন্দে রচিত। বিষয় সাদৃশ্যও দৃঢ় নয়, রস বা ভাবের বন্ধনসূত্রটিও ক্ষীণ। ফলে শতক, সপ্তশতী ও পঞ্চাশিকা সবগুলিই কোনও কবির কবিজীবনে নানা বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত বিচ্ছিন্ন শ্লোকের সংকলন। বোঝাই যায়, এ-জাতীয় সংকলনে সুভাষিতাবলী

ধরনের গ্রন্থ রচিত হতে পারে, কিন্তু সংহত রচনার কাব্যপাঠে যে গাঢ়তা ও রস, ধ্বনি, ইত্যাদির ঐশ্বর্যে যে জাতীয় তৃপ্তি পাওয়া যায় শতককাব্যে বা তার অনুকারী কাব্যে তেমন কোনও অবকাশই নেই।

সপ্তম শতকে চিন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যসম্পর্ক খুব বেশি ছিল এবং বণিকের মুখেমুখে বা পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের সাহিত্যের আদানপ্রদান হওয়াও খুব স্বাভাবিক। ওই সময়ে চিনে তাঙবংশীয় রাজাদের কালে যে অপূর্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়, যার মধ্যে গভীর জীবনবোধ বিধৃত আছে তার প্রভাবও এসে থাকা সম্ভব। এ প্রভাব আসা সম্ভব হল কারণ মহাকাব্যের সুস্থ ধারাটির প্রেরণা তখন নিঃশেষিত; কবিদের এমন শক্তি নেই যা পূর্ণাঙ্গ সার্থক কাব্য রচনা করতে পারে; অথচ কিছু শক্তি আছে যাতে ছোট ছোট সার্থক শ্লোক রচনা করা যায়। বর্ধন রাজবংশের পতনের পরে আর্যাবর্তে রাষ্ট্রিক সংহতি কিছুকাল বিপর্যস্ত ছিল, আর রাজসভাই ছিল কবিদের আশ্রয়, পৃষ্ঠপোষক ও প্রেরণার অন্যতম উৎস। মহাকাব্যের মহাযুগ অবসিত তখন খণ্ডকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হলেন অপেক্ষাকৃত হীন ক্ষমতার কিছু কবি। শতককাব্যে দায় সব চেয়ে কম; বিষয়গত বন্ধন এখানে শিথিল, ছন্দের সাম্যও আর অপেক্ষিত নয়। শতককাব্য যে ক্ষীণসূত্রে গ্রথিত তা-ও যখন শিথিল হয়ে এল তখন এল সুভাষিতাবলী' ধরনের সংকলন গ্রন্থ, যাতে বিভিন্ন কবির রচনা বিষয়সাদৃশ্য অনুসারে গ্রথিত।

ঋতুসংহার বা মেঘদূত-এর মধ্যে যে বিষয়সাম্য (ছন্দসাম্য ও) এবং পরম্পর্য আছে, সূর্যশতক ও চণ্ডীশতকছাড়া অন্যান্য শতকে তা নেই। পরবর্তী শতককাব্যে প্রত্যেকটি শ্লোকই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। কাব্যে কোনও অন্তর্নিহিত প্রেরণার সাম্য নেই, কোনও গতি নেই, রসের ঐক্য নেই, পারম্পর্য নেই, আদি, মধ্য ও অন্ত নেই, পরিণতি নেই। তাই যদিও ভর্তৃহরিতে এক একটি অনুচ্ছেদে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য আছে, যেমন শ্রীপ্রশংসা বা

কামিনীগর্হণতবু সেই অনুচ্ছেদের মধ্যে প্রত্যেকটি শ্লোকই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, পূর্ববর্তী বা পরবর্তীর্ণ শ্লোকের সঙ্গে কোনও ভাবেই সম্পৃক্ত নয়; ফলে সমগ্র শতকটি কখনও একক কাব্য হয়ে ওঠে না। এই ধরনের খণ্ড খণ্ড ছবির মতো শ্লোক সপ্তম শতকেই প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরে জনপ্রিয় থাকে। এই তিন শতক ধরে এই কাব্যের ধারার কাছে পাঠকের প্রত্যাশা ছিল যে শিথিলবন্ধনে গ্রথিত একটি খণ্ডকাব্যের আকৃতি যেন তার থাকে, বন্ধনসূত্র শুধু বিষয়সাম্য। পরে এটুকু প্রত্যাশাও আর রইল না, তাই পরবর্তী শতক বা শতকধমী (অর্থাৎ সপ্তশতী বা পঞ্চাশিকা) কাব্যগুলি একই কবির বহু বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন যুগে রচিত শ্লোকের সংকলনে পর্যবসিত হল, যেমন ভল্লটশতকবা ভাবশতক শতককাব্যের পূর্ণবিকাশের যুগেও একই বিষয়ে বিভিন্ন মনোভাবের প্রকাশ অনুমোদিত ছিল শুধু রচনাটি একই কবির হওয়া চাই; কিন্তু নবম শতকের পরে বিষয়ে বৈচিত্র এসে সংহতিকে আরও শিথিল করে দিল।

আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও এই বিকেন্দ্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী শতকগুলিতে কালিদাস, বাণ বা ময়ুরের মতো ভঙ্গি, রীতি ও ছন্দের ঐক্য নেই। প্রায় সব মহাকাব্যের একটি সর্গ জুড়ে একই ছন্দ থাকত, ব্যতিক্রম দেখা গেল। অষ্টম-নবম শতকের পর থেকে। এই ছন্দসাম্যের নির্দেশ যেন কালিদাস, বাণ, ময়ুর তাদের খণ্ডকাব্যে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীর্ণ শতককাব্যের রচয়িতারা দুই একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, এ নির্দেশ অস্বীকার করলেন; তারা প্রত্যেক শ্লোকের বিবক্ষিত অনুসারে সে-শ্লোকের উপযুক্ত ছন্দ নির্বাচন করলেন। ফলে, বিবক্ষিতে যত বৈচিত্র্য আঙ্গিকে তা-ই প্রতিফলিত হল। সপ্তদশ শতকে সভারঞ্জনশতক যে আগাগোড়া অনুষ্টুপে রচিত তাই স্পষ্টতই মহাকাব্য বা প্রথম যুগের খণ্ডকাব্যগুলির অনুকরণে। শতককাব্যের ইতিহাসে একটা সূচনা, বিকাশ ও অবক্ষয়ের ইতিহাস দেখা যায়। প্রথম দুটি, সূর্যশতক ও চণ্ডীশতক-এ বিষয় ও আঙ্গিকে অনেক বেশি সংহতি দেখা যায়, কারণ,

মহাকাব্যের সুস্থ যুগের প্রভাব তখন সকল রচনার ওপরেই বিদ্যমান। ভর্তৃহরির নীতিশতক স্পষ্টতই মহাভারত-এর শান্তিপর্বের এবং অন্যত্রও যে সকল নীতিকথার অংশগুলি আছে তার দ্বারাই প্রভাবিত; সুভাষিত বা তত্ত্বাশ্রয়ী কাব্যের উদ্ভব বৌদ্ধ সাহিত্যে এবং মহাকাব্য দুটিতে নিহিত; অথবা বলা চলে, মুখে মুখে প্রচলিত গাথা-ও-সুভাষিতের একটি লোকায়ত ধারা ছিল যার থেকে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মাণ্য সাহিত্য উভয়েই বস্তু আহরণ করেছে। ভর্তৃহরির নীতিশতক ও বৈরাগাশতক এই ভ্রাম্যমাণ তত্ত্ব-সাহিত্যের কাছে বিশেষ ঋণী, যদিও বৈরাগ্য শতক-এর উপরে বেদান্ত ও সন্ন্যাস-সাহিত্যের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। অপর কোটিতে আছে ক্লাসিকাল সাহিত্য, যার মধ্যে শৃঙ্গাররসের প্রাবল্য। এদের উপরে কামশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্রও অলংকার শাস্ত্র-এর (বিশেষত, উজ্জ্বলনীলমণি জাতীয় শাস্ত্রের) প্রভাব খুবই স্পষ্ট; শৃঙ্গারশতক ও ভাবশতক এগুলির দ্বারা প্রভাবিত।

মহাকাব্যের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখি কালিদাসের পরে আড়াইশো বছরের মধ্যেই প্রধান মহাকাব্যগুলির অধিকাংশই রচিত হয়েছিল। কালিদাস খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকের; তার অর্ধশতাব্দীর কিছু পরে, ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি ভারবি। তার কিরাতাজুলীয় রচনা করেন। দক্ষিণে সিংহলে ওই সময়েই কুমারদাস তাঁর জানকীহরণ রচনা করেন, (৫১৭-২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে)। ভর্তৃমেন্ঠের নির্দিষ্ট যুগ ঠিক জানা যায় না, তবে মনে হয় এরই কিছু আগে বা পরে তিনি হয়গ্রীববিধ রচনা করেন। ভট্টির যুগ ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের পরে নয়, কাজেই এদের কিছু পরে তিনি তাঁর রাবণবধ রচনা করেন। রাজা বর্মলাতের রাজত্বকালে মাঘের বিকাশকাল; শেষ বর্মলাত ৬২৫ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি, কাজেই সপ্তম শতকের প্রথমার্ধেই মাঘ তাঁর শিশুপালবধ রচনা করেন। এই সব কবির মধ্যে যোগসূত্র একটিই; এরা সকলেই মহাকাব্যের মুখ্যধারার অন্তর্গত, অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজের নিজের শক্তি অনুসারে

কালিদাসের বা তার পরবর্তী ও নিজের পূর্ববতী কোনও মহাকবির অনুকরণ করেছে। এদের সিদ্ধি ও ব্যর্থতা নির্ভর করেছে তাদের প্রেরণা ও কলাকুশলতার উপরে, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক ছিল: রাজসভার কাব্যের যে মুখ্য ধারাটি তৎকালীন বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত ছিল সেই ধারাতে রচনা করা।

এই শ’ দেড়েক বছরের অনুকরণের শেষ পর্যায়ে এটা প্রতিপন্ন হল যে মহাকাব্য রচনার জীবনীশক্তি কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে নিঃশেষিত। সিদ্ধি নিতান্তই সীমিত হয়ে পড়ল, ফলে অনুকরণ স্পষ্টতর ভাবে প্রকট হয়ে উঠল। কবিরা উত্তরোত্তর অলংকার, দুরূহ প্রতিশব্দ ও আঙ্গিকবাহুল্য ও বাহ্য জটিলতার আশ্রয় নিতে লাগলেন, বিবিক্ষিতকে ভঙ্গীভণিতার দ্বারা আচ্ছন্ন করাই রীতি হয়ে উঠল। যে কোনও আঙ্গিকের কাব্য একবার প্রবর্তিত হলে তার থেকে সম্ভাব্য রসের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত নিংড়ে নিয়ে তবে তাকে বর্জন করা হয়; অর্থাৎ ভঙ্গির বিকল্প উপস্থাপিত করে যথাসাধ্য তাকে সরল করে পরিবেশনার দুশ্চেষ্টা চলতে থাকে যতক্ষণ না কবি ও শ্রোতার কাছে তার নিঃশেষিত জীবনীশক্তি পীড়াদায়ক ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ভাবে নানা আঙ্গিকের মকরধ্বজ ও মৃতসঞ্জীবনী সেবন করিয়ে দ্বাদশ শতকে শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত পর্যন্ত চলল। কবির অভাবে কবিযশঃপ্রার্থীরা চেষ্টা করে গেছেন তার পরেও, কিন্তু সে চেষ্টা নিরতিশয় ব্যর্থ বলে আর তেমন স্বীকৃতি পায়নি বিদ্বৎসমাজে। কিন্তু মাঘের সময়েই মহাকাব্যের প্রাণরস বিশুষ্কপ্রায় এবং সহৃদয় পাঠক কাব্যরসের প্রত্যাশায় আর মহাকাব্যের দিকে তাকাননি। তখন কিছু কবিত্বশক্তি যাদের ছিল তারা আঙ্গিক ও কাব্যধারার নূতন উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হলেন।

এই যুগসন্ধিক্ষণে বাণভট্ট দেখা দিলেন। কাব্যদিগন্তে। বাণের পূর্বেও গদ্যসাহিত্য রচিত হত। কিন্তু বাণের হাতে গদ্য এমন এক পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করল যে সে ধারায় নতুন কিছু উদ্ভাবন করা আর যেন সম্ভব রইল না।

বাণের পরবর্তীরা যেন গদ্যে আর নতুন কিছু পরিবেশন করার অবকাশই পেলেন না–বাণের হাতে গদ্য এত পরিপূর্ণ ও রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছিল। বলে। বাণের গদ্যে যতই কৃত্রিমতা, দীর্ঘসমাস, দীর্ঘবন্ধ, দুরূহ প্রতিশব্দ ও অলংকারাবাহুল্য থাক না কেন, তিনি যে এক নতুন ভঙ্গির পথিকৃৎ এবং তীর্থংকর তাতে কোনও সংশয় ছিল না। ফলে শক্তিমান কবিরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অন্য ভঙ্গি, ধারা ও আঙ্গিক উদ্ভাবনের জন্যে। এই সময় অলংকারুশাস্ত্র-এর বিকাশেরও যুগ। আলংকারিকরা ক্রমশই গুরুভার অলংকৃত শৈলীর পক্ষপাতি হতে থাকেন। দণ্ডী, বামন, ভামহ, রুদ্রট–এরা পরপর আবির্ভূত হন। এবং অলংকারের অসংখ্য বৈচিত্র্য ও প্রকারভেদ স্বীকৃত হতে থাকে। মহৎ কাব্যসৃষ্টির যুগহয়তো সম্ভাবনাও— যেন ক্রমে অন্তর্হিত হয়ে গেল। কাব্য অন্তরঙ্গ থেকে বহিরাঙ্গে নিষ্ঠা দেখাল। অভিজ্ঞতা, জীবনবোধের চেয়ে সমাস ও অলংকৃত বাগভঙ্গি প্রাধান্য পেল। মুখ্য মহাকাব্য দুটির পরের কাব্যেও স্থানে স্থানে বৈশিষ্ট্য ও কাব্যগুণ দেখা দিয়েছিল; রোমান্টিক গদ্যও স্বল্পকালের জন্য পাঠককে চকিত করে অন্তর্হিত হল।

সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যে শতককাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ। প্রধান শতক কাব্যগুলির যুগ শেষ হলে কিছুকাল যেন নতুন কোনও ধারার সম্ভাবনা পর্যন্ত দেখা যায়নি; এই সময়ে চম্পূর বিকাশ। চম্পূর তবু স্বীকৃতি ছিল অলংকারশাস্ত্রে; দণ্ডী বলছেন ‘গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিতাভিধীয়তে— গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে যে বীক্য তাই চম্পূ।’ দশম শতকে ত্রিবিক্রমভট্ট রচনা করেন নলাচম্পপু (৯১৫ খ্রিস্টাব্দ); সোমদেব রচনা করেন ফিশক্তিলকচাম্পূর্ণ (৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ)। এর পরেও কিছুকাল চম্পূ রচনা চলতে থাকে, কিন্তু সে সব রচনা সাধারণ, বৈশিষ্ট্যবর্জিত। চম্পূ কিন্তু কোনও দিনই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি, এর পরমায়ুও স্বল্পকালের; কিছুকাল পরেই চম্পূরচনা পরিত্যক্ত হয়। হয়তো এর গদ্যপদ্য সংমিশ্রণের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনও সাহিত্যিক যুক্তি ছিল

না, ছিল শুধু প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুকরণ। কারণ যাই হোক, চম্পূর নিজস্ব কোনও জীবনীশক্তি ছিল না, কোনও শক্তিমান কবিই এ ভঙ্গিতে রচনায় প্রবৃত্ত হননি।

সপ্তম থেকে দশম শতকের মধ্যে নতুন গোত্রের (genre) রচনার উদ্ভাবনে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলে; শতক, সপ্তশতী, পঞ্চাশিকা, চম্পূ এই সব তার ফসল। এগুলির সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টির জীবনকাল হ্রস্ব; কিন্তু তাঁর পরে বহুদিন ধরে চলে অনুকরণের যুগ–প্রেরণাহীন গতানুগতিক সৃষ্টি শুধু ভারাক্রান্ত করেছে সাহিত্যের ইতিহাসকে, সৎসাহিত্য দিতে পারেনি। কারণের সন্ধান করলে দেখি দশম-একাদশ শতকে, যখন থেকে নিষ্প্রাণ অনুকরণ চলতে থাকে–তখন থেকে কথ্যভাষায় সাহিত্যরচনার সূত্রপাত অপভ্রংশ ও কথ্যভাষার সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। কাজেই সংস্কৃত সাতিহ্য ধীরে ধীরে মজা নদীর খাতের মতো নীরস ও প্রাণহীন হয়ে গেল।

চম্পূর তুলনায় শতকের জীবনীশক্তি ও পরমায়ু দুই-ই বেশি ছিল। যে শতক কটি পাওয়া যায় সেগুলি পরস্পর থেকে ভিন্ন, কিন্তু কিছু কিছু সাধারণ চরিত্র সব কটিতেই আছে। মহাকাব্যের বিষয়বস্তু সম্ভবত নানা কারণে ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছিল, তাই খণ্ডকাব্যেই মনোনিয়োগ করলেন কবিরা। এগুলি মাঝে মাঝেই গীতধর্মী (লিরিক) ও রোমান্টিক। এ জাতীয় কবিতায় কবির ব্যক্তিগত আবেগ সহজে প্রকাশ পেতে পারে, যে-অবকাশ মহাকাব্যে ছিল না। শতক গোষ্ঠীর কাব্যই হোক বা সাধারণ স্তোত্র সাহিত্যই হোক, কবিরা প্রায়ই যেন উত্তমপুরুষে কথা বলেছেন, অন্তত বাণ ও ময়ূরের পর থেকেই। পুরাণের কাল থেকেই সাহিত্য ও সমাজে সাম্প্রদায়িক ও পারিবারিক দেবতার পূজা ও ব্যক্তিগত অর্থাৎ ইষ্টদেবতার বোধ ও পূজা দেখা দিয়েছিল; ফলে স্তোত্রসাহিত্যেও ব্যক্তিগত সুরটি লাগে— পুরাণ রচনার মধ্যযুগ থেকে অর্থাৎ

অষ্টম শতক থেকেই। মাতৃকা, দেবী, সূর্য, ইত্যাদির উপাসনার প্রবর্তন হয়, পূজার ব্যাপক প্রচলন হয় ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দী থেকে: দেবতা ও ভক্তের সম্বন্ধের মধ্যে ভক্তি, ব্যক্তিগত আনুগত্য, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর ইত্যাদি ভাবের স্পর্শ লাগে। ফলে যজ্ঞ ও গোষ্ঠীগত উপাসনার স্থানে পূজা ও ব্যক্তিগত নিষ্ঠা প্রাধান্য পাওয়াতে বৈদিক সুক্তের অপেক্ষাকৃত নৈর্ব্যক্তিকতার স্থানে ব্যক্তিগত সংরাগ দেখা যায় স্তোত্রসাহিত্যে। বাণ ও ময়ুর মাতৃকা ও সূর্যপূজার এই নবপর্যায়ের প্রথম উদগাতা। এঁরা দুজনেই যে সমৃদ্ধিশালী বর্ধনসাম্রাজ্যে আবির্ভূত হন তা আকস্মিক নয়; এদের যুগই এদের প্রবর্তনা দেয় শতককাব্য রচনায়। ধীরে ধীরে বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভগ্নদশায় নানা বিপর্যয় ও সামাজিক বিক্ষেপ এবং বিক্ষোভ দেখা দিল; বর্ধনপরবর্তী সাহিত্য তার চিহ্ন বহন করে, আর শতককাব্যও সে চিহ্ন বহন করে। অষ্টম শতকে অমরুতেই মনে হয় শতককাব্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, তার পরেই শুরু হয়ে যায়। উষর অনুকরণের যুগ। ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্লোকে এই মনোভাবের প্রকাশ, এ যেন সমাজের ব্যাপক সংহতির অভাবকেই প্রতিফলিত করে। বিষয়গাম্ভীর্য নেই, কাহিনির আন্তঃসংহতি নেই, অঙ্গরসের সঙ্গে অঙ্গরসের পরিপূণ-সম্পর্ক নেই, কাব্যব্যাপী একটি জীবনবোধ নেই, আছে শুধু বিচ্ছিন্ন একটি একটি উপলব্ধির চিত্রণ। পটও অপরিসর, সিদ্ধিও তেমনই। এই সময়ের মন্দির ভাস্কর্যের মতো মহৎ কোনও পরিকল্পনার স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বল্প-পরিসর চিত্র নিজ অপ্রশস্ত পরিসরে হয়তো সার্থক, কিন্তু সে এমন পরিসর যাতে মহৎ শিল্পের অবকাশ নেই।

কাব্যে অলংকারের সীমা

সংস্কৃত অলংকারসাহিত্যে নানা প্রস্থান; অলংকারের সংজ্ঞানিরূপণে এই প্রস্থানকর্তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ চোখে পড়ে। আপাত ভাবে সব প্রস্থানেরই লক্ষ্য হল কাব্যের আত্মার সন্ধান, অর্থাৎ ঠিক কোন বস্তুটি থাকলে কাব্য প্রাণ পায়, না থাকলে পায় না। কয়েকটি পরিচিত কাব্যসংজ্ঞা দিয়ে আরম্ভ করা যাক। প্রথম দিকের আলংকারিকদের মধ্যে অষ্টম শতকের বামন তার কাব্য লংকারগ্রন্থে কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন: রীতিরাত্মা কাব্যস্য–কাব্যের আত্মা হল রীতি।' (১:২:৬) নবম শতকে আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোক-এ বললেন: 'কাব্যসাত্মা ধ্বনিঃ–কাব্যের আত্মা হল ধ্বনি। (১:২) দশম শতকে কুন্তক তাঁর বক্রোক্তিজীবিত-এ বলছেন: 'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম–বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ।' ওই যুগেরই ক্ষেমেন্দ্র তাঁর ঔচিতাবিচারচর্চাগ্রন্থে বলছেন: 'ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম— রসসিদ্ধ কাব্যের স্থির প্রাণ হল ঔচিত্য।' (১:৫) চতুর্দশ শতকে বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যাদর্পণ গ্রন্থে বললেন: 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম–রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য।' (১:৩) তার অনেক পরে সপ্তদশ শতকে শেষ উল্লেখযোগ্য। আলংকারিক জগন্নাথ তাঁর রসগঙ্গাধর গ্রন্থের সূচনাতে বলেনরমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম— রমণীয় অর্থের প্রতিপাদন করে যে শব্দ তাই কাব্য।' তাহলে এ কািজন আলংকারিকদের সংজ্ঞায় রথাক্রমে রীতি, ধ্বনি, বক্রোক্তি, ঔচিত্য হল কানোর প্রাণ অথবা রসাযুক্ত বা রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক শব্দই কাব্য। এ পর্যন্ত সংজ্ঞা কটির মধ্যে অলংকরকে কেউই কাব্যের প্রাণ বা আত্মা বলেননি। তাহলে কাব্যে অলংকারের স্থান কোথায়? সপ্তম শতকের আলংকারিক দণ্ডী বলছেন: 'কাব্যশোভাকরান ধর্মানলংকারান প্রচক্ষতে— কাব্যের যে ধর্ম কাব্যের শোভা সৃষ্টি করে তাই অলংকার।' (কাব্যাদর্শ ২:১) আনন্দবর্ধন বলছেন:

রসবন্তি হি বস্তুনি সালংকারাণি কানিচিৎ।

প্রায়েণৈব পরাং ছায়াং বিভ্রাল্লক্ষ্যে নিরীক্ষতে।।

অর্থাৎ, কোনও কোনও রাসযুক্ত কাব্যবস্তু অলংকৃত হয়ে প্রায়ই উৎকৃষ্ট কান্তি ধারণ করে কাব্যে লক্ষিত হয়। (২:১৭:১)

কুন্তক বলছেন:

উভাবেতাবলংকার্যে তয়োঃ পুনরলংকৃতিঃ।
বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে।

শব্দ এবং অর্থ এ দুয়েরই অলংকরণ প্রয়োজন। এদের মধ্যে কুশল ভঙ্গির উক্তি যে বক্রোক্তি তা-ই অলংকার। (১:১০)

একাদশ শতকে মৰ্ম্মট তার কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে বলেন:

উপকুর্বন্তি তং সন্তং যে অঙ্গদ্বারেণ জাতুচিৎ।
হারান্দিবদলংকারাস্তো নুপ্রাসোপমাদয়ঃ।।
অর্থাৎ, কাব্যের যে প্রাণ বিদ্যমান তাকে অঙ্গরূপে। কখনও কখনও হার ইত্যাদির মতো যা অলংকৃত করে সেই অনুপ্রাস উপমা ইত্যাদিই অলংকার। (৮:৬৭)

এই মৰ্ম্মটই যঃ কৌমারহরেঃ, ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলছেন 'অত্র সম্মুটোং কশ্চিন্দল কারঃ/রসসৈব্য প্রাধান্যান্নালংকারঃ–এখানে স্পষ্ট কোনো অলংকার নেই; রিসের প্রাধান্যের জন্যেই অলংকার নেই।' ক্ষেমেন্দ্রও অলংকারকে প্রাধান্য দেননি, বলেছেন:

কাব্যস্যালমলংকারৈঃ কিং মিথ্যাগণিতৈঃ গুণৈঃ।
যস্য জীবিতমৌচিত্যং বিচিন্ত্যাপি ন দৃশ্যতে।

জগন্নাথের কাব্য সংজ্ঞার ওপরে নাগেশভট্ট বলছেন, লক্ষণে গুণালংকারাদিনিবেশোপিন লক্ষ্যতে, বস্তুলংকারপ্রধানানাং কাব্যানামাকাব্যত্বাপত্তঃ–রসগঙ্গাধর যেখানে রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক শব্দাবলীকে কাব্যসংজ্ঞা দিলেন সেখানে গুণ বা অলংকগরেব উল্লেখই নেই (কারণ) যে কাব্যে বস্তু ও অলংকার প্রধান তা হল অকাব্য।' অন্যত্র অলংকারের প্রসঙ্গে নাগেশ বলেন, 'প্রাগভিহিতলক্ষণস্য কাব্যসাত্মনো ব্যঙ্গ্যাস্য রমণীয়তাপ্রয়োজকা অলংকার নিরূপ্যন্তে—-অর্থাৎ ব্যঞ্জনালভ্য যে কাব্যের আত্মা অলংকারসমূহ তার রমণীয়তা বিধান করে। বিশ্বনাথ বলেন:

শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ।

রসাদীনুপকুর্বান্তোলংকারাস্তে অঙ্গদাদয়ঃ।।

অর্থাৎ, শব্দার্থের শোভাসমৃদ্ধ যে অস্থির ধর্ম রস ইত্যাদির উপকার করে, তা হল অঙ্গদ ইত্যাদির মতো অলংকার। আনন্দবর্ধন ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাকে কাব্যের প্রাণ বলে অভিহিত করেছেন, সেই ধ্বনিপ্রধান কাব্যে অলংকারের স্থান নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন,

অপৃথগযত্ননির্বর্তঃ সোলংকারো ধ্বনৌ মতঃ।।

ধ্বনিকাব্যের সেই অলংকার পৃথক কোনও চেষ্টার দ্বারা নিষ্পন্ন হবে না, অর্থাৎ সে অলঙ্কার আসবে অনায়াসে, তাকে সৃষ্টি করতে বা অনুধাবন করতে কোনও স্বতন্ত্র প্রয়াসের প্রয়োজন হবে না। (২:১৬) তিনি আরও বলেছেন:

মুখ্যা মহাকবিগিরিমলংকৃতিভুতামপি।

প্রতীয়মানচ্ছায়ৈষা ভুষা, লজেব যোষিতম।

অলংকারযুক্ত যে মহাকবিদের সৃষ্ট কাব্য তার মধ্যেও এই রাসাধ্বনিই হল

মুখ্য একটি প্রতীয়মান কান্তি, তা-ই অলংকার, যেমন লজ্জা রমণীর ভুষণ। (৩:৩৭)

তাহলে দেখছি ব্যঞ্জনা এবং রসাধ্বনি যখন থেকে কাব্যে প্রাণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে তখন থেকেই অলংকার গৌণ হয়ে গেছে। প্রথম যুগের আলংকারিকরা ভামহ, বামন, উদ্ভট, রুদ্রট–এরা কাব্যে অলংকরকে যত মর্যাদা দিয়েছেন। পরবর্তী কালের আলংকারিকরা, বিশেষত আনন্দবর্ধনের পর থেকে যাঁরা প্রখ্যাত প্রস্থানকৃৎ যাঁরা তাঁরা অলংকরকে সেই মর্যাদা আর দেননি। শুধু তাই নয়, রীতি, বক্রোক্তি, ঔচিত্য, ধ্বনি, রস, ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুকে আলংকারিকরা কাব্যের আত্মা বলেছেন, একমাত্র অলংকরকেই কেউ তা বলেননি।

পাশ্চাত্য আলংকারিকদের কয়েকজনের কথা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের সিসেরো কাব্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক যে চারটি গুণের কথা বলেছেন তা হল Coorectness বা দোষরাহিত্য, clarity বা প্রসাদগুণ, propriety বা ঔচিত্য এবং ornamentation বা অলংকার। অলংকারের মধ্যে তিনি রূপককেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি অলংকরকে কাব্যে একপাদ রূপে স্বীকার করলেন। তার কয়েক বছর পরে এপল্লোডোরস অব পের্গামীম, অলংকার সম্বন্ধে আলোচনা করে বললেন এ হল incomprehensibilia, সংস্কৃতে যাকে বলা হয়েছে, ‘অনন্তা হি বাগবিকল্পস্তৎপ্রকার এবং ংকারাঃ–বাক্যের (বা সাহিত্যের) বিকল্প অনন্ত, তার মধ্যে একটি বিকল্প হল অলংকর।’ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের কবি ডিওনিসিস অব হালিকার্নেসস কাব্যের অপরিহার্য গুণের প্রসঙ্গে বলেছেন সেগুলি হল melos (মাধুর্য), rhythmos (ছন্দোময়ত), metabole (বৈচিত্র্য বা বিস্থিতি) আর to prepon (ঔচিত্য) । ইনি সঙ্গে kalon (সৌন্দর্য) ও Hedone (আকর্ষণী শক্তি-র কথাও বলেছেন; এগুলি সৃষ্ট হয়। কাব্যে ঐ

চারটি থাকার ফলে। লক্ষণীয়, দিওনিসিস অলংকারের উল্লেখই করেননি। প্রায় দেড়শো বছর পরে কুইন্টিলিয়ান বললেন schema হল dianolia বা চিন্তাগত বস্তুর Trope পরিবর্তনবিন্দু, আর iexis বা শব্দাবলীরও একটা পরিবর্তনবিন্দু যা জাগতিক সত্যের (বা তথ্যের) অনুরূপ নয়। অর্থাৎ, কাব্যের শব্দ এবং অর্থ (চিন্তাগত বস্তু-র মধ্যে এক সময় বাস্তব থেকে সরে যাওয়ার যে মুহূর্তটি–যা আসে কাব্যে শোভাসম্পাদন করার জন্যে) তাই হল অলংকার। লক্ষ্য করলে দেখি diamojia-তে অর্থালংকার ও lexis-এ শব্দালংকার স্বীকৃতি পেল, আর বাস্তব থেকে সরে যাওয়ার ব্যাপারে স্বীকৃতি পেল ভঙ্গীবাণিতি বা বক্রোক্তি। এরও কিছু পরে লঙ্গিনস On Sublimity নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বললেন কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে hypsos বা চমৎকারিত্বের উপরে এবং সেটির মুলে পাঁচটি গুণ : thought (চিন্তা); emotion (আবেগ); figures, (অলংকার); diction, (শব্দসম্ভার) এবং exalted composition (উচ্চগ্রামে রচনা)। এগুলির মধ্যে প্রধান হল চিন্তা ও আবেগ ; অতএব গৌণ হল অলংকার।

তাহলে দেখছি অলংকার যে কাব্যের বহিরঙ্গ তা নিয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে মতভেদ নেই; যদিও অন্তরঙ্গ কী তা নিয়ে, অন্তত আপাতেদাদৃষ্টিতে, মতানৈক্য আছে। এ দেশে আমরা বলেছি, অলংকার রসকে সাহায্য করতে পারে তার পরিপূর্ণ বিকাশে: রসাদুনীপকুর্বন্তঃ', কিংবা কাব্যাত্মনো ব্যঙ্গস্য রমণীয়তাপ্রযোজকাঃ' অথবা 'কাব্যশোভাকরা ধর্মাঃ'। কিন্তু রসকে থাকতে হবে আগে, তং সন্তম, তবে তো উপকুর্বন্তি'। এবং সেও 'অঙ্গদ্বারেণ, কারণ অঙ্গী তো রস; এবং তাও জাতুচিৎ' কখনও কখনও। অর্থাৎ কাব্যের আত্মার অপেক্ষায় গৌণ অলংকার–তার অধীন। অলংকারের উপযোগিতা অপরিহার্য নয়, কাব্যে তার সত্তা বা অধিকার আপেক্ষিক, একান্ত নয়। মর্ম্মট তার কাব্যপ্রকাশ-এ বলছেন, তদন্দোষে শব্দার্থৌ সগুণাবানলংকৃতী পুনঃ কপি।'

(১:৪) অতএব দো‍ েষরহিত শব্দ ও অর্থ যা গুণযুক্ত, কিন্তু কখনও কখনও অলংকৃত, তাই কাব্য। আগেই দেখেছি জগন্নাথ তাঁর কাব্যসংজ্ঞা-য় অলংকারের উল্লেখই করেননি। এ প্রসঙ্গে টীকাকার নাগেশভট্ট বলছেন, ‘কাব্যানামাকাব্যত্বাপত্তেঃ’; বস্তু বা অলংকার যে কাব্যে প্রধান তা কাব্যই নয়, তা হল অকাব্য। যাঃ কৌমারহরঃ’ শ্লোকটিতে অলংকার না থাকার প্রসঙ্গে নাগেশ বলছেন ‘রসস্যৈব প্রাধান্যান্নালংকারঃ’, অর্থাৎ রসেরই প্রাধান্য থাকার ফলে অলংকার নেই। জগন্নাথ বলছেন, ‘কাব্যাত্মনো ব্যঙ্গ্যাস্য রমণীয়তাপ্রযোজক অলংকারাঃ’, ব্যঞ্জনায় যে রসকে পাওয়া যায় তা-ই কাব্যের আত্মা আর সৌন্দর্যবিধান করতে পারে অলংকার; অর্থাৎ রস না থাকলে অলংকার সম্পূর্ণ নির্ম্মফল। তাহলে অলংকার কাব্যের বহিরঙ্গই শুধু নয়, তা স্থানবিশেষে পরিহার্য; কাব্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক নয়, এ কথা ভারতীয় অতিমালংকারিকরা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে গেছেন। মর্ম্মট তো কাব্যের সংজ্ঞাতেই ‘অনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি’ বলেছেন।

এ প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য হল অলংকার কাব্যের কতটা শোভা সম্পাদন করতে পারে, কখন পারে, কখন পারে না। খুব সাধারণ একটা শ্লোক ধরা যাক: রঘুবংশ-এ দিলীপ ও সুদক্ষিণা রথে করে কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে চলেছেন, কালিদাস বর্ণনা করছেন:

কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীদ ব্রজতোঃ শুদ্ধবেষয়োঃ।
মেঘনির্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব।
শুদ্ধবেশ এই রাজদম্পতির যাত্রাকালে কি শোভাই না হয়েছিল, যেন নির্মেঘ আকাশে চিত্রনক্ষত্রসমেত চন্দ্র। (১:৪৬)

উপমা অনুষঙ্গের দ্বারা পাচ্ছি। ঊর্ধ্বলোকের ব্যঞ্জনা, নিত্যামিলিত একটি দম্পতির ব্যঞ্জনা এবং উজ্জ্বল দুটি জ্যোতিষ্কের গৌরব। শোনা যায় উপমা

কালিদাসস্য, তার অর্থ এই নয় যে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য কালিদাসে অন্য কবিদের চেয়ে বেশি; তার অর্থ কালিদাসের উপমা অভিধাগত আক্ষরিক বিবক্ষিত বিষয়ের গৌরবকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জনার দ্বারা একটি অতিরিক্ত গৌরবের মাত্রা লাভ করে। অন্য দিকে ভারবির কিরাত জুনীয়-তে সেই বিখ্যাত শ্লোকটি দেখা যেতে পারে:

উৎফুল্লীস্থল কমলিনীবনাদমুষ্মাদুর্দ্ধতঃ সরসিজসম্ভবঃ পর্যাগঃ।
বাত্যাভিবিয়তি বিবর্তিতঃ সমস্তাদাধিত্তে কনকময়াতপত্র শোভাম।
সংক্ষেপে অর্থ হল, প্রবল বাতাসে স্থলপদ্মের বন থেকে পুস্পরেণুমণ্ডলাকারে আবর্তিত হয়ে যেন স্বর্ণচ্ছত্রের শোভা ধারণ করছে। (৫:৩৯)

এখানে বিষয়গৌরব যৎসামান্য, তার ওপরে অলংকারে কষ্টকল্পনা, তাই এর দ্বারা কবি ‘ছত্রভারবি’ সংজ্ঞা লাভ করলেন, কিন্তু এটা সৎকাব্য হয়ে উঠল না।

অনেক আগের যুগে ফিরে গেলে ঋগ্বেদ-এ অলংকার প্রয়োগের একটা অন্য যুগ পাই। ঊষার বর্ণনা করছেন কবি; মাতৃমুষ্টের যোষা, যে মেয়েটির দেহ তার মা যত্ন করে মার্জনা করে দিয়েছেন তার মতো। এখানেও স্নেহ কমনীয়তা আদর সবই উপমায় ধ্বনির দ্বারা এসেছে। বেদের উপমায় অন্য এক ধরনের বলিষ্ঠতাও দেখি:

যথা বিদ্যুদ্ধতো বৃক্ষ আমূলান্দনুশুষ্যতি।
এবং স প্রতিশুষ্যতু যো মে পাপং চিকীর্ষতি।।
যেমন বাজপাড়া গাছ মূল থেকে শুকিয়ে ওঠে তেমনই করেই সে শুকিয়ে উঠক যে আমার অনিষ্ট করতে চায়।

দেবতার বর্ণনা, মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠা–প্রবল পাহাড়ি জন্তুর মতো'। ঊষা পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করুক; 'জায়েব পত্যে উশতী সুবাশঃ–যেমন কামনাবতী সুসজ্জিতা বধু তার স্বামীর কাছে নিজেকে প্রকাশ করে।' (১:১২৪:৭) শক্তির প্রকাশ একটি উষস-সূক্তে কী প্রবলভাবেই না। আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি বলতে চান প্রত্যেক ঊষাই মানুষের পরমায়ু একদিন করে নাশ করে দেয়; ঊষা নিজে চিরতরুণী অথচ মানুষকে সে জরা, অক্ষমতার দিকে ঠেলে দেয় প্রতিদিন, যেমন করে ব্যাধস্ত্রী পাখি ধরে তার ডানাদুটো ছিঁড়ে দেয়: শ্বঘ্নীব কৃতুর্বিজ। আমিনানা। (১:৯২°১০)

এ সব জায়গায় অলংকার কাব্যার্থের গৌরব বৃদ্ধি করে, ব্যঞ্জনার দ্বারা অভিপ্রেত আবেগটিকে তীক্ষ্ণতর করে প্রকাশ করে–লক্ষণীয় বেদে শতকরা নকবইটি অলংকারই উপমা। কাজেই অলংকার এখানে কাব্যশোভাকর ধর্ম। কিন্তু মনে রাখতে হবে মূল আবেগটি নিজের জোরে অভিভূত করবার ক্ষমতা রাখে বলেই অলংকার তার প্রকাশকে তীক্ষ্মতর করে তুলতে পারে, তং সন্তং। রসটি খাঁটি বলেই রসাদীনুপকূর্ষন্তি।

আদি মহাকাব্য দুটিতেও মাঝে মাঝে এমন শক্তিশালী অলংকারের দেখা পাওয়া যায়। রাবণ সীতাকে হরণ করবার সময়ে তাকে নিজের পট্টমহিষী করবার লোভ দেখায়, তুচ্ছ মানুষ রামের চেয়ে সে কত প্রতাপশালী তা বলে তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে; তখন সীতা বলেন:

আশীবিষ্যস্য বদনাদ দ্রংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি।
মন্দরং পর্বতশ্রেষ্ঠং পাণিনা হতুমিচ্ছসি।।
কালকূটং বিষং পীত্ব স্বস্তিমান গন্তুমিচ্ছসি।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যামধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি।।

সাপের মুখ থেকে দাঁত তুলে নিতে চেষ্টা করছ, হাত দিয়ে পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দিরকে তুলতে চাইছ, কালকূট বিষ পান করে স্বস্তিতে চলে যেতে চাইছ (ঠিক এই রকমই ব্যাপার হল) রামের প্রিয়বন্ধুকে তুমি অধিকার করতে চাইছ। (অরণ্যকাণ্ড ৪৭:৩৯-৪০)

এখানে অলংকার শক্তিশালী করে তুলছে রাবণের সম্বন্ধে তার প্রগাঢ় অবজ্ঞাকে এবং রামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাসকে। প্রকরণের মধ্যে এ আবেগ দুটি না থাকলে শুধু উপমায় তা আসত না।

মহাভারত-এ কাব্যগুণে অলংকারের স্থান নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি; তারই দু-একটি ব্যবহার করা যেতে পারে। ভীষ্ম শিখণ্ডির আড়াল থেকে অর্জুনের শরনিক্ষেপে বিদ্ধ হয়ে বলছেন :

অর্জুনস্য ইমে বাণা নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ।

কৃন্তন্তি মম গাত্রাণি মাঘমাং সেগাইব।
এ বাণ ত শিখণ্ডির নয় এ অর্জুনের, এ আমার দেহ ভেদ করে আসছে, কাঁকড়াবিছের ছানা যেমন মায়ের দেহ কুরে কুরে খায়! (১২:১১৯:৬৫ বঙ্গবাসী সংস্করণ)

এটা জনশ্রুতি: কিন্তু উপমার শক্তি তার গভীর ব্যঞ্জনায়: ভীষ্মের সঙ্গে শিখণ্ডির কোনও সম্পর্ক নেই; অর্জুন অপত্যস্থানীয়, তাই অর্জুনের শরে যে মরণান্তিক যন্ত্রণা সে হল অপত্যধর্ম পদদলিত হওয়ার যন্ত্রণা, মৃত্যু যন্ত্রণার চেয়েও তা মর্মন্তুদা। বেদ-এ, রামায়ণ-মহাভারত-এর শ্রেষ্ঠ অলংকারগুলি গভীর হৃদয়াবেগকে গভীরতর করে প্রকাশ করেছে। রসকে সমৃদ্ধ করেছে, সে রস আগে থেকেই, প্রকরণেই ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে। অলংকার রসকে সৃষ্টি করেনি।

কালিদাসের সাহিত্যে অলংকারের সার্থক প্রয়োগ অগণিত। একে তো কবির অলংকার-প্রয়োগ সম্বন্ধে সহজাত সংযম আছে, কোথাও আতিশয্য নেই, তার ওপরে কোথায় কোন অলংকারটি কতটা উজ্জ্বল করে তুলবে বক্তব্যকে, সমৃদ্ধ করবে। রসকে এ সম্বন্ধে তাঁর অভ্রান্ত একটি বোধ সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। সীতাকে বনে বিসর্জন দিয়ে এসে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে খবর দিলেন:

বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পস্তুষারবর্ষীবি সহস্য চন্দ্রঃ।

লোকপবাদেন গৃহান্নিরস্তান তেন বৈদৌতীসুতা মনস্তাঃ।।

হঠাৎ রামের দু চোখে জল ভরে এল যেন পৌষ মাসের চন্দ্র হিম বর্ষণ করছে; লোকপবাদে তিনি সীতাকে গৃহ থেকেই নির্বাসন দিয়েছিলেন, মন থেকে দেননি। (রঘুবংশ ১৪:৮৪)

এখানে চোখে হঠাৎ জল ভরে আসায় পৌষের ঝাপসা চাদের উপমানে রামচন্দ্রের মুখকান্তি এবং অশ্রুভরাতুর নেত্র দুটির সাদৃশ্যই শুধু নেই, শীতের রাতের আকাশে এক নীরব চাঁদের ওপরে একটা হিমেল আচ্ছাদন সহসা এসে পড়ার মধ্যে গোপন শোকের নীরব প্রকাশের ব্যঞ্জনাটিও আসছে। আরও লক্ষ্য করলে দেখি এ শ্লোকের অন্তর্নিহিত গভীরতর কবিত্ব কিন্তু এর অনলংকৃত শেষার্ধে যত উপমাসসম্বলিত প্রথমার্ধে তত নয়।

ম্যাকবেথ নাটকে যখন ম্যাকবেথ লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যুসংবাদ শুনলেন তখন প্রথমে একটি সহজ উক্তি করলেন She should have died hereafter/There would have been time for such a thing। কিন্তু মৃত্যু তো মানুষের সময় সুবিধা বুঝে আসে না, তাই হঠাৎ ম্যাকবেথের মনে হল দিনের পরে দিন যত পেরিয়ে যাচ্ছে মানুষ অনিবার্য ভাবে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। যেন একটা মধ্যযুগীয় পুরনো প্রাসাদের সিঁড়ি দিয়ে মোমবাতি হাতে নিয়ে কেউ দোতলার শোবার ঘরের দিকে উঠছে। নিচের সিঁড়িতে ছায়া

দীর্ঘতর হচ্ছে, সে তার অতীত দিনগুলো: ওপরের সিঁড়িগুলো, মায়াবী ভবিষ্যতের দিনগুলো, যেগুলো একে একে পেরোলে শেষে ক্লান্ত মুখটা পৌঁছবে তার মহানিদ্রার শয়নকক্ষে। নিভে যাবে। বাতিটা, জীবন তো একটা চলন্ত ছায়ামাত্র, একটা ছোটখাট ভূমিকার নট মঞ্চে প্রচুর আস্ফালন করে সহসা মিলিয়ে যায় নেপথ্যে। একটা জরদা্িগবের মুখে বলা একটা গল্প তাতে কত না। আস্ফালন, কিন্তু আসলে সে গল্পটা সম্পূর্ণ নিরর্থক। এ বর্ণনায় পদে পদে উপমা এবং অতি সার্থক উপমা, জীবনের নিঃসা্িরতা প্রতিপাদন করে মৃত্যুর অনিবার্যতার পটভূমিকায়। এমনই আর একটি দীর্ঘ স্বগতোক্তি হ্যামলেটের; তারও শুরুতে নেহাৎ আটপৌরে একটা মৌলিক প্রশ্ন: to be or not to be, that is the question—তার পরে দীর্ঘবিলম্বিত স্বগতোক্তি; উপমাশ্রেণির মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হচ্ছে জীবনের আত্যন্তিক নিরর্থকতা। কিন্তু মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে শেক্সপীয়র কত অনলংকৃত ভাষায় বলছেন; হ্যামলেট বন্ধু হোরেশিওকে বলছেন, যদি আমাকে ভালবেসে থাকে, বন্ধু কয়েকটা দিন উৎসব থেকে সরে থেকে, এই কঠোর সংসারে কষ্টে শ্বাস নিতে নিতেই বোলো আমার কাহিনি। কোনও অলংকার নেই। তেমনই কিং লীয়ার-এ প্রিয়কন্যা কর্ডেলিয়ার মৃত্যুর পরে লীয়ার বলছেন: কেন একটা কুকুর, একটা ঘোড়া একটা ইদুরের প্রাণ থাকবে, অথচ, কেন তোমার একটু নিঃশ্বাসবায়ু জুটবে না। আরও কম শক্তিমান নাট্যকার ওয়েবস্টা্েরও তাঁর ডাচেস অব মালফি নাটকে নিজের ষড়যন্ত্রের ফলে মৃত বোনের দেহের সামনে দাঁড়ানো ভাইকে দিয়ে বললেন: ‘ঢেকে দাও ওর মুখ, আমার চোখে সইছে না, বড় অল্প বয়সে মৃত্যু হল ওর।’

কালিদাস বিরহের কাব্য রচনা করেছেন নানা স্থানে। প্রথম দিকের রচনা কুমারসম্ভব-এ রতি বিলাপ করছেন মদনের মৃত্যুর পরে; সে বিলাপে কত অলংকারী:

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদা পতিবর্ত্মগা ইতি প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি।।
চাঁদের সঙ্গেই জ্যোৎস্না মিলিয়ে যায়, মেঘের সঙ্গে বিদ্যুৎ, নারী যে পতিপথগামিনী এ তো অচেতনারাও প্রতিপন্ন করেছে। (কুমারসম্ভব ৪:৩৩)

কিংবা, মদন তুমি চলে গেছ–নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃসেতু ভেঙে গিয়ে জলপ্রবাহ এসে যেমন করে পদ্মিনীকে ভাসিয়ে দেয়, তেমনই করেই। পুরুষের লেখনীতে নারীর বিরহের বর্ণনা, খাঁটি সুরটি যেন বাজেনি, যেমনটি বেজেছে পরিণততর রচনা রঘুবংশ-এ অজবিলাপে। কোথায় অলংকার সেখানে?

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং কিং ন মে হৃতম।।
সদ্যোমৃত বধূ ইন্দুমতীর উদ্দেশে অজ বলছেন, '(তুমি ছিলে) গৃহিণী, সচিব, গোপনের সখী, ললিতকলায় ছিলে প্রিয়শিষ্যা। নিষ্করুণ মৃত্যু তোমাকে হরণ করে কীই না। আমার নিয়ে গেল।' (রঘুবংশ ৮:৬৭)

এখানে সমস্ত কবিত্বটা ওই 'কিং ন মে হৃতম— এতেই আছে। আরও সহজ ভাষায় এই বিরহেরই বর্ণনা অজের মুখে:

ধৃতিরস্তমিত রতিশচ্যুযতা বিরতং গেয়মৃতুনিরুৎসবঃ।
গতমাভরণপ্রয়োজনং পরিশূন্যং শয়নীমদ্য মে।।
ধৈর্য শেষ হয়েছে, প্রেম নিরাশ্রয়, সংগীত থেমে গেছে, ঋতু উৎসববিহীন, অলংকারের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আমার শয্যা আজ শূন্য। (রঘুবংশ ৮:৬৬)

এরও আগে অজ বলছেন, 'ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধন রতিঃ–তোমার প্রতি আমার প্রেমেরই আসক্তি।' (রঘুবংশ ৮:৫২) এত স্বল্প কথায় নিরলংকর ভঙ্গিতে লিখতে পারেন। শুধুমাত্র মহাকবিরাই! কালিদাসে এটি বারেবারে দেখি: অলংকার-প্রয়োগে যিনি এত সিদ্ধহস্ত তিনিই আবেগের চরম মুহূর্তে সম্পূর্ণ নিরলংকার অভিব্যক্তির ওপরেই ভরসা রাখেন। সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফেরবার সময়ে রামচন্দ্র আকাশে রথ থেকে দেখাচ্ছেন নিচে অরণ্যবাসের স্মৃতিবিজড়িত অঞ্চলগুলি। সীতা নেই! অরণ্যে বর্ষা নেমেছে।

গন্ধশ্চ ধারাহতপল্বলানাং কাদমর্ধোদগত কেসরঞ্চ।
স্নিশ্বাশ্চ কেকাঃ শিখিনাং বভুর্বুর্যস্মিন্নাসহ্যানি বিনা ত্বয়া মে।।
পুকুরে বৃষ্টি পড়ছে তার গন্ধ, আধাফোটা কদমফুল, ময়ূরের স্নিগ্ধ কেক ধ্বনি–এ সবই এইখানে তোমার অভাবে আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল।
(রঘুবংশ ১৩:২৭)

কোনও অলংকারই নেই, কিন্তু বিরহের যন্ত্রণার তীব্রতা কত সহজে পৌঁছল পাঠকের মনে; অন্যান্য আবেগ ও রসেও এ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। রঘুবংশ-এরই চতুর্দশ সর্গে রাম-লক্ষণ-সীতা অযোধ্যায় ফিরেছেন, কৌশল্যা সুমিত্রা পুত্রের আদর্শনে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছিলেন (২য় শ্লোক), তাঁরা রামলক্ষ্মণকে কাছে পেয়ে রাক্ষসদের অস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন পুত্রদের অঙ্গে যেন এখনও (রুধিরে) আদ্র এমন কোমল ভাবে সে ক্ষতচিহ্নগুলি স্পর্শ করতে লাগলেন। ক্ষত্রিয়নারীর ঈপ্সিত বীরপ্রসবিনী সংজ্ঞাও আর তার কামনা করলেন না।'

তে পুত্রয়োনৈঋতশাস্ত্রমাগানাদ্রানিবাঙ্গে সদয়ং স্পশন্ত্যৌ।
অপীপ্সিতং ক্ষত্রকুলাঙ্গনানাং ন বীরসূশব্দমকামীয়েতমা।। (১৪:৪)

যা সব ক্ষত্রিয়নারীরই কাম্য সেই বীরপ্রসবিনী সংজ্ঞার জন্যে মর্মান্তিক মূল্য দিতে হয়েছে এ দুটি রাজবধুকে, চতুর্দশ বৎসরের অদর্শন, পুত্রদের সর্বাঙ্গে ক্ষত এবং তারা জীবিত অবস্থায় ফিরবেন কিনা সে বিষয়ে সুদীর্ঘকালের অনিশ্চয়, এ মূল্যে ওই সংজ্ঞা পেয়েছেন তারা; তাঁদের মনে হল এ অত্যধিক মহার্ঘ সংজ্ঞা।

বেণীসংহার বীররসের নাটক। সেখানে দেখি, যুধিষ্ঠির কৌরবদের প্রস্তাবে সন্ধি করতে উদ্যত জেনে ক্রোধে অধীর ভীমসেন বলছেন:

মহ্নমি কৌরবশতং সমরে না কোপাদ্দুঃশাসনস্য রুধিরং ন পিবাম্যুরাস্তঃ।
সঞ্চুর্ণয়ামি গদয়া ন সুযোধনোরু সন্ধিং করোতু ভবতাং নৃপতিঃ পণেন।।
আমি সক্রোধে শত শত কৌরব সৈন্যকে যুদ্ধে মন্থন করব না? দুঃশাসনের বক্ষ থেকে রুধির পান করব না? গদা দিয়ে দুর্যোধনের উরু দুটো চুর্ণ করব না? তোমাদের রাজা মূল্য দিয়ে সন্ধি করুন গিয়ে। (২:১৭)

এখানে ভীমসেনের সারা জীবনের ক্ষত্রিয়োচিত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার সব কটি স্বপ্ন যুধিষ্ঠিরের অক্ষত্রিয়সুলভ ক্ষমাবৃত্তির ফলে ব্যর্থ হতে চলেছে, উত্তাল হয়ে উঠেছে। বীরের হৃদয় চরম ব্যর্থতাবোধে, তাঁর অসহিষ্ণু ক্রোধের ও প্রতিহিংসার নগ্ন ও অত্যন্ত শক্তিশালী প্রকাশ এ শ্লোকে—এবং এই তীব্রতা শ্রোতা বা পাঠকের কাছে পৌঁছবার জন্যে কোনও অলংকারেরই প্রয়োজন হয়নি; কটি প্রশ্নই যথেষ্ট হল। অথবা অশ্বত্থামার সেই উক্তি:

যো যঃ শস্ত্রং বির্ভর্তি স্বভুজগুরুমদঃ পাণ্ডবীনাং চমূনাং
যে যঃ পাঞ্চালগোত্রে শিশুরাধিকবয়া গর্ভশয্যাং গতো বা।
যে যস্তৎকর্মসাক্ষী চরতি ময়ি রণে যশচযশ্চ প্রতীপঃ
ক্রোধান্ধস্তস্য তস্য স্বয়মিহ জগতামন্তকস্যান্তকোহম।।

নিজের বাহুবলের গর্বে অতিশয় গর্বিত পাণ্ডবপক্ষে যে যে অস্ত্রধারণ করছে, পাঞ্চালগোত্রে যে যে শিশু, বৃদ্ধ বা মাতৃগর্ভস্থও (ভ্রুণের আকারেও) আছে, আমার পিতার বধের যে যে সাক্ষী আছে, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করছি এখনও প্রতিযোদ্ধা। যারা আছে–ক্রোধে অন্ধ আমি তাদের সকলের, এমনকী স্বয়ং মৃত্যুরও, (আজি) হত্যাকারী। (৩:৩২)

পিতৃবধের ক্ষোভে ও নিরুপায় যন্ত্রণায় উন্মত্ত অশ্বত্থামার প্রচণ্ড ক্রোধ ও বিধ্বংসী প্রতিহিংসার এই জ্বলন্ত প্রকাশের জন্যে কোনও অলংকারের প্রয়োজন হয়নি, রসোত্তীর্ণ অভিধাগত অর্থই পর্যাপ্ত মনে হয়েছে কবির।

প্রিয়জন প্রিয় হয় প্রিয়কাজ করে বলে নয়, এমনিই হয়। উত্তরামচরিত-এ দু'বার শুনি কথাটা:

অকিঞ্চিদপি কুর্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখানপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ।। (২:১৯, ৬:৫)
কিছু না করেই আনন্দ দিয়ে দুঃখ দূর করে; যে যার প্রিয়জন সে যে তার কী বস্তু।

সমস্ত কবিত্বটাই আছে ওই অনির্বচনীয় কিমপি দ্রব্যম এর মধ্যে। যে যার প্রিয়জন সে যে ঠিক তার কী তা উচ্চারণ করে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করে বলা যায় না–কবির অভিপ্রেত ভাবের গাঢ়তা এরই মধ্যে বিধৃত। এমনই আর একটি উদাহরণ পাই ওই নাটকেই রামচন্দ্র যখন সীতাকে বনে বিসর্জন দিয়ে জনস্থানের অরণ্যে একাকী ভ্রমণ করছেন, তখন বাসন্তী তাঁর ক্ষত থেকে পুনর্বারা যেন রক্তক্ষরণের ব্যবস্থা করলেন, বললেন:

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়াং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োযোরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়াশতৈরুনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব–শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ।

তুমি আমার প্রাণ, আমার দ্বিতীয় হৃদয়, চোখে আমার জ্যোৎস্না তুমি, অঙ্গে তুমি অমৃত,'' এই সব শতশত প্রিয়কথা সেই মুগ্ধা মেয়েটিকে বলে, তাকেই বলা–'থাক, আর বাকিটা বলে কীই বা হবে!' (৩:২৬)

শ্লোকটি সম্পূর্ণ নিরলংকার। স্বামীর মুখে নানা প্রিয়বাক্য শুনে শুনে সীতা মুগ্ধ প্রেমে সবই বিশ্বাস করেছিলেন। সেই সব কথা বলার পর সীতাকেই বিসর্জন দিয়েছেন। প্রতারিতা সখীর মর্মান্তিক দুঃখে বিহুল বাসন্তী বাক্যটি শেষ না করে অতল বিষাদ এবং ধিকৃতির সঙ্গে বাক্যের মাঝপথে থেমে গেলেন। সমস্ত গভীরতা ওই নিষ্ফল উচ্চারণের অর্ধসমাপ্ত বাক্যটির মধ্যে অঙ্কুশের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে রামচন্দ্রকে বিদ্ধ করল। এ কাজ কোনও অলংকার কি এত সার্থক ভাবে করতে পারত?

অথবা অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এর ষষ্ঠ অঙ্কে যখন ধীবরের কাছে সেই হারানো অঙ্গুরীটি পাওয়া গেল তখন দুষ্যন্ত বলছেন:

কথং নু তং বন্ধুরকোমলাঙ্গুলিং করং বিহায়িসি নিমগ্নমস্তুসি।
অচেতনং নাম গুণাং ন লক্ষয়েন্মায়েব কস্মিাদেবধীরিতা প্রিয়া।

অঙ্গুরীটিকে ভর্ৎসনা করে দুষ্যন্ত বলছেন, 'সেই কোমল বন্ধুর অঙ্গুলিযুক্ত হাতটি ছেড়ে দিয়ে তুমি কেন জলে পড়েছিলে? অথবা এ অচেতন বস্তু না হয় গুণ লক্ষ্য করতে পারেনি, আমিই বা কি করে প্রিয়াকে অবহেলা করেছি।' (৬:১৬)

এখানে বিনা অলংকারে দুষ্যন্তের আত্মধিক্কারের সমস্ত তীব্রতা সঞ্চারিত হচ্ছে শ্রোতার মনে, তাৎপর্যপূর্ণ দুটি শব্দের মাধ্যমে। প্রথমত, অচেতন’, অর্থাৎ সোনার আংটি তো জড় পদার্থ, গুণগ্রাহী নয়, শকুন্তলার হাত ছেড়ে চলে গেছে; আমি তো সচেতন, আমি কী করে তার হাত ছেড়ে দিলাম? দ্বিতীয়ত ‘প্রিয়া’; আংটির সঙ্গে আঙুলের তো অন্তরের সম্পর্ক নয়, কিন্তু সে তো আমার প্রিয়া ছিল, আমি তাকে ত্যাগ করলাম কী বলে?

উত্তররামচরিত-এর প্রথম অঙ্কে সুপ্ত সীতাকে কোলে নিয়ে রামচন্দ্র প্রেমভারে বলেছেন:

ইয়ং গোহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়োরসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যস্তু বিরহঃ।
এ (আমার) গৃহের লক্ষ্মী, চোখে অমৃতের অঞ্জনশলাকা, এই ওর স্পর্শ দেহে (যেন) গাঢ় চন্দনরস, আমার কণ্ঠে এই বাহু এ (যেন) স্নিগ্ধশীতল মুক্তামাালো; কী-ই না। এর প্রিয়, শুধু বুঝি। এর বিরহই অসহ্য। (১:৩৮)

আসন্ন বিরহের পূর্ব মুহূর্তে এ উক্তির নাটকীয় শ্লেষ বাদ দিলেও এই কবিতার প্রেমিক হৃদয়ের সদ্যজাগ্রত শঙ্কাটি যেন অকম্পিত অনলংকৃত চতুর্থ চরণে। প্রথম তিনটি অলংকৃত চরণের মুগ্ধ উচ্ছ্বাসের চেয়েও এই আবেগকাম্প্র উক্তিটি রসে অনেক বেশি সমৃদ্ধ।

বিক্রমোর্বশীয়-এর চতুর্থ অঙ্ক বিরহের আর্তিতে মুখর কিন্তু তার আগে তৃতীয়ে ছোট একটি দৃশ্যে যেখানে রাজবধূ ঔশীনারী জানতে পেরেছেন স্বামী

বিক্রম (পুরুদরবা) উর্বশীর প্রেমে আচ্ছন্ন। এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় রাজাকে ছাদে ডেকে পাঠিয়ে বললেন:

দেবী। এষাহং দেবতা। মিথুনং রোহিণী:মৃগলাঞ্ছনং সাক্ষীকৃত্যার্যপুত্রমনুপ্রসাদয়ামি, অদ্য প্রভৃতি যাং স্ত্রিয়মার্যপুত্রঃ প্রার্থয়তে যা চার্যপুত্রস্য সমাগমপ্রণয়িনী তয়া সহ ময়া প্রীতিবন্ধেন বর্তিত ব্যামিতি।
বিদূষক। ভবতি! কিং তাদৃশস্তে প্রিয়স্তাত্রভবান?
দেবী। মূঢ়! অহং খলু আত্মনঃ সুখাবসানেনার্যপুত্রং নিবৃতশরীরং কর্তুমিচ্ছমি। এতাবতা চিন্তয় তাবৎ প্রিয়ো ন বেতি।
(দেবী। এই আমি রোহিণী ও চন্দ্র এই দেবতাযুগলকে সাক্ষী রেখে আর্যপুত্রের প্রসন্নতা বিধান করছি, আজ থেকে যে নারীকে আর্যপুত্র কামনা করেন, যে নারী আর্য পুত্রের সঙ্গে মিলনে অভিলাষিণী সেই নারীর সঙ্গে আমি প্রীতির সম্পর্কে থাকব।
বিদূষক। দেবি! আর্যপুত্র কি তোমার তেমনই প্রিয়?
দেবী: মুখ! আমি আমরা সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে আর্যপুত্রের জীবন জুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এতেই বোঝ, তিনি ততটা প্রিয় কিনা।)

যখন ঔশীনারী চিরমিলিত চন্দ্ররোহিণীকে (সাতাশটি নক্ষত্রবধুর মধ্যে রোহিণীই চন্দ্রের প্রিয়তমা) সাক্ষী রেখে প্রিয়কে প্রসন্ন করার ব্রত উদযাপন করেন। চূড়ান্ত এবং মর্মস্তিক আত্মত্যাগের মধ্যে, তখন এই অনলংকৃত অতিশয়ৌক্তিরহিত কথা কাটির মধ্যে ঔশীনারীর মর্মমূলে রক্তক্ষরণটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কতকগুলি ব্যঞ্জনায়। প্রথমত, চন্দ্র রোহিণীকে সাক্ষী রাখা, এই সে দিন পর্যন্ত এই দেবদম্পতি উপমান ছিলেন পুরুদারবা ও ঔশীনারীরই প্রেমের; আজ সেই প্রেমের প্রতীককে সাক্ষী রেখে প্রেমিককে দান করছেন অন্য এক রমণীকে। এই চরম দানের হেতু কী? প্রেমের যা প্রাথমিক শর্ত: পুরুদরবা

যাকে কামনা করেন এবং পুরস্কারবার সঙ্গে মিলন র্যার কম্য; সেখানে ঔশীনারী যে নিতান্তই তৃতীয় ব্যক্তি, তাই সসম্মানে সরে যাওয়া ছাড়া তাঁর আজ গত্যন্তর নেই। বিদুষকের প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুব্ধ এই মহীয়সী নারী বলছেন: নিজের মর্মমূল উৎপাটন করে প্রেমিককে উপহার দিলাম যেন তিনি শান্তি পান, সার্থকতা লাভ করেন প্রেমে; এর জন্যে নিজেকে চিরবিচ্ছেদে নির্বাসিত করছি, আর তুমি প্রশ্ন করছি এঁকে ভালবাসি কিনা। কত সহজে সম্পূর্ণ স্বভাবোক্তির মধ্যে দিয়ে এই আত্মবলিদান রূপ পেল ভাষায়। অলংকার এখানে বাহুল্য হত, বাধা হত, ক্ষুন্ন করত এর ঋজু মহিমাকে।

কুমারসম্ভব-এ পার্বতী তপস্যা করছেন মহাদেবকে পাওয়ার জন্য; না থাকতে পেরে মহাদেব তরুণ ব্রহ্মচারীর বেশে তপোবনের দ্বারে উপস্থিত। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে পার্বতীর সখী পার্বতীর তপস্যার বিবরণ দিচ্ছেন; এক সময়ে বললেন:

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চক্ষণং নিমীল্য নেত্রে সহসা বাবুধ্যত।
ক্ক নীলকন্ঠ! ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগসত্যকন্ঠাপিতবাহুবন্ধন।

ত্রিযামা রজনীর শেষ যামে চোখ দুটি বুজে আসে, সহসা জেগে ওঠেন; 'কোথায় চললে, নীলকন্ঠ?' এই কথা বলে অসত্য কন্ঠে বাহুবন্ধন অর্পণ করেন। (৫'৫৭)

পার্বতীর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল তৃতীয় সর্গে, তখন মহাদেব হিমালয়ের সে অঞ্চল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান তপস্যার জন্যে।— এখন সমস্ত রাত জাগেন পার্ব্বতী, তপস্যায়ঃ এবং বিরহে। ভোররাত্রে যখন দুটি চোখ বন্ধ হয় স্বপ্নে দেখেন মহাদেব তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে কোথায় চলে যাচ্ছেন। সেদিন বাধা দিতে পারেননি, এখন দু হাতের আলিঙ্গনে তাকে বাঁধতে চান, কিন্তু কোথায় নীলকন্ঠ? এ তো স্বপ্ন শুধু। এই দ্বিতীয়বারের বঞ্চনার তীব্রতা এমন

করে কি কোনও অলংকারে প্রকাশ পেত? পেলে কালিদাস অলংকারের আশ্রয় অবশ্যই নিতেন। ঠিক তেমনই ছদ্মবেশী শিবের মুখে অনেক শিবনিন্দ শোনার পর পার্বতী বললেন

অলং বিবাদেন যথাশ্রুতস্ত্বয়া তথাবিধস্তাবিদশেষমত্স্তু সঃ।

মমাত্র ভবৈকরসং মনঃ স্থিতং ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে।।

‘বিবাদ নির্ষ্মফল; তুমি যেমন শুনেছ, (শিবের বিষয়ে) সে সম্পূর্ণ সেই রকমই হোক, আমার মন এখানে ভাবে একরস, যে নিজের ইচ্ছেমত চলে সে নিন্দাকে গ্রাহ করে না। (৫:৮২) অর্থাৎ শিব নিন্দনীয় মেনেও যদি নিই, তাহলেও আমি আমার সংকল্পে অটল থাকবে, কারণ, আমার মন এ ব্যাপারে প্রেমের ভাবে একরস। অর্থাৎ তুমি শিবের সম্বন্ধে আমার জুগুপ্সা উৎপাদনের চেষ্টা করছি কিন্তু সে-ও তো একটা রস, আমার মন প্রেমে এমনই পরিপূর্ণ যে দ্বিতীয় কোনও রসের স্থানই নেই। সেখানে। পার্বতীর প্রেমের গভীরতা ঐকান্তিকতা এমন করে কি অলংকারের মধ্যে দিয়ে পৌঁছত আমাদের কাছে যেমন পৌঁছেছে। ওই ‘ভাবৈকরস’ শব্দটি দিয়ে?

অমরুশতক-এ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক সম্পর্ক যখন আর অবশিষ্ট নেই, তখনকার একটি বর্ণনা হল,

কোপো যত্র ভ্রুকুটিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনং যত্রান্যোন্যস্মিতমনুনয়ো দৃষ্টিপাতঃ প্রসাদঃ।

তস্য প্রেমণাস্তদিদমধুনা বৈশসং পশ্য জাতং ত্বং পাদান্তে লুঠসি ন চ মে মনুমোক্ষঃ খলায়াঃ।

যেখানে ভ্রুকুটিই (ছিল) ক্রোধ, মৌন (ছিল) অত্যাচার, পরস্পরের প্রতি স্মিতহাস্যই (ছিল) অনুনয় এবং চোখের চাহনি (ছিল) প্রসাদ, সেই প্রেমের

এখন (কী ভাবে) মৃত্যু হয়েছে দেখ, তুমি আমার পদতলে লুণ্ঠিত, আর খলস্বভাবা আমার ক্রোধ এখনও যায় না।

অর্থাৎ যে দম্পতির মিলিত জীবনে মান-অভিমান মিলিয়ে যেত সামান্য একটু স্মিতহাস্য দৃষ্টিপাতে আজ তাদের মধ্যে প্রেম এমনই একান্ত বিলুপ্ত যে, স্বামী পদতলে লুণ্ঠিত তবু স্ত্রীর ক্রোধ যায় না। প্রেমের মৃত্যু জীবনে ঘটলেও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রায় দেখা যায় না, এখানে সেই গভীর প্রেমের নিষ্কারুণ মৃত্যুর এমন দুর্লভ মর্মস্পর্শী চিত্রটি নির্মিত হয়েছে কোনও অলংকারের প্রয়োগ ব্যতিরেকেই। এই আতলাস্ত হতাশা ও বিষাদ অলংকৃত্যবচনে এমন করে। প্রকাশ পেত না।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এর সপ্তম অঙ্কে দুষ্যন্ত ও সর্বদমনের যখন দেখা হল তখন দুষ্যন্ত যদি বা সবেমাত্র জেনেছেন যে সর্বদমন তাঁর পুত্র, সর্বদমন কিন্তু জানে না আশ্রমে এই নবাগত ব্যক্তিটি কে; সে মাকে জিজ্ঞাসা করছে কি এষঃ?'শকুন্তলা উত্তর দিচ্ছেন 'বৎস তে ভাগধেয়ানি পৃচ্ছ–'বাছা, তোমার ভাগ্যকে প্রশ্ন কর।' অর্থাৎ পঞ্চম অঙ্কে একদিন তিনি বড় আশা করে রাজসভায় দুষ্যন্তের স্ত্রী বলে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ্রুপে জর্জরিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, আজ সন্তানকে পিতৃপরিচয় নিজের মুখে জানাতে তাই সাহস পাচ্ছেন না। ভাগ্য তাঁর সঙ্গে চরম বঞ্চনা করেছিল। সে আশঙ্কা এখনও যায়নি, তাই ছেলেকে বলছেন সে তার ভাগ্যকে প্রশ্ন করুক। শকুন্তলার মর্মান্তিক লাঞ্ছনা ও ক্ষোভ যেন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ওই আপাত সংযত ছোট বাক্যটিতে। বাক্যটি নিরলংকর তা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত।

এমনই এক অবস্থায় সদ্য বনে বিসর্জিত সীতাকে লক্ষ্মণ যখন রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করলেন ফিরে রামচন্দ্রকে তিনি সীতার কাছ থেকে কী কথা জানাবেন তখন সীতা বলেন:

বাচ্যুস্ত্বয়া মদ্ধচনাৎস রাজা বহ্নে বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম।
মাং লোকবাদশ্রবণান্দহাসীঃ শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য।
আমার কথায় রাজাকে বোলো, তার চোখের সামনে অগ্নিতে শুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছি যে-আমি, লোকের নিন্দায় আজ সেই-আমাকে যে তিনি ত্যাগ করছেন এ কি তার বিদ্যা বা বংশের উপযুক্ত কাজ হল? (রঘুবংশ ১৪:৬১)

অপমানিতা চিরদুঃখিনী নিরপরাধা নারীর মর্মবেদনা। এখানে তীক্ষ্ণ একটি প্রশ্নের উপরে কঁপিছে যেন। এ প্রশ্নের উত্তর নেই; সমস্ত বঞ্চিতার হয়ে এই নিদারুণ অনুযোগ অনুত্তরিত রইল চিরকাল ধরে। অলংকারে বিড়ম্বিত হত এই ঋজু ভাষণের গৌরব। এত অপরাধেও রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর প্রেম অবিচল। তাই বলছেন:

সাহং তপঃ সূর্যনিবিষ্টদৃষ্টিরূধর্ব্বং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভুয়ো যথা মে জননাস্তরে হিপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ।
(বোলো রামচন্দ্রকে) আমি সন্তনজন্ম পর্যন্ত সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তপশ্চরণে যত্নবতী হব যেন পরের জন্মে তোমাকেই স্বামী পাই, আর বিচ্ছেদ যেন না হয়। (১৪:৬৬)

এখানে সমস্ত কাব্যটি রয়েছে ওই চতুর্থ চরণে–'আর বিরহ যেন না হয়।' এ জন্মের সবচেয়ে সুখ পেয়েছেন বনবাসের বছর কাটিতে। আদর্শনের, বিচ্ছেদের দুঃখের মধ্যেই ছিল লোকনিন্দার সূত্র, পরজন্মে যেন নিত্য মিলিত জীবন পান এই আর্ত প্রার্থনা, এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে ওই কঠিন তপস্যা–এ সবই যেন একটি সংবাদ দেওয়ার ভঙ্গিতেই বলা, অথচ সীতার সম্পূর্ণ মর্মপীড়া কত তীক্ষ্ণ ভাবেই না প্রকাশ পেল এই শ্লোকে। এ-কাজ অলংকারে এমন করে হত না।

মেঘদূত-এ পূর্বমেঘে অলংকারের প্রাচুর্য, উত্তরমেঘে পরিমিত হলেও সুপ্রযুক্ত অলংকাবে কাব্যে দীপ্তি এসেছে বহুবার। মেঘের কাছে যক্ষ তার স্ত্রীর বর্ণনা করে বলেছে, সেই স্বল্পভাষিণী মেয়েটিকে আমার দ্বিতীয় জীবন বলে জেনো, আজ আমি দূরে, সে যেন রাতের চক্রবাকীর মতোই একা। উৎকন্ঠায় গুরুভার এই দিনগুলো যাচ্ছে, সে যেন হিমে মথিত শোভা পদ্মসরোবরের মতো বিবর্ণ" (উত্তরমেঘ ২০) এখানে অনুপ্রাস উৎপ্রেক্ষার দ্বারা যক্ষবন্ধুর বিরহক্লিষ্ট অবস্থাটি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। যক্ষ তার বধূর বিরহিণী রূপটিকে সৃষ্টি করছে: সে হিমে দলিত পদ্মফুলের মতো, অথবা ভোরের পুব আকাশে প্রতিপদের চন্দ্রকলার মতোই ক্ষীণ তনু দেহটি। সম্ভবত এ উপমার ওপরে বাল্মীকির প্রভাব আছে; অশোকবনে সীতার বর্ণনাতেও এ উপমানটি আছে। (৫:১৫:১৯) 'দর্শ শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্ররেখামিবামলামশুক্লপক্ষের শুরুতে নির্মল চন্দ্রকলার মতো দেখলেন' (উত্তরমেঘ ২৬) বা, মেঘলা দিনের স্থলপদ্মনিব মতো— ঠিক জাগ্রতও নয় প্রসুপ্তও নয় (২৭); এ সব নানা উপমায় তার বিরহদীন মূর্তিটি ফুটে উঠেছে। কিন্তু যক্ষ যখন তার নিজের বিরহের বর্ণনা করছে তখন সে অলংকার ব্যবহার করছে না। একবার বলছে:

শব্দাখেয়ং যদ্যপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননাস্পর্শলোভাৎ।
সোহিত্যিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃষ্ট-
স্তামুৎকন্ঠবিরচিত পদং মন্মুখেনেদমাহ।

যে কথা সখীদের সামনে অনায়াসেই উচ্চারণ করে বলা চলত। সে কথাও যে কানে কনে বলবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠত তোমার আনন। স্পর্শ করার লোভে, সে-ই আজ শ্রবণপথের বাইরে অতিক্রান্ত, চোখে দেখারও বাইরে,

(তাই) তার উৎকন্ঠায় পদ রচনা করে আমার মুখে এই কথা বলে পাঠিয়েছে। (উত্তরমেঘ ৪০)

এখানে সমস্ত কবিতাটির প্রাণকেন্দ্র হল একটা বৈসাদৃশ্য–কাছাকাছি থেকেও আরও কাছে এসে প্রিয়ামুখের স্পর্শ পাওয়ার লোভে অতি সহজ কথাও যে-মানুষ কানেকশনে বলতে চাইত, সে আজ এত দূরে যে সেখানে চোখের দৃষ্টি পৌঁছয় না, কথার শব্দ শোনা যায় না। এই দুস্তর ব্যবধান স্পর্শলোভী যক্ষের কাছে কত যে দুর্বিষহ তা ব্যক্ত করার জন্যে অলংকারকুশল কবি কোনও অলংকারই ব্যবহার করলেন না। যক্ষ বধূকে বলে পাঠাচ্ছে:

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহাতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ।
ধাতুর রঙে শিলাখণ্ডের ওপরে প্রণয়কুপিতা তোমাকে একে যখনই নিজে তোমার পায়ে পড়তে যাই তখনই চোখে জল ভরে এসে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়; নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্য সেখানেও আমাদের মিলন সহ্য করে না। (উত্তরমেঘ ৪২)

সম্পূর্ণ অনলংকৃত একটি বিবরণ! এক বিবাহাতুর যক্ষ বিরাহবিনোদনের জন্যে রামগিরি পর্ব্বতের নানারঙা পাথর দিয়ে শিলাখণ্ডের ওপরে প্রিয়ার চিত্র আঁকে। কেমন প্রিয়া? প্রেমের কলহে কুপিতা। কুপিতা বলেই যেন সে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, তাকে কাছে পাচ্ছে না যক্ষ। তাই সে আলেখ্যগত প্রিয়ার পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে মানভঞ্জন করতে উদ্যত হয়, যদি প্রিয়া প্রসন্ন হয়ে কাছে আসে। কিন্তু প্রিয়াকে প্রসন্ন করাই হয় না, সহসা দুচোখ জলে ভরে ওঠে, যেন নিষ্ঠর দুনিয়তি চিত্রগত প্রিযর সঙ্গেও তার মিলন সইতে পারে না; অভিশাপ যে বিচ্ছেদের। সমস্ত করুণ ভাবটি আছে একটা অসম্ভব চেষ্টার ব্যর্থতায়, যে

চেষ্টার পিছনে আছে যাক্ষের বিরহোম্মাদ। মেঘদূত-এ যেমন অনাড়ম্বর শব্দসম্ভার, তেমনই অতি সহজ অন্বয়, তেমনই অলংকারবিরল এর রচনা ’ এখন, এই পরিণততম বিরহকাব্য রচনার ঋতুকে কালিদাস রসের আরও গভীরে প্রবেশ কবতে বলেই অলংকাবা এখন তার কাছে পরিহার্য বহিরঙ্গ! তাই কাব্য রসের গভীরতায়: পৌঁছতে পেরেছে বলেই তিনি বিশুদ্ধ স্বভাবোক্তির দ্বারাই বোদাকে রসলোকের গভীরে উওরণ করে দিতে পারেন;

রামায়ণে সীতাকে দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে বলায় তিনি বললেন:

মনসা কর্মণ বাচা যথা বামমভ্যর্চয়ে
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।
যদি মনে, কাজে ও কথায় রামকেই অর্চনা করে থাকি তো পৃথিবী আমাকে বিবরে (আশ্রয়) পান করুন। (৭.৯৭:২৫)

রামায়ণ-এ এইটি সীতার শেষ উক্তি, রামচন্দ্র, সমাজ এবং জীবনের ওপরে প্রগাঢ় ক্ষোভ ও অভিমান নিয়ে উচ্চারিত কথা ক’টি কোনও অলংকারের প্রযোজন হয়নি, স্বভাবোক্তিই যথেষ্ট হয়েছে, কারণ সীতাক বেদনা নিজের তীব্রতাতেই রসোত্তীর্ণ।

যেখানে উপলব্ধির মধ্যে। জটিলতা, অন্তদ্বন্দ্ব বা মিশ্র আবেগ থাকে, সেখানে আপাতসরল অনলংকৃত বাক্যে এগুলি আরও সার্থক ভাবে প্রকাশ পায় . মহাভারত-এ যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়াকে সপ্তদ্বীপা বসুমতীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বর্ণনা বিশেষ করে শুনতে চাইলেন:

যদিদং ভারতংবষং যত্রেদং মুহ্চিতং বিলম
যতএদ্ধতিমাত্রলুব্ধোহয়ং পুত্রো দুর্যোধনো মম।।
যত্র গৃদ্ধাঃ পাণ্ডুপুত্র যত্র মে সজ্জতে মনঃ।
‘এইযে ভারতবর্ষ, যেখানে বলের প্রকাশ যেখানে আমার পুত্র দুর্যোধন অতিমাত্র লুব্ধ, যেখানে পাণ্ডুপুত্ররাও লুব্ধ, যেখানে আমার মন আসক্ত।’ (৬:১০:১, ২)

বল এবং লোভের নগ্ন প্রকাশ যে ভারতবর্ষে নিজের পুত্রের মাত্র-ছাড়ানো লোভ, তার সঙ্গে পাণ্ডুপুত্রদের লোভের সংঘাতে যেখানে আগামী কাল থেকে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ শুরু হবে। এই কদর্য, রিপুপ্রাবল্যের পরিবেশ সূচনা করে ধৃতরাষ্ট্র। ঘৃণা বা নির্বেদের ভরে যদি বলতেন, ‘এ দেশে বাঁচতে আর রুচি নেই, তাহলে প্রত্যাশিত সংবেদনে জাগা সহজ হত, কিন্তু ওই কদর্যতার নগ্ন রূপ বর্ণনা করেই ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমার মন এখানেই, এই হতভাগ্য দেশেই আসক্ত। এখানে পরস্পর-বিরুদ্ধ আবেগের যুগপৎ বা আনুপূর্বিক সমাবেশ থাকায় উপলব্ধির জটিলতা আছে, এবং এই আবেগের বিরোধের মধ্যে জীবনবোধের এক ঋদ্ধ প্রকাশ আছে। যে প্রকাশ অনলংকৃত বাগভঙ্গিতে যত শক্তিশালী, অলংকারে ততটা হত না। রামায়ণ-এ এবং বিশেষ করে মহাভারত-এ আপাতবিরুদ্ধ আবেগের নিকট সমাবেশে অন্তদ্বন্দ্ব ও আবেগের সংঘাতে সমৃদ্ধতির এক কাব্য স্পষ্ট হয়েছে, যা পরবর্তী যুগে ক্রমেই বিরল হয়ে এসেছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদ-এ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলছেন:

‘যাজ্ঞবল্ক্য, কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষোহিতি-যজ্ঞবল্ক্য, কোন জ্যোতিতে পুরুষ জ্যোথিস্মান?’
যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ‘আদিত্যজ্যোতিঃ— সূর্যের জ্যোতি।’
আর আদিত্য অস্ত গেলে?

'চন্দ্রমা।'
'চন্দ্রমা অস্ত গেলে?'
'অগ্নি।'
'অগ্নি নির্বাপিত হলে?'
'বাক।'
'বাক শান্ত হলে?'
'আত্মা।' (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪:৩:২-৬)

বাইরের সমস্ত জ্যোতি নির্বাপিত হলে মানুষের অন্তরাত্মাই জ্যোতিষ্ক হয়ে তাকে আলো দেখায়, সেই অন্তরাত্মার অনির্বাণে দীপ্তিই সর্বতমিস্রার অন্তিম প্রতীকগর। এত বড় এবং এত জটিল উপলব্ধির কী সার্থক প্রকাশ ঘটল বিনা অলংকারে। উপলব্ধির গাঢ়তাতেই অলংকার নিষ্প্রয়োজন হয়ে উঠল।

স্বভাবোক্তি অলংকার কী না এ নিয়ে বিস্তার আলোচনা হয়েছে। কারণ একটিমাত্র, স্বভাবোক্তি বারবার অলংকৃত বাক্যকেও পরাস্ত করেছে নিজের মহিমায়। স্বভাবোক্তি মাত্রই শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়, কিন্তু এমন অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে, যেখানে স্বভাবোক্তির দীপ্তি অলংকৃত বাক্যে পাওয়া যেত না। মৃচ্ছকটিক নাটকে আশৈশবের সহচরী মন্দনিকা শর্বিলককে বিবাহ করে বসন্তসেনাকে প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছেন: বসন্তসেনা তাকে তুলে বলছেন ইদানীং ত্বমেব বন্দনীয়া সংবৃত্তা/গচ্ছ ইদানীং, আরোহ প্রবহণং স্মরমীম–এখন তুমিই হলে বন্দনীয়া, এখন যাও, গাড়িতে ওঠ গিয়ে, আমাকে স্মরণ কোরো।' নিতান্তই আটপৌরে বাগভঙ্গি, কিন্তু এর মধ্যে বসন্তসেনার একটি প্রবল চাপা দীর্ঘশ্বাস রয়ে গেছে। নিস্ক্রয়মূল্যে না হোক বসন্তসেনার দক্ষিণ্যে মন্দনিকা আর গণিকা নয়, সে শবিলকের বধু হয়ে গণিকত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কুলনারীর মর্যাদা পেল, আর যার আনুকূল্যে এটা সম্ভব হল সেই বসন্তসেনা নিজে গণিকাই রয়ে গেলেন। এর সমস্ত বেদনা প্রকাশ পাচ্ছে ওই কাটাকাটা

বাক্যবিন্যাসে, যেন নিজের নিষ্পরিণাম প্রেমের বেদনা এবং আসন্ন সখীবিচ্ছেদের দুঃখে তাঁর কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে, এ মুহূর্তে দীর্ঘ বাক্যবিন্যাস সম্ভব নয়। কোন অলংকার এ দুঃখের তীব্রতাকে এমন করে স্পর্শ করতে পারত? (তুলনীয় অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এর চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলাকে বিদায় দিতে হবে, এ দুঃখে পালকপিতা কণ্বের সেই বিখ্যাত শ্লোকটি: যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকন্ঠয়া।' সম্পূর্ণ নিরলংকার, শুধু স্বভাবোক্তি দিয়ে এ বর্ণনা এত শক্তিশালী হয়ে উঠল।) এখানে বিবক্ষিত বস্তুটির নিজেরই এমন ঐশ্বর্য আছে যে, অলংকার এখানে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটাত। সপ্তম অঙ্কে শকুন্তলার বর্ণনা বসনে পরিধূসারে বসানা' সে কি প্রথম অঙ্কের ন প্রভারলিং জ্যোতি-র থেকে কাব্যমূল্যে কোন অংশে হীন? মনে পড়ে মর্ম্মটের কথা— 'রাসস্যৈব প্রাধান্যান্নালংকারঃ '।

তাহলে দেখছি সুকবি, যিনি তাঁর কাব্যের অন্যত্র অলংকার প্রয়োগে সিদ্ধহস্ততার বহু প্রমাণ দিয়েছেন তিনিও স্থানবিশেষে অলংকরকে বাহুল্য বা বাধা জ্ঞান করে পরিহার করেন। তাঁরা জানেন উপলব্ধির এমন জ্বলন্ত রূপও আছে, যা তার আপনি তেজে অলংকরকে পরিহাস করে। এ বোধ যতক্ষণ কবিদের থাকে ততক্ষণই কাব্যে অলংকারের প্রয়োগ সুপরিমিত থাকে; না হলে মাঘ ও নৈষিধের উদয় হয়। এই পরিমিতি বোধের মধ্যেই মহাকবি ও হীনকবির পার্থক্য এবং এ বোধ আসে। অলংকারের পরিহার্যতার স্থানকালপাত্রের বোধ থেকে। সৎকবি বহু অলংকার সার্থক ভাবে প্রয়োগ করতে জেনেও প্রয়োজন মতো ক্ষেত্রে সে লোভ সংবরণ করতে জানেন। শুধু যখন অলংকার তাঁর উপলব্ধি প্রকাশের একমাত্র বাহন হতে পারে তখন, এবং ঠিক যতটুকু এবং যে অলংকার প্রয়োগ করলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তখন ততটুকু সেই অলংকার প্রয়োগ করেন। কিন্তু এরও একটা শর্ত আছে সৎকাব্যে, তা হল অলংকারপ্রয়োগের পূর্বেই কাব্যটিকে তার উপলব্ধির স্তরে খাঁটি ও সজীব হতে হবে, নইলে সেটা শবদেহে অলংকার বিন্যাসের মতো

নিরর্থক প্রয়াস হবে। এর ভূরি ভূরি উদাহরণ সপ্তম শতাব্দী থেকে বহু কাব্যে-নাটকে পাওয়া যায়।

আলংকারিকরা কখনো অলংকরকে কাব্যের আত্মা বা প্রাণ বলে অত্যধিক মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেননি, করেছেন, মন্দ কবিযশঃপ্রার্থীরা। কাব্যে যাঁদের মূলধন নেই, অর্থাৎ জীবনবোধে কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, তারাই এই বড় ফাকিটা ঢাকবার জন্যে অত্যধিক অলংকারপ্রয়োগে তৎপর হয়ে উঠেছেন। রসবোদ্ধা পাঠকের কাছে এই অধম কাব্য নিরতিশয় পীড়াদায়ক হয় ওঠে। এই অন্তঃসারশূন্য অলংকারবহুল রচনা সপ্তম শতাব্দীতে খুব বাড়তে থাকে। বাণভট্ট হর্ষচরিত-এ বলছেন,

‘প্রায়ঃ কুকবয়ো লোকে রাগাধিষ্ঠিতদৃষ্টয়ঃ।

কোকিলা ইব জায়স্তে বাচালাঃ কামকারিণঃ।।

সন্তি শ্বান ইবাসংখ্যা জাতিভাজো গৃহে গৃহে।

উৎপাদক ন বহবঃ কবয়ঃ।’

অর্থাৎ, ‘রিপুতে আরক্তদৃষ্টি কুকবিরা কোকিলের মতোই বাচাল এবং স্বেচ্ছাচারী। নামেই কবি অসংখ্য গৃহে গৃহে আছে যেমন থাকে কুকুর, এরা সৃষ্টি করতে পারে না।’ (১:৫, ৬) এ ব্যাপার সর্বদেশে সর্বকালেই ঘটেছে কিন্তু তেমন সমালোচনা না থাকার ফলে মুড়িমিছড়ির একদর হয়ে গেছে। প্রায়ই, তাই কালিদাসের কাব্যও মহাকাব্য আর মেঠের হয়গ্রীববিধ কাব্যও মহাকাব্য। শুধু তাই নয়। এদের মতো অনুপ্রাণিত কবিদের জন্য কবিশিক্ষা গ্রন্থ রচনা হয়েছে যাতে প্রেরণার অভাব এরা পূর্ণ করতে পারে পাণ্ডিত্যে ও কৌশলে। এমনকী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে দন্তীও একটু স্থান রেখেছেন এদের জন্যে।

কাব্যের নানা অবান্তর ভেদের মধ্যেও অকবির সৃষ্টির জন্যে আসন রাখা আছে—গুণীভূতব্যঙ্গা কাব্য, চিত্রকাব্যইত্যাদি। অলংকারশাস্ত্রের উদাহরণে যে বহুল পরিমাণ কুরুচিপূর্ণ প্রেরণাহীন অলংকারসর্বস্ব শ্লোক ইতস্তত ছড়ানো আছে–এবং সৎকাব্য থেকে কম উদাহরণ আছে–তাতেই প্রতিপন্ন হয় কাব্যের সংজ্ঞা না হোক কাব্য সম্বন্ধে বোধটা স্থূল ও সংবেদনাবাজিত হয়ে উঠেছিল। তথাকথিত সহৃদয় কাব্যে কবি খুঁজতেন কৌশল এবং ভট্টিকাব্যের কবি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে বললেন:

ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম।

হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া।

(এই রাবণবধকাব্যটি) ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝতে হবে। এতে পণ্ডিতের উৎসব, যারা মেধাবী নয় তাদের আমি এ কাব্যে হনন করেছি। আমার বিদ্বৎপ্রীতির জন্যে। (রাবণবধ, ২২:৩৪)

সুবন্ধু শ্লাঘাসহকারে বললেন, প্রত্যক্ষরশ্লেষময় তার কাব্য। অর্থাৎ পরবর্তী কবিরা আর উদ্দেশ্য ঘোষণা করার প্রয়োজন বোধ করলেন না, সরাসরি বহিরঙ্গপ্রধান কৌশলনির্ভর কাব্য রচনা করতে লাগলেন এবং শ্রোতারা বাহবা দিতে লাগলেন।

কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখি অলংকারশাস্ত্র কাব্যকে পাঠকের মনোরঞ্জনের অমঙ্গলনাশের, উপদেশের, যশোর, অর্থের উপায়ই বলেছেন (কাব্যং যশসেহর্থকৃতে শিবেতরক্ষতয়ে/সদ্যঃ পরনির্বতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে)

অর্থাৎ অনেক অবান্তর ফলপ্রাপ্তির কথা বললেও এরা কখনওই বলবেন না কাব্য জীবনকে বুঝতে সাহায্য করে, এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল জীবনের পুনর্মূল্যায়ন। জীবনের গভীরতম সমস্যা ও সংঘাতের প্রতিফলন ও তার

মাধ্যমে জীবনের মূল্যবোধের যাচাই করাই কাব্যের প্রাথমিক করণীয়–এই সংজ্ঞা নিরূপণ করলে কাব্য বিনোদনমাত্র না হয়ে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করতে পারত। বিয়োগান্তকে কাব্যে স্বীকার করা হয়নি–সংস্কৃত কাব্য ও অলংকারশাস্ত্রে এ এক চূড়ান্ত অভিশাপ। রামায়ণ-মহাভারত-এর মূল সুরটি এবং প্রকৃত উপসংহার এদের আদিমতম মহাকাব্যকলেবরে বিয়োগান্ত, রঘুবংশও অবক্ষয়ের গ্লানিতে মলিন, বিষন্ন, খণ্ডকাব্য; মেঘদূত বিরহের আর্তিতে করুণ। উত্তররামচরিত-এ ভবভূতি ছুঁয়ে গেছেন সে গভীরতাকে, উচ্চারণ করে বলেওছেন, 'একো রসঃ করুণ এব। নিমিত্তভেদাৎ পৃথক পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তন–রস একটিই, করুণ, প্রয়োজন অনুসারে নানা পৃথক রূপে তা বিবর্তিত হয় মাত্র।'

আর একটি কারণ হল কাব্যের আপেক্ষিক মান নির্ণয়ের কোনও সুস্থ সমালোচনার ধারা সমাজে বা আলংকারিক মহলে প্রবর্তিত হয়নি। কাব্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে অংশত ও/বা সম্পূর্ণত উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার হত না। এ-ও অবক্ষয়ের একটি কারণ। হয়তো এ ধরনের মানদণ্ড সৃষ্ট হওয়া সহজ ছিল না— এতগুলি বিভিন্ন অলংকার প্রস্থানের প্রাদুর্ভাব ও প্রসারের জন্যও। অনেক পরে সংহতি প্রবর্তনের চেষ্টা দেখা যায় বিশ্বনাথ, মর্ম্মটে, কিন্তু অলংকার ততদিনে শবব্যবচ্ছেদে পরিণত হয়েছে, কারণ, সংস্কৃত কাব্য ততদিনে নিষ্প্রাণ। কালিদাসের পরে যখন ভট্টি, ভারবি, মাঘী, নৈষধকার কাব্য রচনা করছেন তখনও, কালিদাস কেন ভাল, এরা কোথায় দীদনতর, কেন হীনতর। তার কোনও সার্থক আলোচনাই হল না। একটা প্রমাণ, অধিকাংশ আলংকারিক উদাহরণ সংকলন করেছেন অর্বাচীন অ-কবিদের গ্রন্থ থেকে অথবা স্বরচিত অ-কাব্য থেকে; কালিদাস থেকে উদাহরণ শোকাবহরদাপে কম। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে সামগ্রিক ও আপেক্ষিক মূল্যবিচারের যে ধারাটি চলিত ছিল তাতে প্রায়শই সুস্থ সাহিত্য অভ্যর্থনা পেত এবং অসৎকাব্য অসৎকাব্য বলেই বিবেচিত হত। বিশুদ্ধ ভঙ্গিবৈচিত্র্য ও

অলংকারের প্রাচুর্যোকাব্যের কাব্যত্ব সেখানে কখনওই নির্ভর করেনি, বোধহায় রোম সাম্রাজ্যের আমলে যাকে ল্যাটিন সাহিত্যের রজত যুগ' বলে অভিহিত করা হয়। সেই শ'দুই বছর বাদে। যে সব শ্লোক শুধুই অলংকার শাস্ত্রে দোষের বা অ-কাব্যের উদাহরণ হতে পারত। তাই পরিবেশিত হল কাব্যের নানা আলোচনায় সাহিত্যেুর ভূমিকায়।

তৃতীয় একটি কারণ মনে হয় সাহিত্য লঘুপ্রমোদের অঙ্গন ছেড়ে জীবনের অন্দর-মহলে বিশেষ প্রবেশ করল না, যেখানে জীবনের তাৎপর্যাে সার্থকতা উদ্দেশ্য নিয়ে বিচিন্তা বা অন্বেষণা। মনে পড়ে। কীটসের কাব্য The Fall of Hyperion-এ কবি এসেছেন কাব্যলক্ষ্মী মনোিটার মন্দিরে, মহৎকাব্য রচনার গুঢ় তত্ত্বটি জানতে। দেবী প্রথমে তাঁকে ধিক্কার দিলেন। পরে ব্যক্তি করলেন কবিত্বের চরম রহস্যটি:

'None can usurp this height, returned that shade
But those to whom the miseries of this world
Are miseries, and will mot let them rest.
'(কবিত্বের) এই (দুরারোহ) শিখরে কেউ সহজে উত্তরণ করতে পারে না, পারে শুধু তারা এ জীবনের আর্তি যাদের কাছে আর্তিই এবং তাতে যারা অস্থির হয়ে ওঠে।'

এই মানদণ্ডের সাক্ষাৎ সংস্কৃত অলংকারের কোনও গ্রন্থে পাই না। মহৎ কাব্য যশ অর্থ আনন্দ ছাড়াও যে আরও কিছু দিতে পারে বলেই তা মহৎ কাব্য, জীবনের দুরুহ ও জটিল নৈতিক মূল্যবোধের, আবেগের, প্রত্যয়ের সংঘাতেও দিশারী হওয়াই যে মহৎ কাব্যের যথার্থ ভূমিকা এ বোধ না পাই অধিকাংশ অলংকারশাস্ত্রে, না পাই কালিদাসোত্তর কাব্যে।

কাব্যের অবক্ষয়ের চতুর্থ একটা ঐতিহাসিক কারণও আছে। দশম একাদশ শতক থেকে কথ্যভাষাগুলির অভ্যুত্থান ঘটল, এবং সজীব, জীবনজিজ্ঞাসার কাব্য কথ্যভাষাতেই রচিত হতে লাগল। ফলে সংস্কৃত মজা নদীর শুকনো খাত হয়ে পড়ে রইল, বহতা নদীর স্রোতেই কাব্যপিপাসুর তৃষ্ণা মিটতে লাগল। কবীরের দোঁহায় দেখি: 'বহতা পানী নির্মলা, বদ্ধ গন্ধিলা জায়–যে জলে স্রোত আছে তাই নির্মল, বদ্ধ জলার জল দুর্গন্ধ।' আবার দেখি সংস্কৃত কূপজল, কবীরা, ভাসা বহতা নীর— সংস্কৃত হল। কুয়োর জল, কবীর, ভাষা হল বহতা জল।' জনসাধারণও বুঝতে পারছে সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যপ্রকাশের অবকাশ আছে, প্রাণের উপলব্ধি প্রকাশের পক্ষে তা অব্যবহার্য, সে-কাগজের জন্যে আছে কথ্যভাষা। দ্বাদশ শতকের পর থেকে প্রথম ক্রমে ক্রমে রাজসভার ভাষা হিসেবে সংস্কৃত অপসারিত হল, বিজয়ীদের ফারসি ভাষাই রাজকার্যের বাহন হয়ে উঠল। রাজসভায় সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা আর রইল না। রাজসভায়। এ ভাষা তখন মুষ্টিমেয়ের চিত্তবিনোদনের মাধ্যম; এই মুষ্টিমেয় তখন জমিদারদের ও দেশীয় রাজাদের সভাপণ্ডিত ও সভাসদগণ– এরা বিদ্বান কিন্তু রসবোদ্ধা নন। কাজেই কাব্যের কাছে এদের প্রত্যাশা পাণ্ডিত্যের, রসসিদ্ধির নয়। দেহের অবয়বের ভঙ্গি ও বিন্যাসেই ভরতনাট্যম ও মণিপুরী, ইত্যাদি নৃত্যশিল্পকৃতির সৃষ্টি হয়, আবার দেহাবয়বের ভিন্ন প্রকারের সঞ্চালন ও বিন্যাসে সার্কাসও হয়। একটি রসোত্তীর্ণ মানুষকে অভিভূত তন্ময় করবার ক্ষমতা রাখে, অন্যটিতে বিস্ময় ও চমক আছে কাজেই তা বাহাদুরি দেখিয়ে বাহবা পায়। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা কাব্যে ভঙ্গিবৈচিত্র্য ও অলংকারপ্রাচুর্য খুঁজলাম, একশো চৌষট্টি রকমে বলতে পারলাম তোমার মুখ চন্দ্রের মতো বা পদ্মের মতো; কিন্তু এর জন্যে কোনও উপলব্ধির প্রয়োজনই হয় না, কাব্য বা অলংকরশাস্ত্র পড়া থাকলেই চলে। কাব্যে রূপ পেলাম, সৌন্দর্য বা রমণীয়তা পেলাম না। অথচ আমরাই বলেছি, 'তদেব রদপং রমণীয়তায়া মুহুর্মুহুর্যন্নবতামুপৈতি–যা মুহুর্মুহু নূতন হয়ে

প্রতিভাত হয় তা-ই হল রমণীয়তার রূপ।’ কোথায় সে মুহুর্মুহু নবীনতা? তা,কেবল অলংকারবৈচিত্র্যে মুখ পদ্মের মতো বলার শ’ দেড়েক ভঙ্গি। এর মধ্যে কাব্য যে দেউলে হয়ে গেছে সে বোধটা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে কোনও অলংকারগ্রন্থে নেই।

পরোক্ষ ভাবে আছে। যখন দেখি ব্যঞ্জনাপ্রস্থান আক্রান্ত হচ্ছে, বিদ্রূপের লক্ষ্য হচ্ছে তখন বুঝি। এ হল প্রাণবানের সম্বন্ধে মুমূর্ষর ঈর্ষা। তবু বলব, বিস্ময়ের বস্তু হল এই যে, কাব্যে যখন প্রাণ অন্তর্হিত তখনও আলংকারিকরা কখনও বলেননি। অলংকার কাব্যের প্রাণ। একেবারে প্রথম দিকের ভামহ বামন প্রভৃতিরা ছাড়া অলংকরকে তত প্রাধান্য পায় কেউই দেননি (পরে অবশ্য রুষ্যক ও রুদ্রটিও দিয়েছিলেন); সম্ভবত অলংকারের চর্চা দিয়েই কাব্যালোচনার সূত্রপাত বলেই এর নাম অলংকারশাস্ত্র। কিন্তু দুটি ব্যাপার প্রণিধানযোগ্য: একটি হল রস-ও ধ্বনি প্রস্থানের মতো সুস্থ, সার্বজনীন ও সূক্ষ্ম আলোচনাপ্রসূত দুটি প্রস্থান যখন এসেছেন তখনও কাব্যে কোনও নতুন প্রাণসঞ্চার হল না, ভঙ্গিবৈচিত্র্য এবং অলংকারবাহুল্যের মর্যাদা হ্রাস পেল না। দ্বিতীয়ত, কাব্যের কাব্যত্ব সম্বন্ধে যতগুলি প্রস্থান সৃষ্টি হয়েছে তখনও সবগুলিকে সংহত করে একটি সুস্থ সর্বাঙ্গীন মানদণ্ড নির্মিত হল না। কাব্যে সম্পূর্ণাঙ্গতা বিচারের জন্যে। সম্ভবত সংস্কৃত ভাষা বহু পূর্বেই শুধু বিদগ্ধজনের পরিশীলিত ভাষা হয়ে যাওয়ায় এবং প্রাকৃত ভাষাগুলি অবহেলিত থাকায় এই মারাত্মক অভাবগুলি সাহিত্য সমালোচক সমাজে থেকেই গেল।

কারণ যাই হোক, ফলটা শোচনীয় হল। শুধু যে সৎ, সুস্থ, গভীর এবং রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হল অবিরত অলংকার চর্চায় ও প্রয়োগে তা-ই নায়, অসৎ অসুস্থ কাব্যও কাব্যপদবাচ্য হয়ে উঠল। যে বাণভট্টে সত্যকার সৃষ্টিপ্রতিভার স্বাক্ষর আছে, তার কাব্যে বারেবারে তিনিও

বিকৃতরুচি অলংকারপ্রিয় রসবোধহীন পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যে লেখনী ধারণ করতে দ্বিধা করলেন না। স্বয়ং বাণভট্টেরই যখন এই অবস্থা তখন অন্যে পরের কথা।

কাব্যের মানদণ্ড, উদ্দেশ্য, বিচার, লক্ষ্য সবই অবনমিত হল। সে তখন চিত্তবিনোদনের বস্তু হয়ে উঠল। সচেতন ভাবে মানবিক, আবেগের, নীতির, প্রত্যয়ের সব বাস্তব সমস্যাকে পরিহার করতে লাগল। একটি সৌন্দর্যের কল্পলোক সৃষ্টির প্রয়াসে কাব্য জীবনকে বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করল না। এই সৌন্দর্যের উৎস কোথায়? দেহের, বিশেষত নারীদেহের এবং নিসর্গের বর্ণনার দ্বারা, ভোগবিলাসের নানা বর্ণনার দ্বারা অবাস্তব একটি কল্পলোক সৃষ্টি করে তার উপাদানকে নানা ভাবে বিন্যস্ত করে কাব্য নির্মাণ করতে লাগল। সমস্যা যেটা দেখা দিল তা হল: নিসর্গই হোক নারীদেহই হোক সবই বহুপরিচিত, তার দ্বারা নতুন কিছুআপাত ভাবেও উপস্থাপিত করা খুবই কঠিন। কবিরা এ সমস্যার সমাধান করলেন অভিনব এক পন্থায়: পরিচিত বিষয়কে অপরিচিত ভঙ্গিতে পরিবেশন করে। এই ভঙ্গি হল মুখ্যত অলংকারবৈচিত্র্য। তাই দেখি সাহিত্যে ও অলংকারশাস্ত্রে অলংকারের প্রকারভেদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। অনুচ্চারিত হলেও সকলেই স্বীকার করছেন রসসৃষ্টির দেবদুর্লভ শক্তি আর নেই। সেই সর্বস্বান্ত অবস্থাকে ঢাকা দেওয়ার কাজে ডাক পড়ল। অলংকারের। প্রবল ঘটা করে এল ভঙ্গিবৈচিত্র্য, এল অসংখ্য অলংকার। যা সৃষ্টি হল তাতে চমক প্রচুর, নেই শুধু উপলব্ধি, নেই প্রেরণা, জীবন সম্বন্ধে কোনও নতুন বোধ, প্রকৃতপক্ষে যা হল কাব্যের প্রাণ। দীর্ঘায়ত বর্ণনা, যত তার ঘটা তত ছটা, কিন্তু প্রকৃতি বর্ণনাই হোক আর রূপ বর্ণনাই হোক, যুদ্ধ বর্ণনাই হোক আর সূর্যাস্ত বর্ণনাই হোক–যতক্ষণ না তার প্রাণকেন্দ্রে থাকছে কোনও যথার্থ উপলব্ধি ততক্ষণ তা নিতান্তই বহিরঙ্গ। ওই যে মর্ম্মট বললেন, ‘উপকুর্বন্তি তং সন্তং’, সেইখানেই ঠেকে গেল এই অবক্ষয়ধর্মী সাহিত্য রস। সার্থক কোনও উপলব্ধি, জীবনকে দেখার নতুন কোনও দৃষ্টিকোণ যখন নেই, অর্থাৎ অঙ্গী

যখন নেই তখন কার অঙ্গদ্বারেণ আসবে অলংকার? বিশ্বনাথের কথাও তো তাই ছিল 'শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ। রসাদী নুপকুর্ব্বস্তোহিলংকদ্ধারাভোহঙ্গদাদয়ঃ।' শব্দার্থময় কাব্যের শোভাবৃদ্ধিকারী 'অস্থির' যে ধর্মগুলি রসাদির উপকার করে। ক্রমে অস্থির ধর্ম শুধু যে স্থির হয়ে উঠল তাই নয়। রসাদির অবর্তমানে তার উপকার করার প্রশ্ন যখন আর নেই তখন অলংকারই রসের স্থানে অভিষিক্ত হয়ে রাজত্ব করতে লাগল।

পরিশেষে একটি কথা: বর্ণনা–তা সে যত অলংকারবহুল যত মনোরমই হোক না। কেন–কখনও মহৎ সাহিত্যের প্রধান উপাদান হয়ে উঠতে পারে না। মহৎ সাহিত্যের ভিত্তিই হল জীবনবোধ এবং তার প্রকাশে অলংকার থাকলেও তার উপলব্ধিগত জটিলতাও থাকবে; নিঃশেষ অর্থ পাওয়া যায় না। যেমন:
হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং,
তত্তে পুষঃপাবৃণু সত্যধর্মীয় দৃষ্টয়ে। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ (৫:১৫:১)
এর অর্থকরা হয়: সোনার পাথর দিয়ে সত্যের মুখ ঢাকা আছে, পূষন সেই ঢাকা তোমার জন্যে খুলে দিন সত্যধর্ম দেখবার জন্যে। বলা বাহুল্য, অভিধাগত অর্থ ও অলংকার বুঝলেও এ কাব্য সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। কারণ এখানে কবির উপলব্ধির মধ্যেই দুরূহতা আছে, যা ভাবগতও নয়। আবার সম্পূর্ব্বত চিন্তাপ্রসূতও নয়, যে, কোনও দর্শন প্রস্থানের শরণাপন্ন হলে সুরাহা হবে। তাতে দার্শনিক ব্যাখ্যা মিলবে ঠিকই কিন্তু কবির উপলব্ধিটির যথার্থ পরিচয় মিলবে না। কিংবা অথর্ববেদের সেই, 'দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মামার ন জীর্যন্তি—দেবতার কাব্যটি দেখ, তা মরেও না জীর্ণও হয় না'— এটা বললে কি পূর্ণ উপলব্ধিটি হৃদয়ঙ্গম করা যায়? 'দেবতার কাব্য' কি অলংকার না অভিধাগত অর্থেই বুঝতে হবে। অথবা যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ ' এর অর্থের জন্যে দেড় হাজার বছর পরের এক বিশিষ্ট দার্শনিক প্রস্থানের প্রবক্তা শংকরাচার্যের ওপরে ভার দিলে স্বভাবতই একটি প্রস্থানগত ব্যাখ্যাই মিলবে

এবং সেটি কবির অভিপ্রেত অর্থ হবে না তা বলাই বাহুল্য। তার পরিবর্তে যদি এ কাব্যাংশটিকে কবির উপলব্ধিরূপেই গ্রহণ করি তাহলে লক্ষ্য করব। আপাতবিরোধী (অমৃত/মৃত্যু) অনুভবের জটিলতাতে ও অন্তর্দ্ধোন্দ্বের গাঢ়তাতে এ-কাব্য সমৃদ্ধ। তেমনই:

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ চন্দ্রশ্চ মৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ। (কঠোপনিষৎ ২:৩:৩)

এর মধ্যে মহাজাগতিক যে পরিবেশটি সৃষ্ট হয়েছে তার মধ্যে সক্রিয় উপাদান হল ভয়

একে কি আক্ষরিক অর্থে নিলে কোনও অর্থ পাওয়া যায়? তার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, সূর্য তাপ দেয়, ভয়ে ইন্দ্র চন্দ্র ও মৃত্যু ধাবিত হয়। এতে অলংকার নেই, না, সমাসোক্তিতেও এর অর্থ নিহিত নেই, এ কাব্য অলংকরকে অতিক্রম করে কাব্য হয়ে উঠেছে উপলব্ধির গভীরতায়। অথবা যখন শুনি:

ন তত্র সূর্যে ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমো বিদ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়ামগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্ববিদং বিভাতি।। (কঠোপনিষৎ ২:২:১৫)

অর্থ, সেখানে সূর্য আলো দেয় না, বিদ্যুৎ দেয় না, এই অগ্নিই বা কোথায়? দীপ্যমান তার দীপ্তি অবলম্বনে অন্য সব কিছু দীপ্তি দেয়, তার উজ্জলতাতেই এই সব কিছ উজ্জ্বল। এখানে কোনও অলংকার নেই, কাব্যটি নির্ভর করছে উপলব্ধির মহিমার ওপরে। এখানেও সেই রসস্যৈব প্রাধান্যান্নালংকারঃ।' কাব্য যে অলংকরকে ছাড়াই সম্পূর্ণ রসের মহিমাতেই অনবদ্য হয়ে উঠতে পারে আনন্দবর্ধন ও জগন্নাথ ছাড়া এ কথা স্পষ্ট করে কেউই বলেননি। এবং দুঃখের বিষয় এদের কোনও সার্থক প্রভাব কবিদের ওপরে বা

আলংকারিকদের ওপরে পড়ল না। অলংকারের প্রাধান্য ঘুচল না। বরং ক্রমে ক্রমে অলংকারই হয়ে উঠল। সর্বেসর্বা। উপরের শ্লোকটিতে যে নিরলংকার উক্তি তাকে স্বভাবোক্তি নাম দিলেও হয়তো ঠিক হয় না। কারণ, এর অর্থ অভিধায় ধরা পড়ে না। ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ রসের গৌরবেই এর গৌরব সম্যক অনুভূত হয়। যে অনুভবের মধ্যে বিচিত্র অঙ্গ অনুভব আনাগোনা করে তা ওই অঙ্গী ও অঙ্গরসের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে মিশ্র জটিল এক উপলব্ধির রসায়নে পরিণত হয় এবং এইখানেই তার ঐশ্বর্য অর্জ্জুনের রথে শিখণ্ডীকে দেখে ভীষ্ম যখন অস্ত্রত্যাগ করেন, তখন, 'গ্রীষ্মসন্তপ্ত মানুষ যেমন করে প্রথম বর্ষণের জলধারার প্রতীক্ষা করে তেমনই করেই ভীষ্ম শিখণ্ডীর শণধারা গ্রহণ করলেন।'।

উষ্ণার্তো হি নরো যদ্বজুলধারাঃ প্রতীচ্ছতি।
তথা জগ্রাহ গাঙ্গেয়ঃ শরধারাঃ শিখাণ্ডিনঃ। (৬:১২৭:২৩, ২৪)

উপমায় এর সবটুকু সৌন্দর্য নিহিত নেই, ব্যঞ্জনার দ্বারা জীবনের তাপে তপ্ত বৃদ্ধের মৃত্যুর মধ্যে মুক্তির প্রতীক্ষা ধ্বনিত হচ্ছে। সমস্ত দৃশ্যটির অন্তর্নিহিত গ্লানি ও ধিক্কার এবং মৃত্যুর মধ্যে এই পঙ্কিল জীবনকে ধুয়ে শুচি হয়ে চলে যাওয়াব, গ্লানিবর্জিত জীবনের স্বস্তি ফিরে পাওয়ার ব্যঞ্জনা–এর কাব্যমূল্য উপমানির্ভর নয়। যদিও এ উপমাটি নিরতিশয় সার্থক।

তবু বলব একেবারে তুঙ্গে পৌঁছে কবিতা নিরলংকারই হয়। পার্বতী যখন বলেন মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং', বা কিং লীয়ার নাটকের শেষে এডগার যখন বলে

The oldest have borne most; we that are young
Shall never see so much nor live so long.
তখন এই সম্পূর্ণ নিরলংকার বচনের মধ্যে উপলব্ধির যে গাঢ়তা তা কোনও

অলংকৃত ভাষণে ধরা পড়ত না। সীতার জীবনের সমস্ত ক্ষুব্ধ বেদনা, বঞ্চনা ও অভিমান যেমন প্রকাশ পেল এই শ্লোকে:

মনসা কর্মণা বাচা যথা রামর্ভ্যচয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি। (৭:৯৭:১৫)

ঠিক এই মুহূর্তে সীতার অন্তর্দাহ এত গভীর যে অলংকারের প্রয়োগটি রসসঞ্চারে বিঘ্ন ঘটাত। একটি স্তরে গিয়ে অলংকার প্রয়োগের নিপুণ কবিও বলেন, ‘আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অহংকার’; একটি স্তরে কাব্য তার সোনার আবরণ উন্মোচন করে নিরঞ্জন উপলব্ধির সত্যের মহিমাতেই সহৃদয়চিত্তকে অভিভূত করে।

চুনি, পান্না, লীলা সবই হীরের জাত, নানা বর্ণের ছটায় সুন্দর তারা, কিন্তু হীরেই সবচেয়ে দামি। বৈজ্ঞানিক বলেন, যে প্রচণ্ড তাপ ও চাপে হীরে তৈরি হয়, এই মণিগুলির জন্যে ততটা প্রয়োজন হয় না। কবির উপলব্ধিতে যখন সেই তীব্রতা সেই প্রাবল্য থাকে, যার ফলে তার জীবনজিজ্ঞাসা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, কঠিন বেদনার ঘনীভূত চাপ ও তাপে কাব্য তখন নিরঞ্জন মহিমায় কমলহীরে হয়ে ওঠে। এবং এ স্তরের জীবনজিজ্ঞাসায় বেদনার উপলব্ধি কোথাও না কোথাও অন্তর্নিহিত থাকেই (Our sweetest songs are those that tell of saddest thought)। আমরাও ত বলেছি মাথুরেই পদকর্তাঁর শক্তির শেষ স্বাক্ষর। সংস্কৃত কাব্যনাটক দুঃখান্ত পরিণতিকে বর্জন করে, জীবনজিজ্ঞাসাঁই যে মহৎকাব্যের অন্তিম অন্বেষা। এ কথা কোথাও না। স্বীকার করে কাব্যে জীবনের গভীরতম প্রকাশের অবকাশ অনেকটাই রোধ করেছে। ক্ষতিপূরণ করতে এসেছে অলংকার তার বিচিত্র চমক নিয়ে, কিন্তু কমলহীরের দ্যুতি সে পাবে কোথায়?

সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্লীলতা

সাহিত্যে সুরুচি, সুনীতি, ইত্যাদি সম্বন্ধে একান্ত ঔদাসীন্য যেমন অস্বাস্থ্যকর তেমনিই এ সব নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তাও অসুস্থ মনের লক্ষণ। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া একেবারেই অসম্ভব। দেশে এবং কালে শ্রীলতার সীমারেখা সংকুচিত ও প্রসারিত হতে থাকে। শরীর ও সম্ভোগের বর্ণনার অত্যধিক বাহুল্য ঘটলে সমাজের স্বাভাবিক সুরুচি যেমন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, তেমনই ওই প্রসঙ্গে অস্বাভাবিক কুণ্ঠা ও দ্বিধা থাকলে সাহিত্য সে কুণ্ঠাকে আঘাত করে তার সহজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। হয়তো এই ভাবেই শালীনতার একটা সীমা সাহিত্যে অনুক্ত ভাবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোনও সাহিত্য 'অশ্রীল'। কিনা তার বিচারের মানদণ্ড কি দিয়ে নিরুপিত হবে। এর উত্তরে 'অশ্রীল' শব্দটির ইতিহাস সন্ধান করা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আর্যরা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে যখন মগধের কাছাকাছি আসে তার পরে কথ্য মাগধী ভাষার প্রভাব পড়ে বৈদিক সংস্কৃতে। সংস্কৃতে যেটা 'র', মাগধী প্রাকৃতে সেটা ল'; কাজেই বৈদিক 'শ্রীর' শব্দ মাগধী-প্রভাবিত 'শ্রীল' শব্দে পরিণত হল। 'শ্রীর' মানে শ্রীযুক্ত; কাজেই শ্রীলতা বিচারে মূল নিরিখ ছিল সৌন্দর্য। শিল্পে যা সৌন্দর্যের পরিপন্থী তা-ই অশ্লীল। পরিশীলিত মনের পাঠকের রসবোধে যা ব্যাঘাত জন্মায় তাই অশ্লীল।

আবার প্রশ্ন আসছে, কী ধরনের পাঠকের রুচির উপরে এত বড় দায়িত্ব ন্যস্ত করা চলে। তাছাড়া, শুধু পাঠকই কি শ্রীলতা নিরুপণে চূড়ান্ত অধিকারী? এ ব্যাপারে লেখকেরই কি প্রাথমিক দায়িত্ব নয়? বোধহয় এই দুটো মানদণ্ড যুগপৎ প্রয়োগ করলে বিচার অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। অর্থাৎ, কোনও রচনায় লেখকের উদ্দেশ্যই যদি হয় নগ্ন বর্ণনার দ্বারা সুরুচিকে আঘাত করা, এবং সে

রচনা পড়ে স্বভাবত বাস্তবভীরু নয় এমন মার্জিতরুচি পাঠকের মন যদি রসগ্রহণে বাধা পায়। তবে তাকে অশ্লীল বলতে বাধা থাকে না।

এদিক থেকে সাহিত্যকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথম, যে সাহিত্যে চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে শিল্পীর বিবক্ষিত বিষয় পরিস্ফুট হয় এবং এর জন্যে দেহবর্ণনাকে মোটের উপর গৌণ করে সম্পূর্ণ নেপথ্যে রাখা হয়; দ্বিতীয়, যে সাহিত্যে মন মুখ্য হলেও মনেরই গতি, বৈচিত্র্য, সংঘাত ও পরিণতি রূপায়িত করার প্রয়োজনে দেহবর্ণনাকে যথাস্থানে ও যথা পরিমাণে উপস্থাপিত করা হয়; তৃতীয়, যে সাহিত্য প্রাথমিক ভাবে শরীরের ও সম্ভোগের বিচিত্র ও অনাবৃত বর্ণনাতেই নিয়োজিত। এই তৃতীয় শ্রেণীর রচনাই বাস্তবিক পক্ষে অশ্লীল এবং এ বিচারের নিরিখ হবে লেখকের উদ্দেশ্য ও পাঠকের উপলব্ধি, অর্থাৎ, রচনার সাধনা ও সিদ্ধি।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য শুধু বাস্তবের যথাযথ বা অকুন্ঠ বর্ণনা নয়, জীবনের মূল্যমান সম্বন্ধে মানুষের বোধকেউন্নততর, সমৃদ্ধতর করাই সাহিত্যের মূল কৃত্য। এর জন্যে— এবং কেবলমাত্র এর জন্যেই–যদি শরীর বা শারীরিক বিষয় বর্ণনার প্রয়োজন হয় তবে সাহিত্য অবশ্যই তাকে স্বীকার করবে এবং সে সাহিত্য যে কোনও মার্জিত রুচির নিরিখে উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু যখন এ জাতীয় বর্ণনাই মুখ্য হয়ে ওঠে অথবা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বা অযথা দেখা দেয়, তখন তা সৎসাহিত্যরসিকের সুরুচি বা ‘শ্রী’র সীমা লঙ্ঘন করেছে বলেই অশ্লীল।

সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত প্রথম পর্যায়ের রচনা। দেহের সাধারণ সৌন্দর্য বর্ণনার বাইরে খুঁটিয়ে কোনও অবয়ব বা অবস্থা বরন করার অবকাশ মহাকাব্যের বৃহৎ গতিশীল পরিসরে থাকে না। তাই পৃথিবীর সকল মহাকাব্যই এই অর্থে দেহ সম্পর্কে উদাসীন। একটা যুগের গণমানসের বিরাট

আশা, আকাঙ্ক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি যে রচনার উপজীব্য, কোনও বিশেষ চরিত্রের শরীরের খুঁটিনাটি বা সম্ভোগের নিপুণ বর্ণনায় কালক্ষেপ করবার অবকাশ তার থাকে না।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকাংশ শিল্পী–ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস, অমরু, শূদ্রক, বাণভট্ট, ভবভূতি এদের রচনায় মুখ্যত চরিত্রগুলির বিকাশ উদঘাটিত করবার প্রয়োজনেই দেহ ও সম্ভোগের বর্ণনা করা হয়েছে। কালিদাসের কুমারসম্ভাব-এ পার্বতীর আপাদমস্তক বর্ণনা করা হয়েছে, সে বর্ণনায় পাঠকের সৌন্দর্যবোধ পরিতৃপ্ত হচ্ছে, কামনার উন্মেষ ঘটছে না। মেঘদূত-এর যক্ষবন্ধু ও রঘুবংশ-এর সীতার রূপবর্ণনা এবং সন্তানসম্ভবা সুদক্ষিণা ও ইন্দুমতীর দেহবর্ণনাও এই শ্রেণির। বর্ণনাগুলি প্রাসঙ্গিক, কাব্যের নিজস্ব প্রয়োজন সিদ্ধির–অর্থাৎ চরিত্রচিত্রণ ও রসসঞ্চারের প্রয়োজনে এগুলির সৃষ্টি, এবং এইসব অংশে কাব্যের মূলরস পুষ্ট হচ্ছে। তাই কোথাও অসুস্থ সংকেতের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। চরিত্রবিকাশ বা রসসৃষ্টির প্রয়োজনের সঙ্গে এ অংশগুলির একটা প্রসঙ্গ ও পরিমাণগত সামঞ্জস্য আছে (কবির সুরুচিতেই সে পরিমিতিবোধ স্পষ্ট থাকে), তাই অস্থানে প্রযুক্ত হয়ে এ সব বর্ণনা রসহানি ঘটায়নি। কুমারসম্ভব অষ্টমসর্গে জগৎপিতা ও জগন্মাতা রূপে বন্দিত দেবদম্পতির সম্ভোগবর্ণনায় যে কুরুচি আছে তার কারণ খুব সম্ভব সপ্তম সর্গের পরবর্তীর্ণ সগগুলি প্রক্ষিপ্ত, কালিদাসের রচনা নয়।

কিন্তু কালিদাসোত্তর সাহিত্যে এ জাতীয় উদাহরণ বিস্তর পাওয়া যায়। ভারবির কিরাত জুনীয় মহাকাব্যের উপজীব্য হল তপস্যার দ্বারা অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্রলাভের চেষ্টা, তপস্যার অন্তে মহাদেব, কীর্তিকেয় ও তাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ ও অবশেষে মহাদেবের প্রসাদে পাশুপতাস্ত্রলাভ। এ কাহিনিতে রস হল বীররস। কিন্তু অলংকারশাস্ত্রে বলা আছে, অঙ্গীরস অর্থাৎ মূলর'স যদি বীররস হয় তবে অঙ্গরস হবে শৃঙ্গার বা হাস্য। মহাকাব্যে

অঙ্গরস সঞ্চারের দায় এসেছে ততটা সাহিত্যের নিজস্ব প্রেরণায় নয়, যতটা অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশে। অতএব অঙ্গরসরূপে শৃঙ্গাররসের অবতারণা করতে হবে। কোথায়? তপস্যারত বা যুদ্ধোদ্যত অর্জুনের পক্ষে সম্ভোগে প্রবৃত হওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে, কাজেই অঙ্গরসের অনুরোধে গান্ধর্ব অপ্সরা ও ষড়ঋতুকে নায়ক-নায়িকা রূপে আনা হল এবং চার সর্গ ধরে তাদের বিলাসের বর্ণনা চলল। এ বর্ণনায় কবি যতই শিল্পকৌশলের পরিচয় দিন না কেন মূল কাহিনির সঙ্গে আন্তরিক সংযোগে এ অংশ অসম্পৃক্ত বলে এতে পাঠকের রুচিকে পীড়িত করে। চরিত্রের বিকাশের জন্য এলে যা সহজ ভাবে কাহিনির মধ্যে অনুসৃত হতে পারত, তাকে শুধুই বহিরঙ্গের নির্দেশ পালনের জন্য আনতে হল বলে সাহিত্যের কোনও সত্য প্রেরণা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাই এ বর্ণনা অশ্লীল, শ্রী’ ও সুরুচির সঙ্গে এর বিরোধ।

মাঘের শিশুপালবধ’-এ। এ ব্যাপার আরও বেশি প্রকট। যুধিষ্ঠিরের অভিষেক সভায় প্রধান অতিথির সম্মানের জন্যে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দী। এ কাহিনিও বীররসাশিত। নিজস্ব ধর্মে এখানেও শৃঙ্গাররসের কোনও অবকাশ নেই, কারণ মূল কাহিনিকে শৃঙ্গাররস সত্যিই কোনও ভাবে স্পর্শই করতে পারে না। তবু অলংকার শাস্ত্রকারদের নির্দেশে অঙ্গরসের অবতারণা করতে হয়েছে, তাই সপ্তম সর্গে সম্ভোগবর্ণনা, অষ্টমে জলবিহার বর্ণনা, নবমে চন্দ্রলোকবিহার, দশমে মধুপানোৎসব ও একাদশে প্রভাতকালীন সম্ভোগবর্ণনা–এই সমস্ত অংশটি মূলক হিনির পরিপ্রেক্ষিতে একান্তই প্রক্ষিপ্ত। এখানে পাত্র-পাত্রী সকলেই এই কটি সর্গের জন্যেই সৃষ্ট ও তার পরে পরিত্যক্ত। কাব্যের নিজের প্রয়োজনে এ অংশটি রচিত নয়, কেবলমাত্র অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশেই এর সৃষ্টি এবং তৎকালীন পাঠকসমাজের রুচির তাগিদেই। তাই কাব্যপাঠের সময়ে এই সমস্ত শৃঙ্গার পরিক্রমাটি রুচিকে পীড়া দেয়। নগ্ন বর্ণনা–তাতে যত কলাকৌশলীই থাক না কেন–যখন দীর্ঘ পাঁচ সর্গ ধরে সম্পূর্ণ অকারণে চলতে থাকে, তখন কৃত্রিম ভাবে প্রাধান্য লাভ করার চেষ্টার

অপরাধে কাব্যবিচারে সেটাকে অশ্লীল বলে স্বীকার করতেই হয়; কারণ কাব্যে তার কোনও যথার্থ সার্থকতা নেই। এ অংশে শৃঙ্গাররস পরিবেশন করে কাব্যটি পাঠকের এমন বৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন করেছে যা কাব্যরস উপভোগের দ্বারা চরিতার্থ হয় না। কাব্যে এ অংশে পাঠকের যে সাহিত্যসম্মত প্রত্যাশা বা উপলব্ধি তার মধ্যে শিল্পগত সত্য বা শ্রী' নেই, তাই এ অংশ অশ্লীল। পরবর্তীকালে তথাকথিত মহাকাব্যে দেহবর্ণনা কাব্যের দীর্ঘ অংশ জুড়ে মুখ্য বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমনি কুরুচির নজির মেলে হরবিজয় কাব্যের দ্বাদশ থেকে অষ্টবিংশ সর্গে, কপফশাভুযদয় কাব্যের অষ্টম থেকে পঞ্চদশে, দ্বাশ্রয় কাব্যের সপ্তমে অথবা কুমারপালচরিত-এর চতুর্থে এবং বিলহণের চৌরসুরত-পঞ্চাশক জুড়ে; যদিও তাতে কোথাও কোথাও সত্যকার রসও দেখা দিয়েছে। কিন্তু বোধহয় এ জাতীয় কুরুচির প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় নৈবদ্ধচরিত-এর দ্বিতীয়, সপ্তম, ষোড়শ, অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ সর্গে। নলদময়ন্তী কাহিনির যে অংশটুকু শ্রীহর্ষের উপজীব্য, মহাভারতে সেটা দুশোরও কম শ্লোকে বর্ণিত। নৈষধে তার পরিমাণ প্রায় ২,৮০০ শ্লোক, অর্থাৎ মহাভারতের প্রতি শ্লোক নৈষধে স্ফীতিলাভ করেছে গড়ে চৌদটি শ্লোকে। এর মধ্যে কবির পাণ্ডিত্যপ্রকাশ, অলংকারপ্রয়োগের কৌশল ও বর্ণনাকে দীর্ঘায়িত করবার নৈপুণ্য বাদ দিলেও কলেবর বৃদ্ধির যেটি প্রধান কারণ তা হল দেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। নলদময়ন্তী কাহিনি মহাভারতের শ্রেষ্ঠ উপাখ্যানগুলির অন্যতম: প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে নল ও দময়ন্তী চরিত্র অপূর্ব মহিমা ও সৌন্দর্যে বিকশিত হয়েছে। এই অসামান্য কাহিনিটির মধ্যে শ্রীহর্ষের নিজস্ব সংযোজনা হল দেহবর্ণনায় নৈপুণ্য ও বহিরঙ্গের অলংকরণ। মনকে বাদ দিয়ে শরীর যেখানে একান্ত হয়ে উঠেছে সেখানে ভিন্ন এক ধরনের পাঠক উপস্থিত, যাদের কাছে কাব্যে জীবনবোধ বা রসোপলব্ধি প্রত্যাশিত নয়। বরং সম্ভোগবাসনা উদ্রিক্ত করতে পারে এমন নগ্ন বর্ণনা বা তার চেয়েও অশালীন, বহুতর নিপুণ আদিরসের সংকেতই তাঁরা আশা করেন। কাব্যে। এ বস্তুর স্রষ্টাও সু-সাহিত্যিক নয়, পাঠকও রসবোদ্ধা নয়।

অতএব এ শালীনতাকে অনায়াসে বর্জন করেছে, শিল্পের অনুরোধে নয়, প্রবৃত্তিকে উদ্দীপিত করার দায়ে।

এই তৃতীয় শ্রেণির সাহিত্যে কামনার উন্মেষ ঘটানোই মুখ্য উদ্দেশ্য; দেহ ও সম্ভোগ বর্ণনাই এখানে মূল উপজীব্য; মন এখানে নিতান্তই গৌণ কিংবা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। শিল্পের বিচারে এ রচনা রসোত্তীর্ণ নয়; এর সাধনাও হীন, সিদ্ধিও হীন; তাই সাহিত্যে এর কোনও সত্য আসন নেই। সাহিত্যের নিজের প্রয়োজনের বিচারে যা গৌণ, তা যেন আপন অধিকার লঙ্ঘন করতে উদ্যত হয়ে শিল্পের পরিমিতিবোধ ক্ষুন্ন করেছে। বহিরঙ্গ যেন মূল উপজীব্যকে আচ্ছন্ন করতে গিয়ে নিজেকেই মর্যাদাচ্যুত করেছে। কালিদাসের কাব্যেও শরীর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবেই বিদ্যমান, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিকল্পনার অবয়ববিন্যাসের সঙ্গে কোথাও প্রসঙ্গত বা পরিমাণগত কোনও বিরোধ তার নেই; অতএব সে বর্ণনা সমগ্রের সৌন্দর্যের পরিপূরক; অযথার্থ অধিকারের লোভে উদগ্র ভাবে প্রগলভ হয়ে সমগ্রকে ও নিজেকে শ্রীভ্রষ্ট করেনি। বাণভট্টের কাদম্বরী-তে চণ্ডালকন্যক, পত্রলেখা, কদম্বরী ও মহাশ্বেতার রূপবর্ণনা; কাদম্বরীতে সন্তানসম্ভবা বিলাসবতী ও হর্ষচরিত-এ সন্তানসম্ভবা যশোমতীর শরীর বর্ণনা এমনি করে। সমগ্র কাহিনির অবিচ্ছেদ্য ও পরিপোষক অংশ হয়ে আছে বলেই এগুলি পাঠকের তৃপ্তিবিধান করে, কুণ্ঠা বা জুগুপ্সা জন্মায় না।

দেহ তার নিজের অধিকারেই সত্য এবং সত্য বলেই সাহিত্য তাকে বর্জন করবে না; প্রয়োজন মতো বর্ণনা করবে। যতটা খুঁটিয়ে বর্ণনা করলে নায়ক-নায়িকার মনের বিকাশ বা চরিত্রের রূপায়ণ দেখানো সম্ভব হতে পারে ততটাই খুঁটিয়ে বর্ণনা করবে, কিন্তু কেবলমাত্র শিল্পের অনুরোধেই। পরিশীলিত রুচির পাঠক যদি বোধ করেন যে, অনাবশ্যক বিস্তারে দেহ বা সম্ভোগ বর্ণনায় কামনার উন্মেষসাধনই একান্ত হয়ে উঠেছে এবং তার দ্বারা রসবোধের বিঘ্ন জন্মাচ্ছে, তবে তা শিল্পগ, কারণেই সাহিত্যে অনুত্তীর্ণ বলে

মানতে হবে। সাহিত্যে শিল্পেতর কোনও নৈতিক বা সামাজিক মানদণ্ড প্রযোজ্য নয়। বস্তুত রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের পাঠক ও যৌন সাহিত্যের পাঠক শিক্ষাদীক্ষা ও রুচিতে সম্পূর্ণ পৃথক দুই গোষ্ঠীর মানুষ। একটি রচনার দ্বারা অপরটির উদ্দিষ্ট পাঠকের পরিতৃপ্তি ঘটবে না। সাহিত্যের কাছে উভয়ের প্রত্যাশাও ভিন্ন। এই কারণেই দেহবর্ণনার প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও কালিদাস সৎ সাহিত্যের স্রষ্টা কিন্তু মাঘ বা শ্রীহর্ষের রচনায় প্রচুর কলাকৌশল ও পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও শিল্পগত সুরুচির বিচারে এদের রচনা হীন হয়ে রইল।

দুঃখান্ত পরিণতি ও সংস্কৃত সাহিত্য

বিয়োগান্ত বা দুঃখান্ত পরিণতি অলংকারশাস্ত্রে নিষিদ্ধ না হলেও সংস্কৃত সাহিত্যে তা একান্ত দুর্লভ। রামায়ণ মহাভারত-এর শেষ সুরটি বিষাদের; রামায়ণ-এর শেষ প্রক্ষিপ্ত অংশে রামের বৈকুণ্ঠে গমন থাকলেও সীতার পাতালপ্রবেশ ও লক্ষ্মণের সরযুর জলে দেহবিসর্জনে একটা করুণ সুন্দর আছে। মহাভারত প্রথম পর্যায়ে শেষ হয় স্ত্রীপর্বে, সেখানে অন্ত্যভাগের মূলসুর অতলান্তি বিষাদের। পরের অংশ শেষ হয় মহাপ্রস্থানে, সেখানেও একে একে চার পাণ্ডব ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর পতন ও মৃত্যু এবং ধীরে ধীরে যুধিষ্ঠিরের নিঃসঙ্গতা ও একক অন্তিমযাত্রা বিচ্ছেদে করুণ। স্বর্গারোহণপর্বের অপেক্ষাকৃত দুর্বল রচনাতে এ সুর কাটে না। এর পরের দীর্ঘ ও বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও কোনও দুঃখান্ত পরিণতি নেই। ভাসের উরুভঙ্গ নাটকে মঞ্চে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ ও মৃত্যু দেখানো হয় বটে, কিন্তু সে মৃত্যু বীরের মৃত্যু, রথে আরোহণ করে স্বর্গারোহণ করার সুর দুঃখের নয় এবং সেটিই নাটকের

অন্তিম ঘটনা। এ ছাড়া বাকি সব মহাকাব্য ও নাটকই মিলনান্ত বা হর্ষান্ত। এর কারণ কি, সেই আলোচনাই এ প্রবন্ধের বিষয়।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের অবস্থা প্রথম থেকেই অন্য রকম। গ্রিক সাহিত্যে হর্ষান্ত নাটক (কমেডি) যথেষ্ট থাকলেও সমধিক প্রখ্যাত নাটকগুলি সবই দুঃখান্ত এ কথা সুবিদিত। গ্রিক ধর্মের সঙ্গে নাটকের অঙ্গাঙ্গী যোগ ছিল; মন্দির চত্বরে প্রায় উপাসনার অংশ হিসেবেই অনুষ্ঠিত হত নাট্যাভিনয় এবং ধর্ম যদিও ঈশ্বরসান্নিধ্যে পৌঁছে সুখী হওয়ারই পথ নির্দেশ দেয় এবং নাটকে যদিও দেবতারা অপরিহার্য ভূমিকায় প্রায়ই অবতীর্ণ হন তবু বিখ্যাত নাটকগুলির অধিকাংশই দুঃখান্ত। ইহুদী খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসে ন্যায়বান ঈশ্বর মানুষের কৃত অপরাধের শাস্তি দেন নানাবিধ দুঃখে–ব্যাধি, অর্থহানি, যশোহানি, প্রিয়জনের মৃত্যু। এই সবের দ্বারা মানুষ তার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে মৃত্যুর মধ্যে শুচি হয়ে স্বর্গে যায়। বাইবেল-এর জোব-চরিত্রটিই প্রথম ট্র্যাজিক বা বেদনদিগ্ধ চরিত্র; এর পরে গ্রিক সাহিত্যে প্রোমিথিয়াস, ঈডিপাস, আগামেম্নন, মিডিয়া, ইলেকট্রা এবং অন্যান্য বহু চরিত্র এ ভাবে দেবতার নির্দেশ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আর্ত ও উৎপীড়িত; মানসিক ভাবে ক্ষতবিক্ষত। পরে এলিজাবেথীয় যুগে শেক্সপীয়রের ওথেলো, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট্র ও লীয়ার এবং অন্যান্য নায়ককেও এই ধরনের যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সপ্তদশ শতকের সাহিত্যে নায়ক রাজা বা রাজন্য নয়, নাটকের পরিসরও পরিবারের মধ্যে সরে এসেছে কিন্তু বেদনার অভিজ্ঞতা সেখানেও নাটকের কেন্দ্রস্থলে। মানুষের উচ্চাশার সঙ্গে সংঘাত কোনও একটি অলঙ্ঘ্য নীতির; এ নীতি ধর্মীয়ও হতে পারে, সামাজিক বা নৈতিকও হতে পারে; কিন্তু এই সংঘাতেই নায়কের যন্ত্রণার সূত্রপাত।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যে দেখি প্রলোভনে পড়ে নায়কের পতন ঘটছে এবং বাকি নাটকে যন্ত্রণা ও পীড়নে তার পতনের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে; অনুতাপে পাপক্ষয়

হচ্ছে। দুঃখের মধ্যে এক ধরনের বোধ বা আত্মজ্ঞান জন্মাচ্ছে। (মরালিটি, ফল অব প্রিন্সেস ও প্রাইড্ অব্ লাইফ নাটকে এই বিষয়বস্তুই নানা প্রকারভেদ আছে। মরালিটি-তে কষ্ট এবং অনুতাপের মধ্যে নায়কের পাপক্ষয় ও মুক্তি ঘটে। প্রাইড অব লাইফ ও ফল অব প্রিন্সেস-এ অহমিকা ও দম্ভই নায়কের পাপ, প্রতিকূল ঘটনার প্রতিঘাতে সেই দর্পচূর্ণ হওয়ার কাহিনিই নাটকের বিষয়বস্তু। এ দুটি ধারায় ঈশ্বরের স্থানে যেন দৈবই মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ)। ষোড়শ শতকে নায়কের চরিত্রে দুঃখভোগের দায়িত্ব দেখানো হতে থাকে এবং এলিজাবেথীয় সাহিত্যেই এ বোধ সবচেয়ে স্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়; ব্যক্তিগত দায়িত্বকেই সুখদুঃখের নির্ণায়ক বলে প্রতিপাদন করা হয়। এ সাহিত্যে। কিছুকাল ফল অব প্রিন্সেস এর ধারাও চলতে থাকে, যেমন চসারের মাঙ্ক'স টেল-এ, গাওয়ারের কনফেসিও আমন্টিস-এ অথবা লীডগেটের ফল অব প্রিন্সেস-এ; কিন্তু এলিজাবেথীয় সাহিত্যে নায়কের ভাগ্যবিধাতা নায়ককেই করা হল, বাইরের প্রতিকূল দেব বা ভগবানকে সে ভূমিকা থেকে অপসারিত করা হল। ইতালীয় নুভেলের মতো অবৈধ প্রণয়, হঠকারিতা ও অন্যায় আচরণ থেকে পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় আসছে এই ধারাটি বিদ্যমান থাকা সত্বেও এলিজাবেথীয় নাটকে একটি বোধ পাওয়া যায় যে দুঃখবিপর্যয় শুধু ব্যক্তিগত পরিসরেই সীমাবদ্ধ নয়, মহাবিশ্বের মধ্যে কোনও এক বিপর্যয়ের প্রতিভাসও আছে তার মধ্যে।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের একটি গ্রন্থ (ট্রাক্টেস্ কইসিলিয়ানুস) বলেছে, দুঃখান্ত নাটকের রসের উৎস দুঃখ, হর্ষান্তের হাস্য। হরেস্ও তার অ্যাস পেয়েটিক-তে এই মতের সমর্থন করেছেন। এই দুঃখ নানা ধরনের নানা কারণের হতে পারে। চসার তাঁর মাঙ্ক'স টেল-এ একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন দুঃখান্ত নাটকেরা:

Tragedie isto seyn a certyn storie,
As olde books maken us memorie,

Of hym that stood in great prosperitie,
And is yfallen out of high degree,
Into myserie, and endeth wrechedly.

প্রাচীন গ্রন্থগুলি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে দুঃখান্ত উপাখ্যানের নায়ক (এমন একজন যিনি) অতি উন্নত ঐশ্বর্যময় অবস্থা থেকে দুঃখে পতিত হন ও অত্যন্ত গ্লানির মধ্যে অবসিত হন।

এই সংজ্ঞার আলোকে রামায়ণ-এর রাম ও মহাভারত-এর যুধিষ্ঠির দুজনেই দুঃখান্ত নাটকের নায়ক। অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এর দুষ্যন্ত বাইরের দিকে না হলেও দীর্ঘ দুটি অঙ্কে বেদনার মধ্যে কাটান এবং উত্তররামচরিত'-এর রাম প্রথম অঙ্ক থেকেই বেদনায় নিমজ্জিত। তা হলেও এ নাটক দুটি এবং পরবর্তী কোনও সংস্কৃত নাটকই পাশ্চাত্য অর্থে দুঃখান্ত নয়। অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার দুঃখের কারণ মুখ্যত দুর্বাসার শাপ। পরে অবশ্য হংসপাদিক-র গানের মধ্যে দুর্য্যন্তচরিত্রের দুর্বলতা দেখিয়ে কতকটা দায়িত্ব চরিত্রেও আরোপিত হয়েছে, যেমন দুষ্যন্তের চিন্তায়, অন্যমন শকুন্তলার অতিথি আপ্যায়নে ত্রুটির দ্বারা শকুন্তলাকেও তার দুঃখের জন্যে কতকটা দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, এ ত্রুটির সঙ্গে দুঃখের যোগ ক্ষীণ ও আপেক্ষিক শুরুত্বে প্রায়শ্চিত্ত অনেক তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী। তাছাড়া ত্রুটি ও দণ্ডের মিল যথেষ্ট নেই বলেই দুর্বাসার শাপকে ব্যবহার করতে হয়েছে। শকুন্তলার সামান্য বিচ্যুতি বা দুষ্যন্তর বহুবল্লভতা, যা তৎকালীন নায়কের পক্ষে ত্রুটি বলেই ধরা হত না, তার দণ্ড এত নিষ্করুণ। এই উপাদানে গভীর দুঃখান্ত নাটকের সৃষ্টি হতে পারত, কিন্তু সপ্তম অঙ্কে মিলনের মধ্যে সমস্ত দুঃখভোগ আনন্দে অবসিত হল। অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকেই দুঃখের ভূমিকা সংকীর্ণ ও অগভীর।

কীথ তাঁর সংস্কৃত নাটকের ইতিহাসে বলেছেন সংস্কৃত নাটকের আদিপর্বে সম্ভবত নিউ এপিক কমেডির প্রভাব পড়েছিল তার ওপরে পাশ্চাত্য নাটকের

ইতিহাসের এই পর্বে যে গ্রিক ও গ্রিক প্রভাবিত রোমান নাটকগুলি রচিত হয় তা লঘু, ও হর্ষন্ত। দুঃখ তাতে নেই বললেই চলে, আছে বিপদ এবং বিচ্ছেদের সম্ভাবনা। ঘটনা দ্রুত ঘটে, জটিলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, নায়কের সখা প্যারাসাইটু (বিদূষক জাতীয় চরিত্র) এবং নায়িকার হিতৈষী এবং হিতৈষিণীর প্রতিচক্রান্তে নিষ্ঠুর অভিভাবকের অনুশাসন পরিবর্তিত হয় এবং নায়ক-নায়িকার মিলনে নাটকের সমাপ্তি ঘটে। এই ছকটি মূলত দেখা দিয়েছে বেশ কিছু সংস্কৃত নাটকে নায়িকায় এবং প্রকরণে ভাণে, ব্যায়োগে ও সমবকারে। বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয়, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, মালতীমাধব, স্বপ্নবাসবদত্ত, প্রতিজ্ঞার্যৌগন্ধরায়ণ ও অবিমার-কে দুঃখের ভূমিকা গৌণ এবং স্বল্পস্থায়ী। মালবিকাগ্নিমিত্র, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা-য় ঘটনা প্রায় একই ধরনের: রাজা বিবাহিত, অন্তঃপুরের সুন্দরী এক তরুণীর প্রতি আসক্ত, সে-ও তাই; বাধা হল পূর্বপরিণীতা মহিষী ও অন্য রাজবধূরা। এঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করছেন যাতে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন না ঘটে। বিদূষক ও কখনও-বা অন্য পাশ্বচরিত্রের সহায়তায় রাজা গোপনে সাক্ষাৎ করছেন তরুণীটির সঙ্গে এবং শুরু হয়ে যাচ্ছে রানিদের ক্রোধ ও মান-অভিমানের পালা। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে প্রজাপতির নির্বন্ধই এমন যে তরুণীটি রাজার পত্নীরূপে উদ্দীষ্ট ছিলেন; রাজপ্রাসাদে আসবার পথে দৈবদূর্বিপাকের ফলে নিষ্পরিচয় আশ্রিতরূপে রাজপ্রাসাদে এসে ওঠে। অতএব রানিরা যখন জানতে পারেন যে দৈবজ্ঞের নির্দেশ হল এই তরুণীটিকে বিবাহ করলে রাজা রাজচক্রবতী হবেন বা অন্য ভাবে তাঁর শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে তখন তাঁরাই উদ্যোক্তা হয়ে বিবাহ ঘটান। অন্য যে নাটক কটির নাম উল্লেখ করা হল তাতেও প্রকারান্তরে এই ধরনেরই নাট্যবস্তু। দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনও জটিলতার অবকাশ নেই; চরিত্রের বিকাশ, নতুন কোনও জীবনবোধ বা জীবনের কোনও পুনর্মূল্যায়নেরও অবকাশ নেই। নায়ক নায়িকার মিলনের যে বাধাকে অবলম্বন করে নাট্যবস্তু আবর্তিত হচ্ছে তা নিতান্তই বাইরের এবং

সেই বাহ্য অন্তরায় আমনই আর এক আপতিক ঘটনার (দৈবজ্ঞের গণনা, ইত্যাদি) দ্বারা অপসারিত হয়ে অন্তে মিলন ঘটা সম্ভব হচ্ছে।

বিক্রমোর্বশীয়-তে এ বাধাকে কতকটা অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে: ঔশীনারী সম্বন্ধে বিক্রম উদাসীন নন; তার প্রেমের চিতার অগ্নি থেকে, উর্বশীর সঙ্গে মিলনের দীপটি জ্বালাতে তিনি দ্বিধা বোধ করছেন। কিন্তু উর্বশীর প্রেম তাকে এত অভিভূত করেছে যে তিনি এ দ্বিধা কাটিয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত। চতুর্থ অঙ্কে তার বিরহের উন্মাদন বর্ণিত হয়েছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ চতুর্থ অঙ্কের শেষ থেকে সপ্তম অঙ্কের মাঝামাঝি পর্যন্ত দীর্ঘবিলম্বিত বিরহ। নাটকের বাধা ধীরে ধীরে চরিত্রের অন্তরে সংক্রমিত হয়ে তাকে পূর্বের লঘু কামনার উচ্ছলতা থেকে প্রেমের গভীরতায় উত্তীর্ণ করে দেওয়ার পরে আসছে মিলন।

এ মিলনও কিন্তু আপেক্ষিত ছিল; দুর্বাশার শাপের খণ্ডনের জন্যে যখন প্রিয়ংবদা ঋষিকে অনুনয় করেন তখন ঋষি বলেন, অভিজ্ঞান দেখলে রাজার বিস্মৃতি কেটে যাবে। অতএব ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথম থেকে আমাদের প্রত্যাশা জন্মায় নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটবে। কালিদাসের নাটকগুলিতে দেখছি মিলনের বাধা আগন্তুক বা আপতিক থেকে ক্রমে ক্রমে নাট্যবস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হয়ে যাচ্ছে। চরিত্রের গহনে তার মূল প্রোথিত হচ্ছে এবং দুঃখ স্বল্পস্থায়ী বা গৌণ ভূমিকা থেকে ধীরে ধীরে অধিক তাৎপর্য ও স্থায়িত্ব লাভ করছে। কিন্তু নাটক অনিবার্যরদাপেই হর্ষান্ত।

মুদ্রার্যক্ষস-এ নাট্যবস্তু পৃথক গোষ্ঠীর: রাজনীতির পটভূমিকায় দুটি মুখ্য চরিত্র চাণক্য ও রাক্ষসের অভীষ্ট এবং প্রযত্নের সংঘাতই এ নাটকের কাহিনি। এখানেও বাধা বহিরাগত এবং সমাধান ঘটছে চাণক্যের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা। দুটি চরিত্রই এক অর্থে নায়ক কারণ, রাক্ষস প্রচলিত অর্থে প্রতিনায়ক

একেবারেই নয়; সংঘাত শ্রেয় এবং শ্রেয়স্তরের মধ্যে। ঘটনা প্রধানত যেন ঘটছে দুটি চরিত্রের চিত্তমঞ্চেই, এবং পরিণতি আসছে প্রবল আবেগ বা হর্ষের মধ্যে নয়, বরং আবেগের প্রশমনের মধ্যেই।

মৃচ্ছকটিক-এ চারুদত্ত ও বসন্তসেনার মিলনের বাধা বাইরে বটে। কিন্তু সে বাধা সমাজের এবং আপাত ভাবে দূরপনেয় কারণ বসন্তসেনা গণিকা, একমাত্র ধনের সাহায্যে চারুদত্ত তাঁকে পেতে পারেন এবং নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকেই শুনি, চারুদত্ত দরিদ্র। কাজেই এ বাধা গুরুতর, এবং এরই সঙ্গে আর এক বাধা হল ধনী সংস্থানক বসন্তসেনাকে কামনা করে। এতে জটিলতা নাটকে বেড়েছে, কারণ সংস্থানক প্রবল প্রতিপক্ষ। কাজেই এ নাটকের বাধা সম্পূর্ণ ভাবে বহিরাগত নয়; সমস্ত নাটক জুড়ে নায়ক-নায়িকার প্রেম অন্ধ গলিতে মাথা ঠুকে মরে। সমাধান আসে। দশম অঙ্কে কতকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে; কিন্তু সম্পূর্ণ প্রস্তুতিহীন নয়। এ সমাধান, কারণ নেপথ্যে যে রাজপরিবর্তন ঘটছে তার প্রস্তুতি নাটকে দীর্ঘকাল ধরেই চলছিল: শর্বিলক, রেভিল, দর্দুরক—এরা ধীরে ধীরে রাজা পালকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করে আর্যককে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। এই রাজপরিবর্তনের ফলে পূর্ব উপকার স্মরণ করে আর্যক চারুদত্তকে সম্পত্তি ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বসন্তসেনাকে গণিকত্ব থেকে মুক্তি দেন; তার ফলে চারুদত্ত তাকে বিবাহ করতে পারেন। এ নাটকের হর্যন্ত পরিণতি দশম অঙ্কের একেবারে শেষ অংশটুকুতে: দীর্ঘ নয় অঙ্কেরও বেশি নায়ক-নায়িকার প্রেম নিষ্পরিণাম দুঃখে আচ্ছন্ন। কাজেই ঠিক দুঃখান্ত না হলেও প্রকৃত অর্থে এ নাটককে হর্যন্তও বলা যায় না, বরং প্রতিহত দুঃখান্ত (averted tragedy) বলাই বোধহয় সংগত হবে। নাটকের মূল সুর করুশই ছিল শেষ অঙ্কের প্রথমার্থ পর্যন্ত। চসারের সংজ্ঞায় মৃচ্ছকটিক দুঃখান্ত নাটক, কিন্তু এবা অন্ত্যভাগে মিলন ও হর্ষ।

তেমনই উত্তররামচরিত। এ নাটক প্রথম অঙ্ক থেকে শেষ অঙ্কের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ছিল। দুঃখে মগ্ন: রামচন্দ্র ও সীতা দুজনের দুঃখই স্বতন্ত্র ভাবে অঙ্কের পর অঙ্ক জুড়ে দেখানো হয়েছে। সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার পর আর যে রামচন্দ্রের সঙ্গে তার মিলন হবে তার কোনও ইঙ্গিত নাটকে তো নেই-ই, মহাকাব্যেও ছিল না। ভবভূতি বলেছেন,

একে রসঃ করুণ এক নিমিত্তভেদাদ
ভিন্নঃ পৃথক পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তন।
অম্ভো যথা সলিলমের তু তৎ সমগ্রম।

এক করুণ রসই নিমিত্তভেদে ভিন্ন ভাবে পৃথক পৃথক রূপভেদকে আশ্রয় করে, জল যেমন আবর্ত, বুদ্বুদ ও তরঙ্গময় বিকারকে (আশ্রিয় করে); কিন্তু সমগ্র ভাবে তা জলই। (৩:৪৭)

এই বাণী যে-নাটকের মর্মকথা তার স্বাভাবিক পরিণতি দুঃখান্ত; কিন্তু সপ্তম অঙ্কে অপেক্ষাকৃত দুর্বল নাটকীয় সংযোজনে তা হর্ষান্ত হয়ে উঠেছে। কেন? সম্ভবত যে নির্দেশ সমাজে চলিত ছিল–বিয়োগান্তং ন নাটকম–তারই প্রভাবে।

কিন্তু কেন এ নির্দেশ অথবা এ মনোভাব? জীবনে যেখানে বিয়োগান্ত ও দুঃখান্ত ঘটনা প্রচুর দেখা যায়, অন্যান্য সাহিত্য যেখানে দুঃখান্ত পরিণতিকে পরিহার করেনি। সেখানে সংস্কৃত সাহিত্যে এ সম্বন্ধে এত কুণ্ঠা কেন? এর একাধিক কারণ থাকাই স্বাভাবিক। গ্রিক ধর্মে স্বর্গনরকের সঙ্গে পাপপুণ্যের যোগাযোগ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে জানা যায় না। এবং পরবর্তী পর্যায়ের মিস্ট্রি’ অর্থাৎ গুঢ় ধর্মবিশ্বাসের প্রস্থানগুলির (ডিওনিসীয় ইলিউসিনীয় বা অফিক ইত্যাদি) উত্থানের পূর্বে মৃত্যুর পর অনন্ত সুখভোগের ধ্রুব কোনও পন্থা উদ্ভাবিত হয়নি; কাজেই দুঃখান্ততার একটা বাস্তব ভিত্তি ছিল পরলোকতত্ত্বেও। খ্রিস্টধর্মে স্বর্গ-নরকনির্ভর করে পাপপুণ্যের ওপরে এবং দুটিই অনন্তকালের, অর্থাৎঅনন্ত দুঃখড়োগের সম্ভাবতা ধর্মের মধ্যেই নিহিত

ছিল। জন্মান্তরবাদ না থাকায় দুঃখের আত্যন্তিকতা এক ধরনের বাস্তব সম্ভাবনারূপে মানুষের মনে জাগরূপ ছিল; হয়তো তা আশঙ্কার, তার প্রতিকারের উপায়ও শাস্ত্র বলেছে, কিন্তু বেশ কটি মহাপাতকের (deadly sins) উল্লেখও আছে যার কোনও প্রতিকার নেই, কাজেই অনন্ত দুঃখের আতঙ্কটা বাস্তব ছিল।

ভারতবর্ষে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে পঞ্চম বা চতুর্থ শতকের মধ্যে উপনিষদের ভাবধারা ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মাণ্য উভয় ধর্মই এবং জৈন ধর্মও, জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ স্বীকার করে, অন্যান্য গৌণ সম্প্রদায়গুলিও করত। পাপের ফলে নরক, হীনজন্ম, প্রেতিযোনি, ইত্যাদি নির্ধারিত ছিল ঠিকই, কিন্তু জন্মান্তরীবাদের ফলে কোনও অবস্থাই চিরস্থায়ী বা আত্যন্তিক নয়। বহু জন্ম পরিক্রমার পরে একেবারে শেষ অবস্থাটি দুঃখের নয়, তা সে মোক্ষই হোক আর নির্বণই হোক। ফলে দুঃখের একান্তত দর্শন এবং প্রচলিত সমাজবোধ থেকে অন্তর্হিত হল। মানুষ এ জীবনে দুঃখ পেতে পারে, সে তার পূর্বজন্মে কৃত অপকর্মের ফল, কিন্তু পুণ্য অর্জন করতে করতে ধীরে ধীরে সে মোক্ষ বা নির্বাণের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। এই বৃহত্তর পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে দুঃখ একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র, অন্তিমে সুখভোগ অবধারিত; লক্ষবর্ষ পরে হলেও সেইটিই চূড়ান্ত পরিণতি। এই বোধ দুঃখান্ত পরিণতিকে অস্বীকার করবেই।

অ্যারিস্টটল দুঃখান্ত নাটকের যে সংজ্ঞানিরুপণ করেছেন তা হল: ‘দুঃখান্ত নাটক’ এমন নাট্যকর্মের অনুকৃতি যা গভীর এবং সম্পূর্ণ. (যা) করুণা ও আতঙ্কের উদ্রেক ঘটায় এবং ওই আবেগগুলির প্রশমন ঘটায়। (Tragedy, then is an imitation of an action that is serious and complete...exciting pity and fear, bringing about the catharsis of such emotions.) (ষষ্ঠ অধ্যায়)

মনে রাখতে হবে এই দুঃখান্ত নাটকেই অ্যারিস্টটল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর সংজ্ঞায় ‘গম্ভীর’ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ কবিদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, যাঁরা গভীর শ্রেণির (কবি) তারা নাটকে মহৎ কর্ম ও মহামানবদের কর্মের অনুকরণ করেন। (Those who were of a graver sort imitated apiendid deeds and actions of great men.) (চতুর্থ অধ্যায়) গভীর বিষয় কী, সে সম্বন্ধে বলছেন, নাটকে চরিত্র থাকবে. যখন কথা বা কাজ স্পষ্ট সূচিত করবে একটি নৈতিক কর্তব্য নির্ণয় যার দ্বারা নির্ধারিত হবে চরিত্র কেমন ধরনের হবে, কর্তব্য নির্ণয় সৎ হলে চরিত্রটি সৎ হবে।’ (There will be character... if speech or act clearly shows a moral choice indicating what sort of a peron the agent is; his character will be good if his choice is good) (পঞ্চদশ অধ্যায়) বিষয়ের গাম্ভীর্য, নৈতিক ইতিকর্তব্যতানির্ণয়ের দ্বারা মহৎ হয়ে ওঠা চরিত্রের নায়ক এবং তার গভীর ও সম্পূর্ণ কর্মের দ্বারা দর্শকচিত্তে আতঙ্ক ও করুণার সৃষ্টি এবং নাটকের গতির মধ্যে ওই আবেগ দুটির প্রশমন– এ সংজ্ঞাটির মধ্যে জীবন সম্বন্ধে এমন একটি বোধের লক্ষণ আছে যা সংস্কৃত অলংকারসাহিত্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আতঙ্ক এবং করুণা–দুটির কোনওটিরই উল্লেখ সংস্কৃত কোনও অলংকারগ্রন্থে নাটকের সম্বন্ধে করা হয়নি। নৈতিক ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের মধ্যেই নাট্যবস্তু গভীরতা অর্জন করে। সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রে নায়িকার প্রকারভেদ শুধু প্রেমের অবস্থাভেদ, আর নায়ক হয়। ধীরোদাত্ত, নয় ধীরললিত, অথবা ধীরোদ্ধত, কিংবা নয় ধীরপ্রশান্ত। চারটিই সৎ, এবং অবস্থাবিশেষে তারা কী ভাবে ইতিকর্তব্যতা স্থির করবে তা তাদের প্রকারভেদের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত।

সমগ্র সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে মহাকাব্য দুটি থেকে নেওয়া চরিত্র ছাড়া কবিকল্পিত কোনও মন্দ চরিত্র নেই, একমাত্র ব্যতিক্রম মৃচ্ছকটিক-এর সংস্থানক। অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ দুর্বাসা, উত্তররামচরিত-এ দুমুখ বা

মালতীমাধক-এর কা◌েপালিকও মন্দ, কিন্তু নাট্যকাররা এদের নাটকে সত্যকার চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করেননি। এরা নাট্যবস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন উপচরিত্র এবং দুর্দৈবের প্রতীক বা কর্মকর; কাজেই এদের মন্দত্ব নাটকের প্রাণকেন্দ্রের বাইরেই থেকে যায়, নাটককে স্পর্শ করে না।

মনে রাখতে হবে, সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের মতে নাটকও কাব্য। দৃশ্যকাব্য– কাজেই কাব্য সম্বন্ধে মৌলিক যে বোধ সেখানে পাই তা নাটক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোনও উদ্ভাবনের অবকাশ নাটকে নেই, নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ— নাটকের ঘটনা বিখ্যাত (অর্থাৎ সর্বজনবিদিত) হতে হবে।' কাব্যের যা উদ্দেশ্য মোটামুটি ভাবে নাটকেরও তাই, অর্থাৎ 'কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবতরক্ষতয়ে/সদ্যঃ পরনির্বতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশ যুজে–কাব্য যশ ও অর্থের জন্যে, নীতিজ্ঞানের জন্যে অমঙ্গলনাশের জন্যে, তৎক্ষণাৎ পরম আনন্দলাভের ও বধূর মতো উপদেশ দেওয়ার জন্যে।' (কাব্যপ্রকাশ ১:২) এই উপদেশ দেওয়ার শাস্ত্রীয় ভঙ্গিও তিনটি: বেদাদি গ্রন্থে যেমন অনুশাসন থাকে, এটা কর, ওটা কোরো না; তা হল গুরুসম্মিত। অথবা মহাকাব্যে যেমন কাহিনি ও উপদেশের মাধ্যমে বলা হয়ে কি করা উচিত বা নয়; তা হল বন্ধুর মতো করে বলা, সখিসম্মিত। যেমন 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ–রামের মতো আচরণ করা উচিত, রাবণের মতো নয়।' আর কাব্য কোনও উপদেশই সরাসরি দেবে না। শুধু কাহিনিটুকু বলেই ক্ষান্ত হবে, তা হল কান্তাসম্মিত। নাটকে এ উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু নাট্যশাস্ত্রগুলি নীরব। ভারতের নাট্যশাস্ত্র-তে ব্রহ্মা বলছেন, 'ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যঞ্চ যদ্ভবেৎ–একটি খেলনা চাই যা দৃশ্য ও শ্রব্য হবে অর্থাৎ মঞ্চে অভিনীত হলে, যা শোনা ও দেখা যাবে।' (১:২) আর বলছেন, 'বিনোদকরং লোকে নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি . ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ—পৃথিবীতে এই নাটক হবে বিনোদনের উপকরণ, ধনীদের বিলাস

(হবে)।’ (১:১১৯-২০; ১:১১) আরও স্পষ্ট করে বলা আছে, ‘দুঃখার্তিশোকনির্বেদখেদবিচ্ছেদকরণম। অপি ব্রহ্মপরানন্দাদিন্দমভধিকং পরম/জহার নারদাদীনাং চিত্তানি কথমন্যথা।–‘দুঃখ, আর্তি, শোক, নির্বেদ, খেদের অবসান ঘটায়, (নাটক), ব্রহ্মাপরানন্দের চেয়েও অধিক এই (নাটক সঞ্জাতি) পরম আনন্দ, না হলে (নাটক) নারদ-আদি (ঋষি)-দের চিত্তরহরণ করল কি করে?’ (১:১১)

তাহলে মূল বিবক্ষিত দাঁড়াল এই দুঃখ শোক ও আর্তির জগৎ থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে নেওয়ার উপায় হল নাটক। তাই এটা খেলনা, ক্রীড়নক, যা দিয়ে লোকে শিশুকে ভোলায়; এ হল চিত্তবিনোদনের উপায়, এবং ধনীদের বিলাস। শুধু যে বাস্তব থেকে মনকে সরিয়ে দেওয়ার, ছেলে-ভোলাবার ক্রীড়ানক তাই নয়। এর শ্রেণিচরিত্রও স্পষ্ট: ঈশ্বরাণাং বিলাসশচ–ধনীদের বিলাস। নিশ্চয়ই সমাজে অন্য রকম নাটকও ছিল যা সাধারণ মানুষ রচনা করত, অভিনয় করত এবং দেখত। তা যে ছিল তার প্রমাণ হল বিংশতি ভেদ রূপক বা নাটকের, এবং তার মধ্যে আট দশ প্রকারই মাত্র পাওয়া যায়। বাকিগুলি নিশ্চয়ই শিক্ষিত ও ধনীদের বিলাসের পর্যায়ে উঠতে পারেনি তাদের দৈনন্দিন বা নিচুতলার জীবনযাত্রার অতিসাধারণতায় এবং অমার্জিত রচনাভঙ্গির জন্যে। হয়তো তা রিসোত্তীর্ণও ছিল না। সব সময়ে, কিন্তু এ কথা জোর করে বলা যায় না, কারণ অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল বহু ভাণ। রক্ষণ পেয়েছে নাগরিক জীবনের বিলাসচিত্র বলে। এগুলির অধিকাংশেরই বিন্দুমাত্র সাহিত্যিক উৎকর্ষ নেই তাও। কাজেই যা রক্ষা পায়নি তা সাহিত্যিক কারণে নয়। সামাজিক কারণেই হয়তো পায়নি এমন অনুমান অসংগত হবে না।

যা বিলাস যা ক্রীড়নক তা গভীর বিষয় পরিহার করবে। এ তো স্বতঃসিদ্ধ। তা বিনোদনের জন্যে বাস্তবের রূঢ়তাকে এড়িয়ে যাবে, কারণ দুঃখ, খেদ,

আর্তি এ সব থেকে চিত্তকে সরিয়ে আনাই তো তার উদ্দেশ্য। ফলে অ্যারিস্টটল যাকে গভীর বিষয় বলেছেন, জীবন সম্বন্ধে মৌলিক জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের ওপরে যার ভিত্তি, প্রচলিত মূল্যবোধগুলির পুনর্মূল্যায়ন যার লক্ষ্য, তা সংস্কৃত নাটকের উপজীব্য হতে পারল না। ‘কাব্যামৃতরসাস্বাদ’ যদি ব্রহ্মাস্বাদসহোদর’ হয় তাহলে কাব্য এবং নাটক দৃশ্যকাব্য ঐহিক জীবনের সুখদুঃখ প্রশ্ন সমস্যাকে পরিহার করে তুরীয় ভাবের সন্ধান করবে। অভিনয় দর্পণ-এ নাটকের করণীয় কি তা বলা আছে: ‘কীর্তিপ্রাগলভ্যসৌভাগ্য বৈদগ্ধ্যানাং প্রবর্ধনম/ঔদার্যস্থৈর্যানাং বিলাসস্য চ কারণম।— কীর্তি, প্রগলভ্যতা ও পাণ্ডিত্যের প্রবর্ধক, ঔদার্য, স্থৈর্যও বিলাসের কারণ (নাটক)।’ অর্থাৎ এ পণ্ডিত ও ধনীর দ্বারা ও জন্য রচিত সাহিত্য। প্রাচীন কালের ভরত থেকে অনেক পরের এই অভিনয় দর্পণ পর্যন্ত সকলেই বিলাসের উল্লেখ করছেন; এবং বিলাস আর যাই হোক জীবনজিজ্ঞাসা নয়। দশম শতকের সাগর নদী তাঁর নাটকীলক্ষণরত্নকেশ গ্রন্থে নাটকের যে সংজ্ঞা দেন তা-ও এই ধরনেরই:

ধর্মাদিসাধনং নাট্যং সর্বদুঃখাপনোদকৃৎ।

অনুসেবধ্বমূষস্তস্যোত্থানং তু নাটকম।

‘ঋষিগণ, আপনারা ধর্ম ইত্যাদির সাধন এবং সকল দুঃখের নিবারক নাট্যের অনুশীলন করুন, নাটক তারই উৎকর্ষ’ (১:৪)

ভামহ কাব্যের সংজ্ঞানিরাপণে বলেছিলেন:

ধর্মার্থকামমোক্ষ্যেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।

করোতি কীর্তিং শ্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম।

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং কলাগুলিতে বিচক্ষণতা এবং কীর্তি ও শ্রীতি লাভ করা যায় সৎকাব্য সেবনে। (কাব্যালংকার ১:১)

ধনঞ্জয় তার দশরূপক নামের বিখ্যাত নাটকসম্বন্ধীয় গ্রন্থে এই সংজ্ঞার প্রতি শ্লেষ করে বলেন :

আনন্দনিষ্যন্দিষু রূপকেষু বুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।

যোহপীতিহাসদিবদাহ সাধুস্তস্মৈ নমঃ স্বাদুপরাঙামুখায়।।

আনন্দনির্বর নাটক থেকে ইতিহাস্যাদির মতো পাণ্ডিত্যমাত্র ফল (পাওয়া যায়) এমন কথা যে সাধু বলেন সেই স্বাদু (বস্তুতে) বিমুখ সাধুকে নমস্কার। (১:৬)

এখানে লক্ষণীয় যে, পূর্বতন গ্রন্থকার নাটক দর্শন ও শ্রবণের ফলগুলির মধ্যে ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ, ইত্যাদি এনে যদিও এগুলি জীবনজিজ্ঞাসার অনুকুল নয়। তবুও–এই সংজ্ঞার মধ্যে কিছু গভীর তাৎপর্যের অবকাশ রেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থকার ধনঞ্জয় তা নিয়ে পরিহাসই করলেন, কারণ তার মতে নাটক বিশুদ্ধ আনন্দেরই নির্বর। এই সংজ্ঞায় নাটকের পরিসর সংকীর্ণ ও অগভীর হয়ে রইল। শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ, হ্যামলেট বা লীয়ারকে তো বিশুদ্ধ আনন্দের নির্বর বলা যাবে না। যেমন সফোক্লিসের ঈডিপাস রেক্সকেও বলা যাবে না, অথচ পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের তালিকায় তো এদের স্থান শীর্ষভাগে। কাজেই ওই গভীর বিষয় পরিহার করে, নৈতিক সংঘাতকে বর্জন করে, ক্রীড়নক ও বিনোদন নির্মাণেই যদি নাটক পর্যবসিত হয় তো মানুষ তা দেখবে, শুনবে বা পড়বে শুধু চিত্তবিনোদনের জন্যেই, জীবনকে নতুন করে বোঝবার বা জানিবার জন্যে নয়। এটা সংস্কৃত নাটকের একটা অভিশাপ।

শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকগুলিতে বস্তুর (plot) বৈচিত্র আছে, শক্তিশালী আবেগের চিত্রণ আছে, প্রচুর চিত্তহারী বর্ণনা আছে মানুষের ও প্রকৃতির, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের যা প্রাণবস্তু, জীবনের পুনর্মূল্যায়ন, জীবনবোধের প্রসার–তা নেই। এর একটা কারণ হল, চরিত্রনির্মাণ সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রগুলি কোনও স্বতন্ত্র চিন্তার

পরিচায় দেয়নি। নৈতিক সংঘাত প্রতিফলিত হবে তো চরিত্রকে অবলম্বন করেই, কিন্তু সে রকম কোনও নির্দেশ কোনও নাট্যশাস্ত্রে নেই। বিষয় যেখানে বহুলাংশে মহাকাব্যনির্ভর, সেখানে ছোটখাটো বৈচিত্র্যের চমক ছাড়া উদ্ভাবনের ক্ষেত্র নেই এবং নৈতিক সংঘাত সম্বন্ধে কোনও নির্দেশ না থাকায় তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেও শাস্ত্রমতে নাটকের অঙ্গহানি হয় না। তাছাড়া সৌন্দর্যসৃষ্টিই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে প্রচুর গীতিকাব্যধর্মী মনোজ্ঞ বর্ণনার সমাবেশ থাকলেই চলে। এ কথা ঠিক যে, চরিত্রকে নৈতিক সংঘাতের সম্মুখীন করে, বহু দুঃখের মূল্যে সে শ্রেয়কে বরণ করছে এমন ঘটনার অবতারণা করতে পারলে উন্নত এক স্তরে সৌন্দর্যসৃষ্টি করা যায়–পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি যা করেছে–কিন্তু তাহলে তা বিনোদন হয় না, ক্রীড়ানক হয় না; ধনীর বিলাসর উপাদানও হয় না। যা হয় তারা কোনও সংজ্ঞাই নেই নাট্যশাস্ত্রে।

হেরোডোটাস বলেছেন, 'সকলের চেয়ে তীব্র দুঃখ যা মানুষ উপলব্ধি করে তা হল অনেক কিছু সম্পাদন করবার উচ্চাশা নিয়ে কিছুই না করতে পারা।' (৯ম খণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়) যে সব দুঃখের উপলব্ধির মধ্যে নায়ক বা নায়িকাকে অবলম্বন করে দর্শক বা পাঠক জীবনের নতুন অর্থের সন্ধান পায় হেরোডোটাস তার একটি সংজ্ঞা দিলেন। আধুনিক নাট্যসমালোচক জর্জ স্টাইনার বলেন, 'প্রাচ্য শিল্পে হিংস্রতা আছে, দুঃখ আছে এবং স্বাভাবিক বা পরিকল্পিত ভাগবিপর্যয় আছে.. কিন্তু ব্যক্তিগত বেদনার ও শৌর্যের যে চিত্রণকে আমরা ট্র্যাজেডি বলি তা হল প্রতীচ্যের শিল্পেরই বৈশিষ্ট্য।... ট্র্যাজেডির নায়ক যে শক্তির দ্বারা বিধবস্ত হয় তাকে সে সম্পূর্ণ বুঝতেও পারে না; চিন্তাপ্রসূত বিচক্ষণতার দ্বারা জয়ও করতে পারে না। আবার এইটিই হল ট্র্যাজেডির কেন্দ্রীয় বস্তু। যেখানে বিপর্যয়ের হেতুগুলি সাময়িক, সেখানে গভীর নাটক হলেও হতে পারে। কিন্তু (যথার্থ) দুঃখান্ত নাটক হতে পারে না।'

(দ্য ডেথ অরস্ট্রাজেডি; ফেবার অ্যান্ড ফেবারি; ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৩ ও ৮) করুণ রস থাকলে করুণরসপ্রধান নাটক হতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা কোনও নাটক যথার্থ দুঃখান্ত নাটক বা ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে না। করুণরস বা শোকদুঃখ তো বাস্তবে আছে, কাজেই সাহিত্যে তার প্রতিফলন থাকতেই পারে, তার দ্বারা নাটকটি করুণরসাশিত হতে পারে, যেমন উত্তররামচরিত বা মৃচ্ছকটিক, এমনকী নাগানন্দও। কিন্তু যা সত্যকার দুঃখান্ত নাটক তার শুধু অন্তে দুঃখ নেই, তার জীবন-উপলব্ধির প্রতিক্রিয়াটির মধ্যেই দুঃখ ওতপ্রোত ভাবে অনুসূদৃত। যেখানে মর্মর্যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জীবনের এক নতুন বোধে উত্তরণ ঘটে নায়ক বা নায়িকার। নীটশে বলেন, 'শিল্প বাস্তবের অনুকৃতি নয়, তার দার্শনিক উপসংহার, বাস্তবের পাশাপাশি তাকে সৃষ্টি করা হয়, যাতে তার দ্বারা বাস্তবকে জয় করা যায়।' (দ্য বার্থ অব ট্র্যাজেডি, ডাবলডে এঙ্কর; ১৯৫৬ ১৪২ পৃষ্ঠা) এরই পাশাপাশি মনে পড়ে 'রূপং দৃশ্যতয়োচ্যতে রূপকং তৎসমারোপাৎ–রূপের আরোপ হয় বলে রূপক (=নাটক), অথবা অবস্থানুকৃর্তিনাট্যম' (দশরূপক ১:৭) এই অনুকৃতি যদি শোকের হয় তবু তা একটি অনুকৃতিমাত্রই, তার দ্বারা জীবনবোধের কোনও প্রসার ঘটে না যদি না মৌলিক কোনও প্রশ্নও তার সঙ্গে উত্থাপিত হয়। যেমন হয়েছে কতকটা মৃচ্ছকটিক বা উত্তররামচরিত-এ যেখানে ভাগ্যবিপর্যয়কে বোঝবার জন্যে একটা অনুচ্চারিত আকৃতি নাটকটিকে কতকটা প্রশ্নকািন্টকিত করে রাখে।

বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মা হলেন রস-স্বরূপ, রিসো বৈ সঃ'; এই রস আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'। এবং জীবন ব্রহ্মাস্বরূপ। কাজেই জীবনের পরিকল্পনায় বেদনার আত্যস্তিকতার স্থান নেই। ধ্বন্যালোক, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর, ইত্যাদি প্রখ্যাত অলংকরশাস্ত্রগুলি সবই বেদান্ত নির্ভর, বেদান্ত অন্য সব দর্শনপ্রস্থানগুলিকে গ্রাস করে রেখেছিল। এখনও রেখেছে, কাজেই ভারতবর্ষ উচ্চাররণ করেছে এবং বিশ্বাস করবার সাধনা করেছে যে: আনন্দাদ্ধেব

খল্বিমানি ভুতানি জায়ন্তে/আনন্দেন জীতানি জীবন্তি/আনন্দং প্রখন্তি অভিসংবিশন্তি!—আনন্দ থেকে জীব জাত হয়, আনন্দে বেঁচে থাকে, চলার শেষে আনন্দেই অভিপ্রবিষ্ট হয়।' (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ৩:৬) দুঃখের স্থান কোথায় এখানে? বাস্তবে দুঃখের যে অনুভূতি? খাঁটি বৈদান্তিক দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত দুঃখ মায়া, প্রতিভাস, রজজুতে সর্পভ্রম। অর্থাৎ দুঃখ অঙ্গ-রাসের মতো নাটকে আনাগোনা করতে পারে প্রয়োজন মতো, কিন্তু নাটকের শেষে সেই সুর বাজবে না কোনও মতেই; শেষে উষ্চারণ করতে পারা চাই 'ওঁ শাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ'। বলতে পারা চাই অথর্ববেদ-এর ভাষায়, 'যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছন্তিং তাচ্ছিবং সর্বামিহাশমন্তু নঃ।–এ পৃথিবীতে যা কিছু ঘোর, ক্রুর ও পাপ তা শান্ত হোক, মঙ্গল হোক, আমাদের সব কিছু শান্তিময় হোক।' (১৯:৯:১৪) প্রার্থনাটি অনাদিকাল থেকে সৃষ্টির বুক চিরে উঠছে, কিন্তু সাহিত্য যখন প্রার্থিতকে লব্ধ বলে মনে করে তখনই তা যথার্থতার সীমা ছেড়ে যায়। এ দর্শনের প্রবল পরাক্রমকে অস্বীকার করবার মতো শক্তিমান শিল্পী ব্যাসবাল্মীকির পরে দেখা দেয়নি। শুধু একবার কালিদাস তাঁর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রঘুবংশ-এ সাহস করে দুঃখ ও অবক্ষয়ের এমনই এক চিত্র আঁকলেন কাব্যের অন্তভাগে যে তার পরে আর 'ওঁ শাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' বলাও কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু নাটকে? সে যে দৃশ্যকাব্য; যেখানে নাটক দেখার শেষে প্রেক্ষকরা কোনও প্রশ্ন, কোনও গভীর সংশয় কোনও দ্বিধাব্যাকুলতা নিয়ে রঙ্গস্থল ত্যাগ করলে তো চলবে না। মনে রাখতে হবে, নাটকের যে কটি প্রকারভেদ সমধিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেমন নাটক নাটিকা প্রকরণ, ব্যায়োগ ভাণ, ইত্যাদি–এগুলির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজারা বা ধনী বণিকরা। গণিকালয়ের মদনমন্দিরের চত্বরে, রাজসভায়, অথবা মন্দিরপ্রাঙ্গণেই নাট্যাভিনয় হত, সর্বত্রই রাজা বা ধনীই পৃষ্ঠপোষক; এবং নাটক হল ঈশ্বরাণাং বিলাসপ্ত'। তারা চিন্তার উপাদান বা জীবন সম্বন্ধে গভীর কোনও সংশয়ে

জর্জরিত হওয়ার জন্যে অর্থব্যয় করত না, চাইত বিনোদন, পেতও তাই; কারণ নাটক সেই খেলানা যা তাদের ভোলাত।

অন্যান্য দেশেও রাজা ও ধনীর আনুকূল্যেই নাটক মঞ্চস্থ হত, কিন্তু সেখানে নাটকের ক্রীড়ানক হওয়ার বা বিনোদন করবার দায় ছিল না। তাই নাটকের কাছে প্রেক্ষকের প্রত্যাশা ছিল জীবনবোধের সম্প্রসারণ, নৈতিক সংঘাতের সম্মুখীন হয়ে নায়ক কেমন করে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষুদ্র স্বার্থকে অতিক্রম করতে পারলেন অশ্রুপাত ও মর্মের রক্তক্ষরণের মূল্যে, তা দেখে তারা নিজেদের জীবনসংগ্রামে শক্তিসঞ্চয় করতে চাইতেন। তাই তারা বলেছেন নাটককে হতে হবে গভীর চরিত্র, নৈতিক সংঘাতে জয়লাভ করার দ্বারা এই গভীরতার মর্যাদা অর্পণ করবে নাটককে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী: তাঁরা পেলেন কালজয়ী গভীর, গভীর জীবনালেখ্য; আমরা পেলাম ক্রীড়নক।

চৌরপঞ্চাশক

চৌরপঞ্চশিক কাব্যটির মোট ৯৮টি পাণ্ডুলিপি এ যাবৎ পাওয়া গেছে (Barbara Stoler Miller: Fantasies of Love thief; Columbia University Press; 1971 a-5) এগুলিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়: উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতীয়। এই দ্বিতীয় পাঠটির দুটি অংশ: (ক) একশোটি কাহিনিমূলক শ্লোক ও মূল কাব্যের চারটি শ্লোক নিয়ে পূর্ব পঞ্চাশৎ; ও (খ) পরিচিত পাঠের পঞ্চাশটি শ্লোকে উত্তর পঞ্চাশৎ, এর অন্তে কয়েকটি অধিক শ্লোক সন্নিবিষ্ট। বিখ্যাত কাটালোগাস্কাটালোগারাম-এ চৌরসুব্রতাপধ্বশিক ও চোরীসুরতপঞ্চশিকা, বিলহশপঞ্চাশক ও শশিকলা পঞ্চাশিক নাম ও কাব্যের উল্লেখ আছে। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপকলাসেন ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গ্রন্থাগারে একখানি কাশ্মীরি পাণ্ডুলিপি পান ও

অধ্যাপক পেত্রুস ফন বোললেনকে দেন; তিনি গণপতির টীকাসমেত একটি জার্মান সংস্করণ ১৮৮৬ সালে প্রকাশ করেন। ওই বছরেই পরে একটি জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হয় (Wilhelm Solf: Die Kashmir Recension der Pancasika) ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ৪৩৮:১৮৮৪-৮৭ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে তিনটি বিভিন্ন পাঠের সংকলন পাওয়া যায়; এতে বিলহণচরিত কাব্যের পরে আরও ৯০টি শ্লোক আছে। তিনটি পাঠভেদের মধ্যে পাঁচটি শ্লোক সাধারণ–এগুলি আর্যাবর্ত পাঠের ১, ২, ১১, ১২ ও ৫০ সংখ্যক শ্লোক। চৌরপঞ্চ শিকা-র টীকাকারদের মধ্যে গণপতি, মহেশ্বর, পণ্ডিত, রাম তর্কবাগীশ (রামোপাধ্যায়) ও রাধাকৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়।

আহমেদাবাদে চিত্রশালায় চৌরপঞ্চশিকা-র আঠারোটি শ্লোকের চিত্রায়ণ সংরক্ষিত আছে, এগুলি পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রকলার রীতিতে ষোড়শ শতকে অঙ্কিত। পদ্মশ্রী মুনি জিনবিজয়জির সৌজন্যে এগুলি মেহতা সংগ্রহে স্থান পায় ও ১৯৬৭ সালে শ্রীমতী লীলা শিবস্বরকার নয়া দিল্লি থেকে এগুলির প্রতিলিপিও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন (The pictures of the Caurapancasika: A Sanskrit Love Lyric). এর আগে বার্লিংটন ম্যাগাজিনের নবতিতম সংখ্যায়। এ ছবিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।)

অনুবাদ

১৮৪৮ সালে প্যারিসে চৌরকাব্যের ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, এইটিই প্রথম বিদেশি অনুবাদ। এর পরে ১৮৯৬ সালে স্যার এডউইন আর্নল্ড ইংরেজি ছন্দে একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ভারতীয় ভাষায় প্রথম গুজরাতিঅনুবাদ(বিটুহলের) প্রকাশিত হয় শশীকলাবিরহবিলাপ নামে ষোড়শ শতকের শেষে; মারাঠি অনুবাদ হয়। ১৬৭১ সালে।

চৌরপঞ্চাশিকা-র বাংলা অনুবাদ ও ছায়ানুবাদ নানা ভাবে নানা সময়ে হয়েছে। গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলকাব্যে চৌতিশায় (চৌত্রিশটি পদ্যে) সুন্দর বিদ্যাকে স্মরণ করছে। অন্য কবিরাও চৌতিশ লিখেছেন, এগুলিতে স্বর-ব্যঞ্জনক্রমে আদ্যাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেক পয়ারের আদিতে। বাংলা অনুবাদে নায়িকার নাম কোথাও শশিকলা, যা যামিনীপূর্ণ তিলকা নয় নায়কও চোর বা বিলহণ নয়–সর্বত্রই নায়িকা বিদ্যা, নায়ক সুন্দর। এর কারণ মনে হয় চৌরপঞ্চ-শিকা-র প্রথম শ্লোকের শেষ চরণটি–'বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি–মনে হয় সে যেন মোহাচ্ছন্ন বিদ্যা।' এর থেকেই নায়িকা বিদ্যা নাম পেয়েছে। বাংলায় তাই মঙ্গলকাব্যের এই অংশটি বিদ্যাসুন্দর নামেই পরিচিত। কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলে সুন্দর রাজার কাছে নটি শ্লোক পাঠ করছেন, এগুলি চৌরকাব্যের নটি শ্লোকের অনুবাদ।

কাশীনাথ ব্রজবুলিতে কিছু কবিতা রচনা করেছেন (সুর-সংযোগে)। যা চৌরপঞ্চশিকা-র অনুবাদ বা ভাবার্থ নয়, বরং বিলহণ কাব্যের অনুসরণে বিদ্যাসুন্দর কাব্য। বস্তুত বিদ্যাসুন্দর কাব্যাংশগুলির আখ্যানভাগ বিলহণ কাব্য থেকেই সংগৃহীত। অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের বিন্দাসুন্দরই সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানে সুন্দর রাজার সামনে চৌরপঞ্চাশিকা-র প্রথম ও শেষ শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করে (ক' পুথি অনুসারে অবশ্য সমগ্র চৌরপঞ্চাশিকারই বাংলা অনুবাদ)। রাজা কন্যার রূপ ও সম্ভোগ-শৃঙ্গারের বর্ণনায় লজ্জিত হন, শ্মশানে সুন্দর পঞ্চাশটি পয়ারে কলিকার স্তব করেন। চৌতিশার মতো এগুলিরও আদ্যাক্ষর স্বর-ব্যঞ্জন-ক্রমে বিন্যস্ত। দেবী স্বয়ং অভয়দান করলে রাজার চেতনা হয় এবং বিদ্যা ও সুন্দর কৈলাসশিখরে যান। অষ্টাদশ শতকের শেষে (১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে) টীকাকার রাম তর্কবাগীশ দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেন যে চৌর কবি সুন্দর দেবী কালিকার উদ্দেশে শ্লোকগুলি রচনা করেন।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে কবীন্দ্র মধুসূদন চক্রবর্তী সম্পূর্ণ চৌরপঞ্চাশক-র অনুবাদ করেন। পয়ার ছন্দে। ওই শতকেরই শেষার্ধে দ্বিজ রাধাকান্ত মিশ্রের বিদ্যাসুন্দর-এ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সুন্দর রাজার সামনে চৌরপঞ্চশিকার প্রথম সাতটি ও শেষ দুটি শ্লোকের অনুবাদ করেন ও শ্মশানে চৌতিশায় কালীর স্তব করেন। ভারতচন্দ্রের সমকালীন কবি রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে চৌরপঞ্চাশিকা-র প্রথম দুটি, আটাশ ও শেষ, শ্লোকের অনুবাদ করেন।

বররুচির প্রণীত বলে খ্যাত একটি বিদ্যাসুন্দর কাব্য আছে, এটি সংস্কৃতে বিদ্যা ও সুন্দরের উক্তি–প্রত্যুক্তিক্রমে ৫৭টি শ্লোকে রচিত। (এটি শ্রীপ্রফুল্ল পালের অনুবাদে শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ বসুমতী সংস্করণে প্রকাশ করেন ১৮৭৩ সালে।) পরিশেষে, অনেক বাংলা মঙ্গলকাব্যে বিদ্যাসুন্দর অংশে সুন্দরের মুখে দ্ব্যর্থবোধক পঞ্চাশটিবাংলা কবিতা পাওয়া যায়তার প্রত্যেকটির যুগপৎ বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে ব্যাখ্যা সম্ভব। কাশীনাথ সার্বভৌম চৌরপঞ্চাশিকা-র যে টীকা করেন এ ধরনের দ্ব্যর্থক অনুবাদ তারই ভিত্তিতে রচিত। অন্যান্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বিদ্যাসুন্দরের দ্ব্যর্থক অনুবাদে কোনও ভণিতা নেই বলে এগুলি ভারতচন্দ্রের বলে মনে করা হত; কিন্তু এখন নিঃসংশয়ে জানা গেছে। এগুলি নন্দকুমার কবিরত্নের অনুবাদ। (১৯৭৪ সালে বিশ্ববাণী থেকে প্রকাশিত শ্রীঅবন্তী সান্যাল সম্পাদিত হাজার বছরের প্রেমের কবিতা-য় শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদে চৌরপঞ্চশিকারনাটিশ্লোকের বাংলা অনুবাদ আছে। ইংরেজিতে প্রাগুক্ত বারবারা স্টোলার মিলার-এর বই ও The Hermit and the Love Thief, Columbia University Press, 1978, বইতে চৌরপঞ্চশিকা-র একই অনুবাদ সন্নিবেশিত আছে।

চৌরকবি ও কাহিনির পটভূমিকা

স্যার আর্নল্ড এডউইনের ধৃত পাঠে চৌরপঞ্চাশক-র পঞ্চাশটি শ্লোকের পূর্বে আরও চুয়াত্তরটি শ্লোক পাওয়া যায়; কাব্যমালার পাঠে এগুলি পূর্বপীঠিক এবং এতে কবির পূর্ব জীবনী আছে, এখানে কবি বিলহণই চোর। শেষের পঞ্চাশটি শ্লোক উত্তরপঞ্চাশৎ, এটিই চৌরপঞ্চাশিকা। বিলহণের পূর্বপীঠিক পড়ে জানা যায় মহিলাপাত্তনে বীরসিংহ নামে এক চাপোৎকট রাজা ছিলেন, চম্পাবতী এর রাজধানী ছিল, ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে এর মৃত্যু হয়। এঁর কন্যার নাম উত্তর ভারতীয় পাণ্ডুলিপিতে শশিকলা এবং কর্ণাটে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে মদনাভিরামের কন্যা যামিনীপূর্ণীতলকা। বিলহণ তাঁর নিজের রচিত বিক্রমাঙ্কদেবচরিত্যগ্রন্থে আত্মকথা কিছু বলেছেন, সেখানে কিন্তু চৌর পঞ্চশিকা-র অনুরদীপ কোনও অভিজ্ঞতার কথাই বলেননি। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিলহণের পরিণত বয়সের রচনা। এখানে যে বিবরণ আছে সে অনুসারে তিনি ১০৬২-৬৫ সালের মধ্যে স্বদেশ পরিত্যাগ করেন ও একাদশ শতকের শেষ দিকে দেশভ্রমণ ও সাহিত্য রচনা করেন। রাজতরঙ্গিনী-র সপ্তম সর্গে দেখি রাজা কলশের রাজত্বকালে বিলহণ তাঁর স্বদেশ কাশ্মীর পরিত্যাগ করে কর্ণাটে যান; সেখানকার রাজা পরমাদি তাকে সভাপতিপদে বরণ করে বিদ্যাপতি উপাধি দেন (শ্লোক ৯৩৫-৩৮; এ উপাধিও কি নায়িকার নাম বিদ্যা'' হওয়ার অন্যতম কারণ?)। বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে বিলহণ বলেছেন, যারা সীমা মেনে চলে না, সর্বদা লজ্জাজনক অশুদ্ধ ভাষা বলে সেই গুর্জরদের পথে পড়ে যে সন্তাপ তিনি অর্জন করেছিলেন সোমনাথ দর্শন করে তা মোচন করেন; এখানে কি চৌরপঞ্চাশক-র অভিজ্ঞতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে?

বিলহণকাব্যে পাই রাজা বীরসিংহ কন্যা শশিলেখার অধ্যাপক রূপে কবিকে নিযুক্ত করেন কিন্তু পাছে পরস্পরের প্রতি তাদের আসক্তি জন্মায় এই আশঙ্কায় তাদের বলেন যে রাজকন্যা কুষ্ঠরোগিণী ও বিলহণ জন্মান্ধ। দারুন্যবনিকার দুই পারে থাকতেন ছাত্রী ও অধ্যাপক। এক পূর্ণিমা রাত্রে

সহসা যবনিকা সরিয়ে পরস্পরকে দেখেন তাঁরা এবং অনুরাগের সঞ্চার হয়; গোপনে তাঁরা নিয়মিত মিলিত হতেন। কিছুদিন পরে রাজা জানতে পারেন ও কবির প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। ঘাতকেরা যখন তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে তখন অতীতের মিলনের স্মৃতি তাঁর মনে উদ্বেল হয়ে ওঠে এবং পঞ্চাশটি শ্লোকে তিনি শেষবারের মতো স্মৃতিচারণ করেন। তাঁর কাব্যনৈপুণ্য এবং আবেগের গভীরতায়, মুগ্ধ অভিভূত রাজা দণ্ড প্রত্যাহার করেন ও সসম্মানে তার হাতে রাজন্যাকে সমর্পণ করেন।

বাংলা অনুবাদে এ-কাব্যের যে পরিণতি হোক না কেন চৌরপঞ্চাশিকা-য় শ্লিষ্ট অর্থ নেই, তার কোনও দ্যোতনাই নেই, এটি স্পষ্টতই শৃঙ্গাররসের কাব্য। প্রাককাহিনিটি ঐতিহাসিক সত্য কিনা সে গবেষণা নির্ম্মফল; আসন্ন মৃত্যুর কালো যবনিকখানি পশ্চাতে আছে মনে রেখে কাব্যটি পড়লে এর তীব্রতা অনুভূত হয় এবং এখানেই সম্ভবত ওই প্রাক কাহিনিটির উপযোগিতা ও সার্থকতা।

প্রভাব

বিলহণ তাঁর কর্ণসুন্দরী কাব্যে বলেছেন যে তিনি কাব্যরচনায় কালিদাসের অনুগামী, একথা চৌরকাব্যে খুব স্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায়; অজবিলাপ ও মেঘদূত-এর বহু অনুকরণ এ কাব্যে পাওয়া যায়। এও এক ধরনের বিলাপকাব্য, কারণ কাহিনি অনুসারে কবি তো জানতেন না যে তাঁর আসন্ন মৃত্যু প্রতিহত হবে। বরং মেঘদূত-এর যক্ষ জানত যে চার মাস পরে তার বিরহের অবসান ঘটবে, চৌরকবি কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাশচিত্তেই প্রিয়তমার স্মৃতিটুকু পাথেয় নিয়ে মৃত্যুপথে অবতীর্ণ। দুই নায়কই নায়িকার ক্ষীণতা সুকুমারতা স্মরণ করে আশঙ্কিত যে এ বিরহ তাদের প্রিয়তমা সইতে পারবে

না। এখানে চৌরপঞ্চাশিকা-য় তীক্ষ্ণতা বেশি, কারণ নায়ক প্রেমের জন্যে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

কাহিনি

সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশ কাব্যনাটকই রামায়ণ-মহাভারত থেকে আখ্যানভাগ সংগ্রহ করেছে, উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে প্রধান উদয়নকথা! বৃহৎকথা-য় এর উল্লেখ থাকলেও নিশ্চয়ই এর আগেই কাহিনিটি জনপ্রিয় হয়েছিল। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে নাট্যকার ভাস এ কাহিনি অবলম্বন করে একাধিক নাটক রচনা করেছেন ও পঞ্চম শতকে কালিদাস যে ভাবে উদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান' বলেছেন মেঘদূত-এ, তাতে মনে হয়। গায়ের ছেলেবুড়ো সকলে ভিড় করে গাঁও-বুড়োর মুখে এই অপূর্ব প্রেম কাহিনিটি তন্ময় হয়ে শুনত। হয়তো দক্ষিণাত্যে এমনই একটি কাহিনি ছিল চোর কবির এই গোপন প্রেমের কাহিনি। দুই কাহিনিতেই গুরু-শিষ্যার প্রেমই কাহিনির মূলবস্তু চৌরকবির কাহিনি এমন করেই স্থানীয় শ্রোতার মর্ম সম্পর্শ করেছিল যে শুনতে পাই:

বসো শুভ্রমৃর্তৃবসন্তসময়ঃ পুষ্পং শরণাল্লিকা।

ধানুষ্কঃ কুসুমায়ুধঃ পরিমলঃ কস্তুরিকাস্ত্রং ধনুঃ।।

বাণী তর্করসোজম্বুলা প্রিয়তমা শ্যামা বয়ো যৌবনং।

মাগঃ শ্যাংকর এব। পঞ্চমলয়া গীতিঃ কবিবিলহণঃ।।

(বসনের মধ্যে (শ্রেষ্ঠ) শুভ্র বাস, ঋতু বসন্ত, ফুল শরতের মল্লিকা, ধনুর্ধর পুষ্পধনু মদন, প্রিয়তম সদ্যযৌবনা নারী, বয়স যৌবন, ধর্মমাগ শৈব, গান পঞ্চমলয়যুক্ত এবং কবিকুলে শ্রেষ্ঠ বিলহণ।)

অত্যুক্তি বাদ দিলেও বিলহণের আঞ্চলিক যশ এ শ্লোকে প্রতিষ্ঠিত।
প্রসন্নরাঘবে জয়দেব কবিতা নায়িকা সম্বন্ধে বলেছেন:

যস্যাশ্চৌরশ্চিকুরনিকারঃ কর্ণপুরো ময়ুরো।

ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।

হর্ষে হর্ষে হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণুসন্মত্স্ত বাণঃ।

কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায়।

(চৌবকবি যাঁর কেশকলাপ, ময়ুর কবি যাঁর কর্ণাাভরণ, ভাস হাসি, কবিকুলগুরু কালিদাস র্যার বিলাস, শ্রীহর্ষ যাঁর আনন্দ, বাণভট্ট যাঁর চিত্তে মদন স্বরূপ এমন কবিতাকামিনী, বল, কার না কৌতুকের হেতু?)

এখানে সম্ভবত প্রচ্ছন্ন প্রেমের কবি বলেই বিলহণকে অন্ধকার কেশকলাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চৌরকবির এই গোপন প্রেম, ধরা পড়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এবং মৃত্যুর ঠিক পূর্বাহ্নে তদগতচিত্তে কবিতায় প্রিয়ামিলনের স্মৃতিমন্থন এবং সে কাব্যের মহিমায় অভিভূত প্রসন্ন রাজার প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে কন্যাদান–এ সমস্ত ব্যাপারটির ঐতিহাসিকতা যত ক্ষীণাই হোক না কেন মৃত্যুর মুখোমুখি এসে প্রেমিকার স্মৃতিতে বিহ্বল কবিচিত্তের এই উচ্ছাস; এটি নিশ্চয়ই আপামর সাধারণের চিত্তজয় করেছিল–এর করুণ মাধুরী দিয়ে। এবং জনমানসে এ কাব্য যে অক্ষয় আসন লাভ করেছিল তা শুধু এর কাব্যমাহাত্ম্যে নয়, ওই আসন্ন মৃত্যুর ক্রুর পটভূমিকার মাাহাত্ম্যেও বটে।

খণ্ডকাব্য চৌরপঞ্চাশিক

চৌরপঞ্চাশিকোকাব্যটি খণ্ডকাব্যের অন্তর্গত অর্থাৎ এ কাব্যে শ্লোকগুলি পরস্পর সংবদ্ধ নয়, কোনও আখ্যান বিবৃত করে না, নুনাধিক পঞ্চাশটি আপাতবিচ্ছিন্ন শ্লোকের সমাহারে কাব্যটি রচিত। এই যুগেই শতককাব্যগুলি

জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর পূর্বযুগে ভর্তৃিহরির শতক ত্রয় (নীতিশতক, বৈরাগাশতক ও শৃঙ্গারশতক), অমরুর অমরুশতক, বাণভট্টের চণ্ডীশতক ময়ূরাকবির সূর্যশতকই সমধিক প্রসিদ্ধশতককাব্য। এগুলির মধ্যে শৃঙ্গারশতক ও অমরুশতকই চৌরপঞ্চাশিকা-র সঙ্গে তুলনীয়। অপরপক্ষে শতককাব্য ছাড়াও শৃঙ্গাররসাশিত কবিতার অনুরূপ সংকলন পাই; এগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কালিদাসের মেঘদূত, পরে এর অনুসরণেও কিছু শৃঙ্গাররসের দূতকাব্য রচিত হয়। সম্ভবত কালিদাসেরও পূর্বে মাত্র বাইশটি শ্লোকের একটি কবিতাগুচ্ছ ঘটকর্পারকাব্য (ইয়াকবি এটিকে প্রাককালিদাস রচনা বলেছেন)। এখানে বিরহিণী মেঘকে দিয়ে বিদেশে প্রেমিককে বার্তা পাঠাচ্ছে। (সম্ভবত এটি ও মেঘদূত দুটিরই ওপর চিনা এক মেঘদূতকাব্যের প্রভাব আছে)। পরবর্তীকালে গোবর্ধনাচার্যের আর্যসপ্তশতী ৭০০টি বর্ণনা। বিষয়গত ভাবে চৌরপঞ্চাশিকা-র সঙ্গে কিছু মিল থাকলেও ময়ুরের কবিত্ব বিলহণের তুলনায় দীন, তেমনই সুভাবিতাবলী বা কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-তে পাণিনির নামে আরোপিত শৃঙ্গাররসাত্মক শ্লোকগুলি চৌরপঞ্চশিকার তুলনায় অপকৃষ্ট। কেবল মেঘদূত, অমরুশতক ও শৃঙ্গারশতক-এর কয়েকটি কবিতা ঘটকপারকাব্য ও গীতগোবিন্দ-এর কিছু শ্লোকের সঙ্গেই চৌরপঞ্চশিকা-র তুলনা চলে। মেঘদূত-এর প্রভাবই এ কাব্যে বেশি; মেঘদূত-এর মতো একটি ছন্দেই সমগ্র কাব্যটি রচিত। কিন্তু মেঘদূতে শ্লোকগুলির বিষয়গত পারম্পর্য আছে, চৌরকাব্যে তাও নেই। আসন্নমৃত্যু প্রেমিকের স্মৃতিতে মিলনের বিভিন্ন লীলায় প্রেমিকার ভূমিকা, রূপ, আচরণ ও প্রতিক্রিয়া একে একে উদিত হচ্ছে, এইটি এর বিষয়গত যোগসূত্র। যেমন আঙ্গিকগত যোগসূত্র হচ্ছে প্রায় প্রত্যেক শ্লোকের শুরুতে অদ্যাপিতং' এবং শেষদিকে স্মরামি'বা 'চিন্তয়ামি'–আজও তাকে মনে পড়ে। এটি ধ্রুবপদের মতো এবং আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্লোকগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করে।

চৌরপঞ্চাশিকা-য় অলংকারপ্রয়োগ খুবই পরিমিত, উপমা রূপক ও উৎপ্রেক্ষাই মূলত ব্যবহৃত হয়েছে। এ কাব্যে আঙ্গিকগত কলাকৌশল বা দুরুহতা নেই বললেই হয়। বর্ণনার নৈপুণ্যে মিলনলীলার নানা দৃশ্য যেন চিত্রশালার পটের মতো একে একে উদঘাটিত হচ্ছে এবং শব্দেবর্ণেগন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে ইন্দ্রিয়গোচর হয়ে উঠছে–এ কাব্যের উৎকর্ষ এইখানেই! লজ্জা, মান, কোপ, দ্বিধা, আত্মসমর্পণ, বেদনা, ক্লেশ, খেদ, ক্রন্দন, তন্দ্রা, ঔৎসুক্য, শ্রান্তি, হর্ষ এ সব যেমন স্পষ্ট চোখে দেখা যায়। শৃঙ্গার এখানে স্থায়িভাব, আর এই যে নানা ব্যাভিচারিভাবের ঐশ্বর্য এর দ্বারা কাব্যটিতে যেন বিচিত্র বর্ণসমাবেশ ঘটেছে। আর আছে আড়ম্বরের বাহুল্য–তরুণী নায়িকার গৌর বর্ণ, সুকুমার অবয়বসংস্থান, তার মহার্ঘ বসন, অলঙ্কার প্রসাধনের বর্ণাঢ্যতা, তার কেশকলাপের বিস্তার, পুষ্পাভরণ, অগুরুচরণকস্তুরীকুঙ্কুমের গন্ধমদিরতা ও ওষ্ঠাধারে তাম্বুলরক্তিমা–এসবের বর্ণনায় মনে হয় মিলনমন্দিরের বাতাসও যেন পুষ্পসজ্জার সম্ভারে ও ধূপের সৌরভে মন্থর। শুধুমাত্র নিপুণ শব্দগ্রন্থনার দ্বারা উদ্দীপনবিভাবের এমন একটি আবহ রচনা করা সহজসাধ্য নয়, এখানে বিলহণের অবিসংবাদিত কৃতিত্ব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিলহণের ঘনসন্নিবদ্ধ সমাস ও সুপ্রযুক্ত অনুপ্রাসের মাধ্যমে তার উপলব্ধ অনুভবটি বারেবারেই যথাযথ ভাবে রূপায়িত হয়ে সার্থক ভাবে পাঠকচিত্তে সঞ্চয়িত হয়েছে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যায়: ‘অদ্যপি তাং সুরতজাগরঘূর্ণ্যমানতিযগবলত্তরলতার কমায়তাক্ষীম।’ (৫) একটি মাত্র সমাসে শুধু যে নায়িকার জাগরক্লান্ত চোখ দুটির বর্ণনা তা নয় মিলনাস্তিক অনুভবেরও বর্ণনা। শুধুমাত্র শব্দের ঝংকারে অনুপ্রাসের মাধুর্যে বিবক্ষিত বস্তু এক ভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বারংবার; যেমন প্রথম শ্লোকেই’অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিং.’ এখানে শুধু যে নায়িকার গৌরবর্ণ ও সুন্দর মুখ বর্ণিত হলো তা নয়, দুটি ফুলের অনুষঙ্গে সৌকুমার্য সতেজত ও কমনীয়তাও ব্যঞ্জিত হল।

তেমনই,–'অদ্যাপি তাং নয়নকাজলমুজ্জ্বলাস্যং;'(৪০) এখানে অনুপ্রাসের মধ্যে সুন্দর একটি মুখে দুটি কাজলকালো উজ্জ্বল চোখ অতি সহজে ফুটে উঠেছে। নায়িকার বর্ণনায় অন্যত্র একটি সমাস প্রয়োগ করছেন– 'শৃঙ্গারবারিরুহ,কানন-রাজহংসীং'; (২২) প্রেমের পদ্মবনে সে যেন রাজহংসী। সমাসবদ্ধ এই রূপক অলংকারে গৌরাঙ্গী রাজকন্যার রাজহংসীর মতো চলার আভাস শৃঙ্গাররসের উদ্দীপক দেহকান্তি এবং পদ্মবনের অনুষঙ্গের মধ্যে সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতার ব্যঞ্জনা নিহিত আছে।

শিল্প-সমীক্ষা

যে প্রেমের চিত্র বিলহণ এঁকেছেন মুখ্যত তা হল নবপরিণীতা দম্পতির প্রণয়চিত্র; গোপন মিলনের কাহিনিটি তার সৌষ্ঠববৃদ্ধি করেছে। এ কাব্যে আছে–বাসকসজ্জা, পূর্বরাগ, মান, মানভঞ্জন, উৎকন্ঠা, বিরহ, মিলন ইত্যাদি শৃঙ্গারের নানা বিচিত্র অবস্থার রূপায়ণ। প্রধানত সম্ভোগলীলার। এর পটভূমিকা করুণরসের, নায়কের আসন্ন মৃত্যু ও নায়িকার আসন্ন বিরহের। লক্ষণীয়, যে নায়ক জানে যে তার মৃত্যু আসন্ন, অনিবার্য, তবু কোথাও তা নিয়ে তার বিলাপ নেই, তার একমাত্র চিন্তা, তার বিরহে তার প্রণয়িণী কি করে বাঁচবে।

আজকের পাঠকের কাছে হয়তো এ কাব্য অত্যধিক দেহাশ্রয়ী মনে হবে। এ প্রেম যেন সম্পূর্ণই দেহনিষ্ঠ সম্ভোগ্যশৃঙ্গারেই পর্যবসিত। দেহকে উপভোগ্য ও মনোহারী করে তোলার অপর্যাপ্ত উপকরণসম্ভার–বসন উত্তরীয় অলংকার অগুরু কুকুম চন্দন মুক্তামােলা পুস্পহার কবরী অলকাতিলকা কাজল ওষ্ঠরঞ্জনী তাম্বলরাগ। সখীরা, গেহসজ্জা, যৌবন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও তৃপ্তি সব মিলে প্রথম প্রণয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে যেন অতিক্রম করতে পারেনি কাব্যটি! সেই সদ্য সঙ্গসুখলাভের উদ্দামতাই যেন এর সীমা নিরুপরণ

করছে। তবু এই উচ্ছ্বাসেই কখনও কখনও তার আপনি তীব্রতাতেই নিজের লঘু ভঙ্গুরতাকে অতিক্রম করে কাব্যের অলকায় উত্তীর্ণ হয়।

গভীরতায় পরিনিষ্ঠিত প্রেমের দু-চারটি উদাহরণ দেওয়া যায়: ‘আজও ফিরে ফিরে মনে আসছে সে দিন রাত্রে (প্রণয়কলাহে) কুপিতা রাজকন্যা আমার হাঁচির পরে ‘দীর্ঘজীবী হও’ এ কথা উচ্চারণ করেনি (বটে)। কিন্তু নীরবে কানে তার সোনার মঙ্গলপল্লবটি ধারণ করেছিল।’ (১১) ‘..আজ এই দিবসের অবসানেও যদি তাকে দেখতে পাই তবে পৃথিবীর রাজত্ব, স্বর্গ এমনকী মোক্ষও ত্যাগ করতে পারি।’ (২৩) এই অতিশয়োক্তি প্রেমিকের, কিন্তু ওই বিশেষ উপলব্ধির তীব্রতার মুহূর্তে এটি আর অতিশয়োক্তি থাকে না, এবং সেই কারণেই কবিতাটি একানে বিশেষ ভাবে রসোত্তীর্ণ হয়। এমনই আর একটি আপাত-অত্যুক্তি হল আজও, এই অন্তিম মুহূর্তেও আমি এই দেখে বিস্মিত হচ্ছি যে সব কিছু জেনেও আমার বুদ্ধি দেবতাদের পরিত্যাগ করে ‘কান্তা আমার, প্রিয়তমা আমার, একান্তই আমার তুমি’, বলে প্রতি মুহূর্তে কেবল তারই দিকে ধাবিত হচ্ছে।’ (২৭) এখানে তরুণ প্রেম তার চপলতা পরিহার করে অনুভবের গভীরতাকে স্পর্শ করেছে এবং এর দ্বারা কাব্যটি নতুন একটি মাত্রা লাভ করেছে। ‘আমার যাওয়ার কথা কানে আসা মাত্র ভীরু হরিণীর মতো আর্ত হয়ে উঠল। তার চোখ দুটি, বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরতে লাগল, মুখটি নত করে রইল সে–আজও মনে পড়ছে সে দৃশ্য।’ (২৮) ‘আমার প্রিয়ার মুখটির স্মৃতি দিনে-রাতে আমার চিত্তকে পীড়িত করছে আজও; পূর্ণচন্দ্রের মতো সে মুখের লাবণ্য রতিকে পরাজিত করে, আজ সামনে এল প্রতিপদ, আর তাকে দেখতে পাব না।’ (৩২) সংস্কৃত সাহিত্যে সুন্দর মুখের উপমানরূপে চন্দ্র ও পদ্ম বহু পুরাতন, কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদের সৌন্দর্য যে মুখে সেটি দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হলে বিরহের অন্ধকারের লগ্ন প্রতিপদ আসন্ন, এ কথা বিচ্ছেদের তীব্রতাকে এমনই স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছে যার তুলনা বিরল। কবি

বলছেন... আমার জীবনের একমাত্র আশাস্থল সেই তরুণীটিকেই স্মরণ করছি... জন্মান্তরে সেই যেন আমার গতি হয়–স্বর্গ নয়, মোক্ষ নয়, যে প্রেমের অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে জন্মান্তরে যেন সেই প্রেম চরিতার্থ হয়। (৩৩) আসন্নমৃত্যু প্রেমিকের এই অন্তিমবাসনা কাব্যটিকে নতুন এক গৌরব দান করেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্র ও নারীর চিত্র: পঞ্চম থেকে একাদশ শতক

এক

সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত সমাজচিত্রের ছকটা নিগীত হয় শাস্ত্র সমাজকে যে অনুশাসন দেয় তার দ্বারা। অবশ্যই সাহিত্যিকের এ কাঠামোকে অতিক্রম করবার স্বাধীনতা আছে। স্বাধীন স্বপ্ন দেখবার, নির্দিষ্ট সামাজিক অনুশাসন বা পরম্পরাক্রমে আগত কাঠামোর সমালোচনা করবার স্বাধীনতাও তাঁর আছে। সীমিত এই স্বাধীনতা সংস্কৃত সাহিত্যেও কখনও কখনও দেখা গেছে। কিন্তু মোটের ওপরে সাহিত্য সামাজিক নিয়মকে লঙ্ঘন করেনি, তাকে প্রতিবিম্বিত করেছে মাত্র। অতএব প্রথমে এই কাঠামোকে সাধারণ ভাবে চিনে নেওয়া ভাল।

শূদ্রের ক্ষেত্রে ধর্মসূত্র থেকে ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থ পর্যন্ত সকলেই এককাব্যে বলেছে যে, তার স্থান অন্য তিন বর্ণের নিচে এবং তার একমাত্র কর্তব্য হল সর্বতো ভাবে এদের সেবা করা। পরবর্তীকালে জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের দ্বারা এই মতকে দৃঢ় করা হয়েছে এই বলে যে, পূর্বজন্মের দুস্কৃতির ফলেই শূদ্রজন্ম এবং এ জন্মে যথোপযুক্ত ভাবে দ্বিজসেবা করলে পরজন্মে। সে উষ্চতর বর্ণে জন্মাবে; এ জন্মে দ্বিজসেবায় ত্রুটি ঘটলে সে আরও হীন পশুযোনি প্রাপ্ত হবে। এই সব মত চালু থাকার ফলে শূদ্রের স্থান ছিল ত্রিবর্ণের পাদপীঠে। সব শূদ্র দাস নয়, শূদ্রদের মধ্যে অভাগ্যত যারা তারাই দাস, অন্যরা বৃত্তিজীবী। এই বৃক্তিজীবীদের দুটি ভাগ: 'অনির্যবসিত' ও 'নির্যবসিত' অর্থাৎ জলচল ও জল-অনাচরণীয়। এই দ্বিতীয় ভাগে আছে বৃষল, পুল্কস, শ্বপাক, ডোম্ব, চণ্ডাল।

সাহিত্যে দু রকম শূদ্রই পাই। কালিদাসের রঘুবংশ-এ আদর্শ রাজা দিলীপের বর্ণনায় জাতি সম্বন্ধে কালিদাসের কালের সমাজের যে বোধ ছিল তার একটি দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞা পাই: মনুর খুঁড়ে দেওয়া পথটি থেকে তাঁর প্রজারা একচুলও এ-দিক ও-দিকে যেত না।' (১৪:৬৭) অর্থাৎ গুপ্ত সাম্রাজ্যের কালে মনুসংহিতা-র অনুশাসনই অলঙ্ঘ্য ছিল। মনুসংহিতা-য় জন্মভিত্তিক জাতি, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, দ্বিজের অধিকার ও শূদ্রের সর্বাত্মক হীনতা সুদৃঢ় ভাবে কীর্তিত ও অপ্রতিরোধ্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ এক জেলের দেখা পাই, প্রহরীরা যাকে বিদ্রূপ করছে তার বৃত্তি নিয়ে। তার ধরা মাছের পেটে দুষ্যন্তের আংটি পাওয়া গেছে। এ কথা তারা বিশ্বাসই করে না, মনে করে সে আংটি চোর; তাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্যে তাদের হাত নিসপিস করছে। অবশেষে আংটি পেয়ে দুষ্যন্ত যখন তাকে অর্থ পুরস্কার দিলেন তখন সে নির্দোষ প্রমাণিত হল বটে, তবু সম্ভবত ভয়েই পুরস্কারের এক অংশ প্রহরীকে উৎকোচ দিল। এতে সমাজে তার সন্ত্রস্ত অবস্থান বেশ স্পষ্ট ভাবেই সুচিত হয়। রঘুবংশ-এ রামায়ণ-এর শম্বুকবধ উপাখ্যানের পুনরাবৃত্তি

আছে। রাম এখানে তপস্বী শূদ্রকে হত্যা করে দেশকে পাপমুক্ত করলেন; কিন্তু কালিদাস রামায়ণ-এর উপাখ্যানে যে খুব স্বস্তিবোধ করেননি। তার দুটি প্রমাণ রেখে গেছেন। প্রথমত, তপঃশীর্ণ শূদ্রের মুখটি শুষ্করেণুমুক্ত পদ্মের মতো, রাম খঙ্গের আঘাতে সেটিকে মৃণাল থেকে বিচুত করলেন।' (১৫:৫১-৫২)–এই উপমাটির মধ্যে। দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর পরে শম্বুক সদগতি লাভ করলএই বৈপ্লবিক উক্তির মধ্যে। বৈপ্লবিক, কারণ বাল্মীকির মতে যে পাপিষ্ঠ, তার সদগতিলাভের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অষ্টম শতকে ভবভূতির উত্তররামচরিত-এ দেখি এই উপাখ্যানই নাট্যকারের স্পর্শকাতর চিত্তকে কতটা অস্থির করে তুলেছে। তাই রামায়ণ-এ যেখানে শম্বুকবধের পরে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে দেশে অনাচার নিবারণের জন্য রামকে অভিনন্দিত করেন, বলেন, শূদ্র কখনও স্বর্গভাক হতে পারে না, সেখানে উত্তররামচরিত-এ মৃত্যুর পরেই শম্বুক দিব্যপুরুষে রূপান্তরিত হন এবং রাম তাঁকে বলেন, 'তুমি তোমার কঠিন তপস্যার ফল ভোগ কর; যেখানে সুখ, আনন্দ, পুণ্য ও সমৃদ্ধি নিত্য বিরাজিত, বৈরাজ নামের সেই প্রশান্ত ও উজ্জ্বল লোকের অধিকারী হও' (দ্বিতীয় অঙ্ক)। এই উক্তির মধ্যেই ধর্মশাস্ত্র, বাল্মীকি ও সমাজের অমানবিক বিধানের একটা সমালোচনা রয়ে গেছে।

ভারবির কিরাতাজুলীয়-তে দেখা দিয়েছে এক কিরাত, যে তপস্যারত অর্জুনকে কঠোর কথা বলেছে; তার আচরণ বলিষ্ঠ, দৃপ্ত। কিন্তু সে শূদ্র নয়, কিরাত; বর্ণবিভক্ত সমাজের প্রান্তবাসী, যেমন নিষাদ বা শবর, কাজেই বর্ণবিন্যাসের ছকের বাইরে। মাঘের শিশুপালবধ'-এ শূদ্রের শূদ্র পরিচয়ে কোনও স্বতন্ত্র ভূমিকা নেই।

প্রথম বিস্ময়কর ব্যতিক্রম বাণভট্টে। এখানে কাদম্বরী-তে শবরসেনাপতি তার শক্তিতে, দেহের বলিষ্ঠতায়, শিকারির নিষ্ঠুরতায় সত্যকার জীবন্ত একটি চরিত্র: 'যেন নতুন জন্ম নিয়ে এল একলব্য। কপালে তার তিনটি

রেখা, যেন তার ভক্তিতে প্রীত হয়ে কাত্যায়নী, ‘এ আমারই লোক’ বলে ত্রিশূল দিয়ে চিহ্নিত করেছেন তার ললাট’কত অনায়াসে কবি চণ্ডালকে কাত্যায়নীর স্বত্ব, ফণে চিহ্নিত করলেন। এখানে তিনি সপ্তম শতকের সমাজের মূল্যবোধকে ছাড়িয়ে গিয়ে কবির চোখ দিয়ে দেখলেন: ওই বলিষ্ঠ পুরুষ মহিষমর্দিনীর আপনি অধিকারের মানুষ। কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য চিত্র আছে: রাজা শূদ্রক সভায় বসে আছেন। এমন সময়ে প্রবেশ করল এক বর্ষীয়ান চণ্ডাল; ব্যায়ামপুষ্ট আঁটি গড়নের দেহ তার, বিগতযৌবন, সৌম্যাকান্তি। সঙ্গে এল একটি চণ্ডালকন্যা:

‘সে যেন বিষ্ণুর মোহিনীমূর্তি, অসুরদের কাছ থেকে অমৃতহরণ করবার সময়কার সেই ছদ্মবেশী; সে যেন ইন্দ্রনীল মণিতে গড়া একটি সচল পুত্তলিকা, পরনে তার নীল কম্বুক, আরক্ত অবগুন্ঠন, যেন নীলপদ্মের বনে এসে পড়েছে। অপরাহের রক্ত ছটা। ললাটে তার গোরোচনার চিহ্ন, যেন কিরাত।বেশিনী ভবানী। সে যেন স্বয়ং লক্ষ্মী, নারায়ণের বক্ষোলগ্ন ছিল বলেই শ্যামবর্ণ… যেন বলরামের ভয়ে পলায়নে উদ্যতা যমুনা নদী… পা দুটি তার অলক্তরঞ্জিত, যেন মহিষাসুরের রক্তে রঞ্জিতচরণ দেবী কাত্যায়নী। নুপুরমণির ছটায় উজ্জ্বল তার দেহবর্ণ, যেন তার জাতটি শুধরে দেওয়ার জন্য অগ্নি স্বয়ং তাকে আলিঙ্গন করছেন। লক্ষ্মীর মতো তারও হাতে ধরা আছে একটি পদ্ম। সে মূর্চ্ছার মতো মনোহারিণী, নিদ্রার মতো লোচনগ্রাহিণী। সে যেন মধুমাসের পদ্মবন, তাই তাতে জাতি (অনার্থ জুঁইফুল) নেই।‘

লক্ষণীয় এ বর্ণনায় কবি চণ্ডালকন্যার বর্ণনায় বারে বারে উপস্থাপিত করছেন দেবতাদের; বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কাত্যায়নী, ভবানী, যমুনা, অগ্নি। কাদম্বরীতে চণ্ডালকন্যা এই একবারই উদিত হয়েছে, কিন্তু কি মমতা দিয়ে কবি তাকে গড়লেন!! এবং, কোনও সংশয়ই রাখলেন না যে সমাজে তার অস্পৃশ্যতা নিয়ে তিনি অস্বস্তি কিংবা কুন্ঠা বোধ করছেন। অথচ বাণভট্ট

বর্ণবিভক্ত সমাজের প্রকাশ্য সমালোচনা কোথাও করেননি, বরং তাঁর বংশ পঙক্তিভোজনের ব্যাপারে। শুদ্ধাচারী এ কথা সগর্বে বলেছেন। তবু মনে হয় এই ব্রাহ্মণগর্কিত ধনী রাজকবির চেতনায় যে সুকুমার কল্পনাবৃত্তি ও সংবেদনা ছিল তা হয়তো তাঁর অবচেতনেই সঞ্চারিত করেছিল। সমাজের অসমদৃষ্টির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ, যার তির্যক উচ্চারণ এই সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন চণ্ডালকন্যার সৃষ্টিতে।

সাধারণ শূদ্র শ্রমজীবীকে বাণভট্টে ইতস্তত দেখা যায়। হর্ষচরিত-এ সপ্তম উচ্ছ্বাসের শেষ দিকে গ্রাম ও অরণ্যজীবনের একটি চিত্র আছে, যেখানে শ্রমজীবী শূদ্র নানা বৃত্তিতে দেখা দিয়েছে।

একটি বনগ্রামে, অন্য গ্রাম থেকে কাঠুরেরা কাঠ কাটতে এসেছিল, বনপাল শুধু যে তাদের আটকেছে তাই নয়, তাদের কুড়ুলও কেড়ে নিয়েছে। ... কোদাল দিয়ে গরিব চাষিরা ছোট ছোট ধানজমি আর ধানমাড়াইয়ের জায়গা ভাগাভাগি করে নিচ্ছে; এদের হাল বলদ লাঙল কিছু নেই, আছে শুধু কোদাল। পরিবার প্রতিপালনের জন্যে এরা শক্ত পতিত জমিতে চাষ করার চেষ্টা করছে, জমিতে দৃঢ়মূল আগাছা আর কাঁটাঘাস হয়েছে, সেগুলো উপড়ে ফেলা খুবই শক্ত, তা ছাড়া বন্য জন্তুর উপদ্রবও আছে। কাঠুরেরা জঙ্গলে সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করবে—সে জন্যে গায়ে হাতে পায়ে তেল মেখে নিয়েছে। তাদের কঁধে বড় বড় ভারী কুড়ুল, দুপুরের খাবারটুকু পুটলি বেঁধে গলায় ঝোলানো আছে। জঙ্গলে ডাকতের উপদ্রব্য, তাই এরা ছেড়াখোঁড়া কাপড় পরে চলেছে, ব্যাধরা ঝোপের মধ্যে খাঁচা লুকিয়ে রেখে পাখি ধরার চেষ্টা করছে। বনের প্রান্তবাসীরা বন থেকে পণ্য সংগ্রহ করে চলেছে: শীধু গাছের বাকল, ধাতকী ফুল, তুলো, অতসী আর শণ দিয়ে তৈরি কাপড়, মধু, ময়ূরের পালক, মালা করে গাঁথা মোমের তাল। ঝুড়িভরা নানা রকম বুনো

ফল মাথায় নিয়ে চলেছে মেয়েরা। পতিত জমিতে সারা দেওয়ার জন্যে নড়বড়ে বলদের গাড়িতে এনেছে ধুলো, আবর্জনা ও গোবরের স্তূপ। ‘

চিরদরিদ্র শূদ্র তার দারিদ্র্য, শ্রম আর বঞ্চনা নিয়ে উপস্থিত এই আলেখ্যে।

ওই সপ্তম উচ্ছ্বাসের প্রথমে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধযাত্রার আরম্ভে সেনাবাহিনীর বর্ণনা:

‘হাতি ঘোড়া গাধা ও উটের পালক পরিচারক চেটক দাসের স্থানপাল ও ঘাসিক এরা সবাই চলেছে। এদের ওপর খবরদারি করছে গরিব গোরস্থবাড়ির ছেলেরা। সৈন্যদল চলছে ভারেভারে প্রয়োজন ও বিলাসের উপকরণ নিয়ে। ছোট ছোট কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আসছে সৈন্যরা, আত্মীয়রা বাইরে এসে বিদায় দিচ্ছে তাদের। হাতির পায়ের তলায় দলে পিষে গেল কত কুঁড়েঘর, বাসিন্দারা কোনও মতে প্রাণ বাঁচিয়ে এসে মাহুতদের উদ্দেশে ঢিল ছুড়ছে। সৈন্যদের সঙ্গে চলেছে চুন্দী বা কুট্টনী, থপথপে মোটা বর্ষীয়সী; এদের দেখে হসাহসি করছে লোড়কেরা। গোরস্থবাড়ির বউরা চলেছে বাহনে চড়ে; তাদের চারদিকে ভিড় করেছে মন্দ লোকেরা, যাদের পাঠিয়েছে অভিজাত পুরুষরা ওই বউদের ফুসলে আনার জন্যে। সৈন্যদলের যাত্রাপথে হাতি ঘোড়ার দানাশস্য ছড়িয়ে পড়েছে। আশপাশের লোকেরা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দুস্থ কুলপুত্ররা সৈন্যযাত্রার নিন্দে করছে। গরিব গ্রামের লোকদের কাছ থেকে অনেক কষ্টে বলদ নিয়ে এসে তাদের পিঠে বোঝা চাপিয়েছে তারা, দুর্বল বলদগুলো ভার বইতে পারছে না বলে এরা নিজেরাও কঁধ দিয়েছে বইবার জন্যে। বলছে, ‘এই সৈন্যযাত্রা শেষ হলে বাঁচি; উচ্ছন্ন যাক এ সব। শেষ হোক এই অতিলোভ, চাকরিকে দণ্ডবৎ।’

শূদ্রই শুধু দাস নয়, সব চাকরিই দাসত্ব, এ সম্বন্ধে আমাদের কবি অবহিত ছিলেন তাই অপেক্ষাকৃত উচ্চপদস্থ এক রাজকর্মচারী প্রাগজ্যোতিষপুরের দূত হংসবেগকে দিয়ে বলিয়েছেন, ‘মনস্বী মানুষ এক মুহূর্তের জন্যে হলেও মনুষ্যত্ব দেখাক; ত্রিভুবনের রাজ্যভোগের লোভেও মনস্বীর নত হওয়া উচিত নয়।’

ভট্টির রাবণবধ কাব্যে শূদ্র প্রায় অনুপস্থিত বললেই হয়; কাহিনি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত, কাজেই অবকাশও কম। দ্বিতীয় সর্গে গোপবধুদের দধিমন্থনের বর্ণনা আছে একটি শ্লোকে (১৬) কবি দৃশ্যটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ, মধুর সঙ্গীত ও নৃত্যের মতো তালে গোয়ালিনীদের দেহসঞ্চালনের মনোরম বর্ণনা। মাঘের শিশুপালবধে একটি ছোট উল্লেখ দৃষ্টি আকর্ষণ করে: কৃষ্ণ যখন সসৈন্যে যাত্রা করেছেন তখন তাঁর সৈন্যদল গ্রামবাসীদের ওপরে কোনও অত্যাচার করেনি বা কষ্ট দেয়নি। (১২:৩৬) এর পিছনের বাস্তব কী ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। মাঘে পঙক্তিপাবনের উল্লেখ পাই (১৪:৩৩) এবং সদব্রাহ্মাণের সম্বন্ধে শুনি: খাবার সময়ে তাদের বাসনে ছোঁওয়াছুয়ি হয়নি–অকৃতপাত্রসংকরৈভোজনৈঃ (১৪:৫০), রৈবতক পাহাড় শ্রেয়ান (৪:৩৭)। অন্যত্রও বারে বারে দ্বিজের শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃসিদ্ধের মতোই উচ্চারিত, অর্থাৎ শূদ্র দ্বিজের পায়ের তলায়।

দণ্ডীর সমাজ সম্বন্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল, দশকুমারচরিত-এ সমাজের একটি বৃহৎ ব্যাসাংশ প্রতিফলিত, এতে শূদ্রের নানা বৃত্তি, নানা অবস্থা দেখা যায়। দ্বিতীয় উচ্ছাসে মাতঙ্গ নামে এক ব্রাহ্মাণের দেখা পাই যে কিরাতদের মধ্যে বাস করেও ডাকাতি করে; ব্রাহ্মাণ্য আচরণ সে বর্জন করেছে। রাজা রাজহংসের বন্ধু এক শবর রাজা–এ উল্লেখও আছে।

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক পড়ে মনে হয় জাতি ও বৃত্তি যে চরিত্র নিরুপণ বা নিয়ন্ত্রণ করে না। এ বোধ তাঁর ছিল। বহুতর বৃত্তির প্রতিবিম্বন এ নাটকে কিন্তু প্রায় সর্বত্রই মানুষকে বৃত্তিনিরপেক্ষ ভাবে ভাল বা মন্দ দেখানো হয়েছে। দুটি রাজপুরুষ (প্রহরী)–বীরক ও চন্দনক; বীরক যান্ত্রিক ভাবে কর্তব্য করে, চন্দনকের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ মানবিক। শ্মশানে দুটি চণ্ডাল, গোহ ও আহীন্ত, এদের মধ্যেও একই পার্থক্য। বরং শূদ্র দাসের ক্ষেত্রে মৃচ্ছকটিক-এ যেন বেশি সহানুভূতি। চারুদত্তের দাস বর্ধমানক, দাসী রদনিকা— এদের প্রভুভক্ত বললে ঠিক হয় না। এরা চারুদত্তের গুণমুগ্ধ, এদের প্রতি তাঁর ব্যবহারেও সুবিচার ও মমতা প্রকাশ পেয়েছে। ধনমদমত্ত সংবাহকের আচরণ নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, অমানবিক; কিন্তু তাঁর ভৃত্য স্থাবরকের আচরণে মহানুভবতা ও আদর্শবাদিতার পরিচয় মেলে, প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করে সে তার চরিত্রের মর্যাদা রক্ষা করেছে। এ নাটকে শূদ্র বা দুস্থের মধ্যে মানবিকতার অভাব কখনও ঘটেনি।

অষ্টম শতকে ভবভূতির উত্তররামচরিত-এ শম্বকবধ ছাড়া স্বতন্ত্র ভাবে শূদ্রের কোনও চিত্র নেই; এ কাহিনির উল্লেখ পূর্বেই করেছি। নবম শতকে ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতারচরিত-এ সাধারণ প্রজা হিসেবে উপস্থিত শূদ্র। যেহেতু এ কাব্যের উপজীব্য, পৃথিবী উদ্ধারের জন্যে বিষ্ণুর মর্তে অবতরণ, সেহেতু পাপক্লিষ্ট পৃথিবীর রূপায়ণ এর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সপ্তম সর্গে পড়ি: প্রজার উপদ্রবকারী নীচ ধূর্তর লোকের ধন হরণ করেছে, রাষ্ট্রপ্রধানেরা বিমুখ; প্রজাদের দুঃসহ ক্লেশের সংবাদ পেয়েও তারা ঘুমোচ্ছে। বিজয়ী কায়স্থ রাজাকে করায়ত্ত করেছে, লোকের কষ্ট অবর্ণনীয়; দুর্ভিক্ষ, অগ্নিকাণ্ড, চোর, কুমির।–নানা উৎপাতে জর্জরিত। (৭:২৮০-৮২) ধনী বৈশ্য বিশেষ ভাবে প্রজাপীড়ক, বৃক্তিজীবী শূদ্র অসহায় ভাবে বলছে: ‘বেতন নিতে হাত তুলতে হয় আমাদের, প্রভুসেবায় দীন ও কৃপার পাত্র আমরা কী করব?’ (৮:৬৭৩) দশম সর্গে পড়ি, ব্রাহ্মণরা ভোগী, আত্মতৃপ্তিসর্বস্ব,

ক্রোধলোভপরায়ণ, তমোমূঢ়। লোকে আত্মহত্যা করছে, রজ্জু, বিষ, শস্ত্র, অগ্নি, শিলাখণ্ড কণ্ঠে নিয়ে জলমগ্ন হয়ে। ধারণী অক্ষত্রিয়া অর্থাৎ আর্ত ত্রাণের জন্যে কেউ নেই। পৌরজনের যারা রক্ষক তারাই প্রাণ ও ধন হরণ করছে, নানা ভাবে প্রজাপীড়ন করছে। ক্ষমতাশালীরা দুঃখীর ক্রন্দনে বধির, মদান্ধি, ন্যায় বা বিচারের ব্যাপারে মৌনী। কায়স্থ বাড়বাগ্নির মতো। প্রজারা দসুযদলিত, কোনও প্রতিকার নেই। মন্ত্রী, সেনাপতি, দৌবারিক, সভাপতি ও পুরোহিত সর্বদাই উৎকোচ গ্রহণের জন্য উত্থানপাণি। বৈশ্য নির্বিষ সর্প কৃতান্তও করুশর্ত হতে পারে, বৈশ্য কখনও সদয় হবে না; কালকূট বিষ পান করে কিংবা খরিদকণ্ঠের অগ্নিতে বা সন্নিপাতেও বেঁচে থাকা সম্ভব, কিন্তু বৈশ্য শত্রু থাকলে মৃত্যু অবধারিত। বৈশ্যের উৎপীড়ন স্বভাবতই শূদ্রের ওপরেই বেশি হত। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্রের আক্রোশ শূদ্রদের ওপরেও: তারা এখন কেউ ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করে, কেউ বৈশ্যের, কেউ বা ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণের মতো। ব্রাহ্মণ এখন শূদ্রের দাস, শূদ্রের পায়ে প্রণিপাত করছে ব্রাহ্মণ শিষ্য—এই হল কলিবিপর্যায়, যার অনিবার্য্যফল হল বর্ণসংকর। (১০.৫।-২০)

শেষ যে গ্রন্থকারের আলোচনা করব। তিনি প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ, হয়তো বা একমাত্র, ঐতিহাসিক, কলহণ। একাদশ শতকে রচিত এর রাজতরঙ্গিণী-তে সম্ভবত সপ্তম থেকে একাদশ শতকের কাশ্মীরের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। কারণ কলহণের পূবপুরুষরা কয়েক শতক ধরেই বংশানুক্রমে কাশ্মীর রাজসভায় মন্ত্রিত্ব করে এসেছিলেন। পরম্পরাক্রমে আগত তাদের জ্ঞান ও স্মৃতিভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী কলহণ। ইনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থায় ও ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজা মিহিরকুলের মৃত্যুর পরে দৈববাণী হল যে, তিনি তিন কোটি তিনি পাপমুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করেছেন।'(১:৩১১) রাজা যশস্কর হীনজাতীয়া নারীর সন্তান, কিন্তু তিনি সৎ ছিলেন বলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা তাকে রাজা করেন। রাজা হয়ে তিনি বর্ণাশ্রম

ধর্ম নতুন করে প্রবর্তন করেন। (৩:১০) রাজপ্রাসাদে আগুন লাগল; কলহণের মন্তব্য: ‘ডোমচণ্ডালের সংসর্গেদূষিত রাজাদের পাপ পুড়ে গেল।’(৬:১৯২) রাজা হর্ষদেবের অন্তঃ পুরে ৩৬০টি অন্তপুরিকা, ডোম ও চণ্ডাল বাদে সব জাতের মেয়ে ছিল, অর্থাৎ শূদ্রাও বিস্তর ছিল। কঠোর বর্ণাশ্রমধর্ম থাকা সত্ত্বেও কলহণের বিবরণে অপরাধী ব্রাহ্মাণের দণ্ড মধ্যে মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে, সম্ভবত ব্রাহ্মণকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করবার উদ্দেশে। রাজা যশস্করের আমলে এক অপরাধী ব্রাহ্মাণের শাস্ত্রীয় দণ্ডের কথাও আছে: তার কপালে কুকুরের পায়ের ছাপ দেওয়া হয়। অবশ্য দণ্ডিত ব্রাহ্মাণের আত্মীয়রা অচিরেই অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা রাজার প্রাণনাশ করে। ব্রাহ্মাণের ইস্ট্রসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মাশাপ, ইত্যাদি বারে বারে ব্যবহৃত হয়েছে। কলহণের লেখনী সবচেয়ে বিষাক্ত কায়স্থদের বিবরণে: তারা হীনজন্মা, স্বার্থসর্বস্ব, কুটিল, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর।

সাধারণ প্রজা অর্থাৎ শূদ্র, কিছু বৈশ্যও হয়তো, কলহণের বিবরণে বেশ স্পষ্ট ভাবেই প্রত্যক্ষ। রাজার প্রাথমিক কর্তব্য যে এই উৎপাদক শ্রেণির রক্ষণাবেক্ষণ এ বিষয়ে তিনি সতত অবহিত। এক অত্যাচারী রাজা নিষ্ঠুর শোষণ ও রাজস্ব আদায়ের দ্বারা তিন বছরের মধ্যেই প্রজাকে সর্বস্বান্ত করে দিলেন, যেমন শীতকাল গাছের সমস্ত ফল হরণ করে। (৪:৬২৮) চণ্ডালীর কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে সুষ্য রাজা হলে বিতস্তা নদী কাদায় মজে গেল; রাজা এক এক করে নদীতে মোহর ছুড়তে লাগলেন, লোক কুড়িয়ে নিতে নামল– উঠে এল সারা গায়ে প্রচুর কাদা মেখে, নদী আবার স্রোতস্বিনী হল। তারপর থেকে রাজা নিয়মিত জলনিঃ সরণের ব্যবস্থা করলেন যেন আশপাশের চাষিদের খেতগুলো জল পায়। কাশ্মীরি তাতির তীতশিল্প এবং পশুবাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও খ্যাতির কথা পড়ি (৫:১৬২); অনুমান করা অসংগত হবে না যে, তখনও তাতির নিজস্ব সমৃদ্ধির মান নিচুই ছিল, মধ্যবতী বণিকই নিত প্রায় সবটা। অগ্নিকাণ্ডে সমস্ত সঞ্চিত শস্য পুড়ে

যাওয়ার ফলে যে দুর্ভিক্ষ হয় তার বিবরণ আছে। (৮:১২০৬) অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হলে পর খারি ধান বিক্রি হতে লাগল। ১০০০ দিনারে। মন্ত্রীরা উত্তরোত্তর ধনী হল গরিবদের কাছে চড়া দামে ধান বিক্রি করে। (৫:২৭৪) আর একটি দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গে বলেছেন খারিধান, দ্রাক্ষারস, পশম, নুন, গোলমরিচ ও হিংয়ের দাম সাংঘাতিক বেড়ে গেল (৭:১২২০-২১); এগুলি সবই সাধারণ লোকের নিত্যব্যবহার্য বস্তু। কাশ্মীরের ইতিহাসে রাজপরিবারে বর্ণসংকর বারে বারেই ঘটেছে, কলহণ সখেদে তার উল্লেখ করেছেন। এক গানের জলসায় এল দুটি ডোম্বী, রাজা প্রেমে পড়লেন, ঘটল। বর্ণসংকর। সভায় নীচজাতীয় গায়ক 'রঙ্গ' অশ্লীল গানে রাজার চণ্ডাল রানি ও রক্ষিতাদের নামে গান বেঁধে গাইল। (৫:৩৯১) ডোম্বীগমনের পাপ খণ্ডাতে রাজা শুদ্ধাচারিণী এক ব্রাহ্মণীকে ধর্ষণ করলেন। (৫:৪০২) অধম ব্রাহ্মাণেরা সে রাজার দান ও অন্ন গ্রহণ করত। রাজা কলশের মৃত্যুর পরে মহিষী কষ্যা সহমরণে গেলেন না, হীনজাতীয় এক শ্রমিকের প্রতি আসক্ত হলেন। কলহণের মন্তব্য, 'তাতে আমাদের দুঃখ হয়–অতো দুঃখকরোতি নঃ।' (৭:৭২৭)

কাশ্মীরে এক বিশেষ ধরনের রক্ষণশীলতা ছিল; উপত্যকার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা থেকে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও যেমন এসেছিল, তেমনই উত্তরপশ্চিম বাণিজ্যপথ ধরে বহু জাতির আনাগোনা ছিল বলে বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্পর্কে এক সদাসতর্ক মানসিকতাও ছিল। ব্যতিক্রম ঘটত বিস্তর, কলহণ অপ্রসন্নচিত্তে তার বিবরণ দিয়েছেন; কিন্তু বারে বারেই বিলাসী স্বার্থসর্বস্ব রাজার নিন্দা করেছেন যাঁরা দুঃখী প্রজার কথা ভাবেননি। ধর্মকর্ম করা, অর্থাৎ মঠমন্দির, কূপপুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করেছেন যখন রাজা সাধারণ প্রজার দুঃখ দূর করেছেন। তারা যে কত অসহায়, কত নিঃস্ব, তার বহু চিত্র 'রাজতরঙ্গিণীতে পাই। রাজসভাসদ

মন্ত্রীপুত্র কলহণ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য কাশ্মীর উপত্যকা পর্যটন করেছেন, এই পর্যটনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাজ্য জুড়ে দুঃখী প্রজার আর্তি।

নারীর ক্ষেত্রে সাহিত্য শিল্পীর ব্যক্তিগত কল্পনার স্বাধীনতা হয়তো কিছু বেশি ছিল, কারণ নারী প্রত্যক্ষ ভাবে উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তবে অন্য দিকে নারীর স্থান সমাজে ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। নারী সম্বন্ধে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ছকটি হল: তার প্রাথমিক পরিচয় গৃহিণী ও জননীরূপী, পুত্রের জননীরূপই তার সার্থকতা। তার সামাজিক মূল্য বংশপরিচয়, বশংবদন্তা, সেবাপরায়ণতার ওপরেই নির্ভর করত। কিন্তু সাহিত্যে এবং জীবনে তার ব্যক্তিগত মূল্য নিরুপিত হত তার রূপ ও যৌবনের দ্বারা। যা তার কাছে প্রত্যাশিত নয় বরং যা সমাজের দৃষ্টিতে দোষাবহ তা হল তার বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বতন্ত্র চিন্তার ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব। এই ছকটি বেদাঙ্গ থেকে মহাকাব্য ও পুরাণগুলিতে পরিব্যাপ্ত; দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এর ব্যত্যয় নেই বললেই চলে।

কালিদাসের কিছু পূর্বেই হয়তো ভর্তৃমেণ্ঠ তাঁর হয়গ্রীবাবধকাব্য রচনা করেন। সেখানে অন্ধ নারীর বর্ণনা হল, সে মধুররচনা, নীবীবিভ্রংসিনী, কম্পিতালুলোচনা (৫৬৪); গ্রাম্য নারী মধুরবদনা, পল্লবাধরা, স্বতঃস্ফূর্ত তার উচ্ছহাসি, যার বিনিময়ে গোটা রাজ্যই দিয়ে দেওয়া যায়। (৫৭৬) ওই সময়ের নাট্যকার ব্রহ্মযশার পুষ্পদূষিতক-এ একটি উপাখ্যান আছে:

‘বণিক সমুদ্রদত্ত বিদেশে ছিল, অল্প সময়ের জন্যে দেশে ফিরে গোপনে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়। তার পিতা সাগরদত্ত শুনলেন পুত্রবধূ নন্দয়ন্তী সন্তানসম্ভব এবং গোপনে কোনও পুরুষ তার সঙ্গে দেখা করেছিল। শ্বশুর তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। এক শবর সেনাপতি তাকে আশ্রয় দেয়। দেশে ফিরে সমুদ্রদত্তের সন্তানের পিতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ যায় না; অবশেষে শবর সেনাপতির দৃঢ় যুক্তিতে সংশয়ের নিরসন হল।‘

দুটি মূল ব্যাপার এ কাহিনিতে বিধৃত: সম্পত্তিমানের সন্তানের পিতৃত্ব সম্বন্ধে সংশয় এবং এর ফলে নারীকে অসতী সংজ্ঞা দিয়ে নির্যাতন করা। মনে রাখতে হবে, এ দেশে সতীর কোনও সমার্থক পুংলিঙ্গ শব্দই ছিল না।

ঋতুসংহার সম্ভবত কালিদাসের কিশোর বয়সের রচনা, নারী এখানে নিতান্তই গৌণ, তার সাধারণ চিত্রটি ভোগ্যবস্তুরই চিত্র। কুমারসম্ভক এ প্রেমের সাধনা, কিন্তু সে আমাদের শিবরাত্রিরই এক বিলম্বিত কৃচ্ছ্রসাধনের সংস্করণ; মনের মতো স্বামী পাওয়ার সাধনা, যার বহু উপাখ্যান মহাকাব্যে ও পুরাণে মেলে। পার্বতীর সাধনায় শিবের টনক নড়ল ঠিকই, কিন্তু পার্বতীকে পাওয়ার জন্যে তার দিকে কোনও তপস্যার প্রয়োজন ঘটেনি। এর মর্মবিস্তু যে প্রেমের আলেখ্যটি, কাব্য বিচারে সেটি অত্যন্ত মূল্যবান, কিন্তু এর উপজীব্যটি চিরাচরিত সংস্কারেরই অনুগামী। মেঘদূত-এ প্রেমিক প্রেমিকা দুজনেই দুঃখভোগ করেন; যদিও এখানে দুঃখের নিমিত্ত পুরুষ, ফলভাগিনী নিরপরাধী যক্ষবধূও। প্রেমে এখানে দেহ,মন দুয়েই স্থান আছে, যদিও দেহই মুখ্য। মালবিকাগ্নিমিত্র-এ প্রৌঢ় রাজা অগ্নিমিত্র যাঁর পিতা ও পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে, তিনি কন্যার বয়সিনী এক সুন্দরী তরুণীকে দেখে আকৃষ্ট হলেন। ইরাবতী ও ধারিণী দুই সপত্নী প্রাণপণে ষড়যন্ত্র করে চললেন যাতে রাজা মালবিকার সঙ্গে মিলিত হতে না পারেন। অবশেষে জানা গেল, মালবিক রাজকন্যা, মহিষী ধারিণীর আত্মীয়া এবং এর সঙ্গে মিলনে রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল হবে। তৎক্ষণাৎ ধারিণী নিজে উদ্যোগ করে বিয়েটা দিয়ে দিলেন; অর্থাৎ প্রেমের প্রতিবন্ধকতা ভেসে গেল জ্যোতিষীর গণনার সামনে। প্রেমের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গৌণ হল রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের কাছে; নারীর সেই পণ্যদ্রব্য পরিচয়ই মুখ্য হল। তবে নাট্যকার তো স্বয়ং কালিদাস, তাই এ নাটক প্রথম দিকের রচনা হলেও এর মধ্যে মুন্সিয়ানা যথেষ্ট এবং মালবিকার অসহায় প্রেম মাঝেমাঝে পাঠককে অভিভূত করে।

বিক্রমোর্বশীয়-তে সমস্যা জটিলতর। রাজমহিষী ঔশীনারী ও রাজা পুরুরবার প্রেমের দৃঢ় ভিত্তি ছিল। হঠাৎ দেখা দিল স্বগের স্বপ্নসুন্দরী উর্বশী। গৌণ হয়ে গেল পুরাতন প্রেম যা গড়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে। কালিদাস কোথাও ঔশীনারীর রূপবর্ণনা করেননি, কেবল একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্যে উদঘাটন করেছেন তাঁর চরিত্র। রাজা উর্বশীতে আসক্ত জেনে তিনি এক জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় রাজাকে প্রাসাদশীর্ষে ডেকে পাঠালেন প্রিয়-প্রসাদন ব্রত উদযাপন করবেন বলে। মাঙ্গল্য উপাচার সামনে রেখে বললেন, 'রোহিণী ও শশাঙ্ককে সাক্ষী রেখে আর্যপুত্রকে প্রসন্ন করতে বলছি: আজ থেকে যে নারীকে আর্যপুত্র কামনা করবেন এবং যে নারী আর্যপুত্রের সমাগমপ্রার্থিনী হবেন তার সঙ্গে আমি প্রীতি বন্ধনে যুক্ত থাকব।' এক দিন ছিল যখন যে নারীকে আর্যপুত্র কামনা করতেন তাঁর নাম ছিল ঔশীনারী। সেদিন গেছে, আজ ঔশীনারীর আত্মসম্মানবোধ তাকে দিয়ে এই কথা বলাাচ্ছে, যেমন গোপন প্রেমের অনাবশ্যক জটিলতা ও গ্লানি থেকে মুক্ত পান পুরুরবা। সম্পূর্ণ নেপথ্যে চলে গেলেন ঔশীনারী, নাটক থেকে মুছে গেলেন। রয়ে গেল কালিদাসের হাতে-আঁকা অনাদৃত নারীর আত্মসম্মান রক্ষার এক আলেখ্য।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ সমস্যা গভীরতর। শকুন্তলা আশ্রমে ললিতা, কিন্তু তার বিবাহ হয়েছে রাজার সঙ্গে, অতএব সমাজ তার কাছে প্রত্যাশা করে যে সাধারণ কুলবধুর ভূমিকাতেই তাকে দেখা যাবে। তাই কন্যা বিদায়ের মুহূর্তে কশ্ব তাঁকে আশীর্বাদ করে উপদেশ দিচ্ছেন: 'গুরুজনদের শুশ্রুষা কোরো, সপত্নীদের সঙ্গে প্রিয়সখীর মতো আচরণ কোরো। স্বামী রেগে গেলেও তুমি কখনও রেগে তার বিরুদ্ধ আচরণ কোরো না. এই পথেই নারীরা গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হয়, এর অন্যথা যারা করে তারা বংশের ব্যাধিস্বরূপিণী।' (৪:১৮) বুঝতে অসুবিধা নেই, এ উপদেশ শুধু শকুন্তলার প্রতি নয়, পঞ্চম শতক ও পরবর্তীকালের তাবৎ নারীর প্রতিই এটি উদ্দিষ্ট।

কথা শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে বলছেন, ‘কন্যা হল পরের ধন, তাকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে, আজ মনটা শান্ত। যেমন মন শান্ত হয় গচ্ছিত ধন ফেরত দিয়ে।’ (৪:২২) পিতৃকুলে নারী পিতার কাছে গচ্ছিত স্বামীর সম্পত্তি, বিবাহের পরে স্বামীর ব্যক্তিগত এবং শ্বশুরকুলের পরিবারগত সম্পত্তি; নিজের ওপরে তার কোনও অধিকারই নেই। এই কথাই শুনি শাঙ্গারবের মুখে; দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করলে পর সে দুষ্যন্তকে বলছে, ‘একে পরিত্যাগই করুন আর গ্রহণই করুন, এ হল আপনার পত্নী, স্ত্রীর ওপরে, স্বামীর সর্বতোমুখী প্রভুত্ব আছে।’ (৫:২৬) কিন্তু কবি কালিদাস সমাজের মন রাখার পরে, ছোট একটি কথায় শকুন্তলাকে কিছু মর্যাদা দিয়েছেন। শকুন্তলা যখন নিশ্চিন্ত জানলেন যে দুষ্যন্ত তাঁদের প্রেম, গান্ধর্ব বিবাহ ও নিজের অঙ্গীকার সবই অস্বীকার করছেন তখন বললেন, ‘সেই প্রেমের যখন এই পরিণতি তখন আর (রাজাকে) স্মরণ করিয়ে দিয়েই বা কী হবে? তথাপি নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করতে হবে।’ আর আর্যপুত্র সম্বোধন করলেন না, বললেন, ‘পৌরব’ অর্থাৎ ‘পুরুবংশীয় রাজা’। তোমার কাছে তার মর্যাদার অনুরূপ আচরণ আপেক্ষিতা।’ এই নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করার প্রয়োজনবোধটিই কালিদাসের গৌরবময় সংযোজন: সমাজ, রাজা, প্রেমিক, স্বামী—কেউই যার মর্যাদা দিল না তারও অধিকার এবং প্রয়োজন আছে আত্মপক্ষ সমর্থনের। মেঘদূত-এ যেমন, এখানেও তেমনই পুরুষের দোষে দুঃখ ভোগ করল নারী। কিন্তু এটি কালিদাসের পরিণততর রচনা, তাই এখানে কালিদাসের শিল্পী দৃষ্টি সত্যতর। ষষ্ঠ অঙ্কে আত্মগ্লানি, অপরাধবোধের জ্বালা ও অতলান্তি বিরহে ক্লিষ্ট দুষ্যন্তের যে ছবিটি কবি এঁকেছেন তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: নারীও সাধনার ধন, তাকেও পেতে হয় দুঃখের মূল্যে।

রঘুবংশ একটি অসামান্য মহাকাব্য। এখানে অনেক নারী, সকলের আলোচনা সম্ভব নয়, দু। একজনের কথাই বলব। পুরুষের বহু পত্নীত্ব

উপমাও এ কাব্যে বারংবার উপস্থিত। লক্ষ্মী বিষ্ণুর পদসেবা করেন। (১০:৮, স্মরণীয়, গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যেই প্রথম লক্ষ্মী বিষ্ণুর পদসেবা করেন।) নারীর অভিসারের বহু উল্লেখ এ কাব্যে এবং অন্যত্র পাওয়া যায়। অভিসারের সমস্ত ঝুঁকিটা নিতে হয় নারীকেই; অন্ধকার রাতের সাপখোপ, বর্ষ রাতের বাজবিদ্যুৎবর্ষণ এবং জ্যোৎস্না রাত্রে আত্মগোপন করার দায়– সবটাই নারীর। সাহিত্যে অভিসারী' নেই, যে নিরাপদে সংকেতস্থলে বসে থাকে, শিরে সংক্রান্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নারীই, যেন গরজ তার একারই। রঘুবংশের শেষ সর্গে ইন্দ্রিয়পরায়ণ রাজা অগ্নিবর্ণের অবক্ষয়ের জন্যে কালিদাস রাজাকেই দায়ী করেছেন, অন্তঃপুরিকদের নয়। ইন্দুমতীর মৃত্যুর পরে অজ বলছেন, 'করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমাকে হরণ করে আমার কী-ই না নিয়ে গেলগৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ/করুশাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং কিং ন মে হৃতম।' (৮:৬৭) লক্ষণীয়, এই বিখ্যাত শ্লোকটিতে কোথাও রূপবর্ণনা নেই, বরং বধুর মানসিক সাহচর্যের কথা আছে যা সংস্কৃত সাহিত্যে একান্তই দুর্লভ। বিরহক্লিষ্ট অজের কাছে জীবন এমনই দুর্বহ বোধ হল যে, তিনি ধীরে ধীরে যেন মৃত্যুবরণ করলেন। এর পূর্বে বা পরে একমাত্র বাণভট্ট ছাড়া আর কোনও কবিই নারীকে এতটা মূল্য দেননি। শুধু হর্ষচরিত-এর প্রথম উচ্ছ্বাসে দেখি সরস্বতী স্বর্গে ফিরে গেলে দধীচ বনে গেলেন–জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে এবং পুত্রের ব্যবস্থা করে অকালে প্রাণত্যাগ করলেন।

সীতার চরিত্রচিত্রণে কালিদাসের যেন অভীষ্টই ছিল বাল্মীকির মূল্যবোধের সমালোচনা করা। অযোধ্যায় সীতা বিসর্জনের ব্যাপারে বাল্মীকির রাম দুঃখিত, কালিদাসের রামের নৈতিক বোধ দ্বিধাগ্রস্ত; বলছেন (প্রজাদের মধ্যে) এই আত্মনিন্দা উপেক্ষা করব, না নির্দোষ সীতাকে ত্যাগ করব।' (১৪:৩৪) শেষ পর্যন্ত নির্দোষ জেনেও ত্যাগ করলেন (১৪:৪০) লক্ষ্মণের কাছে বনে বিসর্জনের কথা শুনে সীতা বললেন, সেই রাজাকে বোলো, অগ্নিশুদ্ধ

আমাকে প্রত্যক্ষ করেও লোকপবাদে আমাকে যে ত্যাগ করলেন এটা কী তাঁর বংশের অনুরূপ হল, না তাঁর পাণ্ডিত্যের?' (১৪:৬১) পরেই অবশ্য বলছেন, 'এ নিশ্চয়ই আমার পূর্বজন্মকৃত পাপের ফল।' (১৪:৬২) বাল্মীকির বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর পূর্বজন্মই বা কোথায়, পাপই বা কোথায়? কিন্তু এ হল কালিদাসের মানবী সীতা। লক্ষ্মণের কাছে সীতা বিসর্জনের সংবাদ পেয়ে 'রামের চোখে সহসা জল ভরে এল, যেন পৌষ রাতের কুয়াশা-ঢাকা চাদ; লোকপবাদে তিনি সীতাকে গৃহ থেকেই নির্বাসিনি দিয়েছেন, মন থেকে নয়।' (১৪:৮৪) এ রামে একান্তই কালিদাসের সৃষ্টি, যে-কবি বোঝেন যে প্রেমের মূল্য দিতে হয়, শুধু নারীকে নয়, নারীর জন্যে পুরুষকেও।

সম্পূর্ণ অন্য এক জগৎ পঞ্চম শতকের শ্যামিলকের পদতড়িতক নাটকে। এক গণিকা বিট তৌণ্ডিকোকির মস্তকে পদাঘাত করায় বিটদের সভা বসল: প্রায়শ্চিত্ত কী হবে? কেউ বলে, 'আর একবার পদাঘাত করুক মদনসেনিক'; কেউ বলে আহা, তৌণ্ডিকোকি হল যজ্ঞের পশু, ওর মাথায় পদাঘাত করাটা ঠিক হয়নি। তৌণ্ডিকোকিই বরং প্রায়শ্চিত্ত করুক। মদনসেনিকার পা ধুইয়ে দিয়ে।' কেউবা বলে 'সেই পা-ধোওয়া জলে ও নিজের মাথাটা ধুয়ে নিক' কেউ বলে, মাথার ওই অশংটা কমিয়েই ফেলুক।' এই কথাটা তৌন্ডিকোকির মনে ধরে, কিন্তু তার মনে হয় কমিয়ে ফেলা যথেষ্ট নয়, মাথাটা কেটে ফেলাইবিধেয়। শেষ পর্যন্ত সভাপতি বিধান দেন: মদনসেনিক ওর সুন্দর পা দুটি দিয়ে পুনর্বার আঘাত করুক তৌণ্ডিকোকির মাথায়! দেখা যাচ্ছে গণিকালয়ের পরিবেশে অনেকটা যেন স্বাভাবিক ভাবে দেখা হয়েছে নারী পুরুষের আপেক্ষিক সম্পর্ক অর্থাৎ নারীমাত্রই পুরুষমাত্রের চেয়ে হীন, এ বোধটা নেই। অবশ্য গণিকার এক নামই স্বতন্ত্রা।

অমবুতশতক-এ নারী প্রেমিকরূপে নানা ভাবে চিত্রিত। প্রেমে নারীর কিছু স্বতন্ত্র স্থান দেখানো হয়েছে, কখনও বা পুরুষ অসহায় তার সামনে। মান ও

মানভঞ্জনের কটি পদে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু মনে হয় অমরুর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হল প্রেমের মৃত্যু দেখানো; শীলা ভট্টারিকার একটি পদ এবং সংকলন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত কিছু শ্লোক বাদ দিলে আর কোনও কবির লেখনী এটা দেখাতে সাহস পায়নি। অমরুতে নায়িকা বলছে, ‘আমাদের সেই প্রেমের এ কী করুণ মৃত্যু! সেই তুমিই পায়ে ধরে সাধছ, আমার মন তাও গলছে না তো।’

শীলা ভট্টারিকার সেই অমর শ্লোকটিতে নারী বলে, ‘যে আমার কৌমার হরণ করেছিল, সে-ই আজ আমার বর; সেই চৈত্ররজনী, তেমনই ফুটে আছে মালতী ফুল, কদমের সুরভি নিয়ে তেমনই বইছে বাতাস। সেই আমিই আছি, তবু আজ প্রিয়মিলনের ক্ষণে রেবাতটের বেতসকুঞ্জে প্রাণ কেন উৎকণ্ঠায় ভরে ওঠে?’

দুই

ষষ্ঠ শতক থেকে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে সাহিত্যে নারীর চিত্র স্থূল রেখায় আঁকা, এ চিত্র ভোগ্যবস্তুর। ভারবির কিরার্তাজুলীয়-তে ষষ্ঠ, সপ্তম সর্গে নিতান্ত অনাবশ্যক ভাবে অপ্সরাদের আনা হয়েছে। এদের ছলাকলা হাব-ভাব সবই বাৎস্যায়ন-বাণিত গণিকার আচরণ: জলকেলি, বনবিলাস সবই এতে আছে, অর্থাৎ অপ্সরাদের অন্য নাম যেন স্ববেশ্যা সেটাই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এ ছবির রং চড়া এবং নারী দেহ ও বিলাসবিভ্রমের বর্ণনাই মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু। এই শতকেরই শেষে এক অত্যন্ত অপকৃষ্ট রচনা সুবন্ধুর গদ্যকাব্য বাসবদত্তা। বাসবদত্ত ও কন্দর্পকেতু পরস্পরকে স্বপ্নে দেখে ব্যাকুল হলেন। নায়ক বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন স্বপ্নদৃষ্টার সন্ধানে, নায়িকা তমালিকা নামে এক সারিককে পাঠালেন নায়কের খোঁজে। ক্রমান্বয়ে অবাস্তব ঘটনাবলির অন্তে দুজনের যখন দেখা হল তখন নায়ক নায়িকার

সঙ্গে একটি কথাও না বলে তাকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নায়িকার আচরণ আগাগোড়াই সম্পূর্ণ যান্ত্রিক: সুপ্রচুর হা-হুতাশ, আত্মহত্যার সংকল্প, নির্দিষ্ট সময়ে মূর্ছা, ইত্যাদি-অলঙ্কার শাস্ত্রে যেমনটি নির্দেশ দিয়েছে ঠিক তেমনই। বলে রাখা ভাল, অধিকাংশ নায়িকাই হুবহু এই ছকেই নির্মিত।

সপ্তম শতকে বাণভট্টের কদম্বরী-তে কাদম্বরী ও মহাশ্বেতাও এই ছকে নির্মিত। বাণভট্টে বরং দৃষ্টি আকর্ষণ করে অন্য নারীরা। নায়িক বা রাজ-অন্তঃপুরের গণিকারা ছাঁচে ঢালা চরিত্র; কিন্তু নারী বিলাসবতীর সহচারিণী বৌদ্ধ প্রব্রাজিক একটু অন্যরকম; তিনি বই পড়েন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন; অবিবাহিতা শিক্ষিতা এই স্বাধীন রমণীর আসন অন্তঃপুরিকদের শ্রদ্ধায়। আর আছে কুলুতরাজকন্যা পত্রলেখা। এই একটিবার মাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে তরুণ কুমার রাজপুত্রের একটি কুমারী তরুণী বান্ধবী ও সহচরী। রানি বিলাসবতী চন্দ্রপীড়কে বলছেন, ‘দেখিস, এর যেন অনাদর করিসনে। এ আমার বড় আদরের মেয়ে। একে বালিকাদের মতো আদর করবি, নিজের চিত্তবৃত্তির মতো চাপল্য থেকে রক্ষা করবি, শিষ্যার মতো দেখবি, বন্ধুর মতো সমস্ত গোপন কথা জানাবি।’ এই মেয়ে দিনেরাত্রে রাজপুত্রের কাছে কাছে থাকে; দুজনের পরস্পরের প্রতি গভীর সম্প্রীতি জন্মাল। অকুণ্ঠ বর্ণনা সেই শ্রীতির, সত্যিই ‘কামগন্ধ নাহি তায়’। অথচ পত্রলেখা রাজকন্যা, নবযৌবনা। এই চিত্রটিতে বাণভট্টের লেখনী অদ্ভুত এক সংযমের পরিচয় দিয়েছে। পত্রলেখা চন্দ্রপীড় অভিন্নহৃদয়া, তাঁর দেহবহির্ভূত নিঃশ্বাসবায়ু, দ্বিতীয় প্রাণ। রাজপুত্র প্রেমে পড়লে সে তার দূতী হয়ে কাদম্বরীর কাছে যায়। দুজনকে আশ্বাস দেয়, মিলনে সহায়তা করে। কাদম্বরীর সংবাদ নিয়ে, সে যখন প্রাসাদে এল তখন চন্দ্রাপীড় তাকে জড়িয়ে ধরলেন, সকলকে সরিয়ে তার হাত ধরে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। অথচ বর্ণনাটি নিতান্তই সখা ও সখীর, মনেরই সম্পর্ক। মহাশ্বেতা পুস্তরীকের আচরণের মধ্যেও পর্দার

কোনও আভাস নেই। পুন্ডরীকের বন্ধু কপিঞ্জল নির্জনে একা মহাশ্বেতার সঙ্গে দীর্ঘকাল আলাপ করে, মহাশ্বেতা সখী তরলিকাকে সঙ্গে নিয়ে এক অভিসারে বনের মধ্যে নিরালা এক মন্দিরে যায় এবং সেই সরাসী তীরের মন্দিরে এক অনাত্নীয় চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে গল্প করেন। ক্লান্ত হলে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েন। পল্লবশয্যায়। চন্দ্রপীড় মহাশ্বেতার সঙ্গে সখীর কাছে গেলে পর কাদম্বরীর পিতৃগৃহে কন্যান্তঃপুরে গীতবাদ্যশিল্পের পরিবেশে পরিহাসে কৌতুক আলাপ জমে ওঠে। অন্তঃপুরকাননেরই রত্নহার্মে চন্দ্রপীড় রাত্রিযাপন করেন।

ভাবতে অবাক লাগে সপ্তম শতকের রক্ষণশীল সমাজের রাজকবি নির্ভয়ে এমন বর্ণনা পড়ছেন রাজসভায় বসে: নারীপুরুষের সখ্য; সহজ, মুক্ত আলাপ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ। সৌন্দর্যের রম্য পরিবেশে যৌবন ও প্রেমের স্মৃরণের অকুণ্ঠিত্ব, নির্মল ও অন্নান কাটি আলেখ্য। হর্ষচরিত’-এ রাজকুমার দধীচের দূতী কুমারী তরুণী মালতী এক ঘোড়ায় চড়ে শোণি নদী পেরিয়ে আসে। সরস্বতীকে রাজপুত্রের প্রেম ও আগমনবার্তা শোনাতে। এ কি সপ্তম শতকের ভারতবর্ষ, না রাজার প্রিয় কবি তার সমস্ত স্বাধীনতা প্রয়োগ করে একটি চিরন্তন আদর্শ কল্প লোক নির্মাণে উদ্যত? অথচ অন্যত্র সামাজিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে সতর্ক নিষ্ঠা ছিল বাণভট্টের: বিধবা হওয়ার ভয়ে রানি যশোমতী আত্মহত্যা করেন। বিধবা রাজ্যশ্রী মালবরাজের কারাগার থেকে পালিয়ে যান বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দিবাকরমিত্রের আশ্রয়ে। বারাঙ্গনারা রাজসভার অলঙ্কার; তারা রাজাকে স্নান করিয়ে দেয় ও নানা ভাবে পরিচর্যা করে। খণ্ডকাব্য চণ্ডীশতক-এ বাণভট্টের প্রতিপাদ্য হল, পুরুষ দেবতারা মহিষাসুরের সামনে নিষ্প্রভ, নিষ্পরাক্রম, পরাজিত ও হৃতদর্প, চণ্ডিকা একক বিক্রমেই মহিষাসুরমর্দিনী। সমস্ত বাণভট্ট পড়ে মনে হতে থাকে নারীপুরুষের সামাজিক স্থানবিন্যাসে তাঁর সংবেদনশীল কবিচিত্ত স্বস্তি পায়নি, তাই তিনি আরও সহজ আরও স্বাভাবিক এক সমাজকে একে

গেলেন। যা ঘটছিল তাকে উপস্থাপিত করার পর বললেন, কী হওয়া উচিত, কী হতে পারত তাও দেখ–অপারে কাব্যসংসারে কবিরে প্রজাপতিঃ।’

এই শতকেরই শেষ দিকে রচিত রাজা শ্রীহর্ষের তিনটি নাটক–রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিক ও গানানন্দ এগুলিতে নারী প্রচলিত সব ভুমিকাতেই দেখা দিয়েছে–নায়িকা, দূতী, গণিকা, সখী, সপত্নী— কিন্তু সব কটি নারীরই আচরণ যান্ত্রিক, বৈশিষ্ট্যবর্জিত। তেমনই ভট্টানারায়ণের বেণীসংসার; সেখানে অন্তঃপুরে মহিষী ভানুমতীর করস্পর্শ দুর্যোধনকে বিচলিত করে তোলে, যুদ্ধক্ষেত্রে তখন যুদ্ধ চলছে। অর্থাৎ সেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রলোভিকার ভূমিকা। ভর্তৃহরির শতকল্পয় (বা ক্লিশতী)-এও, বিশেষত, শৃঙ্গারশতক-এ সেই ছবিটিই পাই: স্মিতহাসিতে, লজ্জাভয়ে, মুখ ফিরিয়ে অর্ধকটাক্ষের চাহনিতে, কথায়, ঈর্ষাকলহে ও লীলায়–সমস্ত ভাবেই নারী পুরুষের বন্ধন। (১) নারী নরকের দ্বার, প্রলোভন ও পতনের হেতু। কিন্তু ভর্তৃহরি নারীকে মোহিনী ও সুন্দরী ছাড়াও অন্য ভাবেও দেখেছেন। প্রকৃত প্রেম অমৃতনিষেকে জীবনকে সঞ্জীবিত করে, নারীর ভূমিকা সেখানে আশীর্বাদের মতোই। মিলনে যে অমৃতলতা, অপ্রসন্ন হলে বিষবল্লরী।’ (৪৪) ‘এ সংসারে কুনুপতির ভবনদ্বারে প্রভু। সেবায় নিরত মনকে মনস্বী কেমন করে ধারণ করত, যদি জ্যোৎস্নাপুঞ্জের মতো এই পদ্মনেত্রা নারীরা না থাকত?’ (৩১) ‘সংসার, তোমার প্রান্তদেশ অনেক দূরে— মধ্যের ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠত যদি এই মন্দিরেক্ষণারা না থাকত।’ (৩৮)

মাঘের শিশুপালবধ কাব্যে কিন্তু নারী শুধুই সুন্দরী যুবতী এবং প্রকৃষ্ট ভোগ্যবস্তু। সেখানে নায়িকা, প্রতিনায়িকা (বা প্রতিযুবতী), দূতী, বারাঙ্গনা, জলকেলি, কাননবিহার, ইত্যাদির সুদীর্ঘ প্রথা সিদ্ধ বিবরণ আছে বাৎস্যায়নের নির্দিষ্ট ছকে। নারী সুরাপান করে–কপিশায়ন, পরিসুৎ, বারুণী, মৈত্রী, হালা, মৈরেয়, ইত্যাদি সুরার বহু নাম পাই। সহমরণের যুক্তি দেওয়া হয়েছে: সহমৃতা না হলে পরজন্মে ওই পতি পাওয়া যাবে না। (৯:১৩)

গণিকাকেও বারবার দেখা গেছে মাঘে, তার ক্রুর, লুব্ধ ভূমিকায়। এই একই চিত্র পাই দণ্ডীর ‘দশকুমারচরিত-এ, নারী সেখানে কুলকন্যা, কুলবধু বা গণিকা। দণ্ডীর দৃষ্টি বাস্তবমুখী, মোহবিমুক্ত, তাই নানা সামাজিক পরিবেশে এদের দেখা পাওয়া যায়।

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক-এ নারী কুলবধু ও গণিকা এই দুই ভুমিকাতেই আছে। কুলবধু নেপথ্যাচারিণী। ধূতা স্বামীগর্বে গর্বিতা, সামাজিক পরিচয়েই তাঁর আসন দৃঢ়। সেখান থেকে তিনি গণিকা বসন্তসেনার প্রদত্ত মুক্তমালা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ‘আর্যপুত্রই আমার আভরণ।’ নাটকের শেষে চারুদত্তের প্রেম এবং বসন্তসেনার মহত্বে অভিভূত হয়ে এবং কতকটা নিরুপায় হয়েও বসন্তসেনাকে সপত্নীরূপে স্বীকার করেন। বাসন্তসেনা গণিকা, চারুদত্তের প্রতি গভীর প্রেমে তাঁর জীবনে নবজন্ম ঘটেছে, সেখানে তিনি গণিকা থেকে প্রেমিকার ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি চারুদত্তের গুণমুগ্ধা; চারুদত্ত তাঁর রূপে মুগ্ধ, তবুতাঁর দৃষ্টি রূপকে অতিক্রম করে বসন্তসেনার মনটিকেও দেখতে পেয়েছিল। কাহিনি প্রাচীন, সেখানে শূদ্রকের কৃতিত্ব গণিকার প্রেমকে তার চরিত্রের মহিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করায়।

নারীচরিত্র চিত্রণে বোধহয় ভবভূতির বৈশিষ্ট্যই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মালতীমাধব নাটকে রাজাকে তুষ্ট করবার জন্যে মালতীর পিতা তাকে অপাত্রে সম্প্রদান করতে উদ্যত শুনে মালতী বলে, ‘বাবার কাছে রাজার তুষ্টিই বড় হল, মালতী কিছু নয়?’ যুগে যুগে অসংখ্য মেয়ের এই নালিশ একবার তো ভাষা পেল সাহিত্যে। উত্তররামচরিত-এ ভবভূতি সচেতন ভাবে বাল্মীকি রামায়ণে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধগুলির পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। এখানে দ্বিতীয় অঙ্কে সীতা রামের বিষয়ে স্পষ্টই বলেন, যিনি অকারণে আমাকে পরিত্যাগ করছেন’, ‘অন্যায় ভাবে আমাকে বনে পাঠিয়েছেন।’ তাঁর সখী বাসন্তী রামকে বলেন, লোকে বলে, যশ আপনার প্রিয়, কিন্তু

যশোবিরোধী এমন ভয়ঙ্কর কাজ আর কী হতে পারে?' (৩:২৭) তমসা সীতাকে বলেন, 'তিনি (রাম) নিজেই যখন তোমাকে ত্যাগ করছেন, তখন শুধু অশ্রুবর্ষণে তাঁর সান্ত্বনা পাওয়া কঠিন।' রামচন্দ্রকে সীতার অরণ্যসহচরী সীতা পরিত্যাগ নিয়ে ধিক্কার দিয়ে বলেন: 'তুমি তাকে বলতে–তুমি আমার প্রাণ, আমার দ্বিতীয় হৃদয়, নয়নের জ্যোৎস্না তুমি, অঙ্গের অমৃত। এই সব শতশত প্রিয়বচনে সেই মুগ্ধাকে অভিভূত করে, তাকেই— থাক, আর বলেই বা কি হবে?' (৩:২৬) শুধু অন্যান্যদের ভর্ৎসনাই নয়, ভবভূতি স্বয়ং রামকে তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হতে দিয়েছেন। সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোলে নিদ্রিতা সীতার দিকে চেয়ে রামচন্দ্র বলছেন, 'শৈশব থেকে লালন করেছি যে প্রিয়াকে, বন্ধুত্বে যার সঙ্গে আমি অভিন্ন হৃদয়, সেই প্রিয়াকে ছলনা করে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিচ্ছি, এ যেন গৃহপালিত বিহঙ্গীটিকে নিয়ে চলল শিকারী।' (১:৪৫) বলছেন, অস্পৃশ্য আমি, সীতাকে স্পর্শ করে দূষিত করছি।' কোলে নিদ্রিতা সীতার উদ্দেশে বলছেন, 'অকর্ম করায় পটু চণ্ডাল আমি, অয়ি মুগ্ধে ত্যাগ কর আমাকে; চন্দনতরুভ্রমে তুমি দুর্বিপাক বিষদ্রুমকে আশ্রয় করেছ।' (১:৪৬) এ নাটকে ভবভূতি অনেক নারীচরিত্র উদ্ভাবন করেছেন: তমসা, মুরলা, ভাগীরথী, পৃথিবী, আত্রেয়ী, বাসন্তী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি। এঁদের সকলেরই সহানুভূতি সীতার প্রতি; ফলে রামের নিষ্ঠুরতা নানা ভাবে সমালোচিত হয়েছে। নাটকের শেষ অঙ্কে রামসীতার পুনর্মিলন হয়তো শুধু বিয়োগান্তং ন নাটকং'— এ নির্দেশের বশেই নয়; হয়তো সমাজের কাছে বারে বারে দুবিচার পেয়েছেন যে সীতা তাঁকে ফিরে কিছু সুখ দেওয়ার বাসনায় বাল্মীকির কাহিনিকে তিনি অন্য ধারায় প্রবাহিত করেছেন। নাটকের শুরুতেই সূত্রধার বলছেন, 'যেমন নারীর, তেমন ভাষার সাধুত্ববিষয়ে মানুষ দুর্জন।' (১:২) নট শুধরে দিয়ে বলছেন, 'বল, অতি দুর্জন!' এই চিরাচরিত অন্যায়ের কিছু প্রতিকার যেন এ নাটকের একটি উদ্দেশ্যে। নাটকের অন্তে ভারতবাক্যে ভবভূতি বলছেন, 'জগতের মাতার মতো,

গঙ্গার মতো মাঙ্গলিক ও মনোহরা এই কথা, যার রূপ অভিনয়ে বিন্যস্ত হল। এই কথা পাপ থেকে উদ্ধার করুক, শ্রেয়কে বর্ধিত করুক। পরিণতপ্রজ্ঞ শব্দব্রহ্মবিৎ বাল্মীকির এই বাণী পণ্ডিতেরা বিশেষ ভাবে চিন্তা করুন।’ (৭:২০) রামায়ণকাহিনি প্রাচীন, পরিণতপ্রজ্ঞ কবি এখানে ভবভূতি, ‘স্বয়ং সরস্বতী যাঁকে দাসীর মতো অনুগমন করেন।’ (১:২) তাঁরই লেখনীতে এই প্রাচীন কাহিনি যে নবরূপ পরিগ্রহ করেছে তার প্রতিই কবি পাঠক ও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। রামসীতার কাহিনি যে সামাজিক দুর্বিচারের চিহ্ন বহন করে, পরিমার্জনার দ্বারা তার একটি মনন-শোধিত রূপ এ-নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে, তাই এ-কাহিনি মাতার মতো, গঙ্গার মতো, মাঙ্গলিক ও মনোহরা।

কলহণের রাজতরঙ্গিণী-তে নারী ভাল মন্দ দুই রূপেই চিত্রিত, সেখানে নারীর নানা পরিচয়: রাস্ত্রী, উপপত্নী, গণিকা, কুট্টনী, দেবদাসী, অবরুদ্ধা (বা রক্ষিতা) কুলবধূ, মাতা। সমাজের মূল্যবোধ রক্ষণশীল: পতিই নারীর দেবতা, সতীত্ব একটি পবিত্র ব্যাপার। সতীর তেজও বিঘোষিত হয়েছে সরবে: সতী, দেবতা ও ব্রাহ্মণের কোপে ত্রৈলোক্যেও বিপ্লব হয়।’ (১:২৭২) নারী ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্যেই (৩:৫১); নারী স্বভাবতই চঞ্চল, কে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবো? (৩:৫১৮, ৫১৯) নারী সুরাপান করে, অত্যাচারী রাজা নিরপরাধা নারীর অঙ্গহানি ও গর্ভপাত ঘটায়, রাষ্টিক বা সামাজিক ইষ্টসিদ্ধির জন্যে প্রয়োজন মতো নারীকে ডাইনি বলে অত্যাচার করা হয়। থেকে থেকেই কলহণ নারীনিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। রাজা ডোম্বীর প্রতি আসক্ত হওয়াতে রাজ্য অশুচি হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য বণিক গোনপা-র স্ত্রীকে কামনা করলে বণিক স্ত্রীদান করতে চান। রাজা অসম্মত হলে বলে, ‘মন্দিরে দেবদাসীরূপে দান করছি, সেখান থেকে নিয়ে নিন।’ (৪:৩৬) নারী ক্রয়ের সংবাদ শুনি: তুরস্ক বণিক বহু দেশ থেকে নারী সংগ্রহ করে বিক্রি করত। (৭:৫২০) কলহণ অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে সহমরণে সতী হওয়ার

বিবরণ দেন; এক স্ত্রী সহমরণে যাননি, তার প্রভূত নিন্দাও তিনি করেন। (৮:২:৩৪৩) কলহণ ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতির যুগের মূল্যবোধকেই সমর্থন করেছেন; তবে কোনও রাজা ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে অনাচারী হলে কলহণ রাজাকেই দোষ দিয়েছেন, নারীকে নয়। যেমন বর্ণসংকর সম্বন্ধেও তিনি নারীকে দায়ী করেননি, যেমন করেছে ভগবদগীতা।

তিন

এ যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে নারীকে প্রেমের বাতাবরণে ছাড়া অন্য ভাবে দেখা হয়নি। সে-ও যে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি, পারিবারিক ভূমিকার বাইরে সে-ও যে একজন নাগরিক, তারও যে একটা চিন্তা কল্পনা ও স্বপ্নের জগৎ থাকতে পারে যেখানে তার নিজস্ব সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতাবোধ থাকতে পারে। এ সম্বন্ধে এ সাহিত্যে কোনও চেতনাই নেই। এই দিক থেকে বসন্তসেনার চরিত্রে শূদ্রক অন্য একটি মাত্রা আনতে পেরেছেন; সে শুধু প্রেমিক নয়; সে প্রভু, নাগরিক, গৃহকর্ত্রী ও সখী। অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে নারী প্রেমিকা ছাড়া অন্য পরিচয়েও দেখা দেয়, যেমন গ্রিক নাটকে; অবশ্য রোমান নাটকে বিশেষত নিউ অ্যাটিক কমেডিতে নারীর মুখ্য ভূমিকা প্রেমিকারই। এ কথাও সত্য যে অন্য যে ভূমিকাতেই নারী অবতীর্ণ হোক না কেন সেটিও পুরুষ পরিকল্পিত পূর্বনিরূপিত একটি ছক, তার সীমার মধ্যেই নারীর সঞ্চরণ। তবু সেখানে তার প্রসার কিছু বেশি, তার সত্বর অন্য কিছু দিক স্বীকৃত; শুধু দেহমাত্রসার নায়িকার যান্ত্রিক ভূমিকাতে ভোগ্যবস্তু রূপে সে দেখা দেয়নি। সংস্কৃত ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যে কিন্তু প্রেমই তার একমাত্র বাতাবরণ; তাই গুপ্তপ্রণয়, দূতী, সংকেতস্থল ও অন্তঃপুরের কুঞ্জকাননের মধ্যেই তার বিচরণ। নায়িকার শ্রেণিবিভাগও প্রেমের অবস্থা অনুসারেই: পূর্বরাগ, মান, মিলন ও বিরহ। প্রকারভেদও তাই: অভিসারিকা,

বাসকসজা, মানিনী, খণ্ডিতা, স্বাধীনভার্তৃকা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভাতুক, বষ্মাবলোকিনী, ইত্যাদি। দেহ অনুসারে তার ভাগ শঙ্খিনী, পদ্মিনী, হস্তিনী, ইত্যাদি। গৃহে সে স্বামী সন্তান ও শ্বশুরকুলের সেবায় একনিষ্ঠ থাকবে এই-ই প্রত্যাশিত। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবে যেমন প্রেমিকরূপে তার প্রতিষ্ঠা, শাক্তসাহিত্যের প্রভাবে তেমনই তার মাতৃরূপ বিঘোষিত। সেখানে তার প্রতি সমাজের আচরণের ক্ষতিপূরণ হয়েছে দেবী ও শক্তিরূপে তার স্তবের দ্বারা। তখন আদর্শায়িত সেই নারী হয় অসুরদলনী বিশ্বজননী, নয়। পরমা নায়িকা শ্রীরাধা। সাংখ্যে ও তন্ত্রে সে পরমা প্রকৃতি, আদ্যশক্তি। এই কাল্পরূপের অন্তরালে বাস্তবে যে নারী ছিল, সে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সব মৌলিক মানবিক অধিকারে বঞ্চিত, ভোগ্যবস্তু ও সেবিকা মাত্র।

খ্রিস্টিয় পঞ্চম থেকে একাদশ শতকের ভারতবর্ষ হল হিন্দু ভারতবর্ষ। এক দিকে যেমন বৌদ্ধ জৈন প্রভাব সমাজ থেকে অন্তর্হিত, অন্যদিকে তেমনই মুসলমান রাজত্বের সূচনা তখনও হয়নি। এই ভারতে শূদ্র ও নারী একেবারে নিচের তলার বাসিন্দা; খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের বেদাঙ্গ সাহিত্য থেকেই এদের নাম একনিঃশ্বাসে উচ্চারিত। খ্রিস্টিয় প্রথম দ্বিতীয় শতকে মোটের ওপর ভগদগীতাও মনুসংহিতা-র স্বার্থপ্রণোদিত প্রভাবে তাদের স্থান তৎকালে ও উত্তরকালের জন্যে স্থিরীকৃত হয়ে গেল। পঞ্চম ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সমাজে কিছুস্থিতিস্থাপকতা ও সজীবতা ছিল, তখনও পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। নানা নতুন চিন্তার ও ধারণার ঘাতপ্রতিঘাত এসে দেশের মনোজগতে পৌঁছত। সপ্তম শতকের পরে ইয়োরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল, রইল শুধু দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে, সেখান থেকে ভারতবর্ষ নতুন কোনও চিন্তা বা ধারণা পায়নি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরে আর্যাবর্তে অত বড় সাম্রাজ্য আর গড়ে ওঠেনি, আর্যবর্ত ক্রমে খণ্ডিত হয়ে গেল ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্যে। সংকীর্ণ দ্বৈপায়ন মনোবৃত্তির প্রসার

ঘটিল; বিজ্ঞানের কিছু উন্নতি ঘটলেও চিন্তার জগতে আর নতুন ঢেউ এসে লাগিল না। গতানুগতিকের চর্চা, টীকাভাষ্য ও স্মৃতিরই বিস্তার ঘটল। অষ্টম থেকে দশম শতকে অর্ধমাগধী থেকে অবহট্টের বিকাশ ঘটল, দশম-একাদশ শতকে কথ্য ভাষা ও লিপির প্রবর্তন হল ধীরে ধীরে। আঞ্চলিকতার স্বল্পসলিল পঙ্কিলতার মধ্যে স্রোতহীন জীবন আবর্তিত হতে থাকল। আর্যাবর্তে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক সভ্যতার মুক্ত বায়ু গতি হারালে; বিচ্ছিন্ন, সংকীর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ এক সভ্যতার উদ্ভব হল যার প্রভাবে সমাজ ক্রমেই বেশি রক্ষণশীল হয়ে উঠল। এ রক্ষণশীলতার সবচেয়ে বেশি করে দণ্ডিত হয়েছে নারী ও শূদ্র। পুরাণ, স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রের যুগ এটা, এ সব গুলিই দৃঢ় করে তোলে এই রক্ষণশীলতাকে।

পরিশেষে ভেবে দেখা উচিত এই যুগে করা লিখছে ও কাদের জন্য লিখছে? ব্যাপক গণশিক্ষা তখন ছিল না, ফলে লেখক ও পাঠক একই শ্রেণির লোক: শিক্ষিত, মোটামুটি অবস্থাপন্ন ও দ্বিজ! অল্প কিছু বিত্তবান শূদ্র শিক্ষার সুযোগ হয়তো পেত, তারা পড়তে পারত কিন্তু সেই সম্পত্তিমান শূদ্রের শ্রেণিচরিত্র ততদিনে বদলে ওই পূর্বের শ্রেণির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত। ফলে সাধারণ ভাবে শূদ্র অবজ্ঞাত; সাহিত্যে তার প্রতিবিম্ব হল সে মুর্খ বুদ্ধিহীন, অতএব শ্লেষ বিদ্রুপ ও কৌতুকের লক্ষ্য। ব্যতিক্রম কদাচিৎ আছে, যেমন মৃচ্ছকটিকে ব্রাহ্মণ বিদূষক মৈত্রেয় মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে, শূদ্র স্থাবারক তার চেয়ে বুদ্ধিমান। অন্যত্রও ব্রাহ্মণ বিদুষক মাঝে মাঝেই নিবুদ্ধির ভূমিকায় দেখা দিয়েছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে বিদূষক একটি পূর্বনির্ধারিত ছাঁচ, সেখানে তার নিবুদ্ধিতা ততটা ব্যক্তির নয়, যতটা প্রতীকী। রাজতরঙ্গিনী-তে শূদ্র অশিক্ষিত, রুচিহীন; ডোম্বী বর্বর; কিন্তু কলহণ বড় শিল্পী এবং সৎ ঐতিহাসিক; তাই অপক্ষপাত চিত্রণে দেখি দ্বিজ ব্রাহ্মণও বহুবার ওই রূপে চিত্রিত। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও মন্ত্রী স্বার্থসর্বস্ব; ক্ষত্রিয় রাজা

ইন্দ্রিয়পরায়ণ; কায়স্থ কুটিল, অসৎ; বরং সাধারণ শূদ্র সৈন্য সৎ ও প্রভু ভক্ত। অসৎ রাজার রাজত্বে সাধারণ শূদ্রগরিষ্ঠ প্রজাবৃন্দের দুর্গতির বিবরণের মধ্যে এবং সে দুর্গতির দায়িত্ব রাজাকে অর্পণ করে কলহণ শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেছেন, কবি-ঐতিহাসিকের সততা রক্ষা করেছেন। নারী সম্পর্কে বহু নিন্দাবাদ করেও তিনি বারে বারেই নিঃস্বর্থ প্রজাহিতৈষিণী, আত্মত্যাগে অকাতর বহু নারীকে চিত্রিত করেছেন। তেমনই ভবভূতি যে-সমাজে বাস করতেন তা নারী সম্পর্কে নিষ্ঠুর, কিন্তু কবি ভবভূতির ক্রান্তদর্শিতা তাঁকে এমন একটা লোকোত্তর বোধে উর্ত্তীর্ণ করেছিল যেখানে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল যে, নারী সমাজে কখনও সুবিচার পায়নি– যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ।’ সামান্যতম স্বলনে এবং অস্বলনেও নারীনিন্দায় সমাজ পঞ্চমুখ। কবির পরিশীলিত সংবেদনা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে সীতা চরিত্রে, সমাজকে সমালোচনা করেছে রামচরিত্রে। কালিদাসের ঔশীনারী, সীতা ও শকুন্তলাতেও এ প্রতিবাদ মুখ্য বা গৌণ ভাবে ভাষা পেয়েছে। যেমন রঘুবংশ-এর ও উত্তররামচরিত-এর অনুতপ্ত বেদনাদীর্ণ রামের রূপায়ণে সহস্রাব্দের সামাজিক মূল্যবোধ পুন্যমূল্যায়িত।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজের মুখপাত্র উত্তম কবিরা যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও বোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে রচনায় প্রবৃত্ত হন তার দাবি হল: শুধু নিজের ও শ্রোতার শ্রেণিচরিত্রের প্রবক্তা হলেই চলবে না, সেই শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সমালোচকও হতে হবে এবং আগামীর পথিকৃৎও হতে হবে, কারণ কবি ক্রান্তদর্শী। সাধারণত, কোনও নতুন উৎপাদনব্যবস্থা ও সম্পর্কগুলি যখন একটা যুগে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে তখন তার প্রথম দিকের কবিরা সমাজের শ্রেণিবিন্যাস ও শ্রেণিচরিত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে অবচেতনের আভাসে অবহিত থাকেন, তার চিত্রণ ও সমালোচনা করেন, কখনও বা পুনর্বিন্যাসের পথ দেখাবার চেষ্টা করেন। পরবর্তী কবিরা সে সম্বন্ধে আর তত সচেতন

থাকেন না; তাঁরা পূর্বনির্ধারিত কাঠামোকে মেনে নিয়ে তার মধ্যেই নানা আঙ্গিকের কসরৎ ও মুন্সিয়ানা দেখাবার চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকেন। এই যুগে শূদ্রের শোষণ ও উৎপীড়ন দ্বিজ ও বিত্তবানু-শাসিত সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার পক্ষে সুবিধার ছিল। নারীকে সেবিকা ও ভোগ্যবস্তুর ভূমিকায় রেখে পদানত রাখাও পুরুষ ও তার পরিবারের পক্ষে বিশেষ সুবিধার ছিল; তাই এ দুজনের সম্পর্কে কবি-নাট্যকাররা ধর্মশাস্ত্রকারদের সঙ্গে সর্বদাই একমত। কিন্তু সংবেদনশীল স্বপ্নদশী সাহিত্যশিল্পীই শুধু এর ব্যতিক্রম। এঁরাই এক বিশেষ অর্থে বৈপ্লবিক সমাজচেতনায় আগামীর পথিকৃৎ।